Registered No. C. 563.

বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২২ সাল। [১ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১৷৹ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

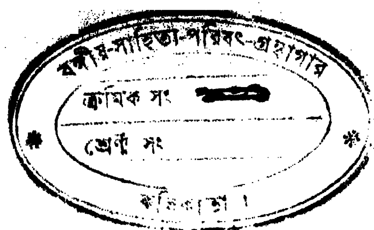
১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥৹ আনা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।৹ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

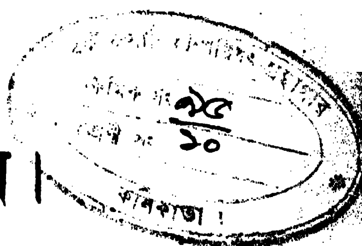
৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥৹, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২॥৹, সিকি পৃষ্ঠা ১॥৹, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵৹ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।



উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

নববর্ষ—১৩২২।

(১)

মানুষকে জাগিতে হইবে। জাগিবার চেষ্টাই মানুষের মনুষ্যত্ব। আপনি জাগিয়া আর পাঁচজনকে জাগান ইহাই মানুষের কার্য্য। ইহাতেই ব্যক্তির কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণ।

উপস্থিত সময়ে বহু সংশয় জীবকে আক্রমণ করিয়াছে। সংশয়ের আক্রমণে মানুষ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। মানুষ কি করিবে বুঝিতে পারিতেছে না।

মানুষের কর্ম্মগুলি মানুষ বুঝুক। বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করুক। ইহাতেই মানুষ জাগিবে। আর আপনি জাগিয়া অন্যকে জাগাইতে পারিবে।

আজ কাল বহুলোকে কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন। এ সমস্ত উপদেশে যদি বিরোধ থাকে তবে মানুষের বড় বিপদ্। সেই বিপদ্ আসিয়াছে।

আমার উপদেষ্টা এই উপদেশ দিয়াছেন—সকলেই এই কথা বলিতে শিখিতেছে। কিন্তু উপদেষ্টাগণ যদি আপনার স্বেচ্ছাচারমত উপদেশ করেন তবে লোকের মধ্যে বিরোধ আসিবেই। কাজেই সমাজ বলহীন হইয়া যাইবে। হইতেছেও তাই।

সকলে একরূপ উপদেশ পায়—ইহার কি কোন উপায় আছে?

আছে বৈকি। উপদেষ্টাগণের একমত হওয়া আবশ্যক। ইহা হইবে কিরূপে?

যে উপদেশ দ্বারা সকলে মিলিতে পারি—সেই উপদেশ যেখানে পাওয়া যায় তাহাই আমাদের অবলম্বন।

এই অবলম্বন—শাস্ত্র। শাস্ত্রের যে সমস্ত উপদেশ সকলে একমত হইয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহাই সকলের গ্রহণ করা উচিত।

শাস্ত্রশ্রদ্ধা ভিন্ন সকলের একমত হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য শাস্ত্রশ্রদ্ধাই প্রথম কার্য্য। যিনি যাহা উপদেশ করিবেন তাহা শাস্ত্রীয় উপদেশ হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন অন্য উপদেশ অগ্রাহ্য করা আবশ্যক।

শাস্ত্র কিন্তু অধিকারী বিচার করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইহা না করিলে একজনের উপদেশ অন্যের প্রতিপালন করা কথনই সম্ভব নহে।

জাগিতে হইলে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে আলস্য, অনিচ্ছা ত্যাগ করা চাই। শাস্ত্রের আজ্ঞা পালন জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই কল্যাণপথ।

শক্তিগুলিকে জাগানই মানুষের জাগা। মানুষ আপন শক্তি জাগাইবার জন্য চেষ্টা ত করিবেই, কিন্তু নিজের চেষ্টায় এ কার্য্য পূর্ণভাবে হইবে না। এই জন্য ঈশ্বরকেও অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ঈশ্বরই সর্ব্বশক্তির আধার। শক্তি তাঁহার। তাঁহার নিকটে শক্তির প্রার্থনা এবং শক্তি সঞ্চয় জন্য তাঁহার আজ্ঞামত নিত্যকর্ম্ম—ইহাই প্রয়োজন।

শ্রীভগবান্ জীবকে শক্তি দিয়াছেন। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে তাঁহার প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করা যায় না। সেই জন্য তাঁহার আশ্রয়ে নিত্য তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারই প্রদত্ত শক্তির ব্যবহার করা চাই। ইহা হইলেই জীবের মঙ্গল হয়।

তিন প্রকারের শক্তি শ্রীভগবান্ মানুষকে দিয়াছেন। সকল মানুষকেই দিয়াছেন। এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে যাঁহার স্বভাবে যে শক্তি প্রবুদ্ধ করা সহজ-সাধ্য তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে। একটিতে জোর দিয়া অন্যগুলিকে আনুষঙ্গিক ভাবে রাখিতে হইবে। তবেই ক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তি জাগিল। ইহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কল্যাণ নাই। বলা হইতেছে, মানুষের মধ্যে তিন প্রকারের শক্তি আছে। প্রাণশক্তি, মনঃশক্তি আর বুদ্ধিশক্তি। এই

শক্তিগুলিকে ছন্দমত স্পন্দন করিবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কার্য্য করাই প্রকৃত জাগ্রত হওয়া।

প্রাণশক্তির ছন্দমত স্পন্দন হয় প্রাণায়াম দ্বারা। মনঃশক্তির ছন্দমত স্পন্দন হয় উপাসনা দ্বারা, আর বুদ্ধিশক্তির ছন্দমত স্পন্দন হয় বিচার দ্বারা। প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগপথ, উপাসনাদি ভক্তিপথ, আর বিচার জ্ঞানপথ। যাহার যে টিতে স্বাভাবিক রুচি তাহাই বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়া, অন্যগুলিকে বিঘ্ন নিবারণের জন্য ব্যবহার করিলেই মানুষ ঈশ্বরভাবে জাগ্রত হইতে পারে।

ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যাতে এই মিশ্রপথ ধরিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। বৈদ্য, কায়স্থাদি সকল জাতির মন্ত্র জপ, গায়ত্রী জপাদিতে ইহারই উপদেশ আছে।

তিনবার করিয়া বসা আবশ্যক। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক—সকল সংসারে সকলেরই তিনবার করিয়া বসার অভ্যাস করা উচিত। তিনবারে বিশেষ ভাবে শ্রীভগবান্‌কে ডাকা হইবে। আর সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম লইয়া সাধারণ ভাবে থাকিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রীয় উপদেশ। ইহা করিতে পারিলে, শক্তির অপব্যবহাররূপ পাপ আর হইবে না।

শ্রীভগবানের অপার করুণা। পাপ যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাও তিনি ক্ষমা করেন। যদি কেহ তাঁহার আজ্ঞামত চলিতে চেষ্টা করে, আর প্রার্থনা করে—হে মঙ্গলময়, আর আমার মন্দ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই। আমি আর মন্দ কর্ম্ম করিব না। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার আজ্ঞামত চলিতে প্রাণ-পণ করিতেছি। তুমি সহায় হও। এইরূপ প্রার্থনা অবলম্বনে তাঁহার আজ্ঞা-মত নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ আলস্য, অনিচ্ছা দূর করিয়া সকল শক্তি প্রবুদ্ধ করিতে পারিবে।

মানুষ, পশু আর দেবতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। একটু পশ্চাতে হটিলেই হয় পশু, আবার ভাল করিয়া উপরে উঠিলেই হয় দেবতা। মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। ইহার জন্য এই জীবন।

এই পৃথিবীই এক দিকে নরক, আর এক দিকে স্বর্গ। মানুষ একটু পশ্চাৎ হটিলেই পৃথিবীকে করে নরক, আবার ভাল করিয়া উপরে উঠিলেই এই পৃথিবীকে করে স্বর্গ।

মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। এই পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গৃহী হও। পৃথিবীকে স্বর্গ করিবার সোপান প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য বাদ দিয়া কর্ম্ম কর, ক্রমে দেখিবে পৃথিবী নরকে নামিতেছে।

পশু ভাব ত্যাগ করিয়া দেবভাব লাভ করিতে হইবে। এ শক্তি শ্রীভগবান্ মানুষকে দিয়া দিয়াছেন। এ শক্তির অপব্যবহার যখন মানুষ করে, তখন মানুষ ক্রমে নীচে নামিতে থাকে। শেষে মানুষের দেহটা পর্য্যন্ত আর পায় না। এই দেহটা হারায়। হারাইয়া পায় পশুর দেহ। প্রথমে ভিতরে পশু হইয়া যায়। স্বার্থপরতাই জীবনের অবলম্বন হয়। জড়তা, কর্ম্মে অনিচ্ছা এইগুলি স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। রিপুগুলির কার্য্যের জন্য একটু চলা ফেরা মাঝে মাঝে লাগে। আহার, ভয়, মৈথুনাদি জন্যই চলনটা হয়। নতুবা শুধু ঝিমান। আফিঙ খোরের, বা নেশাখোরের শেষ অবস্থা দেখিলেই হয়।

শক্তির ব্যবহার কর। প্রাণ মন বুদ্ধিকে ছন্দমত নাচাও। শক্তির ব্যবহার হইবে। শরীর স্বচ্ছন্দ থাকিবে। মন ছন্দে নাচিয়া ভগবান্ লইয়া থাকিবে এবং বুদ্ধি ছন্দমত বিচার করিয়া চিরদিনের তরে স্থায়ী ভাবে দেবভাব পাইবে।

বল চাই। বলই জীবনের সার বস্তু। বলবান্ সকলই লাভ করিতে পারেন। আত্মাও বলহীনের লভ্য নহেন।

চীৎকার করা বলহীনতার চিহ্ন। বলবান্ কখন দুঃখের কথা বলেন না। দুঃখের প্রতীকার জন্য প্রাণপণ করেন। শক্তিলাভের কর্ম্ম আছে। এই কর্ম্ম হইতেছে প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে ছন্দমত স্পন্দিত করা। ইহাতে শরীরের এবং মনের—উভয়েরই বল লাভ হয়। এই বল লাভ করিয়া যে দিকে লাগাও সেই দিকেই কৃতকার্য্য হইবে।

কতকগুলি কার্য্য একা করিতে হয়; কতকগুলি কার্য্য দশজনে মিলিয়া মিশিয়া করা চাই।

মনে কর দেশের অর্থবৃদ্ধি। এ কার্য্যে একটা সমবেত শক্তি আবশ্যক করে। যাঁহারা কিন্তু সমবেত হইয়া কার্য্য করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্ততঃ মানসিক বল থাকা আবশ্যক। মানসিক বল যাঁহাদের নাই, তাঁহারা সৎ হইতে পারেন না। সৎ না হইলে, সমবেত শক্তির সৎ ব্যবহার হইতেই পারে না।

এক প্রকার সর্প আছে তাহাদের গায়ের রং গাছের পাতার মত। ইহারা

দুর্ব্বল। শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা যে বস্তুর মধ্যে থাকে, তাহাদের সমান বর্ণ ধরিয়া থাকে। মানুষও যদি দুর্ব্বল হয়, তবে অন্যের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা জন্য ইহারা দলের মত সাজিয়া থাকে। কিন্তু যিনি বলবান্ তিনি আপনার ন্যায়পথ যদি বহুলোকের মতের বিরোধীও হয়, তথাপি কখনও তাহা ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বলতা দেখান না।

দেশের অর্থবৃদ্ধি জন্য পরিশ্রম ও অর্থ একত্র হওয়া চাই। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে যেখানে অর্থ সেখানে স্বার্থপরতা, পরোপকার বিমুখতা, শ্রম বিমুখতা, অনিচ্ছা প্রায়ই দেখা যায়। আর যেখানে পরিশ্রম করিবার শক্তি আছে, সেখানে প্রায় অর্থাভাব দেখা যায়। আর অর্থ ও পরিশ্রম যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানে লোভগ্র স্বার্থপরতা, অন্যের উপর বৃথা কর্তৃত্ব ইত্যাদি নীচবৃত্তি দ্বারা দেখা যায় প্রকৃত স্থায়ী কার্য্য প্রায়ই হয় না। মন্দলোক একত্র হইয়া অনেক মন্দ কার্য্য করে। সেইরূপ ভাললোক একত্র হইলেও অনেক মঙ্গল কার্য্য সাধিত হয়। ভাললোক একত্র হইয়া অর্থ ও পরিশ্রম যদি সংগ্রহ করেন, তবেই দেশের যথার্থ উপকারের কার্য্য করা হয়।

আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। শ্রুতিই আমাদের—শুধু আমাদের কেন জগৎ যদি বুঝে তবে জগতেরও বটে—সমস্ত শক্তির ভাণ্ডার। অধুনা শ্রুতিবাক্যের যেরূপ অসৎ ব্যাখ্যা দেখা যায় তাহাতে বলবান্ হওয়া দূরে থাক, মানুষ দুর্ব্বল হইয়া ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে বলিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। "যমেবৈষ বৃণুতে" এই কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপে লওয়া যাউক। বচনে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায় না, শাস্ত্রজ্ঞানেও লাভ করা যায় না, সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেও লাভ করা যায় না—তবে তিনি যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহারই তিনি লভ্য হয়েন। সত্য কথা। কিন্তু কাহাকে তিনি বরণ করেন? যে কিছুই করে না, যে তাঁহার আজ্ঞা মানে না তাহাকে, না যে তাঁহার আজ্ঞামত কর্ম্ম করে তাহাকে?

শ্রীভগবান্ কৃপা করেন তাঁহাকে যিনি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করেন। ইহাতে হইবে না, উহাতে হইবে না—এই বলিয়া লোকে যে লোককে কর্ম্মবিমুখ করে ইহাই আজ কালকার দিনের নিদারুণ ব্যাধি। শাস্ত্রমত কর্ম্ম কর তবে পরমেশ্বরের কৃপা অনুভব করিতে পারিবে, নতুবা নহে।

যাঁহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মও করেন তাঁহাদের মুখেও শুনা যায় কোন দিন ভাল

হয় কোন দিন হয় না। যে দিন ভাল হয় সেদিন বেশ স্ফূর্ত্তি, আর যে দিন না হয় সে দিন বড়ই মলিনতা, বড়ই দুঃখ।

আমরা বলি যে দিন ভাল হইল সে দিন ত পূর্ব্ব সুকৃতির ফলেই ইহা হইল। প্রাক্তন শুভকর্ম্ম যখন ফলদান করে, তখন মানুষের ভালই হয়। ইহাতে মানুষের বিশেষ কিছুই লাভ নাই। কিন্তু যে দিন অশুভ কর্ম্ম ফলদান করিতেছে যে দিন কিছুই করা যাইতেছে না সে দিন যদি যথার্থ পুরুষকারে ঐ আলস্য অনিচ্ছা তাড়াইতে না পারা গেল, তবে আর সাধনা হইল কি?

তাই বলিতেছি, আলস্য অনিচ্ছা দূর করিয়া রজস্তমকে পরাস্ত করিয়া সত্ত্ব-গুণ জাগানাই তপস্যার উদ্দেশ্য। লয় বিক্ষেপ দূর করাই তপস্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ভাবে যখন রজস্তম বশীভূত হইয়া ইহারা সত্ত্বের অধীন হইয়া যাইবে, তখন ঠিক ঠিক ধর্ম্ম কর্ম্ম হইবেই। রজস্তমকে পরাজয় করিবার যে বল, তাহাই হইল যথার্থ বল, যথার্থ শক্তি।

এখন আমরা ধর্ম্মজগতে যাহা আর এক বৎসর ধরিয়া করিতে হইবে তাহার কথা বলিব।

তোমার আজ্ঞাপালনে কার না ইচ্ছা? যারে সংসারের রূপ একটু দেখাইয়াছ—যারে এই কারাগারকে কারাগার বলিয়া একটু বুঝাইয়াছ—সে তোমার কথামত না চলিয়া আর কি করিবে?

চলিতে গিয়াও যে চলিতে পারে না—এ রঙ্গ কার? সর্ব্বদা বলিয়া দিতেছ চল এই পথে, নানাভাবে বলিতেছ এই পথে চলিলে ভাল হইবে—আবার চুপি চুপি কারে বা বলিতেছ এপথে যাইতে দিও না? এ রঙ্গ কি তোমার?

না না। এ সব তুমি কর না। মানুষকে তুমি সব শক্তি দিয়াছ। আবার স্বাধীনতাও দিয়াছ। মানুষের যাহা ইচ্ছা তোমার কাছে চাহিয়া লয়। এ রঙ্গও তোমার।

মানুষ করিবে কি? চলিতে চেষ্টা করে—যথার্থ প্রাণে চেষ্টা করে—এ চেষ্টার উদ্রেক তুমিই কর, আবার বাধা তুমিই দাও। বল মানুষ কি করিবে?

মানুষ মরুক এই কি তোমার ইচ্ছা? মানুষ শুধু যাতনা পাউক এই কি তুমি চাও?

না এ ইচ্ছা তোমার হইতে পারে না। তোমার স্বভাবে ইহা হয় না।

তবে এ ক্ষেত্রে কথাটা কি ?

কথাটা বুঝিবার কথা বটে। কিন্তু অত বুঝিয়া আর কাজ নাই। যেমন ভাবে চলিতে হইবে এই বর্ষারম্ভে আর একবার বলিয়া দাও।

এ বলা যে তোমার বলা—এ সম্বন্ধে যেন আর সন্দেহ না রাখ। অসংশয়ে যাহাতে করিতে পারি তাই করিয়া দাও।

সর্ব্বদা হরি হরি কর। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কর। হরি শ্বাসের মত হইয়া যাউক। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় শ্বাস যেমন চলিতেছে, হরি হরিও তেমনি শ্বাস চলার মত চলুক। আগে সর্ব্বদা ইচ্ছায় চলুক, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া চলুক। তার পরে না হয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও চলুক। কিন্তু জাগিলেই যেন প্রথমে লক্ষ্য পড়ে—শ্বাসের সহিত হরি হরি চলিতেছে।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই। ঘুমাইয়া পড়া ত একেবারে বন্ধ করিবে না। সেই জন্য আরও কত কি তুলিয়া অন্যমনস্ক কর।

হরি ছাড়া আর যা উঠে তাহাও যেন হরিই অন্যরূপে আসিতেছেন—এইটী স্মরণ করার অভ্যাস করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়।

যাহাকিছু চক্ষুর সম্মুখে বা কর্ণের সম্মুখে আসিবে তাহাই তোমারই অন্যরূপ। তরঙ্গ যে ভাবে উঠুক সে তরঙ্গ জলই—এইটি যেন সর্ব্বদা ধরা থাকে। সুখও হরি, দুঃখও হরি। ভাবও হরি, অভাবও হরি। রজস্তমও হরি, সত্ত্বও হরি। সঙ্কল্প বিকল্পও হরি, সঙ্কল্প বিকল্প না থাকাও হরি। শরীরটাও হরি, মনটাও হরি। এই হউক। কোন দিন ভাল হওয়াও তুমি, ভাল না হওয়াও তুমি। এইটি নিঃসন্দেহে বুঝিয়া সকল অবস্থাতে যেন চিত্তটা প্রসন্নই থাকে।

কষ্ট যখন হইতেছে তখন অন্ততঃ মনে হউক কষ্টরূপে তুমিই আসিয়া কি যেন কি কল্যাণ করিতেছ। জগতে যাহা কিছু হইতেছে, কোথাও কোন প্রকার অকল্যাণ হইতেছে না। অসংশয়ে এইটি ধারণা হইয়া যাক্।

আর তৃতীয় কথা কি ?

হরি হরি জপা প্রথম। জপের বিঘ্ন যাহা তাহাও হরির খেলা দেখিয়া শান্ত থাকা দ্বিতীয়। শেষ কথা বিঘ্ন যাহা মনে হইতেছিল, তাহা সত্য সত্য উঠিতেছে না। যাহা উঠার মত মনে হইতেছিল তাহা কল্পনা—তাহা মিথ্যা। সত্য সত্যই উঠিতেছে না। হরি হরিই আছেন, সর্ব্বদা আছেন। যা উঠে তাহাও হরি। সত্যই আর কিছুই উঠে না। বৎসর ধরিয়া ইহারই অভ্যাস হউক।

তার পর অন্নচিন্তায় যে হরি হরি হয় না বল তাহার উত্তরে বলি আহার বিহার চলে, একটু স্ফূর্ত্তি একটু আমোদ, একটু রঙ্গ রস সবই চলে কেবল হরি হরি চলে না? এও কি কথা গা? যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? যার যতটুকু সময় আছে সে ততটুকু হরি হরি করা অভ্যাস করুক। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে যাহা হয় তাহা ত হইবেই। তবে সেজন্য গালে হাত দিয়া ভাবিয়া লাভ নাই। তাই বলা হইতেছে ত্রিসন্ধ্যা কর আর হরি হরি সর্ব্বদা কর। তোমার কাতর প্রার্থনা শ্রীহরি শুনেন। এবং বিঘ্ন সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহার কাছেও রাখেন।

সাধু দর্শনে।

তোমাতে আমাতে, আকাশ পাতাল,
ব্যবধান দেখি আমি,
পূতিগন্ধময়, নরক আমাতে,
তোমাতে স্বরগ ভূমি।
ধরমের জ্যোতি, তোমার হৃদয়,
সদা আলোকিত করে,
আমার অন্তর, আছে নিরন্তর,
ঘোরতর অন্ধকারে।
আনন্দ তোমায়, উজল প্রদীপ,
জ্বালিয়া আরতি করে,
নিরানন্দ সদা, নির্ব্বাণ প্রদীপ,
রেখেছে আমার তরে।
দুঃখ দেখে তুমি, কাতর হইয়া,
ভাস নয়নের নীরে,
আমার হৃদয়, পাষাণ এমনি
ফিরিয়া দেখিনা তারে।

স্বার্থ তেয়াগিয়া,　　　　কর নিরন্তর,
　　পর উপকার তুমি,
অর্থের লাগিয়া,　　　　ফিরি দিবানিশি,
　　স্বার্থের মূরতি আমি।
তোমার প্রশান্ত,　　　　উন্নত হৃদয়ে,
　　সদাই মহতী আশা,
কাণা কড়ি ল'য়ে,　　　　করি টানাটানি,
　　আমার এমন দশা।
তোমার অন্তরে,　　　　আত্ম পর ভাব,
　　প্রতিষ্ঠাত নাহি হয়,
আমার অন্তর,　　　　হেরি নিরন্তর,
　　আত্ম পর ভাবময়।
সরল পরাণে,　　　　সরল নয়নে,
　　সুভাবে দেখ যা তুমি,
কুটিল পরাণে,　　　　কুটিল নয়নে,
　　কুভাবে দেখি তা আমি।
তাই বলি আমি,　　　　তোমার সহিত,
　　তুলনা আমার কিসে,
অমৃত আধারে,　　　　গরল ঢালিলে,
　　তাহা কি কখন মিশে।
তবে না কি শুনি,　　　　পরশ পরশে,
　　লোহাও কাঞ্চন হয়,
পাপী জনে সাধু,　　　　করুণা করিলে,
　　তারাও তরিয়া যায়।
আমি সেই আশে,　　　　তোমার সকাশে,
　　বলি হে মিনতি ক'রে,
বিন্দু মাত্র তব,　　　　করুণা বিতরি,
　　চির সাথী কর মোরে।

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান, রাজবাটী

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

আদিকাণ্ড।

অনুক্রমণিকাধ্যায়।

একদা কহেন সূত শুন ভক্তগণ,
জগতের হিত বাঞ্ছি ব্রহ্মার নন্দন।
পর্য্যটন করি মুনি সমস্ত ভুবন,
অবশেষে সত্যলোকে করেন গমন।
মূর্ত্তিমান্ বেদ চারিদিকেতে বেষ্টিত,
নবোদিত ভানু সম ব্রহ্মা প্রকাশিত;
স্তূয়মান প্রজাপতি সহিত বাগ্দেবী,
ব্রহ্মতেজ সম দ্যুতী মার্কণ্ডেয় আদি।
ভক্তজনাভীষ্ট ফলপ্রদ জগন্নাথে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি মুনি কহে জোড়হাতে।
হে দেব, হে বিশ্বপতি, জগৎ-কারণ,
অনাদি অনন্ত প্রভো ব্রহ্ম সনাতন।
ভক্তিতে সন্তোষ প্রভু কহে হাসি হাসি,
স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কর নারদ দেবর্ষি।
অবশ্য প্রার্থনা পূর্ণ করিব তোমার,
অকপটে বল পুত্র নিকটে আমার।
ব্রহ্মবাক্য অবসানে করি নমস্কার,
জীবত্রাণ হেতু মুনি কহে পুনর্ব্বার।
পূর্ব্বেতে শ্রীমুখে নাথ বচন মধুর,
তত্ত্বজ্ঞান কথামৃত শুনেছি প্রচুর।
অপর শুনিতে কিছু বাঞ্ছা এবে হয়,
দয়া করি নিজগুণে কহ দয়াময়।
ঘোর কলিযুগ যবে হইবে আগত,
ধর্ম্মত্যাগী হবে জীব দুরাচারে রত।

সত্যাসত্য বিবৰ্জ্জিত হিংসাপরায়ণ,
পরস্ত্রীতে অনুরক্ত কামে অচেতন।
পিতা মাতা গুরুজনে সদা রুক্ষ ভাষে,
কামকিঙ্কর কামচারী নারী মন তোষে।
স্বজাতীয় ধর্ম্মত্যাগী বেদশাস্ত্রহীন,
পর ধনে স্পৃহা সদা করিবে ব্রাহ্মণ।
বেদবিক্রয়োপজীবী বঞ্চনাতে মন,
পশুবুদ্ধি ক্ষমাহীন হইবে ব্রাহ্মণ।
স্বধর্ম্মে নাহিক দৃষ্টি ক্ষত্র বৈশ্যগণ,
শূদ্রেরা করিবে সব ব্রাহ্মণাচরণ।
ভর্ত্তা প্রতি ভক্তিহীনা হইবে কামিনী,
অন্য পুরুষেতে রত দুষ্টা কলঙ্কিনী।
শ্বশুর শাশুড়ী আদি গুরুজন যত,
অনিষ্ট সাধনে দুষ্টা সদা হবে রত।
চিন্তায় সতত চিত্ত হ'তেছে আকুল,
বল প্রভো এরা কিসে পাবে মুক্তিফল?
পরকালে গতি কিসে হবে সবার,
প্রকাশিয়া বল নাথ সৃজন-আধার।

(ক্রমশঃ)

নববর্ষে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ।

দুঃখী জীব আজকালকার এই দুর্দ্দিনে এক ত হরিকে মানিতেই চায় না; তারপরে যদি কেহ বুঝাইতে চায় সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কি লৌকিক, কি বৈদিক সমস্ত কর্ম্ম করা উচিত, ইহারা তখন এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন যে ভারত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া উৎসন্ন গিয়াছে এখন ভগবান্‌কে "থোও ফেলাইয়া" করিয়া পুরুষকার-বলে কর্ম্ম করিতে হইবে।

আমরা এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ ইহা আর্য্যের কথা নহে। কোন আর্য্যশাস্ত্রও ইহা সমর্থন করেন না।

শ্রীগীতাকে আমরা আর্যশাস্ত্র বলি। ইহাতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

যাহা কর, যাহা খাও, যাহা যজ্ঞ কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর—তাহা আমাতে অর্পণ কর।

করা, খাওয়া ইত্যাদি লৌকিক কর্ম্ম আর যজ্ঞ, দান, তপস্যা এইগুলি বৈদিক কর্ম্ম। কি লৌকিক, কি বৈদিক সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। ইহা বেদের উক্তি, ইহা গীতার উক্তি, ইহা ভাগবতের উক্তি, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রথম শিক্ষা ও প্রধান শিক্ষা।

সর্ব্বকর্ম্মার্পণ কিরূপে করিতে হয় যিনি ইহা জানিয়া অভ্যাস করেন, তিনিই আর্য্যশাস্ত্রমত যথার্থ মানুষ ; তিনিই মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার করেন ; তিনিই একদিকে জগতের উপকার করেন, অন্য দিকে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ-প্রাপ্তির দিকেও অগ্রসর হয়েন। আর ইহা যিনি করেন না তিনি যতই কেন লোকহিতকর কর্ম্ম করুন না, তাঁহার কর্ম্মে জগতের যথার্থ উন্নতি যাহা তাহাও হয় না, আর তিনি কখনও মনের শান্তিও পান না। কারণ তিনি বন্ধন-দশা হইতে কোন কালে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। তবে লোকের অনিষ্টকর কর্ম্মে বন্ধন হয় লৌহশৃঙ্খলে, আর লোকহিতকর কর্ম্মের বন্ধন হয় স্বর্ণশৃঙ্খলে। আর্য্যশাস্ত্রের এই উক্তি যে সত্য তাহার প্রমাণ আজকালকার মানবজাতি। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই বলিতে চাহি না। যাঁহারা গীতার সর্ব্ব-কর্ম্মার্পণটিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন আমরা তাঁহাদের জন্য সর্ব্বকর্ম্মার্পণ কিরূপে করিতে হয় এখানে তাহাই আলোচনা করিতেছি।

কর্ম্মগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। (১) অবুদ্ধিপূর্ব্বক, (২) বুদ্ধিপূর্ব্বক। এতদ্ভিন্ন ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন কর্ম্ম প্রথম অবস্থায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়, আবার শেষে সেইগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বকও হইয়া যায়। যাহা হউক বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকেই ঈশ্বরে অর্পণ করার বিধি শাস্ত্র দিয়া থাকেন। কারণ অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যাহা, তাহাতে ভালমন্দ বিচারের কিছুই নাই। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ অথবা রক্তসঞ্চালন ইহারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম। ইহাদিগকে

ন্যায় অন্যায় বা ভাল মন্দ কিছুই বলা হয় না। এই সকল কর্ম্ম জন্য মানুষের দায়িত্বও নাই, কাজেই এই সমস্ত কর্ম্মে কোন প্রকার বন্ধনও নাই। কিন্তু বুদ্ধি-পূর্ব্বক আমাদিগকে যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাই শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হয়।

বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যাহা, তাহাদের একটী সূক্ষ্ম অবস্থা থাকে। কর্ম্মগুলি প্রথমে সঙ্কল্প আকারেই মনে উদয় হয়।

মনে করা হউক কোন মানুষ ক্রোধের বা কামের কর্ম্ম করিতে যাইতেছে। এখন এই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা যায় কিরূপে? আর ঈশ্বরে অর্পণ যখন হয়, তখন এই সমস্ত কর্ম্ম হইতে পারে কি না?

এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরে আমরা প্রলোভনের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহাও নিশ্চয় করিতে পারি।

রিপুর উত্তেজক কোন বস্তু দেখিবা মাত্রই আমাদের মধ্যে একটা কার্য্য চলে। ঐ সময়ে প্রথমে উত্তেজক স্থূল বাহিরের বস্তু হইতে মনটি সরাইয়া লইতে হয়। ইহা করাও কঠিন নহে। সম্মুখে যখন হাব ভাব কটাক্ষ পড়ে তখন যদি একটু স্থির হওয়া যায়, অন্ততঃ যখন দেখিব না বলিয়াও চক্ষু বুজিয়া রাখা যায় বা অন্য দিকে চাওয়া যায় তখন স্থূল বস্তুটি আর দেখা যায় না। কিন্তু স্থূলটি না দেখিলেও সূক্ষ্ম ভাবে এই বস্তুটিই হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই যে সূক্ষ্ম বস্তুটী এটি কি যদি দেখা যায়, তবে আমরা বুঝিতে পারি ইহা সঙ্কল্প মাত্র। এই সঙ্কল্পটাই আমাদিগকে কষ্ট দেয়। অনেক সময়ে দুঃখটা সঙ্কল্পরূপেই ক্লেশ দেয়।

স্থূলটাকে যখন আমরা হৃদয়ে আনিয়া সঙ্কল্পে পরিণত করি, তখন বিচার আনিতে হয় এই সঙ্কল্পটা কোন্ বস্তু? এই সঙ্কল্প কোথায় উঠিল? ইহার উত্তরে আমরা দেখি একটী শান্তভাব ছিল তাহাই কোন কারণে সঙ্কল্প হইয়া আমাকে চঞ্চল করিতেছে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, সেইরূপ সঙ্কল্পটাও সেই শান্তভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অন্ততঃ শান্ত জলের উপরে যেমন তরঙ্গ ভাসে আর সেই তরঙ্গ জলই সেইরূপ পরম শান্ত চৈতন্যের উপরেই সঙ্কল্প তরঙ্গ উঠিয়াছে—আর সঙ্কল্পটিও মূলে সেই চৈতন্যই বটে। প্রথমে স্থূলটা গলিয়া সঙ্কল্প হইল, আবার সঙ্কল্প গলিয়া দাঁড়াইল অধিষ্ঠান-চৈতন্য। যদি বিচার করা থাকে যে সঙ্কল্প যাহা উঠে তাহা মায়ারই কার্য্য, আর মায়ার কার্য্য যাহা তাহা মায়িক, তাহা মিথ্যা, অথচ মিথ্যাই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছিল তখন যে মুহূর্ত্তে অধিষ্ঠান-

চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ মনে জাগিয়া সঙ্কল্পও দূর করিয়া দিল; তখন থাকিল অধিষ্ঠান-চৈতন্য বা শ্রীহরি। বুদ্ধিপূর্ব্বক যে কর্ম্ম তাহা মূলে সঙ্কল্প বলিয়া—সঙ্কল্পকে যখন চৈতন্যে অর্পণ করা হইল—তখন সঙ্কল্প মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইল। ইহাই হইল কর্ম্মার্পণের তত্ত্ব। সকল কর্ম্ম করিবার সময় যখন অধিষ্ঠান-চৈতন্যই সত্য—শ্রীভগবানই সত্য—ইহাতে দৃষ্টি পড়ে, তখন হয় কর্ম্মগুলির ঈশ্বরে অর্পণ। সেই জন্য বলা হয় ঈশ্বরকে প্রথমেই স্মরণ করিয়া কর্ম্ম কর, তবেই ঐ কর্ম্মের ফলাফলে তুমি আবদ্ধ হইবে না। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, সে কর্ম্ম আমাদিগকে বিচলিত করে না। কারণ মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া যদি করাও যায় তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না, কোন বন্ধনও তাহাতে নাই। কর্ম্ম হইলেও সেই সময়ে ঈশ্বর লইয়া থাকা যায়। হৃদয়ে ঈশ্বর চিন্তা রাখিয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক যেন হইয়া যায়। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিলে এক দিকে শুভ কর্ম্ম দ্বারা জগতের হিত হয় এবং অন্য দিকে নিজেরও ঈশ্বর লইয়া থাকা হয় বলিয়া ইহাতে পরমানন্দপ্রাপ্তির বাধা হয় না।

যিনি জ্ঞানী তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃশ্য দর্শন মার্জ্জনটি যখন অভ্যাস করেন, তখন এই জন্মেই তিনি পরমপদে স্থিতিলাভ করেন।

নববর্ষে সমস্ত বৎসর ধরিয়া অভ্যাসের কথা বলা হইল। বলা হইল স্থূল ভুলিবার কৌশল সম্বন্ধে আসা এবং সঙ্কল্পকে ভুলিবার প্রথম কৌশল তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—সেইরূপ সঙ্কল্প তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই পর্য্যন্ত ভক্তিমার্গ। কিন্তু যখন বিচার দ্বারা নিশ্চয় হইবে সেই পরমশান্ত বস্তু পরমশান্ত ভাবেই আছেন—সঙ্কল্প যাহা উঠিতেছে মত বোধ হইতেছে তাহা মায়ার কার্য্য বলিয়া মিথ্যা—ফলে সঙ্কল্প বলিয়াও কিছুই নাই তিনি তিনিই আছেন—রজ্জুকে ভ্রমজ্ঞানে সর্প বলিয়া বোধ হইতেছিল—ভ্রম দূর হওয়ার জানা গেল তিনি তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, আর কিছুই উঠিতেছে না, এই অবস্থা লাভ করিলেই প্রাপ্তি হইল স্থিতি। ইহাই মুক্তি।

কেমন ক'রে জান্‌ব বল আমি।

কেমন ক'রে জান্‌ব বল আমি,
দীর্ঘ এমন হবে দিনমান,
পাংশু মেঘে ভর্‌বে আকাশ খান,
সাগরও যে ভুলে যাবে গান ;
যখন তুমি চ'লে যাবে স্বামী।
কেমন ক'রে জান্‌ব বল আমি,
অন্ধকরা আঁধার হবে রাতি,
বাতায়নে জ্বল্‌বে না'ক বাতি,
ঝঞ্ঝাভরা বাতাস রবে মাতি ;
যখন তুমি চ'লে যাবে স্বামী।
কেমন ক'রে জান্‌ব বল আমি,
সুষমা যা দূরে যাবে চ'লে,
ভালবাসা ভরে যাবে ছলে,
সারানিশি কাঁদ্‌বে আঁখি-জলে ;
যখন তুমি চ'লে যাবে স্বামী।
কেমন ক'রে জান্‌ব বল আমি,
বেঁচে থাকা হবে আমার ভার,
বেদনা যে হবে হৃদয়-হার,
তোমার পথে চাইব বারে বার ;
যখন তুমি চ'লে যাবে স্বামী।

তোমায় আমায়।

"যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন" তোমরা দু'জন ছাড়া আর কিছুই নাই। তুমি শক্তি আর উনি শক্তিমান্। তুমি সীতা আর উনি রাম। তুমি পার্ব্বতী আর উনি শিব। তুমি রাধা আর উনি কৃষ্ণ। তুমি প্রকৃতি আর উনি পুরুষ।

তুমি নামরূপ আর উনি অস্তিভাতিপ্রিয়। তুমি বাহিরে আর উনি ভিতরে। তুমি ছন্দ আর উনি প্রণব। তুমি গতি আর উনি স্থিতি। যা দেখি, যা শুনি, যা স্পর্শ করি, যা আস্বাদন করি, যা আঘ্রাণ করি তা তুমি, আর যা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অধিষ্ঠান-স্থান তা উনি। তুমি আবরণ আর উনি আবৃত। তুমি জড় হইয়াও চৈতন্যদীপ্তা আর উনি চৈতন্য। তুমি সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা ও চঞ্চলাবস্থা আর উনি সর্ব্ব প্রকার চলনরহিত পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

জগতে যা দেখি, শুনি, যা ভাবি, তাহাই তোমর দু'জনে জড়িত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। তুমি মন আর উনি যাঁর উপরে মন সঙ্কল্প তুলিয়া নৃত্য করেন। তুমি সঙ্কল্প বিকল্প আর উনি অধিষ্ঠান-চৈতন্য। তুমি বুদ্ধি উনি আত্মা।

মূলে তোমার কোন আকার প্রকার নাই, উঁহারও নাই; কিন্তু তুমি উঁহাতে উঠিয়া আপনি নামরূপ ধর আর উঁহাকেও নামরূপ দাও। তাই বলা হয়, তোমরা দু'জন ছাড়া আর কিছুই নাই। বলা হয় যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন।

তোমরা দু'জন পৃথক হইয়াও এক সাজিয়া থাক। এই বিশ্বে এমন কিছুই দেখা যায় না, এমন কিছুই জন্মে না—যথায় তোমরা দু'য়ে মিলিয়া এক হইয়া না আছ? যেখানে নারী মূর্ত্তি ধরিয়াছ, সেখানেও বাহিরে তুমি ভিতরে তিনি। আর যেখানে পুরুষ মূর্ত্তি ধরিয়াছ সেখানেও বাহিরে তুমি ভিতরে তিনি।

তবেই ত হইল—নারী মূর্ত্তিতেও তোমাদের দু'জন আর পুরুষ মূর্ত্তিতেও তোমরা দু'জন। নবজলধরশ্যাম ঐ যে তোমার নয়নাভিরাম মূর্ত্তি ওখানেও যে দেখিতে জানে সে দেখে শ্যামমূর্ত্তিই জানকীলতা আর ভিতরে তুমি। আর ঐ যে তোমার কনকচম্পক গৌরবরণ ওখানেও বাহিরে তুমি ভিতরে সে।

এ সব ত হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সবই ত তুমি, তবে সংসারে এত মারামারি, খাওয়াখায়ি কেন? আপনার সঙ্গে আপনার বিবাদ এত কর কিরূপে?

যখন লয়বিক্ষেপরূপে আইস, তখন ত নিজেই শান্ত থাকিয়াও অশান্ত হও। হইয়া যেন লয়বিক্ষেপের জ্বালায় অস্থির হও। আপনার রিপু আপনি যেন দমন করিতে পার না এই দেখাও। এ কি রঙ্গ তোমার! আপনার ভুল আপনি ভাঙ্গিবার জন্য কষ্টও কর। কখন ভাঙ্গ কখন ভাঙ্গিতে পারও না। একি প্রহেলিকা তোমার? সদা মুক্ত। তবুও বদ্ধ সাজিয়া মুক্ত হইতে প্রাণপণ কর। এ কি অদ্ভুত কার্য্য তোমার?

বন্ধনটা স্বপ্নবন্ধন। রাত্রিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে মনে হইল কতকগুলা চোর যেন বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। আর মিছামিছি গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। এই স্বপ্নবন্ধন ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে মিথ্যার কিরূপে ক্লেশ দিবার শক্তি আইসে?

হায় রে অজ্ঞান! তবে তাই হউক—তিন বেলার নিত্যকর্ম্ম যতদিন দেহ থাকে, ততদিন দেহটা করুক। তোমার আজ্ঞা বলিয়া করুক। অন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যেন না করে। এই যদি ভাল হয় হউক। ইতি

কলহান্তরিতা।

সত্য বটে তোমা পরে
উথলে উঠে মান,
আমি বিন্দুমাত্র সইতে নারি
তরল স্বরের টান।
সাঁজ দুপুরে একই রূপ
দেখ্‌তে চাই গো আমি,
যবে উষার বুকে সোহাগ ভরে
এলিয়ে পড় তুমি।
যখন ধীর গমনে উষা রাণী
ফুলের বোঝা গায়,
যখন ছড়িয়ে দিয়ে বিমল ছটা
রূপটি মেখে ধায়।
আবার শরতের মেঘে নীরদ গর্জ্জনে
পলকে প্রলয় হয়,
বৃথা আড়ম্বর কোথায় অশনি
সুধার ধারা যে বয়।
তবে সাজিয়া গুজিয়া নিদয় হইয়া
বল কি থাকিবে তুমি,
চির-প্রেমময় জানিয়া তোমায়
দেখ আসন পেতেছি আমি।

কখন ভাল কখন মন্দ।

কখন ভাল কখন মন্দ ইহা ঘুচিবে কবে? শুধুই ভাল কি থাকা যায় না। বাহিরে ভাল কাজ করা বা মন্দ কাজ করা ইহার কথা বলা হইতেছে না। অথবা বাহিরে সকল প্রকার লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করা, মধুর ব্যবহার করা, অথবা কর্কশ ব্যবহার করা ইহার কথা বলা হইতেছে না। অথবা সর্ব্বদা সকল লোককে হাসিমুখে মিষ্ট সম্বোধন করা, কাহারও মনে এমন কি জীব জন্তুর প্রাণে পর্য্যন্ত ব্যথা না দেওয়া ইহার কথাও বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে আপনাতে আপনি সর্ব্বদা আনন্দে থাকা, ইহা কখন হয়?

সাধনা দ্বারা একটা আনন্দের অবস্থা আনা যায়; যাঁহারা সাধনা করেন, সম্মুখে যথেষ্ট সময় রাখিয়া যাঁহারা ইহা করিবই এই দৃঢ় সঙ্কল্পে তপস্যা করেন, তাঁহারা সকলেই উহা অনুভব করিয়াছেন। বহিরঙ্গ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ, অন্তরঙ্গ সনে ভাব আস্বাদনের আনন্দ, একা একা বসিয়া মানসপূজার আনন্দে প্রাণায়ামে মনে মনে প্রিয়জনের চরণসেবার আনন্দ, ধ্যানে তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ অথবা তাঁহার মিষ্ট সম্বোধনের আনন্দ, এক কথায় নানা উপায়ে আদর করার আনন্দ এবং আদর লওয়ার আনন্দ—এ সব ত সাধক মাত্রেই কখন না কখন ভোগ করেন, কিন্তু কবে এমন হইবে যে আর আনন্দের অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না, জ্ঞানের স্থিতি হইতে আর ভ্রমজ্ঞানে পড়িতে হইবে না? কবে এমন হইবে যখন ইচ্ছা মাত্রেই ইষ্টকে পাওয়া যাইবে? কবে এমন হইবে যখন ইষ্টকে ছাড়িয়া আর থাকিতে হইবে না?

ইহাতে ভাবনা করিবার অনেক রহিল। আমরা সে সব ভাবনা আর করিলাম না। এই মাত্র বলিলাম যে, সত্যসঙ্কল্প না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনা করা চাই। ইহা যাহাতে হয় তাই করিতে যাঁর রুচি তিনি করিবেন।

"হরের্নামৈব কেবলম্।"

অন্নগত-প্রাণ কলির জীবকে ভবব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য হরের্নামৈব কেবলং মহৌষধি অনেক ভাগবত ভেষকরাজ ব্যবস্থা করিয়া

থাকেন। তবে এই পেটেণ্ট ভবজ্বরান্তক লৌহ, সকল ধাতুর পক্ষে সমান উপযোগী বা তৃপ্তিপ্রদ হইবে কি না একথা হলপ করিয়া কেহ বলিতে স্বীকার করেন না।

এখন কথা হইতেছে অর্থ-চিন্তা না করিয়া, প্রেম ভক্তি না মিশাইয়া কেবল কড়ান্‌কে সট্‌কে পড়ার মত নাম আওড়াইলে নামের সার্থকতা হয় কি? কোন ফল আছে কি? এই প্রকার নাম কীর্ত্তনের স্বপক্ষে অনেকে বাল্মীকি ও অজামিলের কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। অবশ্য এ সেকালের কথা; কিন্তু সেকালেই যখন এরূপ হওয়া সম্ভবপর হইত, তখন এই কলিযুগের বলে কথা। তবে ইহার ভিতর একটী জন্মান্তরীণ অর্জ্জন বা নামে বিশ্বাসের কথা তাঁহারা উত্থাপন করেন। বড় শক্ত কথা। আমার মনে হয় বিশ্বাস থাক্ বা নাই থাক্, বিরেচক ঔষধ ব্যবহারে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। তবে হাঁ, ফল, মাত্রা ও সময় সাপেক্ষ এই পর্য্যন্ত। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও তাহা না হইবে কেন? এত কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য যদি কোন মহাজন আমার মত নাম জপার স্বপক্ষে মস্তক হেলন করেন, তবেই তো মনে একটু বল হয়; তাহা না হইলে বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথায়।

এখন এ বিষয় একটু ভাল করিয়া চিন্তা করা যাউক। বিবেচ্য বিষয় এই। যদি এক মাত্র নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই উপাসনার সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে জপ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গগুলির সার্থকতা কি রহিল?

নাম কীর্ত্তন অর্থে আমরা বুঝি কি? নাম শব্দের অর্থ কি? গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি যাহা অর্থ ভাব দ্বারা নত হয়, তাহা নাম। নাম—বাক্ আর বাক্ বৈ বিশ্বজগৎ।

নাম বা বাকের পরা পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। আমরা সাধারণতঃ নাম কীর্ত্তন অর্থে নামের বৈখরী অবস্থার কীর্ত্তনই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু যখন জপ, ধ্যান বা জ্ঞানের বিচার করা হয়, তখন প্রকৃত পক্ষে কি আমাদের নাম কীর্ত্তন করা হয় না?

তবে প্রভেদ এই, তখন আমরা নামের মধ্যমা প্রভৃতি যে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থা আছে তাহাদিগকে অলক্ষিত ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকি।

নাম বিশ্লেষ করিলে পাওয়া যায় কি? ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তি নামের মধ্যেই

সব থাকে। একটী নামের ব্যাখ্যা হইলেই তদভিহিত সমস্ত বিষয়ই ব্যাখ্যা হইয়া যায়।

শব্দকে যাহা পোষণ করে, শব্দের যাহা রক্ষাসাধন করে তাহাই শব্দের ধাতু বা প্রকৃতি। আবার ধাতুই ক্রিয়াবচন। ক্রিয়া বলিলে সামান্যতঃ উৎপত্তি-ক্রিয়া, স্থিতি-ক্রিয়া ও নাশ-ক্রিয়া আমাদের নয়নে পড়ে। নামে এই তিন প্রকার ক্রিয়াই বিদ্যমান আছে, তবে প্রত্যেকটীর বিবক্ষা নাই।

উদাহরণ স্বরূপ মনে করা হয় "রাম" শব্দ। রাম ধাতু হইতে রাম শব্দ উৎপন্ন। রাম ধাতুর অর্থ উপরম বা লয়। রাম ধাতুর এই অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এখানে রাম ধাতুতে তিন প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে উপরতি ক্রিয়াই বিবক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কাহার উপরতি? উত্তর আসিবে—যাহা একবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আসিয়াছিল এবং যাহা এখন পুনর্ব্বার অব্যক্তে ফিরিয়া যাইতেছে তাহারই উপরতি। অতএব রাম ধাতুর মধ্যে উৎপত্তি ক্রিয়ার ভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহার পর অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া পুনরায় অব্যক্তে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার কিছুকাল স্থিতিও হইয়াছিল। তবেই দেখুন—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই তিনটি ক্রিয়াই রাম ধাতুর দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং যে রাম শব্দ একবার উচ্চারণ করিলে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের সংবাদ লওয়া হয়, সে নাম লইলে বলুন দেখি, সাধনার আর বাকি কি থাকে?

রামেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং মরণে যদি সংস্মরেৎ।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈঃ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

তাহার পর শব্দের অর্থ চিন্তা। বাক্য ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। যদিও অধুনা অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না, শব্দার্থ সম্বন্ধ সাময়িক তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন; করুন, কিন্তু আমার authority কালিদাস। সেই সে'কালে রঘু-বংশের প্রথম শ্লোক মনে হয়। পণ্ডিতেরা অর্থ-চিন্তা করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দেন; ভালই, আমি ইহার উপর বলি—না হয় হেলায়, শ্রদ্ধায়, উঠে, ব'সে, দাঁড়িয়ে, শুচিই বা কি অশুচি বা কি, ভিতরে বাহিরে প্রত্যেক নিশ্বাসে নিশ্বাসে চালাও। জপতু জপতু তন্মু কর ছার। দ্রব্য এবং গুণ লইয়া নাম হইয়াছে। শক্তি বা গুণ, আধার-রূপী নাম বা দ্রব্যে লীন থাকে। অভিব্যক্তি হইলেই দেখা যায়। অবশ্য

মূলতঃ সকল নাম বা শব্দই ব্রহ্মবাচী। অর্থ-চিন্তা করিতে করিতে শেষে গিয়া ব্রহ্মে পঁহুছিবেই। আমার এক পরমাত্মীয়ের কথায় একটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

এক .বলীবর্দ্দ স্বামীর অনেকগুলি বলবর্দ্দ ছিল। সকলের সহিত সমকালে সম্বন্ধ রাখিবার জন্য তিনি নিজ হস্তে একটি মূল রজ্জু সংলগ্ন করিয়া রাখিতেন এবং সেই মূল রজ্জুর সহিত বহু শাখারজ্জু সংলগ্ন ছিল। সেই সকল শাখার অন্ত্যভাগ সকলের সহিত বলীবর্দ্দগুলি সংযুক্ত ছিল। বলীবর্দ্দ স্বামীকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত শাখারজ্জু টানিলে যথেষ্ট হইত। কারণ শাখারজ্জুগুলি মূল রজ্জুর সহিত সম্বন্ধ থাকাতে শাখারজ্জুতে টান পড়িলে মূল রজ্জুতে টান পড়িত। সেই প্রকার কোন এক বেদোক্ত বা সাধু শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে বৈখরী মধ্যমা, পশ্যন্তী প্রভৃতি অবস্থা পথ হইয়া গিয়া পরমব্রহ্মে পঁহুছিবেই। কোন এক নাম রজ্জু ধরিয়া টান দাও, মূল রজ্জুতে টান পড়িবেই। উত্তর আসিবে "কেয়া চাহতে হও"।

শ্রীগুরু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেহ কেহ মনে করেন মন্ত্র নেওয়া আবশ্যক—ইহা একটা নাম নিলেই হইল, অথবা কোন গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র নিলেই হইল; এজন্য আবার একজন গুরু করার আবশ্যক কি? আর পূজাদি অনুষ্ঠান করারই বা প্রয়োজন কি? হিন্দুর জাতকর্ম্ম হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়—সমুদায় ক্রিয়াতেই দেবতার পূজা, পিতৃগণের পূজা ভোজন ও বাদ্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যদিও আজকাল নব্যদল প্রায় সকল ক্রিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা বিবাহ ক্রিয়াটী রক্ষা করিয়াছেন, ইহা কেবল নব্য হিন্দু সম্প্রদায় নহে; সভ্য, অসভ্য সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মেই বিবাহের কিছু না কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায়। কেবল কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির মধ্যেই এসম্বন্ধে কোন অনুষ্ঠান দেখা যায় না। সুতরাং এই বিবাহের দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখান যাইতে পারে যে, যদি লোকে বিবাহের কোন অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে

কোন রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিত, তাহার ফল কি দাঁড়াইত? তাহা হইলে একটু মনান্তর কি একটু অবস্থান্তর হইলেই, পুরুষ রমণী সকলেই নিত্য নিত্য, মাসে মাসে, বা বৎসর বৎসর স্ত্রী বা স্বামী পরিবর্ত্তন করিত কি না? এবং ইহাতে সংসারের কি বিশৃঙ্খলা হইত একবার ভাবিয়া দেখুন। সেইরূপ নিজে নিজে একটা মন্ত্র গ্রহণ করিলে যে তাহার গুরুত্ব থাকে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কয়েক দিন সেটা জপ করিয়া মনে হইতে পারে এমন্ত্রটা হইতে অন্যটা ভাল, অথবা মনে হইতে পারে এ সকল মন্ত্র আওড়াইয়া কেন সময় নষ্ট করি; যথোপযুক্ত দীক্ষিত লোকের এরূপ না হয় তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে ঘোর বিষয়ী ও নাস্তিক ভাবের লোকের এরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকের এরূপ হয়। যথোপযুক্ত বিবাহিত ব্যক্তিও সময় সময় তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বিবাহের অসম্মান বা অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার সংখ্যাও বেশী নহে; সুতরাং এ সকল নিয়ম নহে, নিয়মের ব্যভিচার। আর দীক্ষার অনুষ্ঠানও বেশী নহে। গুরুদেব মন্ত্রের যে দেবতা তাঁহার পূজা দিয়া কাণে মন্ত্রটী দিয়া থাকেন ও যে ভাবে মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজা, সন্ধ্যা করিতে হইবে তাহার উপদেশ দিয়া থাকেন। যিনি ঈশ্বর-সাধনের ও তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক তাঁহার এ সকল অনুষ্ঠান কেনই বা বিরক্তিজনক বা অনর্থক বলিয়া উপলব্ধি হইবে? কেহ কেহ বলেন যে, যাঁহারা মন্ত্রগ্রহণ করিয়া পূজা, সন্ধ্যা করেন ও যাঁহারা তাহা করেন না—তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এ অবস্থায় মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ফল কি? এ কথাটী বড় শক্ত। কারণ সময় সময় এমনও দেখা যায় যে, পূজা, সন্ধ্যাকারীদের মধ্যে এমন অনেক কদর্য্য স্বভাবের লোক দেখা যায় যাহা অদীক্ষিত লোকের মধ্যেও বিরল এবং অদীক্ষিতের মধ্যেও এমন ভাললোক দেখা যায়, যাহা দীক্ষিত ও পূজা, সন্ধ্যাকারীদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। কেহ কেহ হয়ত মন্ত্রগ্রহণ করিয়া লোক-দেখান পূজা, সন্ধ্যা করেন, পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভে তত যত্ন বা আগ্রহ থাকে না; ইহাও দোষের কথা এবং তজ্জন্যও এরূপ হইতে পারে এতদ্ব্যতীত ইহজগতের দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দ্বারা ইহার মীমাংসা করা কঠিন। ইহার মীমাংসা করিতে অদৃষ্টপূর্ব্ব জন্ম, প্রাক্তন, এই সকল কথার অবতারণা করিতে হয় ও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হয়। কেবল এ বিষয় কেন, সংসারে অনেক বিষয়ই আছে যাহার মীমাংসা ঐ সকলের উপর নির্ভর করে।

মানুষ সকলেই একভাবে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কেহ বা বুদ্ধিমান্, কেহ বা নির্ব্বোধ হয় কেন? কেহ বেশী শোকতাপ ভোগ করে, কেহ তাহা না করে কেন? সময় সময় এমনও দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ ও অলস ব্যক্তিই বেশী ধনী, এবং কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান্ লোক দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিতেছে। ইহা দ্বারা কি আমাদের মীমাংসা করা উচিত যে, নির্ব্বোধ ও অলস হওয়াই আমাদের উচিত এবং কেহ কি এরূপ মীমাংসা করিয়া থাকেন? এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতেও আমাদের পূর্ব্বজন্ম ও প্রাক্তনের আশ্রয় নিতে হয়। ইহকালের কার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা কতকটা পূর্ব্বজন্মের আভাস পাইতে পারি। রাম ও শ্যাম দুইটী বালক কোন বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীতে পাঠ করে। ডিপুটী ইন্‌সপেক্টর মধ্যে মধ্যে তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখেন রাম নিতান্ত নির্ব্বোধ পড়াতেও বড় ভাল নয়, আর শ্যামের বেশ প্রখর বুদ্ধি ও পড়াশুনায়ও বেশ। ইতোমধ্যে ডিপুটি ইন্‌সপেক্টর বদলী হইলেন। রাম যদিও অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ সে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠাভ্যাস করিয়া অতি কষ্টে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

জীবের দুঃখ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা আর একবার অতি সংক্ষেপে সমস্ত কথাগুলির আলোচনা করিতেছি।

আরম্ভে আমরা বলিয়াছিলাম প্রাচীন ভারত উন্নতির বিরোধী নহে। যাহা সমাজে চালাইতে চাও চালাও, কিন্তু প্রাচীন ভারত এই কয়েকটি বস্তু ত্যাগ করিবে না,—ঈশ্বর-বিশ্বাস, পুরুষের পবিত্রতা, স্ত্রীলোকের সতীত্ব, একাগ্রতা এবং নিরোধ। প্রাচীন ভারত নবীন জগতকে বলেন, এই কয়েকটি বস্তুতে যদি এক মত হওয়া যায়, তবে কোন প্রকার বিরোধ আর থাকিতেই পারে না।

ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রাচীন ভারত ও নবীন জগতের বিরোধ আমরা কয়েকটি

প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম। এত বুদ্ধিমান্ লোক আজকাল দেখা যায়, শত শত বুদ্ধিমান্ লেখকও দেখা যায়, কিন্তু এই বিরোধ কি মিটিবে না? বিরোধ মিটাইবার চেষ্টাও কি হইবে না? যদি হয় মঙ্গল; আর যদি না হয়, তবে চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর হইতে পাঁচ হাজার বৎসরের কিছু বেশীটা বাদ দিলে যত বৎসর থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত নবীন জগতে মানুষ খাওয়াখায়ি করিবে। কিছুতেই জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে না। যত উন্নতিই কর, নবীন জগতে মনের শান্তি কিছুতেই থাকিবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপরেই পবিত্রতা, সতীত্ব, একাগ্রতা ও নিরোধ ভাব নির্ভর করিয়া আছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা বলা হইল; এখন বাকীগুলি বলিলেই প্রবন্ধ শেষ হইবে।

পুরুষের পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারত ও নবীন জগতের ধারণা এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনা যদি ঠিক ভাবে করা যায়, তবে উপস্থিত সমাজের অনেকগুলি অকল্যাণকর বিরোধ মিটিতে পারে। এই যে সমুদ্র যাত্রার বিরোধ, এই যে যাহা তাহা আহার করার বিরোধ, এই যে বাবুরচির হাতে খাওয়ার বিরোধ, এই যে টেবিলে বসিয়া চর্ম্মপাদুকা পরিয়া পলাণ্ড রসুনাদি সুগন্ধীকৃত কুক্কুটাদি মাংস সহ, কুক্কুটাদি ডিম্বসহ, বিচিত্র ভোজন বিলাসের বিরোধ, এই যে সকল জাতি মিলিয়া এক সঙ্গে আহার বিহারের বিরোধ, এই যে সকল জাতির মধ্যে বিবাহ করার বিরোধ, এই যে গলায় সূত্র বন্ধন বিরোধ, এই যে ত্রিসন্ধ্যায় সাপের মন্ত্র আওড়ান বিরোধ, এই যে যথেচ্ছাচারে ঈশ্বরকে ডাকার বিরোধ, এই যে ব্রত উপবাসাদির বিরোধ, নিশ্চয়ই এই সমস্ত বিরোধ মিটিয়া যায়—যদি পুরুষের পবিত্রতা কি, কিরূপে ইহা উপার্জ্জন করিতে হয়, কিরূপে ইহা রক্ষা করিতে হয়, এই ব্যাপারগুলির একটা মীমাংসা হয়।

কিন্তু এ মীমাংসা করিবে কে? প্রাচীন ভারতের কথা শুনিবে কে? আর ঠিক ভাবে শুনাইবে কে?

আমরা শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে এই বিষয় চিন্তা করিতে বলি। স্কুল কলেজের ছাত্র মধ্যে এবং স্কুল কলেজের শিক্ষিত, শিক্ষিতা, উপাধিধারী, উপাধিধারিণী যুবক, যুবতীর মধ্যে আহার সম্বন্ধে কোন কুসংস্কার রাখা উচিত নহে—এই কথার প্রচার বর্ত্তমানে বেশী দেখা যায়। ক্রমশঃ।

বহু পৃথিবীশ্বর রাজা উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন জন্য পদ্মনরপতিকে জয় জীব ইত্যাদি বাক্যে আদর প্রদর্শন করিতেছে। পুরীর পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ অবস্থিত! দক্ষিণ দ্বারে অসংখ্য রাজ রাজেশ মণ্ডল; পশ্চিম দ্বারে অসংখ্য ললনা লোক—স্ত্রীজন। উত্তর দ্বারে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব।

লীলা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছেন নানা দেশ হইতে দূতগণ আগমণ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের সংবাদ দিতেছে। কেহ সংবাদ দিল দক্ষিণা পথে যুদ্ধ সম্ভাবনা; কেহ বলিতেছে কর্ণাটাধিপতি পূর্ব্ব দেশ, মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ, সুরাষ্ট্রাধিপতি উত্তর দেশ বশীভূত করিতেছেন। দক্ষিণ সমুদ্রের তট হইতে লঙ্কাপুরী আক্রমণের কথা, পূর্ব্বাব্ধি তট হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে বিদ্রোহের কথা, উত্তরাব্ধি তট সমীপস্থ দেশে বিদ্রোহের কথা, পশ্চিমাব্ধি তট হইতে পশ্চিম দেশে বিগ্রহ ঘটনার কথা লীলা বহু সংবাদ শ্রবণ করিল। লীলা আরও দেখিতেছে চত্বরে কতশত পরাজিত রাজা দণ্ডায়মান। যজ্ঞগৃহ হইতে বেদধ্বনি বাদ্যধ্বনি হইতেছে; তাহার পার্শ্বদেশ হইতে বন্দিগণের উল্লাস শব্দ ও গীত বাদ্যধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইতেছে লীলা এই সমস্ত শুনিতেছে। ইহার সহিত অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথের ঘর্ঘরধ্বনি মেঘধ্বনির মত এ সমস্তও কর্ণে আসিতেছে।

সভাগৃহ পুষ্প, কর্পূর ও ধূপ গন্ধে আমোদিত। কোথাও পরাজিত রাজগণের উপঢৌকন প্রদান ব্যাপার। রাজপুরী অতি উচ্চ অট্টালিকায় এবং গগনভেদী স্তম্ভরাজিতে সুশোভিত। সর্ব্বত্র কিঙ্করকুল কার্য্যে ব্যস্ত, নানা স্থানে শিল্পিগণ নগর নির্ম্মাণে তৎপর।

পপাতাথ মহারম্ভা সা তাং নরপতেঃ সভাম্।
ব্যোমাত্মিকা ব্যোমময়ীং মিহিকেবাম্বরাটবীম ॥১৭।৩১॥

আকাশ শরীরিণী লীলা তখন ব্যোমময়ী রাজসভায় প্রবেশ করিল। আকাশ হইতে কানন প্রদেশে যে ভাবে নীহার কণা আপতিত হয় ব্যোমাত্মিকা লীলার ব্যোমময়ী রাজসভায় প্রবেশও সেইরূপ।

ভ্রমন্তীং তত্র তামগ্রে দদৃশুস্তে ন কেচন।
সঙ্কল্প মাত্র রচিতাং পুরুষাঃ কামিনীমিব ॥ ৩২

এক পুরুষের সঙ্কল্প-রচিত কামিনীকে অন্য পুরুষ যেমন দেখিতে পায় না সেইরূপ রাজসভায় লীলার ভ্রমণ কেহই দেখিল না। একজনের সঙ্কল্প-রচিত নগর

যেমন অন্য কেহ দেখে না সেইরূপ পুরোবর্ত্তিনী ভ্রমণশীলা লীলাকে সেই রাজসভার কেহই দেখিতে পাইল না। লীলা কিন্তু পূর্ব্বের মত সমস্তই দেখিতেছেন; দেখিতেছেন সেই রাজা, সেই রাজ্য, সেই ভৃত্য, সেই অমাত্য তাঁহার ভর্ত্তা পদ্মরাজা যেন সকলের সহিত এক নগর হইতে নগরান্তরে উঠিয়া আসিয়াছেন।

তদ্দেশাং স্তৎ সমাচারাং স্তথা তানেব বালকান্।
তা এব বালবনিতা স্তাং স্তানেব চ মন্ত্রিণঃ ॥ঐ॥৩৫॥
তানেব ভূমিপালাংশ্চ তাং স্তানেব পণ্ডিতান্।
তানেব নর্ম্মসচিবান্ ভৃত্যাং স্তানেব তাদৃশান্ ॥ঐ ৩৬॥

সেই বেশ, সেই স্বদেশীয় আচার সম্পন্ন বালক বালিকা, সেই সব মন্ত্রী সেই সব রাজা, সেই সব পণ্ডিত, সেই সব নর্ম্মসচিব (রহস্য বেত্তা ভৃত্য)—সেই সমস্ত পুরবাসী। আশ্চর্য্য সকলই সেই। সেই মধ্যাহ্নকাল সেই ঘন দাবানলাকুল দিক্, সেই আকাশ সেই চন্দ্র সূর্য্য, সেই মেঘ, সেই পবনধ্বনি। সকলই সেই আছে। সেই বৃক্ষ, সেই নদী, সেই পর্ব্বত, সেই পুর, সেই পত্তন, সেই সমস্ত নগর বিন্যাস, সেই গ্রাম, সেই জঙ্গল।

সকলই সেই আছে কেবল রাজা ষোড়শ বর্ষীয় যুবা পুরুষ। পূর্ব্বের সেই জরা-জীর্ণ দেহ নাই।

প্রাক্তনীং জনতাং সর্ব্বাং সমস্তান্ গ্রামবাসিনঃ ॥৪০॥

সেই পূর্ব্বের জনতা এবং সেই সমস্ত গ্রামবাসী।

এই সমস্ত দেখিয়া লীলা চিন্তাপরবশ হইয়াছেন। ভাবিতেছেন "অস্মিন্নগর বাস্তব্যাঃ কিং তে সর্ব্বে মৃতা ইতি"। এই ত বাসনা-নগর দেখিতেছি। কিন্তু পূর্ব্ব নগরবাসী সকলেই কি মরিয়াছে? রাজা মরিয়াছেন, না হয় এখানে তাঁহাকে দেখিলাম, কিন্তু আর সকলেই কি মরিয়াছে? নতুবা এখানে ইহাদিগকে দেখি কিরূপে?

পুনঃ প্রজ্ঞপ্তিবোধেন প্রাক্তনান্তঃ পুরং গতা ॥৪১॥
প্রজ্ঞপ্তিঃ সরস্বতী তৎপ্রসাদজেন বোধেন সমাধিব্যুত্থানেন।

সরস্বতীর কৃপায় লীলা সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন। ব্যুত্থিত হইয়া তিনি

দেখিলেন আপনার অন্তঃপুরেই তিনি আছেন। রাত্রি তখন দুই প্রহর। স্বজনগণ পূর্ব্বকার মত স্ব স্ব ভবনে নিদ্রিত।

লীলা নিদ্রাক্রান্ত সখীজনকে জাগাইলেন; আহ চাতীব মে দুঃখমাস্থানং দীয়তামিতি ॥৪৩॥ বলিলেন আমার অতীব দুঃখ হইতেছে। আস্থানং—সভায়াং সন্নিধানম্॥ আমাকে রাজসভায় যদি লইয়া যাও তবে হয়।

ভর্ত্তুঃ সিংহাসনস্যাস্য পার্শ্বে তিষ্ঠামাহংযদি।

পশ্যামি সভ্য সঙ্ঘাতং তং প্রজীবামি নান্যথা ॥৪৪॥

দেখ আমার বড় কষ্ট হইতেছে তোমরা আমাকে রাজসভায় লইয়া চল সেই-খানে স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্বে পূর্ব্বের ন্যায় সভ্যদিগকে যদি আবার দেখিতে পাই তবেই বুঝি আমার জীবন থাকে নতুবা নহে।

লীলার অভিপ্রায়—রাজা ত মৃত হইয়াছেন। সমাধি অবস্থায় তাঁহাকে ত দেখি-লাম। সেই সঙ্গে পূর্ব্বের সভাসদদিগকেও ত দেখিলাম। ইঁহারা ত মরেন নাই। তবে রাজার সঙ্গে ইঁহাদিগকে দেখিব কিরূপে? ইঁহারা মরিয়াছেন কিনা তাহার পরীক্ষা জন্যই লীলা সকলকে সভায় আসিতে বলিতেছেন।

রাজপরিবারবর্গ তখন লীলার আজ্ঞা মত আপন আপন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। যষ্টিধারীগণ, পৌরজন ও সভাসদদিগকে ডাকিতে ছুটিল "পৌরান্ সভ্যান্ সমানেতুং যযুর্যাষ্টিক পংক্তয়ঃ॥ ভৃত্যসমূহ মহা আদরে সভাস্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিয়া গেল, যেমন বর্ষা দ্বারা মলিন আকাশকে শরৎকালের দিবস পরিষ্কার করে সেইরূপ। চত্বর ভূমিতে দীপমালা অন্ধকার দূর করিল আর সেই আশ্চর্য্য দর্শন জন্য যেন নক্ষত্র সমূহ আরও উজ্জ্বল হইল। সেই অজির ভূমি—সেই সভাস্থল দেখিতে দেখিতে জনতায় পূর্ণ হইল—যেমন প্রলয় কালের শুষ্ক-সমুদ্র জল বর্ষণে পূর্ণ হয় সেইরূপ।

মন্ত্রিগণ, সমস্ত নরপতিগণ, দেখিতে দেখিতে আপন আপন স্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন—যেমন পুনঃসৃষ্টি সময়ে দিক্‌পালগণ আপন দিক অধিকার করেন সেইরূপ।

তখন আবার কর্পূর সদৃশ শুভ্র নীহার কণা পড়িতে লাগিল, আর শীতল স্পর্শ উৎফুল্ল কুসুম সুরভিবাহী বায়ু মৃদুমন্দ বহিয়া বহিয়া চারিদিক আমোদিত করিতে লাগিল।

দ্বারপালগণ সভার প্রতি দ্বারে শুক্ল-বসন পরিধান করিয়া শান্তি রক্ষার্থ দণ্ডয়মান হইল সূর্য্য-কিরণ প্রতপ্ত ঋষ্যমূক্ পর্ব্বতবাসীদিগের শান্তি জন্য যেমন মেঘমালা পর্ব্বতের উপরে উদয় হয় সেইরূপ। প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ু—তাড়নায় আকাশ হইতে যেমন নক্ষত্র সকল ছিঁড়িয়া পড়ে ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ পদ্মনরপতির সভাস্থলে পুষ্পরাশি নিপতিত হইয়া অন্ধকার দূর করিতে লাগিল।

সেই সভা মহীপালগণের অনুযায়ী জন সমূহে পরিপূর্ণ হইল—"উৎফুল্ল কমলোৎকীর্ণং হংসাইব সরোবরম্॥ ৫৪॥—প্রফুল্ল কমলাকীর্ণ সরোবরে হংসসমূহের শোভা যেরূপ সেইরূপ।

মদন হৃদয়ে রতির আগমনের ন্যায় রাজ্ঞী লীলা স্বামী সিংহাসনের সর্মীপে নূতন হৈম চিত্রাসনে উপবেশন করিলেন।

দদর্শ তান্ নৃপান্ সর্বান্ পূর্ব্বানেব যথাস্থিতান্।
গুরুনার্য্যান্ সাখীন্ সভ্যান্ সুহৃদং সম্বন্ধি বান্ধবান্॥ ৫২॥

পূর্ব্বের মত যথাস্থিত রাজন্যবর্গ, গুরুজন, আর্য্যগণ, সখীগণ, সুহৃদ্গণ সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ—লীলা সকলকে দেখিতেছেন।

সকলমেব হি পূর্ব্ববদেব সা
সমবলোক্য মুদং পরমাং যযৌ।
নৃপতিরাষ্ট্রজনং খলু জীবনা
ভুমদিতয়া চ বভৌ শশিবচ্ছ্রিয়া॥ ৫৭॥

পূর্ব্ব মত সমস্তই দেখিয়া লীলা পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইলেন। স্থির জানিলেন মহারাজ ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

জগদ্‌ভ্রান্তি প্রতিপাদন।

রাজ্ঞী লীলা তখন সভা হইতে উঠিলেন। যাইবার সময় সভাসীন রাজাদিগকে আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন যে আমি আমার দুঃখিত চিত্তকে এইরূপে বিনোদন করিতেছি।

লীলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর মণ্ডপে যে স্থানে স্বামীর জীবাত্মা পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গুপ্তভাবে রক্ষিত সেইখানে আসিয়া লীলা উপবেশন করিলেন, করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—

অহো বিচিত্রা মায়েয়মেতেঽস্মৎপুর মানবাঃ।
বহিরন্তরবদ্দেশে তত্র চেহ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩ ॥

অহো! কি বিচিত্র মায়া ইহা! এই আমার রাজধানীতে এবং সেখানকার সেই সমাধি দৃষ্ট অন্তরবর্তী অবকাশবর্তী দেশে এই সমস্ত মনুষ্য একভাবেই অবস্থান করিতেছে।

তাল-তমাল-হিন্তাল-মালা শোভিত পর্ব্বতসমূহ সেখানেও যেমন এখানেও সেইরূপ। মায়ার কি অপূর্ব্ব বিস্তৃতি। "বত মায়েয়মাততা।"

আদর্শেন্তর্ব্বহিশ্চৈব যথা শৈলোনুভূয়তে।
বহিরন্তশ্চিদাদর্শে তথা সর্গোনুভূয়তে ॥ ৫ ॥

দর্পণের ভিতরে ও বাহিরে যেমন এক পর্ব্বতই অনুভূত হয় সেইরূপ চিৎ দর্পণের ভিতরে বাহিরে একই সৃষ্টি অনুভব করা যায়। সমাধিতে ভিতরে যাহা দেখিলাম সমাধিভঙ্গে চিৎ দর্পণের বাহিরেও তাই দেখিতেছি।

এই সৃষ্টির মধ্যে ভ্রম কোন্‌টি আর সত্য কোন্‌টি? বাগ্‌দেবীকে অর্চ্চনা করিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করি।

লীলা আবার পূজা করিলেন। কুমারীরূপধারিণী সরস্বতী আসিলেন। দেবীকে ভদ্রাসনে বসাইয়া লীলা ভূতলে সেই পরমেশ্বরীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। করিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন মা! সৃষ্টিবিষয়ে আপনার একটা নিয়ম আছে। আমি ইহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিতান্ত উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। পরমেশ্বরি! আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিলে বুঝিব আমার উপর আপনার অনুগ্রহ সফল।

সরস্বতী—বল তোমার সংশয় কি।

লীলা—সমাধি কালে আত্মস্বরূপ যে দর্পণ দেখিলাম—যে দর্পণে সেখানে জগৎ দেখা গিয়াছিল, সেই জগৎ যে আত্মদর্পণে প্রতিবিম্বিত, সেই দর্পণ আকাশ অপেক্ষাও অধিক নির্ম্মল। কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত এই ব্যখান দৃষ্ট জগৎ সেই চিৎ দর্পণের কাছে অতি ক্ষুদ্র।

সেই চিৎ দর্পণ বা আত্মদর্পণ, বেদের মহাবাক্য দ্বারা যে অখণ্ড বোধ স্বরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় প্রজ্ঞা স্বরূপ সেই ব্রহ্মেরই জ্যোতি। এই চিৎ অন্তরে বাহিরে একরূপ বলিয়া ঘন—অত্যন্ত নিবিড়। কঠিন নয় বলিয়া মৃদু; এই চিৎ নিঃশেষে সমস্ত শোক তাপ উচ্ছেদ করেন বলিয়া শীতল; এই চিৎ বহির্ম্মুখতাশূন্য বলিয়া ইনি অচেত্য চিৎ বলিয়া খ্যাত, কোন আবরণ নাই বলিয়া ইনি নিভিত্তি, আর সমস্ত ব্যবহারিক বিষয়ের অগ্রে অগ্রে ইঁহারই স্ফুরণ হইয়া থাকে।

এই আত্মদর্পণে—এই চিৎ দর্পণে দিক্ কাল ও তদন্তর্গত সর্ব্ব কার্য্যের উৎপত্তি, আবার উৎপন্ন সমস্ত বস্তুর স্থিতি জন্য অবকাশ প্রাপ্তিরূপ আকাশ, তেজ চক্ষু ইত্যাদি যায়া সমস্তের প্রকাশ, আবার প্রকাশিত বস্তু সমূহকে এই এই রূপে ব্যবহার করা উচিত এইরূপ নিয়তিক্রম—এই সমস্ত এই চিৎ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় এবং পরা পরিণতি—দেশ কাল বিস্তীর্ণ বিকারবৈচিত্র প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহারা প্রতিবিম্ব মত দর্পণের ভিতরে স্ফুরিত হয়।

ত্রিজগৎ প্রতিবিম্বশ্রীর্ব্বহিরন্তশ্চ সংস্থিতা।
তত্র বৈ কৃত্রিমা কা স্যাৎ কাসৌ বা স্যাদকৃত্রিমা॥ ১৪॥

এই যে ত্রিজগতের প্রতিবিম্ব শোভা চিৎ দর্পণের ভিতরেও বাহিরে দেখা যায় তাহার মধ্যে কৃত্রিম কোনটি অকৃত্রিমই বা কোনটি?

সরস্বতী—সৃষ্টির আবার কৃত্রিমত্ব অকৃত্রিমত্ব কি তাহাই অগ্রে বল?

লীলা—আমি ও আপনি যে এইখানে আছি এইটিকে আমি অকৃত্রিম সৃষ্টি বলি। আর আমার ভর্ত্তা যে সৃষ্টিতে স্থিত তাহা কৃত্রিম। কারণ দেশ কাল

ইত্যাদি দ্বারা যাহা অপূর্ণ অর্থাৎ দেশ কালাদি ব্যবহারের সীমার বাহিরে যাহা তাহাকে ত আমি শূন্য মিথ্যাভূত বলিয়াই মনে করি।

"অহং মন্যে যতঃ শূন্যো-দেশকালাদ্য পূরকঃ।" ১৭॥

সরস্বতী—তুমি আমি যে সৃষ্টিতে, তাহাকে বলিতেছ অকৃত্রিম সৃষ্টি। আর তোমার স্বামীকে যে সৃষ্টিতে দেখিয়া আসিলে তাহা কৃত্রিম সৃষ্টি। কৃত্রিম সৃষ্টিটা তবে তোমার বা আমার দ্বারা কল্পনা করা হইয়াছে। আচ্ছা তুমিই দেখ অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কখন ত কৃত্রিম সৃষ্টি জন্মিতে পারে না। যেহেতু কারণটি যাহা, তাহা, হইতে অসদৃশ কার্য্য কখন উদয় হয় না।

লীলা—এক দীপের আলো হইতেছে কারণ; আর একটি দীপের আলো হইতেছে কার্য্য। এক্ষেত্রে দীপাদ্দীপান্তরং ন তত্র বৈচিত্রং দৃশ্যতে। এক্ষেত্রে কারণও যাহা কার্য্যও তাহাই বলিতে পারা যায়। দুই দীপের আলো যেন একই হইল। কিন্তু কতকটা মাটি হইতেছে ঘটের কারণ। মাটিটা ত ভিতরে জল ধারণ করিতে পারে না কিন্তু ঘট ত পারে। তবে কারণ ও কার্য্য যে এক তাহা বলি কিরূপে? যতখানি মাটিতে একটি ঘট হয় সেই মাটিতে যতখানি জল ধরিবে, ঐ মাটি নির্ম্মিত ঘটে কি ততটুকুই জল ধরিবে? যখন কারণের শক্তি ও কার্য্যের শক্তি এক নহে তখন কার্য্য ও কারণ এক বলা যায় কিরূপে?

সরস্বতী—কার্য্যটি যাহা কারণটিও তাই। কিন্তু মুখ্যকারণটির সহিত যদি অন্য সহকারী কারণ যুক্ত হয় তদ্দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহা মুখ্য কারণের সহিত এক হইবে কিরূপে? কতক খানা মাটিকেই ত আর ঘট বলিতে পার না। মৃৎপিণ্ডের সহিত অন্য সহকারী কারণ যুক্ত হইলে অর্থাৎ মৃতপিণ্ড, দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার এই গুলি যুক্ত হইলে তবে ত ঘট হইবে! মৃতপিণ্ড দণ্ড চক্র কুম্ভকার এই সমস্ত মিলিত হইয়া যে ঘট হইল তাহা ঘটের মুখ্যকারণ যে মৃতপিণ্ড তাহার সহিত এক হইবে কিরূপে?

এখন বিচার কর। যে সৃষ্টিতে তোমার স্বামীকে দেখিলে তাহার কি কোন কারণ আছে বা নাই? যদি বল কারণ নাই তবে আমি বলিব তাহা বলিতে পার না। তুমি ত ভঙ্গসর্গ দেখিয়াছ। কার্য্য দেখিয়াছ তবে কিরূপে বলিবে যে তাহার কারণ নাই?

তবে বল তাহার কারণ আছে। আচ্ছা কারণ যাহা আছে সে কারণটা কৃত্রিম কারণ বা অকৃত্রিম কারণ?

যদি বল কৃত্রিম কারণ তবে জিজ্ঞাসা করি ঐ কৃত্রিম কারণটি কি এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টির কৃত্রিম কারণের মত বা অন্যরূপ?

অন্যরূপ বলিতে পার না। কারণ আদিকল্প যখন শেষ হইয়াছিল তাহার পর এই সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্য এই সৃষ্টির কারণ তোমার মতে কৃত্রিম।

এই সৃষ্টি ও সেই সৃষ্টি যদি ভিন্নই হয় তবে ইহাদের দর্শনটা ও ভিন্ন হইবে। এই সৃষ্টিকে যেরূপ দেখ সেই সৃষ্টিকে সেরূপ দেখিবে না। তুমি কিন্তু দুই সৃষ্টিই একরূপ দেখিতেছ। তবেই বলিতে হয় উভয় সৃষ্টিই একরূপ।

পূর্ব্বে বলিলাম মূল কারণের সহিত সহকারী কারণ মিলিত হইয়া যে কার্য্য হয় সেই কার্য্য কখন মূল কারণের সহিত এক হয় না। এখন বল দেখি তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি যে দেখিলে আর সে সব যে কৃত্রিম বলিতেছ এবং তোমার ও আমার অবস্থানকে এবং তোমার স্বামীর এখানে অবস্থানকে যে অকৃত্রিম বলিতেছ তাহা কেন বলিতেছ? দুই এক নয় কেন? কোন্ সহকারী কারণ দ্বারা তোমার এখানকার অকৃত্রিম ভর্ত্তা সেখানে কৃত্রিম ভর্ত্তা হইয়া গেলেন?

বদ তদ্ভর্ত্তৃসর্গস্য কিং পৃথ্ব্যাদিষু কারণম্।
তদ্ভূমণ্ডলতোভূতির্জ্জাতা তত্র বরাননে॥ ২১॥

বল এই সৃষ্টির অন্তর্গত পৃথিব্যাদির মধ্যে তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তির কোন্ বিচিত্র কারণ থাকিতে পারে? ভৌতিক সৃষ্টিকেই যখন তুমি অকৃত্রিম বলিতেছ তখন এই ভূমণ্ডল হইতে যেমন ভাবে সৃষ্টির উৎপত্তি হইতেছে সেখানেও সেইরূপ ভাবে উৎপত্তি হইতেছে। বৈষম্য কিরূপে হইবে?

ভাল করিয়া বলি শ্রবণ কর। তুমি বলিতেছ এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা অকৃত্রিম আর সেই জগৎটা কাল্পনিক, কৃত্রিম। আর অকৃত্রিম জগৎটা কৃত্রিম জগতের কারণ। কৃত্রিম কল্পনা অকৃত্রিমের সংস্কার মাত্র। আবার বলিতেছ সে জগৎ ও এই জগৎ একরূপ। যদি ভিন্নরূপ হইত তবে বলিতে পারিতে সহকারী কারণের যোগে ভিন্নরূপ হইয়াছে। তা যখন নয় তখন বলিতে হইবে এ জগতের মত সেই জগতের উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু এ জগতের উৎপত্তির

যদি কোন কারণ থাকে তবে সেই কারণই সেই জগতের ও উৎপত্তির হেতু হইবে। তুমি যদি বল কাল্পনিক জগতের উৎপত্তি এই অকৃত্রিম জগতের উৎপত্তির মত নহে তবে বলিতে হয় "গতঞ্চেদিত উড্ডীয়" এই জগতটাই উড্ডীয়মান হইয়া সেইখানে যায়? যদি বল এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া সেই ভূমণ্ডলে যায় তবে বলিব এই ভূমণ্ডল কোথায় তাই বল? আরও এখানকার মৃত্তিকা এখানকার ভূত সেখানে যখন যাইতে পারে না অথচ না গেলেও এখানকার মত সেখানে সৃষ্টি হয় না তবে সৃষ্টিটাকে কি বলিবে?

এই যুক্তি দ্বারা কি পাইলে দেখ।

তদ্বৎ সর্গস্য ন অসাধারণকারণবৈচিত্র্যং কল্পয়িতুং শক্যম্। সেই সৃষ্টির কোন অসাধারণ কারণ কল্পনা করা গেল না।

লীলা—তবে সেই সৃষ্টিটাকে কি বলিব?

সরস্বতী—উভয়োর্ম্মায়াকামকর্ম্মবাসনামাত্রমূলবত্বাবিশেষাৎ। সেই সৃষ্টিই বল আর এই সৃষ্টিই বল উভয় সৃষ্টির কারণ হইতেছে মায়া, কাম, কর্ম্ম বা বাসনা। যাহা কিছু সৃষ্ট হইতেছে তাহার কারণ হইতেছে পূর্ব্ব সর্গীয় কাম কর্ম্ম বাসনাদি। দুই সৃষ্টির এক কারণ। সর্ব্বত্রই সৃষ্টির অবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারে। মরণ মূর্চ্ছাকালে তোমার ভর্ত্তার বাসনা যেরূপে স্ফুরণ হইয়াছিল তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তিও সেই রূপে হইয়াছে।

লীলা—স্মৃতিঃ সা দেবি মদ্ভর্ত্তুস্তথা স্কারত্বমাগতা।
স্মৃতি স্তৎ কারণং বেদ্মি সর্গয়োরিতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৪।

আমার স্বামীর স্মৃতি যেমন যেমন হইয়াছিল মৃত্যুর পরে সেই সেই প্রকারেই স্ফুরণ হইয়াছে। স্মৃতিই তবে সৃষ্টির কারণ।

সরস্বতী—অবলে! স্মৃতিটা আকাশরূপা। যাহা আবার স্মৃতি হইতে জন্মে তাহাও স্মৃতির মত আকাশ রূপ। তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি অনুভূত হইলেও তাহা আকাশই বটে।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর।

পূর্ব্ব দৃষ্ট সৃষ্টি হইতে সংস্কার দ্বারা জগত যে তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি—সেই উৎপত্তিটা আকাশরূপা স্মৃতি মাত্র। সেই স্মৃতির অগ্রে কোন স্থূল বিষয় নাই বলিয়া

তাহা আকাশ সদৃশ। ইহা কিন্তু অনুভূত হয়। পূর্ব্ব সৃষ্টিও এইভাবে আকাশের মত কারণ তাহাও সেইরূপ তৎপূর্ব্ব সংস্কারের স্মৃতি মাত্র।

লীলা—স্মৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি তাহা আকাশময়। যেমন আমার স্বামী। এই সৃষ্টিকেও সেই সৃষ্টির মত আকাশ স্বরূপ মনে করিতেছি। এই সৃষ্টিও যে শূন্যাত্মক সেই সৃষ্টিই তাহার নিদর্শন।

সরস্বতী—সুতে! সৃষ্টি সর্ব্বদাই অসৎ। এই সৃষ্টিই বল আর তোমার ভর্ত্তৃ সৃষ্টিই বল আত্মাই সৃষ্টি ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। সৃষ্টি নাই। যিনি আছেন তিনিই মায়ার অবলম্বনে কখন সেই সৃষ্টি কখন এই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

লীলা—যথা পত্যুরমূর্ত্তোঽস্মাৎ সর্গাৎ সর্গো ভ্রমাত্মকঃ।
জাতস্তথা কথয় মে জগদ্ভ্রম নিবৃত্তয়ে ॥ ২৮ ॥

আপনি আবার অমূর্ত্ত এই সৃষ্টি হইতে যেরূপে পতির সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি জন্মিয়াছে জগৎ ভ্রম নিবারণ জন্য আমাকে তাহাই বলুন।

সরস্বতী—এই সৃষ্টি পূর্ব্ব স্মৃতির ভ্রান্তি মাত্র। স্বপ্ন ভ্রমের মত ইহা যেরূপে উদিত হইতেছে তাহা শ্রবণ কর। এখানে আর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়া যাও।

চিদাকাশের কোন একবিন্দু পরিমিত স্থানে চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশের এক দেশে নীল কাচ খণ্ড মত এই আকাশ আচ্ছাদিত এই পরিদৃশ্যমান সংসারমণ্ডপ। এই মণ্ডপে ১৪টি কুঠরী আছে। তাহাই হইতেছে চতুর্দ্দশ ভুবন। একটি স্তম্ভের উপর মণ্ডপ। স্তম্ভটি মেরু। লোকপালগণ এই মণ্ডপের পুরবাসী। ত্রিভুবনের অন্তরালগুলি ইহার গর্ত্ত। ত্রিভুবন বিবরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য একটি দীপ। এইটি সূর্য্য। এই মণ্ডপের এখানে ওখানে পর্ব্বত মৃৎখণ্ডগুলি গৃহ কোনস্থ বল্মীক মত নগরাদি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই মণ্ডপের ব্রাহ্মণ হইলেন প্রজাপতি। তিনি অনেক পুত্র জঠর। এখানে যত জীব বাস করে বড় বড় রাজা রাণী হইতে অতি ক্ষুদ্রজীব পর্য্যন্ত সকলেই গুটিপোকার মত আপন আপন কোশে বদ্ধ হইয়া কি যেন কি করে। ব্যোমোর্দ্ধতল এই গৃহের কালিমা-ঝুল। উপরের আকাশে সে সমস্ত সিদ্ধগণ বিরাজ করেন, তাঁহারা এই গৃহের ঘুম্ ঘুম শব্দকারী মশক মত।

মেঘ সকল জ্বালা বেষ্টিত গৃহকোণের অগ্রধূম। বায়ুপথগুলি মহাবংশ। তাহা আবার বিমান কীট পূর্ণ। এই গৃহ সুর অসুরাদি দুষ্ট বালকগণের ক্রীড়া—কল কল রবে সর্ব্বদা আকুল। ত্রিলোকের মধ্যে যে সমস্ত পুর গ্রাম তাহা এই মণ্ডপের অন্তর্গত ভাণ্ডের উপস্কর উপকরণ বা মশলাদির মত। এই গৃহের দীপ্তিযুক্ত কোটর হইতেছে পাতাল, ভূতল ও স্বর্গ। উহার ভূতল সমুদ্র রূপ সরোবর জলে সিক্ত। সেই অম্বর কোটরের এক কোণে শৈল রূপ লোষ্ট্রতলে অনেক গর্ত্ত। সেইগুলি হইতেছে গ্রাম। তাহার একটির নাম গিরিগ্রাম।

তস্মিন্নদী শৈল বনোপগূঢ়ে
সাগ্নিঃ সদারঃ সুতবান্ অরোগঃ।
গোক্ষীরবান রাজভয়াদ্বিমুক্তঃ
সর্ব্বাতিথি ধর্ম্মপরো দ্বিজোঽভূৎ ॥ ৩৮।

নদী শৈল বন আলিঙ্গিত সেই গিরি গ্রামে এক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র ছিল। তিনি রোগ শূন্য। তাঁহার পয়স্বিনী গাভী প্রভৃতি অনেক পশুধন ছিল। রাজ-উপদ্রব তাঁহার উপর ছিল না। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমস্ত বর্ণাশ্রমের অতিথি তাঁহার নিকট পূজা পাইত ও তাঁহার পোষ্য ছিল।

১৯শ সর্গ বা পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ মরণ।

কি বিত্ত, কি বেশভূষা, কি বয়স, কি কর্ম্ম কি বিদ্যা "বশিষ্ঠ স্যৈব সদৃশো নতু বাশিষ্ঠ চেষ্টিতঃ"—সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠদেবের মত ছিলেন কেবল ইক্ষ্বাকুবংশের পৌরোহিত্য ও রাম উপদেশ এই বাশিষ্ঠ চেষ্টা তাঁহার ছিল না। ব্রাহ্মণের নামও ছিল বশিষ্ঠ আর ভূম্যাকাশ অবস্থিতা ইন্দু সুন্দরী তাঁহার স্ত্রীর নামও অরুন্ধতী।

উভয় অরুন্ধতীই রূপে গুণে বিদ্যা বিভবে সমান। বিশেষ এই যে প্রসিদ্ধ অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠ ছিলেন জীবন্মুক্ত আর ইহারা ছিলেন বদ্ধাবস্থায়।

অকৃত্রিম প্রেমরসা বিলাসালস গামিনী।
সাস্য সংসার সর্ব্বস্বমাসীৎ কুমুদ হাসিনী॥ ৮॥

স্বামীর অকৃত্রিম আদরে আদরিণী, বিলাসবতী, অলসগামিনী কুমুদহাসিনী এই অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের সংসার সর্ব্বস্ব ছিলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ শৈলসানুদেশে হরিদ্বর্ণ সর্ব্বত্র সমান তৃণক্ষেত্রে উপবিষ্ট। দেখিলেন এক মহীপতি স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেছেন। তাঁহার সৈন্য কোলাহল যেন মেরুকেও বিদীর্ণ করিতেছে।

কি বৈভব এই রাজপদে! চামর ও পতাকা দ্বারা লতাবন যেন চন্দ্রকিরণাকীর্ণ জ্যোৎস্নাময় হইয়া যাইতেছে আর শ্বেত ছত্রসমূহ দ্বারা আকাশ যেন রৌপ্য সৌধ-বিশিষ্ট হইয়া যাইতেছে। অশ্ব পাদোৎখাত রজোরাজি অম্বরতল আচ্ছাদন করিতেছে, হস্তিগণের পৃষ্ঠে মণিমুক্তা বিজড়িত আস্তরণ। সেখানে সূর্য্যকিরণ নিরুদ্ধ হইয়া এবং বায়ু দ্বারা যেন কত কত স্বর্ণ রজত মুক্তা মণ্ডপ রক্ষিত হইয়াছে। সৈন্যগণের কোলাহলে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া মৃগাদি ভূতমণ্ডল আবর্ত্ত মত ঘুরিতেছে। রাজার অঙ্গে হার কাঞ্চন মাণিক্য কেয়ূর কেমন ঝক্‌মক্ করিতেছে। রাজাকে এই রূপে দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "অহো সুরম্যা নৃপতা সর্ব্ব সৌভাগ্য ভাসিতা।" সর্ব্ব সৌভাগ্য দ্বারা অলঙ্কৃত রাজপদ কত রমণীয়। আমি কি কখন রাজা হইতে পারিব? কবে আমার পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, ছত্র, চামর—দিক্ কুঞ্জ পূর্ণ করিবে? কবে আমার এমন হইবে যে কুন্দ পুষ্পসমূহের সুগন্ধ মকরন্দবাহী বায়ু আমার অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সুরত শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত করিবে? কবে আমি কর্পূর দ্বারা পুরন্ধ্রীগণের মুখমণ্ডল এবং নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের মত প্রকাশ করিব?

ইত্থং ততঃ প্রভৃত্যেব বিপ্রঃ সঙ্কল্পবান ভূৎ।
স্বধর্ম্মনিরতো নিত্যং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ॥ ১৪॥

ব্রাহ্মণ সেই দিন হইতে প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ

সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্তই করিতেন, এবং জীবনের শেষ পর্যান্ত আলস্য ত্যাগ করিয়া রাজা হইবার সঙ্কল্পও করিতে লাগিলেন।

হিমানী দ্বারা পদ্ম যেমন বিরূপ হয় সেইরূপে জরা আসিয়া ব্রাহ্মণকে জীর্ণ করিল। ব্রাহ্মণী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসিতেছে দেখিয়া দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন। পুষ্প ঋতুতে লতা গ্রীষ্ম সমাগম ভয়ে যেরূপ হয় সেইরূপ।

অরুন্ধতীও তোমার মত আমার আরাধনা করিলেন। অমরত্ব দুর্লভ জানিয়া বর চাহিলেন যেন বশিষ্ঠের জীবাত্মা আপন মণ্ডপ হইতে কোথাও না যান। আমিও ঐ বর তাহাকে দিলাম।

কালবশে ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এবং সেই গৃহাকাশেই জীবাকাশ রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকার দৃঢ় সঙ্কল্পবশে ব্রাহ্মণ ঐ আকাশ শরীরেই পরম শক্তিসম্পন্ন রাজা হইলেন।

রাজার বলে পৃথিবী জয় করিলেন প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ করিলেন এবং দয়াতে পাতাল পালন করিলেন। এইরূপে তিনি ত্রিলোক বিজয়ী হইলেন।

তিনি আর বৃক্ষের কল্পাগ্নি, স্ত্রীগণের মকরকেতু, বিষয়বায়ুর মেরু সাধু পদ্মসমূহের দিবাকর। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের আদর্শ, ভিক্ষুকের কল্পপাদপ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের পাদপীঠ বা আশ্রয়, রাকাধর্ম্মামৃত ত্বিষঃ—ধর্ম্মলক্ষণস্য অমৃতত্বিষশ্চন্দ্রস্য রাকা পৌর্ণমাসী। অর্থাৎ সুধাকরের পৌর্ণমাসী।

ব্রাহ্মণ এই রূপে সেই গৃহাকাশে সেই দিনে পূর্ব্ব সংস্কারপূর্ণ চিত্তাকাশময় ভূতাকাশ শরীরে রাজা হইলেন। তাহার ব্রাহ্মণী ভার্য্যা শোকে নিতান্ত কৃশ হইলেন এবং শুষ্ক মাষসিম্বীর মত তাঁহার হৃদয় যেন দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গেল। তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন এবং আতিবাহিক দেহে বা ভাবনাময় দেহে ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইলেন। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় সেইরূপ। বাসন্তীলতিকা যেমন আনন্দ প্রফুল্ল হয় অরুন্ধতীও সেইরূপ হইলেন।

আজ আট দিন হইল গিরিগ্রামে গৃহমণ্ডপে তাঁহারা মরিয়াছেন। সেই গিরিগ্রামে সেই বিপ্রের গৃহ, ভূমি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে।

২০শ সর্গ বা ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরমার্থ প্রতিপাদন।

সরস্বতী—লীলা।

লীলা—মা আমি যেন কেমন হইয়া যাইতেছি।

সরস্বতী—কিছু কি বুঝিতেছ?

লীলা—মা আমি কে? আমি কি কাহারও সঙ্কল্পের মূর্ত্তি? আর আমার স্বামী? তিনিও কি এখন সঙ্কল্পের সঙ্কল্প?

সরস্বতী—তোমরা কে তাহা বলিতেছি। মনোযোগ কর। ইহা বুঝিলে বুঝিবে সকল জীব কি, জগৎ কি।

লীলা—বলুন।

সরস্বতী—সতে ভর্ত্তাস্থ সম্পন্নো দ্বিজোভূপত্বমাগতঃ।

স দ্বিজোঽস্থ ভূপত্বমাগতঃ সন্ তে ভর্ত্তা সম্পন্নঃ॥

সেই দ্বিজ অস্থ ভূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার স্বামী হইয়াছেন। আর তুমি।—

যা সাবরুন্ধতী নাম ব্রাহ্মণী সাত্বমঙ্গনে॥ ১॥

অঙ্গনে! সেই অরুন্ধতী নামক ব্রাহ্মণী তুমি।

চক্রবাক মিথুনের মত তোমরা। তোমরাই হরপার্ব্বতীর মত পৃথিবীতে নূতন জন্ম পাইয়াছ। পদ্ম ও লীলা হইয়া যাহারা রাজত্ব করিতেছিল তাহারা তোমরাই। তোমরাই সেই দম্পতী। এই তোমাকে পূর্ব্ব সৃষ্টিক্রম সমস্তই বলিলাম।

ভ্রান্তিমা একমাকাশমেবং জীবস্বরূপ ধৃক্॥ ৩॥

জীব রূপে যে অমান সেটা ভ্রম মাত্র। সেটা আকাশ মত শূন্য।

ভ্রমাদস্মাচ্চিদাকাশে ভ্রমোঽয়ং প্রতিবিম্বিতঃ।

অসত্য এব বা সত্যো ভবতোর্ভবভঙ্গদঃ॥ ৪॥

পূর্ব্ব ভ্রম হইতে এখনকার ভ্রম, আবার এই ভ্রম হইতে ভবিষ্যৎ ভ্রম। পূর্ব্ব ভ্রম, এতৎ ভ্রম আবার ভবিষ্যৎ ভ্রম সমস্তই চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

ইহাদের পৃথক্ সত্তা যদি দেখ তবে ইহারা অসত্য আর চৈতন্যের বিবর্ত্ত ভাবে দেখিলে ইহারা সত্য। ভিতরটি দেখিলে বুঝিবে ইহারা বাস্তবিক নাই।

তস্মাৎ ভ্রান্তিময়ঃ কঃ স্যাৎ কোবা ভ্রান্ত্যুজ্ঝিতো ভবেৎ।
সর্গো নিরর্গলানর্থ বোধান্নান্যো বিজৃম্ভতে ॥ ৫ ॥

সেই জন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে বলি ভ্রান্তিময় কোন্‌টি আর ভ্রান্তিবর্জ্জিতই বা কোন্‌টি? সমস্ত সৃষ্টিই ভ্রম বিজৃম্ভিত। ভ্রম দূর হইলে সৃষ্টি নাই।

শুনিতে শুনিতে লীলা বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে বলিল দেবি! আমরা কল্পনার মূর্ত্তি? সেই ব্রাহ্মণদম্পতি আমরা? ইহা মিথ্যা। কিরূপে ইহা হইবে? সেই ব্রাহ্মণের জীব ত তাহার ক্ষুদ্র গৃহাকাশে আর আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতে। আমার স্বামীকে যেখানে দেখিয়া আসিলাম সেই লোকান্তর, সেই শৈল, সেই দশদিক্ ক্ষুদ্র গৃহাকাশে থাকিবে কিরূপে? তাহারাই যে আমরা, সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

মত্ত ঐরাবতোবদ্ধঃ সর্ষপস্যেব কোটরে।
মশকেন কৃতং যুদ্ধং সিংহৌঘৈরণু কোটরে ॥
পদ্মাক্ষে স্থাপিতোমেরুর্নিগীর্ণো ভৃঙ্গসূনুনা।
স্বপ্নাব্দ গর্জ্জিতং শ্রুত্বা চিত্রং নৃত্যন্তি বর্হিণঃ ॥ ১০ ॥

মত্ত ঐরাবত হস্তীকে সর্ষপের মধ্যে আবদ্ধ করা যেমন অসম্ভব আপনার কথাও সেইরূপ অসম্ভব। অণুর মধ্যে সিংহসমূহের সহিত মশকের যুদ্ধ যেমন অসম্ভব ইহাও তাই। ভৃঙ্গতনয় কর্ত্তৃক পদ্মাক্ষ স্থাপিত সুমেরুর গ্রাস এবং স্বপ্নদৃষ্ট মেঘগর্জ্জন শ্রবণে চিত্রিত ময়ূরের নৃত্য মত ইহা অসম্ভব। হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি! আমার বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন। আপনার মত যাঁহারা তাঁহারা যাহাকে অনুগ্রহ করিবেন, তাঁহারা তাহার অযথা প্রশ্নেও উদ্বেজিত হন না।

সরস্বতী—নাহং মিথ্যা বদামীদং যথাবচ্ছৃণু সুন্দরি!
ভেদনং নিয়তিনাং হি ক্রিয়তে নাস্মদাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥

সুন্দরি! আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি না। আবার বলিতেছি শ্রবণ কর।

"মিথ্যা বলিও না" এই নিয়ম শ্রুতি করিয়াছেন। আমাদের মত লোকে নিয়ম ভেদ করে না।

বিভিদ্যমানামন্যেন স্থাপয়াম্যহমেব যাম্।
মর্য্যাদাং তাং ময়া ভিন্নাং কোঽপরঃ পালয়িষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অন্যে নিয়মভঙ্গ করিলে আমরা শাসন করিয়া নিয়ম স্থাপন করি আর আমরাই যদি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করি তবে আর কে তাহা পালন করিবে?

লীলে! গিরিগ্রামের সেই ব্রাহ্মণ যখন মরণমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি আপন জন্ম কর্ম্মরূপ সংসার ভুলিলেন, ভুলিয়া তাঁহার জীবাত্মা রাজবাসনা ব্যাপ্ত ভাবনাময় দেহ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আকাশরূপ স্বভবনে ব্যোমাকৃতি মহারাজা দেখিতেছেন।

তোমাদের বিপ্রদম্পতি কালীন প্রাক্তনস্মৃতি—পূর্ব্ব স্মৃতি লোপ হইয়া গিয়াছে। এখন অন্য প্রকার স্মৃতির উদয় হইয়াছে। স্বপ্নকালে যেমন জাগ্রৎ স্মৃতি থাকে না সেইরূপ মরণ হইলেও জীবের পূর্ব্ব সংসারের কিছুই স্মরণ থাকে না।

স্বপ্নকালে ত্রিভুবন দর্শন, সংকল্পময় মনোরাজ্যে ত্রিজগৎ দর্শন, কথার্থে সংগ্রাম দর্শন, মরুভূমিতে জলদর্শন যেরূপ তোমাদেরও রাজা রাণী হওয়া সেইরূপ—শুধু সঙ্কল্পমাত্র। ব্রাহ্মণের গৃহাকাশ মধ্যে সশৈলবনপত্তনা পৃথিবী দেখা দর্পণে সঙ্কল্পমূর্ত্তি দর্শন তুল্য।

এই পরিদৃশ্যমান অসত্য জগৎ সত্য স্বরূপ চিদ্ ব্যোমের প্রতিফলন। আকাশের মত সূক্ষ্ম পরমাত্ম দর্পণে সমুদায় অসত্যতা সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। জগৎটা যে সত্যমত বোধ হয় সে সত্যতা জগতের নহে সে সত্য পরমাত্মার। পঞ্চকোশান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই ভ্রম জ্ঞানে চিদাত্মাকে জগৎরূপে যে দর্শন তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র।

অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন যাহা তাহাও অসৎ। মৃগতৃষ্ণা তরঙ্গিণী হইতে যে তরঙ্গ উঠে তাহা যেমন অসৎ স্মৃতি হইতে জাত জগতও সেইরূপ। এই তোমার গৃহাকাশের মধ্যে তোমার গৃহ, তার মধ্যে তুমি আমি সমস্ত—এই সমস্ত কেবল চিদাকাশ মাত্র।

Registered No. C. 5 1.

০ম বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল। [২য় সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৷০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি, সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪৷৷০, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷৷০, সিকি পৃষ্ঠা ১৷৷০, সিকির অৰ্দ্ধেক ৸৵০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

"ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা।"

অখিলপ্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাও। সুখ হউক বা দুঃখ হউক, ইহারা "প্রারব্ধ" এই বলিয়া ভোগ করিয়া যাও।

রামায়ণের এই কথা কত দুর্ব্বলের প্রাণে বল আনিয়া দেয়, কত হতাশের প্রাণে আশার সঞ্চার করে, কত পুত্রহারা জননীর প্রাণ শীতল করে, কত তাপিতের প্রাণ জুড়াইয়া দেয়, কত স্বামীবিয়োগবিধুরা বালাকে ভগবদনুরাগিণী করে—যদি তাহারা প্রারব্ধ ভোগটা কি একবার দেখে অথবা আপনি বুঝিতে না পারিলেও যদি অন্যের কাছে বুঝিয়া লয়।

বড় প্রাণ জুড়ান উপদেশ ইহা। যদি কেহ ইহা একবার ভাল করিয়া দেখে।

বড় ভারি তত্ত্ব কথা ইহাতে আছে। স্ত্রী হও বা পুরুষ হও যদি ভাল করিয়া একবার দেখ তুমি বুঝিবে তুমি চেতন। চেতনটি ব্যাপক। জড়টা চেতন অপেক্ষা ক্ষুদ্র। যেমন লোকে বলে আমার মধ্যে আকাশ আছে অথচ সে আকাশ এই মহাকাশ হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হয় না, সেইরূপ দেহের মধ্যবর্ত্তী চৈতন্য সেই অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হন না। ফলে চৈতন্যের কখন অংশ হয় না। অথচ মনে হয় চৈতন্য যেন দেহের মধ্যে আবদ্ধ। প্রকৃত কথা এই যে, চৈতন্য মহাসাগরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বুদ্‌বুদ উঠিতেছে, লয় হইতেছে; আবার

উঠিতেছে আবার ভাঙ্গিতেছে। এই হইতেছে; কতদিন ধরিয়া হইতেছে কেহ জানে না। যতদিন তিনি আছেন ততদিন ধরিয়া তাঁহাতে সৃষ্টি তরঙ্গ একবার করিয়া উঠিতেছে, আবার লয় হইয়া যাইতেছে। চিরদিনই এইরূপ হইতেছে; ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। তথাপি ইহারই ভিতর মহাপ্রলয় হয়, আবার মহাপ্রলয়ের পরে সেই আপনি আপনি চৈতন্য পুরুষ হইতে সৃষ্টি জাগে আবার লয় হয়।

এখন দেখ তোমার এই দেহটা বা আমার এই দেহটা আমাতে কোনরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। চলন রহিত চৈতন্যসাগরে এই সদাচঞ্চল দেহটা কোন প্রকারে উঠিয়াছে।

এই দেহটা আসিয়াছে কতকগুলি কর্ম্মের ফল ভুগাইতে। তা হউক না কেন। এটা কতকদিন ধরিয়া নাচুক হাসুক, উঠুক পড়ুক, ইহাতে কি হইল? এটা নাচিতেই আসিয়াছে নাচিয়া নাচিয়া শেষে সভা হইতে চলিয়া যাইবে। এটা চিরদিনের নয়, এটা থাকিবেও না। যখন না থাকিবে তখন যিনি আছেন তিনি আছেন, মহাস্ফূর্ত্তি। আবার রোজ সকল জীবের ইহাই হইতেছে। কখন জাগ্রত, কখন স্বপ্ন, কখন সুষুপ্তি কার না হয়? কিছুদিন এইরূপ হইবে তার পর রঙ্গশালার দীপ নিবিয়া যাইবে। তখন যিনি আছেন তিনিই আছেন।

এই যে সুখ দুঃখে মানুষ কাতর হয়—ইহা হয় কেন? সুখ দুঃখটা কি? ইহারা কর্ম্মের ফল মাত্র। চেতন যিনি তাঁতে ত কোন কর্ম্ম নাই। কর্ম্মটা দেহের। দেহটা আগন্তুক মাত্র। এটা নাচিতে আসিয়াছে। এটা নাচুক না কেন—এটা কর্ম্ম করুক না কেন, তাতে সুখ দুঃখ উঠুক না কেন—এটা ত থাকিবেও না—তবে ইহার কর্ম্মের সুখ দুঃখ পাওয়াই বা কেন আর তাতে এত হা হুতাশ করাই বা কেন? দেহটা কখন তমে জড়িভূত থাকিবে, কখন রজে ছুটাছুটি করিবে, কখন সত্ত্বে আনন্দে নাচিবে। কখন লয় আসিয়া এটাকে যেন কাতর করিবে, কখন বিক্ষেপ আসিয়া এটাকে হা হুতাশ করাইবে। তা করুক না কেন তাতে তোমার আমার কি—হইল? ঘটটা ভাঙ্গুক না কেন তাতে আকাশের ক্ষতি কি হইল—জড়টা মরুক বা থাকুক তাতে চেতনের কি হইল?

তত্ত্ব কথাটুকু কি ধরিলে? আপনাকে চেতন বলিয়া কি বুঝিলে? চেতন যে জড়ের সঙ্গে খাপ খায় না তাহা কি দেখিলে? বল দেখি তবে তাঁহার উপর এই তরঙ্গের ভাঙ্গা ভাসাতে সাগরের কি?

এইটুকু ধারণা করিতে বলিতেছি। আপনি যে চেতন এইটি বুঝিয়া দেহটাকে

জড় ভাবিয়া—এটা যেমন নাচে নাচুক তাহা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিলেই সব আপদ শান্তি হইবেই। দিন কতক এটা নাচিবে বইত নয়? তার পরে এটা থাকিবে না, তবে এত মূর্খতা কেন? এসা দিন নাহি রহেগা।

তবেইত প্রারব্ধ ভোগটা কি বুঝা গেল। আপনার চৈতন্য ভাবটি ধরিয়া আগন্তুক দেহটার নৃত্য ধীর ভাবে দেখা—যা হয় হউক আমি কিন্তু এই দেহটাও নই, এটার কর্ম্মে যে সুখ দুঃখ সংযোগ ও বিয়োগ এ সব আমার কিছুই নয়। এই ভাবে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া দিন কাটানও বেশ আনন্দ।

আর কি বলা যাইবে। যিনি ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন তিনি আপনার পরম শান্ত স্বভাবে থাকিয়া নৃত্যশালায় বহু নৃত্য দেখিয়াও কিছুই ব্যথিত হইবেন না।

ইহাই ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখংব দুঃখ মেব বা।

তুমি।

তুমিই তুমি আবার সবই তুমি। এইটি বোঝ যা চাও তাই পাইবে। শুধু বুঝা নহে অভ্যাস চাই। যে বোধে দৃশ্য দর্শনটাও নিতান্ত অসম্ভব সেই বোধের অভ্যাসই অভ্যাস।

কি চাই আর পাইবই বা কি?

চাও সুখ। পাইবে সুখ স্বরূপকে। সুখ কখন ক্ষুদ্র হয় না। অল্পে সুখ নাই। যিনি অফুরন্ত তাহাই সুখ।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখংনাল্পে সুখমস্তি।

দৃশ্যের অত্যন্তাভাব যে বোধে তিনিই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত সুখ।

ইহাকে পাইব কিরূপে?

দুই প্রকারে। ক্ষুধার সময় অবোধ শিশু যেমন মাকে পায় সেই একরূপ। আর মাকে বুঝিয়া সর্ব্বত্র মায়ের আরোপে মায়ের স্বরূপে সেই ভূমায়, সেই আপনি আপনিতে স্থিতি এই দ্বিতীয় প্রকার।

স্পষ্ট করিয়া বল।

যাতে চিত্ত যা' তাতেই ধর্ম্মের মূল কাঠিটি ছোঁয়াইয়া তাকেই ভাল করিয়া দেখ, যা চাও তাই পাইবে। এই মূল কাঠিটি তুমি। তুমিই বেদমাতা, তুমিই গায়ত্রী।

(২)

তুমিই তুমি শেষে। আগে সবই তুমি।

অবোধ শিশু। সে ত মাকেই চিনে। আর কাহাকেও চিনে না। মা যে প্রসব করিয়াছেন তাহাও সে জানে না। জানে কেবল এই, যে ক্ষুধায় মা খেতে দেয়। সেই আনন্দে পুনঃ পুনঃ মুখের দিকে চায়। আবার প্রতি অঙ্গ দিয়া মাকে স্পর্শ করে তাই সে মাকে চিনে। এত চিনে যে যাকে দেখে তাকেই মা বলিয়া ফেলে।

যদি আপনাকে আপনি অবোধ বলিয়া সত্য সত্য ঠাওরাইয়া থাক তবে ত মাকেই চিনিবে আর কাকেও চিনিবে না। তা ত নাই। চিনিয়াছ যে অনেককে। কাজেই অবোধ শিশুর মত মা মা করিতে পারিবে না। শেয়ানা হইয়া গোল করিয়াছ।

অনেক চিনিয়াছ তাতেও ক্ষতি নাই। কেন না অনেক বড় একটা নাই। সবই সে। সেই সে।

(৩)

কিরূপে ধরা যায় সবই সে?

ধর্ম্মের মূল কাঠিটি ছোঁয়াও। যাতে ছোঁয়াইবে সেই সে হইয়া যাইবে।

ধর্ম্মের মূল কাঠটি কি? আর ছোঁয়ালেই বা সব এক হইয়া যায় কিরূপে? বড় আশ্চর্য্যের কথা বল "সব অঙ্কের এক ফল"?

সব অঙ্কেরই এক ফল। মূল কাঠটি জান। জানিয়া সবে তাহা ব্যবহার করা হইবে।

কি সেটি?

সেটি মা। সেটি গায়ত্রী। সেটি বেদমাতা।

(৪)

ভাল ক'রে বল।

মাকে আগে প্রণাম কর। পরে প্রার্থনা কর আর বল! মা তুমি প্রসন্ন হও। যা কিছু করি তাতে প্রসন্ন হও। প্রসন্ন হও বলিতে ভুলিও না। এখন দেখ।

অবোধ শিশু ত একদিন ছিলে। তখন যে স্তন দুগ্ধ দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, যে তখন যাতনা দূর করিয়া সুখ দিয়াছিল তখন ত সেই ছিল অভিলষিত বস্তু।

সুখ যে দেয়, অফুরন্ত সুখ যে দিতে পারে সেই অভিলষিত বস্তু। অফুরন্ত সুখ পেয়োনা হইয়া পাও নাই। তবু যে অনেক সময়ে সুখ দেয়, যাতে বহুসময়ে সুখ পাও তাই ধর। তাই অবলম্বনের বস্তু হউক।

কোন কিছু সুখের বস্তু অবলম্বন কর। করিয়া তাহাতে গায়িত্রীটি চিন্তা কর; হইবে। যতদিন অভ্যাস না হইয়া যায় ততদিন কর। তারপর সকল বস্তুতে ঐ চিন্তা কর। ইহাই ধ্যান।

(৫)

এখন বল কিরূপে গায়ত্রী চিন্তা করিব?

শোন। যাহা অবলম্বন করিয়াছ তাহাকে বল তুমি ওঁ। তুমি ভূর্ভুবস্বঃ। তুমি তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য। এস এস আমরা ধ্যান করি। ধীমহি। ধ্যান করিলে বুঝিব তিনি আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। যাতে আমাদের যথার্থ মঙ্গল হয় তাতেই প্রেরণ করিতেছেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ পথে প্রেরণ করেন। একটি পথেই প্রেরণ করেন। যে পথে চলিতে চলিতে প্রথম লাভ হয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হইলেই আসে অর্থ। অর্থে আসে কাম। কামে হয় মোক্ষ। এই চতুর্ব্বর্গ পথে ইনি প্রেরণ করেন। ইহাতেই ভীমভবার্ণবের পারে আমরা চলিয়া যাই। ধীয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

(৬)

যে বস্তুটী আমার প্রিয় তাহা কি সত্যই সত্যই ওঁ ইত্যাদি যে তাহাকে আমি ঐ ভাবে চিন্তা করিব?

যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ বা শুনিতেছ বা ভাবিতেছ তাহা ওঁকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বালকে এই যে বৃক্ষ দেখে, পাখী দেখে, পশু দেখে, মানুষ দেখে, সবই কি ওঁকার?

হাঁ সকলই ওঁকার। তবে বালকে ওঁকারকে স্পন্দন এবং নামে আচ্ছাদিত দেখে আর জ্ঞানীতে সর্ব্ব আবরণ শূন্য করিয়া তাঁহার স্বরূপটিই দেখে। এ দেখা ঠিক দেখা নহে কিন্তু স্থিতি।

ওঁকার আপন স্বরূপে যাহা তাহাতে তাঁহার শক্তি জড়িত যখন দেখা যায় তখনই তাঁহার মূর্ত্তি হয়। চিন্মণি স্বভাবোত্থ ঝলক জড়িত হইয়া রূপ ধারণ করেন। তখনই তাঁহার নাম দেওয়া হয়। রূপ ধারণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার নাম নাই।

রূপ ধারণ করিলেই নাম। চলন রহিত যিনি তিনি যে ভাবে হউক চলন জড়িত হইলেই উভয়েরই অব্যক্তাবস্থা হইতে একটা অভিব্যক্তি হয়। ইহারই নাম।

ওঁকার যখন আপনি আপনি থাকেন তখন কোন নাম নাই, কোন রূপও নাই। কিন্তু ঐ স্বভাবোথ চলন যখন তাঁহার উপরে ভাসে তখন সেই চলনের ভিতরে যত কিছু আছে তাহাই সূচীর শত পত্র ভেদের মত জাগিয়া উঠে বলিয়া ঐ স্পন্দনাত্মিকা শক্তিটিকে বলে বীজ। বীজের ভিতরে যেমন বৃক্ষ থাকে সেইরূপ ঐ স্পন্দনাত্মিকা অজ্ঞান বীজের ভিতরে এই মায়িক জগৎ থাকে। তাই ওঁকার বীজ ও নাম এই তিনই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ।

নাম হইতে রূপে যাও। তখন নাম ছাড়িবে। আবার রূপ হইতে বীজে যাও তখন রূপ ছাড়িবে। আবার বীজ হইতে স্পন্দনে যাও। তবে বীজ ছাড়িবে। আবার স্পন্দন হইতে সেই চলন রহিত আপনি আপনিতে যাও যিনি সর্ব্বকালে আছেন, যাহার কখনও কোন বিকার নাই, যাঁহার উপরে একটা মিথ্যামত, সঙ্কল্পমত, স্পন্দনাত্মিকা কি যেন কি একটা ভাসিয়া এই বিচিত্র সৃষ্টি দেখায়, যাঁহার উপরে ভাসিয়া এই সব তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তখন আর কিছুই রহিল না। তিনিই তিনি রহিলেন।

তাই বলিতেছিলাম আগে দেখ তিনিই সব। সবের মধ্যে তিনি এই যখন সর্ব্বদা দেখিতে পারিবে—তার পরেই সব যাহা দেখিতেছিলে তাহা ছিন্নাভ্রের মত লয় হইয়া যাইবে। থাকিবেন তিনিই তিনি।

এই স্থিতিতে পৌছিবার জন্য, এই নির্গুণ উপাসনা জন্যই সগুণ উপাসনা। বৈদিক সন্ধ্যা ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা এই একেই স্থিতি জন্য।

ধরিব কি ?

সর্ব্বাপেক্ষা সহজটি ধর, সর্ব্বাপেক্ষা বড়টিতে ক্রমে পৌছিবে।

প্রণাম করা সকল সাধনার সঙ্গে জড়িত কর, করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম করিয়া যাও, এমন কি ব্যবহারিক কোন কিছুতেই মাং নমস্কুরু ভুলিও না, যথাযোগ্য স্থানে মাং নমস্কুরু দেখাইয়া কর এবং অন্য সর্ব্বস্থানে মনে মনে ইহা অভ্যাস কর, ক্রমে উপরে উঠিতে থাকিবে। নিত্যকর্ম্মে কত স্থানে নমঃ প্রয়োগ

আছে দেখ। নমস্কারটি ভক্তির প্রথম অবস্থা। নমস্কারটি অভ্যাস করিয়া ফেল। ক্রমে জ্ঞানে পৌঁছিবে।

আর ভক্তিটিকে বাদ দাও, জ্ঞান কখন তুমি লাভ করিতে পারিবে না।

ভক্তিশূন্য যে জ্ঞানকে তুমি জ্ঞান বল তাহা ঊর্ণনাভির সূত্র মত কোন ব্যবহারে লাগে না। তাহা মাকড়সার ফাঁদের মত ক্ষুদ্র কীটকে সংহার জন্য। ইহাতে মাকড়সার স্বার্থ সাধন হইতে পারে বটে কিন্তু মাকড়সাকে পক্ষীর ভক্ষ হওয়া হইতে বাঁচাইতে পারে না। ভক্তি শূন্য জ্ঞান জ্ঞানই নহে। উহা মাকড়সার জালের মত বচন মাত্র। ঐজ্ঞানে তোমাকে শান্তও করে না তোমাকে স্বরূপে পৌঁছাইতে পারে না। ঐ জ্ঞানে অবিনয় থাকে, ঐ জ্ঞানে মনের দমন হয় না। ঐ জ্ঞানে বিষয় মৃগতৃষ্ণা শান্ত হয় না, ঐ জ্ঞানে ভূতে দয়া বিস্তার হয় না, ঐ জ্ঞানে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

ভক্তি অবলম্বনে যে জ্ঞান জন্মে, ভক্তির সাধনা করিতে করিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, ততাহাই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের ভিতর দিয়া তোমাকে মোক্ষে প্রেরণ করেন।

ভক্তি ধর; প্রণাম ধর; মাং নমস্কুরু সর্ব্বদা কর, বুঝিয়া কর সহজে পাইবে। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে চিত্তশান্তির সহিত, চিত্তপ্রসন্নতার সহিত, তাঁহার অনুগ্রহ অনুভবের সহিত লাভ করিবে। ইহা ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। যেমন তেমন করিয়া প্রণাম অভ্যাস কর—যতই অঙ্গভঙ্গ হউক মহাভয় হইতে সেই ত্রাণ করিবে। নমঃ বলিতে বলিতে যাঁহাকে নমঃ করিতেছি তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে নমস্কার, সকল ভাবনায়, সকল কার্য্যে, সকল বাক্যে, অভ্যাস করিয়া ফেল হইবে। সহজে হইবে। প্রথম প্রথম বহুবার ভুল হইবে। কিছুই রস আসিবে না মনে হইবে। কিন্তু সেই বলিয়াছে মাং নমস্কুরু—তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া কারিয়া যাও হইবেই নিশ্চয়।

শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী দুর্গা

নম দেবী জগদ্ধাত্রী আদিভূতা।
মম হৃদ্দেশে আসীনা বিশ্বমাতা॥
শোভে চন্দন চর্চ্চিত চরণোপরে
জবা বিল্বদল দুর্ব্বা থরে থরে॥

তব সুরাসুর অর্চ্চিত পদ নখরে
সদা ঝরে সুধা অমৃত অযুত ধারে ॥

সুধাপানে ভোর সুরাসুর নারী নরে।
প্রেমানন্দ ভরে নৃত্যগীত করে ॥

নম দুর্গা জগদ্ধাত্রী আদিভূতা।
মম হৃদ্দেশে আসীনা বিশ্বমাতা ॥

হীরা মাণিকখচিত রক্ত বস্ত্রোপরে।
মার কুন্তল ধরাতল পরশ করে।

কিবা স্তনযুগমণ্ডিত হীরক হারে।
নব বনফুল মালা দোলে হৃদোপরে ॥

স্বর্ণ আভরণে ভূষিত বারি করে।
শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ শোভা করে ॥

নম দেবী জগদ্ধাত্রী আদিভূতা
মম হৃদ্দেশে আসীনা বিশ্বমাতা ॥

মৃদু সুমধুর হাসি নধর অধরে।
যেন সতত "মা ভৈঃ" রবে ভীতি হরে ॥

কিবা শ্রবণে রতন ছবি দোলে ধীরে।
ভালে ত্রিনয়নে চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি ক্ষরে ॥

কিবা রতন মুকুট জ্বলে শিরোপরে।
অনুপম ভাতি হেরি মন মন্দিরে ॥

নম দেবী জগদ্ধাত্রী আদিভূতা
মম হৃদ্দেশে আসীনা বিশ্বমাতা ॥

পশু রাজ গরজে গজরাজ 'পরে।
নাশ সিংহ বাহিনী রক্তবীজাসুরে ॥

মম চিত্ত বৃত্তি রক্ত বীজ শরে।
জর জর কলেবর দেবী তার মোরে॥
নম দেবী জগদ্ধাত্রী আদিভূতা।
মম হৃদ্দেশে আসীনা বিশ্বমাতা॥

শ্রীহরেন্দ্র নাথ নাগ।

জননীর প্রতি।

ভৈরবী মধ্য।

কি জানি কেন মা ভাল,
লাগেনা সংসার আর।
ক্ষম দেবী অপরাধ,
ঘুচাও মা মনের আঁধার॥
একাকী বিরলে বসি,
কত কাঁদি কত হাসি।
সেও ত মা ভাল বাসি,
ভাল লাগেনা সংসার॥
কে যেন মা কানে কানে,
বলে আমার নিশিদিনে।
পার হবি রে কেমনে,
এই ভব পারাপার॥
করগো মা আশীর্ব্বাদ,
পুরা মা মনেরই সাধ।
(যেন) হরি প্রেম রসাস্বাদ,
করি এ জীবনের সার॥

শ্রীহরেন্দ্র নাথ নাগ।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্

এক দিন দুই দিন করিয়া বাল্য ও কৈশোর অতীত হইয়া গেল। যৌবনও অতীত প্রায়। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শ্রীগুরুর নিকট অবগত হইয়াছি। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা তেমন করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিলাম কৈ? হয় ত একদিন প্রাণে ব্যাকুলতা অনুভব করিলাম আর একদিন মোটেই রস পাইলাম না। এ দুঃখ যে সহ্য করিবারও নয়, প্রকাশ করিয়া বলিবারও নয়। প্রারব্ধ ভোগকালে আমার দারুণ ব্যথায় আহা বলিবার লোকও নাই।

কার কথায় আমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি আইসে? সে ত আমার মন। মন! তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু; যে দিন হইতে বিষয় প্রপঞ্চ সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ, সেই দিন হইতে তোমার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা উভয়ে কত কর্ম্মই না করিয়াছি। প্রত্যেক কর্ম্মেই ত তুমি আমার প্রধান সহায়। বাল্যে ধুলা খেলায় মত্ত হইতে বলিয়াছিলে; আমি সেইরূপ হইয়াছিলাম। যৌবনে কামিনী কাঞ্চনের জন্য পাগল হইতে বলিয়াছ; আমিও সেইরূপ হইয়াছি। আবার যৌবনের সায়াহ্নে বিষয় মৃগতৃষ্ণার পশ্চাতে শাশ্বত সুখের সঙ্কল্প উঠাইয়াছ; তাই আমি আবার বামনের চাঁদ ধরিবার মত কি এক অজানিত সুখের আশায় বুক বাঁধিয়াছি।

মন! তুমি কতবার পরম শত্রুর কর্ম্ম করিয়াছ আবার বলিতে কি পরম মিত্রের কর্ম্মও করিয়াছ।

যদি দয়া করিয়া একবার মিত্রের কর্ম্ম করিলে তবে আর শত্রুর কর্ম্ম করিও না। তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, তোমার সঙ্গে আজ আমি একটা আপোস করিয়া লইতে চাই। যখন যৌবনের প্রারম্ভে রূপের পশ্চাতে তুমি আমাকে বংশীরবমুগ্ধ হরিণের ন্যায় উধাও করিয়া লইয়াগিয়াছ, তখন তোমার সঙ্গে কতবার ঝগড়া করিয়াছি কিন্তু সব সময় জয়লাভ করিতে পারিনাই, শুধু ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, আবার পরক্ষণেই তুমি আমাকে স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখিয়াছ। আজ হইতে শত্রুতা ভুলিয়া যাও; তোমার সহিত আমার পরম বান্ধবতা। তুমি আমার সহায় হও। আমি অসাধ্য সাধন করিতে পারিব।

হায়! হায়! ও আবার কি সন্দেহ উঠাইলে? আমি ভগবদারাধনার অধিকারী কি না? পাপস্রোতে একবার দেহ ভাসাইয়া দিয়াছি বলিয়া আর কূলে

উঠিতে পারিব কি না? মন! ভাই আমার তুমিত অনেক কথা শুনেছ—অনেক কথা জান। কাঙ্গালের প্রতি দয়াল ঠাকুরের যে আশ্বাস বাণী আছে তাহা ত অবগত আছ "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" সুদুরাচার ব্যক্তিও তাঁহাকে কাঙ্গালের ঠাকুর বলিয়া ডাকিতে পারে। তবে আমার আশা নাই কেন? তুমি যদি একটু কৃপা কর তবে আমি ভজনা করিতে পারি। তারপর অনন্য ভাক্ হওয়া সে ত ভাই তোমার উপর নির্ভর করে। যদি আমাকে কামনার পশ্চাতে দৌড়াইতে বল তাই ত আমি দৌড়াই, কামনার বস্তু পাইলে আনন্দে অধীর হই, আবার না পাইলে বা পাইয়া হারাইলে মরমে মরিয়া যাই। তুমি একটু দয়া কর, আমাকে অনন্য ভাক্ করিয়া দাও।

মন, তোমার প্ররোচনায় কত অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি তাহা স্মরণ করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সে সব কথা আমি আর ভাবি না। সেগুলি প্রারব্ধ রূপে যখন আসিবে আমি তাহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিব। তুমি যে শাশ্বত সুখের ছবি সম্মুখে ধরিয়াছ তোমার কৃপায় তাহা আমি নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিব।

ভাই মন! তুমি ত নির্ব্বোধ নও তুমি ত জান চুরি করিলে চোরকে শাস্তি ভোগ করিতে হয় তবুও ত তুমি আমাকে কতবার চুরি করিতে বলিয়াছ। আজ হইতে তুমি যখন আমার পরম বন্ধু হইলে তখন আমাকে অসাধ্য সাধন করিতে একবার প্রস্তুত করাও। আমি দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া প্রাণপণে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

মন! ঐ দেখ প্রবৃত্তির তাণ্ডবনৃত্যের পশ্চাতে নিবৃত্তির লাস্যনৃত্য—সর্ব্ব-দুঃখের অন্তরালে পরম আনন্দ—মৃত্যুর পরপারে অমৃতের ধারা। তুমি একবার উত্তেজনার পাঞ্চজন্য বাজাও, আমি পরমোৎসাহে ইষ্ট কর্ম্মে লাগিয়া যাই। শ্রীগুরু-কৃপাবলে সাধনার সিদ্ধি লাভ হইলে আমিও ধন্য হইব তুমিও ধন্য হইবে। তুমি আমাকে কৃপা করিলে চক্ষুঃ কর্ণ ইত্যাদি কেহই আমার বিরোধী হইবে না বরং আমার সহায় হইবে। তোমারা সকলে আমার সহায় হও আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

এস চক্ষুঃ তুমি ত জন্মাবধি রূপের কাঙ্গাল; এতদিন কত রূপই দেখছ, তৃপ্তি ত পাও নাই, পেয়েছ শুধু জ্বালা। এবার শ্রীপতির অজস্র রূপ দর্শন কর চিরতৃপ্ত হইয়া যাইবে। এস কর্ণ, তুমিত আজীবন সুস্বরের ভিখারী, কত কণ্ঠ

স্বরই শুনেছ কিন্তু তৃপ্তি লাভ ত হয় নাই। এস এস অপূর্ব্ব স্বর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে। এ স্বরের যে আর তুলনা হয় না। সাধকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "দূরাগতঘণ্টানিনাদ বৎ" ওই শুন ভিতরে মধুর নিনাদ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হইতেছে। এস নাসিকা কত গন্ধই না আঘ্রাণ করেছ। এবারে নূতন গন্ধ আঘ্রাণ কর। এ যে নব কিশলয়ের গন্ধ। এ কিশলয় চিরবিকশিত, কখনও মলিন হয় না কখনও গন্ধ হীন হয় না।

এস রসনা—এত দিন মিষ্ট তিক্ত অম্ল কটু কত রস পান করেছ, কিন্তু পিপাসা মিটেছে কি? জল শুষ্ক হয়েছে কি? কখনই নয়, এস এস একবার নাম রস পান কর; এ যে অমৃত, এ যে বড় মিষ্ট, পিপাসা চির দিনের জন্য মিটিয়া যাইবে। ইহা স্তোক বাক্য নয়। তুমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।

এস ত্বক তুমিও এস, এত দিন যে স্পর্শ সুখের জন্য লালায়িত ছিলে? আলিঙ্গন লাভের আশায় কতই না ব্যাকুল হয়েছিলে। সে আলিঙ্গনে কখনও গ্লানিশূন্য আনন্দ পাও নাই, পেয়েছ শুধু জ্বালা। এস ত্বক একবার সেই চন্দ্র কোটী সুশীতল-চরণ হৃদয়ে লইয়া স্পর্শ সুখ অনুভব কর। সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে।

এস এস আমার বন্ধু বৃন্দ বাহির হইতে ভিতরে এস। মাতৃহীন সন্তানের মত চির বুভুক্ষু কাঙ্গালের মত বাহিরে আর ঘুরিয়া বেড়াইও না। এস ইন্দ্রিয়ের রাজা মন! তুমি তোমার সাঙ্গ পাঙ্গ লইয়া ভিতরে চণ্ডিমণ্ডপে এস আমি শ্রীজগ-দম্বার পূজায় বসিয়া গেলেন। তোমরা বন্ধুর ন্যায় আমাকে সাহায্য কর।

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

আহা! মায়ের কি অপরূপ। রূপ এ যে ভুবন ভরা রূপ। এ যে দশ দিক আলো করা রূপ। এ যে সন্তানের একমাত্র দেখিবার রূপ। মা আমার এক হস্তে বর, অপর হস্তে অভয় লইয়া সন্তানের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

মা! বহুদিনের সাধ মিটাইয়া তোমার ঐ রাতুল চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি—গ্রহণ কর মা।

ত্বমেবসর্ব্বং ত্বয়িদেব সর্ব্বং
স্তোতা স্তুতিস্তব্য ইহত্বমেব

ঈশ ত্বয়া জগ্যমিদং হি সর্ব্বং
নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমোনমস্তে ॥

মা তোমার সুশীতল চরণে আমার শিরলুণ্ঠন করিতে দাও। আমার জন্ম জন্মান্তরের মস্তিষ্কের জ্বালা জুড়াইয়া যাক্। আহা, মায়ের অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত-চরণে শিরলুণ্ঠন করিয়া ধন্য হইলাম। আর ত কিছুই দেখা যায় না, শুধু মায়ের অলক্তমাখা রাঙ্গাচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; দয়াময়ী মা, প্রাতঃসূর্য্যাকৃতি অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ আমার ভ্রূযুগলের মধ্যে স্পর্শ করাইয়া দিলেন। একটী ছাপ অঙ্কিত হইয়া গেল। উহাও বালসূর্য্যের মত জ্বলজ্বলে দীপ্তিময়, কিন্তু জ্বালা নাই।

মা, আশীর্ব্বাদ কর মা ভ্রূযুগলের মধ্যে যে টীপ পরাইয়া দিলেন সকল সময়েই যেন স্পষ্টরূপে তাহা দেখিতে পারি। উহা দেখিতে দেখিতে যেন তোমার অভয়পদের কথা মনে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমার সচ্চিদানন্দময়ী প্রতিমা ঐ বিন্দু মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখিতে পারি। মা, আমার নিত্যকর্ম্ম যেন এইরূপে হয়। তারপর "সাধুরেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবসিতোহি সঃ।" সে ত তোমার ইচ্ছা।

শ্রীগুরুদাস।

সাবিত্রী পরিশিষ্ট

উপাসনা তত্ত্ব ।

ভূমিকা।

পুরাতনে ছিল উপাখ্যান অংশ ও উপাসনার আভাস। নূতনে উপাখ্যান অংশের সহিত বিশেষভাবে উপাসনার জ্ঞাতব্য প্রকাশিত হইল। উপাসনা অংশটি এই সংস্করণের বিশেষত্ব।

ঋষিদিগের উপাসনা প্রভাবে জগতের অভ্যুদয় ও নরনারীর নিঃশ্রেয়স হইবেই সদ্বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন।

ভারতের বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় ভারতকে নষ্ট করিয়াছে কেহ কেহ ইহা বলেন। বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ভারতের অধোগতি হয় নাই। হইয়াছে বহু সম্প্রদায়ের পরস্পর পরস্পরের সহিত হিংসা বিবাদে।

বৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা যেমন বৃক্ষের সজীবতার চিহ্ন সেইরূপ ধর্ম্মের বহু সম্প্রদায়ও জীবন্ত ধর্ম্মের চিহ্ন। ঋষিদিগের ধর্ম্ম এখনও মরে নাই। যদি মরিত তবে এত সম্প্রদায় থাকিত না।

কালধর্ম্মে বুদ্ধির বিকৃতি আসিয়াছে। বিকৃতিবুদ্ধি-মানুষ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তাই বিরোধ বাধাইতেছে।

শাখাপ্রশাখাগুলি এক বৃক্ষেরই যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলি এক বেদ ব্রহ্মেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়া যখন লোকের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে তখনই ভারতের শুভদিন ফিরিয়া আসিবে।

ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁহার নামরূপ বহু। আবার যিনি ব্রহ্ম তিনিই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা। সমুদ্রে বহু তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে বলিয়া যেমন এক সমুদ্র বহু হইয়া যায় না সেইরূপ বহু নাম রূপ ধারণ করিয়াও এক ঈশ্বর বহু হন না।

গঙ্গা এক কিন্তু ঘাট বহু। ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁহার নিকটে যাইবার পথ বহু। বিভিন্ন প্রকৃতিতে একভাবে ডাকা হইতেই পারে না। তাই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাব, মাতৃ ভাব, মধুর ভাব, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে থাকিবেই। স্থিতিটি হইতেছে সকল সম্প্রদায়ের একত্ব।

উপাসনা তত্ত্বটি বুঝিয়া উপাসনা না করা পর্য্যন্ত যথার্থ চরিত্রবান চরিত্রবতী হওয়া যাইবে না। তাই এই প্রয়াস।

শুধু বই পড়িয়া লাভ কি? যদি ইহাতে ইহার আদর্শ হৃদয়ে সজীব ভাবে রাজত্ব না করে? আদর্শ হৃদয়ে সজীবতা লাভ না করা পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক চরিত্র গঠন হইতেই পারে না। শুধু নিয়ম পালন কয় দিন করা যায়? যদি যাঁহার নিয়ম তাঁহাকে ভলবাসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন না যওয়া যায়? ঈশ্বরকে ভাল না বাসিয়া কে কবে চিরদিন ধরিয়া নীতিবাক্য মত চলিতে পারিয়াছে? ব্যবহারকালে নৈতিক নিয়ম কতক্ষণ পালন করা যায়? ঈশ্বরকে ভালবাসিতে না পারিলে নৈতিক উপদেশ স্বাভাবিক হইয়া যায় না। নৈতিক নিয়ম স্বভাবে মিশিয়া না গেলে চরিত্রও গঠিত হয় না। আর যতদিন নিয়মগুলি স্বাভাবিক হইয়া না যাইতেছে ততদিন পদস্খলন হইবেই।

তাই বলিতেছি নিতান্ত কুচরিত্রও সুচরিত্র হইয়া যাইবে যখন উপাসনাটি বুঝিয়া উপাসনাটি অভ্যাস করা হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য সাবিত্রীতে উপাসনা তত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। উপাসনা তত্ত্বে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি থাকিবে।

প্রথম অধ্যায়—সাধারণভাবে সতীধর্ম্ম ও সাধনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দুঃখের কথা বা বিষাদযোগ।

তৃতীয় অধ্যায়—বিশেষভাবে উপসনা তত্ত্বে আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়—উপাসনা স্বাভাবিক।

পঞ্চম অধ্যায়—প্রচোদয়াৎ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—বিদ্মহে—শ্রবণ মনন।

সপ্তম অধ্যায়—ধীমহির পূর্ব্বে ধারণা অভ্যাস।

অষ্টম অধ্যায়—ধীমহি।

নবম অধ্যায়—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ধীমহি ও তান্ত্রিক সন্ধ্যার ধীমহি।

দশম অধ্যায়—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা উপাসনার ভাব।

শেষ—উপসংহার।

অতি সংক্ষেপে উপাসনায় প্রাপ্তির কথা বলিয়া এই ভূমিকা শেষ করিতেছি।

উপাসনার দুই অঙ্গ। এক অঙ্গে মিলন। মিলনের শেষ অর্দ্ধনারীশ্বর। দ্বিতীয় অঙ্গে এক হওয়া। অনায়াসপদ এইটি। ইহা এক অখণ্ড জ্ঞানে স্থিতি, ইহা এক অপরিচ্ছিন্ন আনন্দে স্বরূপ প্রাপ্তি।

* দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত উপাসনা তত্ত্ব পৃথক পুস্তাকাকারে বাহির হইবে।

এই অনায়াসপদে সর্ব্বদা থাকিয়াও জানিয়া শুনিয়া জগৎ লইয়া খেলা, জানিয়া শুনিয়া হাসি-কান্নায় বিচলিত হওয়া, জানিয়া শুনিয়া যেন স্বরূপে থাকিয়াও স্বরূপ ভুলার অভিনয় করা, ইহাই প্রথম অঙ্গের উপসনার উচ্চ অংশ। ইহাই শ্রীভগবানের দিক হইতে। আবার শ্রীভক্তের দিক হইতে রস সমুদ্র শ্রীভগবানের ভাব তরঙ্গে ৺ পুরীধামের সমুদ্রে স্নান করার মত প্রথম প্রথম নানা ভাবে উঠা পড়া, ক্রমে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত থাকা, সব শেষে এই বাহ্য দৃশ্য-ঐশ্বর্য্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই অন্তর্ভোগ্য মাধুর্য্যে সর্ব্বদা মধুর লইয়া থাকা এই হইল উপাসনার প্রথম অঙ্গের সর্ব্বজন আকর্ষণের কার্য্য। ইহার পরের অবস্থা যেটি সেটি কথায় বলা যায় না। তাহা স্থিতি।

উপাসনায় বসিয়া প্রথমেই একবার সকল ইন্দ্রিয়কে ডাকিয়া তাঁরে দেখাইবার অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। অভ্যাস হইয়া গেলে যখন সে অনুরাগ বাড়াইয়া দেয়; বাড়াইয়া দিয়া খেলা করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যায় তখন হয় উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্ত। এই অবস্থায় আর কোন ইন্দ্রিয় ধৈর্য্য মানে না। এই অবস্থায় বিষে অমৃত, অপার দুঃখে অনন্ত সুখ।—

বৈষ্ণব কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
আমি কারে বা বুঝাই না।
(এরা হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী)"

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে হয়—

"হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পারণ পীরিতি লাগি থির নাহে বাঁধে॥" ইত্যাদি।

এই অস্থিরের স্থির অবস্থা যাহা তাহাই উপাসনার শেষ।

উপাসনাতত্ত্বে পরে পরে ক্রম অনুসারে উপাসনার সমস্ত অঙ্গগুলি বুঝিতে প্রয়াস পাওয়া হইল। তত্ত্ব কথা নিতান্ত সূক্ষ্ম। তুমি না বুঝিলে মানুষের সকল চেষ্টাই বিফল। তোমার প্রসন্নতার অনুভব ভিক্ষাই আমাদের সম্বল। আর কি বলিব আমাদের ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে তোমার শ্রীচরণের স্পর্শ জীবন্তভাবে যদি একবারও হয়, তবেই এই উপাসনা স্বার্থকতা লাভ করে।

সন ১৩২১ সাল।
শকাব্দ ১৮৩৬।
১৬ই কার্ত্তিক রাসপূর্ণিমা, কলিকাতা।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণভাবে সতীধর্ম্ম ও সাধনা।

স্ত্রী—দেখ কত শান্ত হইয়াছি!

স্বামী—শান্ত? হুঁ। খুব দুরন্ত ছিলে নাকি?

স্ত্রী—শান্ত বুঝি তোমার মনের মতন হই নাই? কিন্তু দুরন্ত ছিলাম কি না তা কি আর তুমি জান না?

স্বামী—জানিত সবই। তবু কি ছিলে আর কি হইয়াছ?

স্ত্রী—বলিব? কেন বলত বলিতে বল?

স্বামী—বলই না কি?

স্ত্রী—প্রথম বয়সের কথা মনে কি পড়ে? আমার এ চাই, আমার তা চাই, আমার চাওয়ার অন্ত ছিল না। সর্ব্বদাই নূতন সাজ সজ্জার খেয়াল। গয়নার বাক্স খুলিয়া কত লোককেই না দেখাইয়াছি। ট্রাঙ্ক খুলিয়া সাজ পোষাক কতই না দেখিয়াছি ও দেখাইয়াছি। ঘরের মেজে অন্যকে দেখাইবার জন্য কত কৌশলই না করিয়াছি। আর নূতন অলঙ্কার হইলে? নূতন অলঙ্কার হইলে তাহা সকলকে দেখাইবার কত কৌশল। গলার কণ্ঠীর উপর লোকের দৃষ্টি পড়ুক সেই জন্য গলার কাপড় আলগা। উপর হাতের অলঙ্কার দেখাইবার জন্য হাতের কাপড় কাঁধে ওঠা। তার পর চুলে কত আলবার্ট, আর কত ঝাপটা কাটা। এই লইয়া ত ছিলাম। কোন কার্য্য করিতে হইলে কত উৎপাত ভাবিতাম।

বাহিরে এই ছিল। আর ভিতরে? কত উৎপাত ত করিয়াছি। রঙ্গের জ্বালায় সময়ে সময়ে বিরক্তি আনিতাম।

তুমি শ্রীভগবান্‌কে ডাকিবে আমি ভাবিতাম ও সব ভণ্ডামী। তাই কত কৌশলে তোমায় বাধা দিতাম। শুধু শুধু রাগ করিয়া তোমায় ক্লেশ দিতাম।

আজকাল না বুঝি খণ্ড আমি সেই অখণ্ড নারায়ণে মিশিতে গেলে মন যেমন বাধা দেয় আমি তদপেক্ষা তোমায় অধিক বাধা দিতাম।

আর এখন? আমার ইচ্ছা করে সর্ব্বদা তোমার কার্য্যে সহায়তা করি। সর্ব্বদা দাসী হইয়া তোমার কার্য্যে হাজির থাকি। আমি সব আয়োজন করিয়া দি, আর তুমি তাঁরে ডাক। নারায়ণের প্রীতি জন্য গৃহস্থালীর সকল কাজ পরিপাটি করিয়া করি। যে দিন তুমি আপনি আপনি থাক, সে দিনও তোমার ভাব না বুঝিয়া বলি কৈ ডাকিলে না।

স্বামী—আপনি আপনি থাকার সময় ডাকার কথা মনে করায়া দিতে হয় কিনা—সে এখনও অনেক দূরের কথা। যে দিন ইহা ধারণা করিতে পারিবে, সেই দিন উপাসনাতত্ত্ব বুঝিবে। তা এখন থাক। কি ছিলে তাত চুম্বকে বলিলে, এখন কি হইয়াছ বা হইতেছ বল দেখি?

স্ত্রী—দেখ তুমি যে সমস্ত উপদেশ আমায় দাও তুমি ভাব আমি সমস্তই বুঝিতে পারি। এইটি তোমার আমার সম্বন্ধে অন্ধতা।

হাসিতেছ হাস। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তুমি অন্ধ, ইহাই আমার বিশ্বাস। তুমি যতখানি আমাকে মনে কর তার কিছুই আমি নই। তোমার সকল উপদেশ আমি বুঝিতে পারি না। কতক কতক যাহাও বুঝি, সেই মত আবার কার্য্য করিতেও পারি না। অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া ভাবনা করি তুমি কি করিতে বলিতেছ।

একদিনের কথা বলি শুন।

একদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া যেমন বলিয়াছ সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। তুমি তখন ছিলে না।

ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্র একেবারে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বদ্ধপদ্মাসন করিতে চেষ্টা করিলাম। তুমি বলিয়াছ ইহাতে আলস্য ও অনিচ্ছা দূর হয়। পদ্মাসন যত সহজে পারি, বদ্ধপদ্মাসন তত সহজে হয় না। প্রথমে কতক্ষণ বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া থাকি। পরে তাহা ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া থাকিলাম। ক্রমে বদ্ধপদ্মাসন হইল। দেখিলাম ইহাতে সত্য সত্যই আলস্য দূর হয়। পরে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছ তাহা করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছি না। মন যেন নিতান্ত দুঃখী হইয়া রহিয়াছে

মনকে লইয়া প্রণাম করাইতে চাই, প্রার্থনা করাইতে চাই, লোকের দুঃখ ভাবিয়া কাতর করাইতে চাই, চিতা-চিন্তার বৈরাগ্য আনিতে চাই, মহাপ্রলয়ে জগৎ নাশ হইতেছে, ইহা ভাবনা করাইতে চাই, দেখি কিছুতেই ইহার সাড়াশব্দ পাই না। রসময় শ্রীভগবানকে লইয়া রঙ্গ করাইতে চাই কিছুতেই কিছুই হয় না।

জপ, প্রাণায়াম, ধারণাভ্যাস, বিচার করাইব কাহাকে? তখন তোমার উপদেশ মনে পড়িল। তুমি বলিয়াছিলে বহু চেষ্টাতেও যখন হইবে না তখন চুপ করিয়া বসিয়া দেখিবে মন কি করে। বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম

মনটাকে কে আক্রমণ করে। ঠিক তমোগুণ ইহা নহে। কারণ নিদ্রা বা তন্দ্রার আক্রমণ তখন ছিল না। ছিল একটা প্রবল অনিচ্ছা। নিত্যকর্ম্মে যে উদ্যম পাই তখন তাহা জাগাইতে পারিতেছিলাম না।

তখনও রাত্রি অনেক ছিল। বাহিরে আসিয়া মুখে হাতে জল দিয়া আবার শয্যায় গমন করিলাম। তখন যে যে কার্য্য তুমি শিখাইয়াছ একে একে সকল গুলিই কতক কতক করিতে লাগিলাম। বৈখরীতে কতক্ষণ জপ করিলাম, ক্রিয়ার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিছু কিছু করিলাম, মুদ্রা করিলাম। পরে নাভী করিলাম। ক্ষণকালের জন্য একটু উদ্যম জাগিল।

আবার এ দিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিতে লাগিল কোকিল বধুর সঙ্গে কোকিল শব্দ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক আলোকিত হইল। তখন শীতকাল। চারিদিকে কুয়াসা। তাহার উপরে আলোকরেখা পড়িতেছে। ক্রমে কাক সালিক ইত্যাদি ডাকিয়া উঠিল। তখনও অরুণোদয় হইতে বিলম্ব ছিল। ঐ সময়ে আমি তোমার উপদেশমত শয্যাকৃত্য করিবার জন্য মন্ত্রগুলি পাঠ করিলাম। করিয়া সূর্য্য চন্দ্র নাড়ী দেখিয়া, একের গতি অনুসারে সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া, ঐ দিকের হস্তে ঐ দিকের মুখের অংশ স্পর্শ করিয়া, পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, শয্যা ত্যাগ করিলাম। বড় শীত করিতে লাগিল। মনে করিলাম যেরূপ উদ্যম দেখিতেছি তাহাতে আজ ঠিক ঠিক সকল কার্য্য যে হইবে তাহাত বোধ হয় না। শয্যাকৃত্য ত ঠিক মত করিয়া করিতে পারিলাম না, তবে কষ্ট কেন? অমনি তোমার উপদেশ মনে পড়িল।

রাজ রাজ্যেশ্বর হইয়া, সুকুমারী রাজরাণী হইয়াও তাঁহারা এই দারুণ শীতে দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীতে স্নানে যাইতেন। আমি? হা ধিক্! আমাকে। আরও মনে হইল যেমন যৌবনকালের কার্য্য বৃদ্ধবয়সে হয় না, যেমন বাল্য কালের কার্য্য যুবা বয়সে করিলে কিছুই হয় না, সেইরূপ প্রাতঃসন্ধ্যার করনীয় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় অথবা দুই সন্ধ্যা একবারে করিলেও হয় না। এই মনে হইবা মাত্র শয্যাকৃত্য সারিয়া গাত্রমার্জ্জন স্নান করিলাম। তুমি বলিয়াছ স্নান ত্রিবিধ। (১) নিমজ্জন স্নান। (২) মন্ত্র স্নান। (৩) গাত্র মার্জ্জন স্নান। আমি গাত্র মার্জ্জন স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিবার জন্য আলনার নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখি কি আনলা ছিঁড়িয়া কাপড় চোপড়গুলি ধূলায় লুটাইতেছে। এদিকে বেলা হইয়া যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিলাম আর তোমার গায়ের কাপড়খানি গুছাইতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল মানুষও

থাকে না তবে কাপড় গুছাইয়া সময় নষ্ট করি কেন? থাক্ এসব করিব না। কিন্তু পারিলাম না। মনে হইল এ যে তোমার গায়ের কাপড়। এই মুহূর্ত্তে আমার একটা পরিবর্ত্তন আসিল। এতক্ষণ কিছুতেই আনন্দ পাইতেছিলাম না। হঠাৎ তোমার কাপড় মনে হইয়া আনন্দ জাগিল। এ যে তার কাপড়। বড় যত্ন করিয়া কাপড় গুছাইলাম। সে যে পূজা করিবে তার পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়া আনন্দ পাইলাম। সে যে পূজা করিবে এই ভাবিয়া আমার উদ্যম আসিল।

কিন্তু কোথায় বা তুমি—আর আমিই বা কোথায় কাপড় গুছাই? কোথায় বা পূজার জায়গা করি? কিন্তু অতি আশ্চর্য্য হইল। কি দেখিলাম জান?

স্বামী—জানি। তা আর বলিয়া কাজ নাই।

স্ত্রী—না! কিন্তু কি সুন্দর! দেখিলাম—

স্বামী—আবার? কুন্তীর উপর অভিসম্পাত জান ত?

স্ত্রী—স্ত্রীজাতির পেটে কথা থাকিবে না এই ত। আমি ত আর বলি নি।

স্বামী—এই ত বলিয়া ফেলিতেছিলে। শোন। মনটা স্ত্রীর মতন। এইটাই জীব চৈতন্যকে ঈশ্বর চৈতন্যে মিশিতে দেয় না। রাম রাম করিতে না করিতে নানা কথা তোলে—বহু অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে—খালি প্রবৃত্তিমার্গে ডুবাইয়া রাখিতে চায়। নিবৃত্তিমার্গ ধরিলেই জীব কিন্তু সরাসর তাঁর কাছে যাইতে পারে। মন শান্ত হইলেই আর বাধা দিবার কেহ নাই। এ তখন পূজার জায়গা করিয়া দেয়, কাপড় গোছাইয়া দেয়। এ তখন বসিতে বাধা দেয় না। এ তখন তোমার মত সহধর্ম্মিণী হয়, হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে সহায়তা করে।

আগে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে বাধা দিত এখন সহায়তা করে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিতে বলে। আবার আপনি আপনি থাকিতে গেলেও বলে ডাকিলে না?

স্ত্রী—এ একটা তুমি কি ঠাট্টা করিতেছ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামী—কি বল দেখি?

স্ত্রী—আহা! যেন কিছুই জানেন না। ঠাট্টা টুকুও করা আছে আবার ন্যাকা সাজাও আছে।

স্বামী—এইত আবার প্রলয়ঙ্করী ভাব তুলিতেছ।

স্ত্রী—আহা গো! কত কি মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বলিবেন। আর আমি নির্ব্বোধ কি না? আমি কিছু বলিলেই বলিবেন স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

স্বামী—এইত প্রলয় উঠিল।

তাইত! কেহ কোথাও নাই। একলা ঘরে একলা আমি এ কি করিতেছি? এত বেশ। সে ত নাই। না না তাত নয়। এই যে তুমি। তুমিত আছই। আমার মধ্যে তুমিও আছ আমিও আছি। আচ্ছা এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবার বলিব?

স্বামী—এখনই।

স্ত্রী—কত কথাইত জিজ্ঞাসা করি। বল কৈ?

স্বামী—কেন সবইত বলি।

স্ত্রী—কৈ উপাসনা তত্ব বলিবে কবে?

স্বামী—বলিতে ভয় পাই।

স্ত্রী—কেন? আমি কি শুনিবার অধিকারিণী নই?

স্বামী—রাগ ত আমার উপর করিতেই পার না—সেই জন্য বলি এখনও তোমার অধিকার হয় নাই। কারণ সতী নও।

স্ত্রী—বড় দুঃখ হয় আমি শত চেষ্টা করিয়াও ভাল হইতে পারি না। তোমার কথায় অবিশ্বাস করি না। লোকে যা করে শুনি, আমি তাহা ত করি না। কিন্তু তবু তুমি—

স্বামী—বল সতী নও কেমন? লোকে কি করে?

স্ত্রী—বহু স্ত্রীলোক ত আমার কাছে আসে। ব্যবহার শুনিয়া অবাক হইয়া হইয়া যাই।

স্বামী—কি বলত।

স্ত্রী—দেখ যদি কাহারও পিতা তাহার স্বামীর লেখা পড়া শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করেন, সে মেয়ে রাগে পাইলে স্বামীকে বলিতে ছাড়ে না—আমার বাপের পয়সায় তুমি মানুষ। যদি কাহারও পিতা মেয়েকে দুই চারি খানা বাড়ী দিয়া যান আর স্ত্রীর সেই বাড়ীতে স্বামী বাস করে তবে স্ত্রী কখন কখন ক্রোধোন্মত্তা হইয়া স্বামীকে বলে—এত আমার বাপের বাড়ী। তুমি আমার বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাও। আবার কেহ কেহ আছেন যিনি স্বামী ঘরে আসিলে গোময় দিয়া স্বামী যে স্থানে পা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা এক পক্ষ দুই পক্ষ তিন পক্ষ করিয়া শোধন করেন। স্বামী যদি জলের কল স্পর্শ করেন তবে কলকে জল দিয়া একবার ধূইয়া এক পক্ষ, পরে আগুন দিয়া সংশোধন করিয়া দুই পক্ষ করেন এইরূপ কত পক্ষই হয়। স্বামী ঘরে ঢুকিলে ইঁহাদের গৃহ কলঙ্কিত হইয়া যায়।

জীবের দুঃখ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কাল শিক্ষিত যুবকগণ স্বামী বিবেকানন্দের বড় আদর করেন। করাই উচিত। যুবক যুবতীগণ তাঁহার কথা শুনেন বলিয়া তাঁহার মতটি যে ভাবে তাঁহার পুস্তকে প্রচারিত হইতেছে, তাহা বলা আমরা আবশ্যক মনে করি।

আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ যে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ, একথা আজকাল শিক্ষিত সমাজ শুনিতে চান না। অথচ তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'রাজযোগ', 'রিলিজান অব লভ' ইত্যাদি গ্রন্থে আহারের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহুভাবে দেশে বিদেশে প্রচার করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রের শিক্ষাগুলি বেশ জোরের সহিত বলিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কথা ভাল লাগে।

আহার শুদ্ধি না হইলে যে শ্রীভগবানকে স্মরণে রাখা যায় না—কাজেই অহং অভিমানে কর্ম্ম হইয়া যায় এবং তাহাই বহু দুঃখে বা বহু জন্মের কারণ হয়, ইহা বেদের উপদেশ। সর্ব্ব শাস্ত্রে আহারের উপরেই যে চিত্তশুদ্ধি প্রধান ভাবে নির্ভর করিতেছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পরে শাস্ত্রের মতটি উদ্ধার করিব, কিন্তু আজ কালকার বিস্তর লোকে শাস্ত্র শ্রদ্ধা করিতে পারেন না বলিয়া প্রথমেই যে স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, তাহার কথাই বলিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামানুজের মতটি ব্যাখ্যা করিয়া আর একজন ভাষ্যকারের মত বলিতেছেন,—

"He says when food is pure the mind becomes pure, when mind is pure the memory of God becomes constant."
Religion of Love, pp 5&6.

এই কথাই শাস্ত্র বলেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আহার পবিত্র না হইলে মন পবিত্র হইবে না কেন, আর কেনই বা ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখা যাইবে না, বিবেকানন্দ শ্রীরামনুজের মতটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন,—

"All exciting food should be avoided, as meat for instance. This should be avoided because it is by its very nature impure.—যে সমস্ত খাদ্যে মনটা রিপুর দিকে উত্তেজিত হয়, তাহা ত্যাগ করা উচিত। যেমন মাংস। মাংস বস্তুটির স্বভাবই এই, ইহা অপবিত্র।"

আহার শুদ্ধি না হইলে যেমন পবিত্র থাকে না, এবং মন পবিত্র না হইলে যে ঈশ্বরকে ধ্যান করা যায় না এবং সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কার্য্য করা হয় না, স্বামী বিবেকানন্দ ঐ গ্রন্থে ইহা বুঝাইয়াছেন।

"Food contains all the energies that go to make up the forces of our body and mind; all that I am now was in the bit of food I ate; and my body and mind have nothing essentially different from the food that I ate. A good deal of the misery we are suffering is simply occasioned by the food we take. You find that after a heavy and indigestible meal it is hard to control the mind; it is running, running all the time. Then there are certain foods which are exciting; if you eat such food, you find that you cannot control the mind."

সাত্ত্বিক আহার কর, সত্ত্বগুণ বাড়িবে। এতদ্ভিন্ন মাংস ডিম্বাদি বা পলাণ্ডাদি ভক্ষণে মন কখনই পবিত্র থাকিবে না—কাজেই সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইতেই পারিবে না, ইহাই স্বামীজীরও মত।

তার পরে বাবুরচি পক্ক খাদ্য বা হোটেলাগত মুরগী, মাংসাদি, অণ্ড বা অন্যান্য খাদ্য খাইয়া যে ভগবান্‌কে স্মরণ করা যায় না তৎসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—

"The idea is that each man has a certain area round him and whatever he touches a part of his character, as it were his influcence is left on that thing. Just as effluvia is coming out of each man's body, so character is coming out of him, and whatever he tuches takes it. So we must take care who touches our food when it is cooked any wicked or immoral person must not touch it."

স্বামীজী এখানে বলিতেছেন, দুষ্টলোকের স্পর্শে আহার্য্য দ্রব্য অপবিত্র হয়। অপবিত্র আহার দ্বারা মনও অপবিত্র হয়। মন অপবিত্র হইলে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখা যায় না। আহারের দোষে যখন মানুষ ঈশ্বরকে হারায়, তখন আহার সম্বন্ধে সংযত হওয়া কি নবীন ভারতের কর্ত্তব্য নহে? এই যে সহরে সহরে, গলিতে গলিতে, গরম গরম চায়ের দোকান, আর যেখানে সেখানে খানার দোকান, হোটেল—এই সব ছেলেপুলেরা খাবে আর চক্ষু বুজিয়া ধ্যানও করিবে—এ ধ্যান কি হয়? যেমন একজন গুরু, শিষ্যকে বলিলেন ওহে বাপু! শালগ্রামে কৃষ্ণ চিন্তা করিতে হইবে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে? গুরু তখন শিষ্যকে বুঝাইতে লাগিলেন, বলিলেন,—শালগ্রামের নীচে দুইটি পা খুজিয়া দাও

শিষ্য—দিলাম।

গুরু—তার পরে একটি ছোট মাথা উপরে খুজিয়া দাও।

শিষ্য—দিলাম।

গুরু—এখন কি দেখিতেছ বল দেখি।

শিষ্য—আজ্ঞা—কাঁকড়া দেখিতেছি।

কৃষ্ণ চিন্তা করিতে গিয়া যদি কাঁকড়া চিন্তা হইয়া যায়, তবে কি হইল? যা তা খাও আর কাঁকড়া চিন্তা কর—এইটাই ধ্যান?

কুতর্ক ছাড়িয়া দিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, আহার শুদ্ধি না করিলে কিছুতেই ভগবৎ চিন্তা হইতে পারে না। ছান্দোগ্য শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতি।" গীতাতেও বলা হইয়াছে সাত্ত্বিক আহার ভিন্ন কোন মানুষ প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্রের এই মত।

শুধু আহারের পবিত্রতা নহে, আচার ব্যবহারেও পবিত্র হইতে হইবে। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এখন নবীন ভারত কি এইগুলি স্বীকার করিবেন? আর আহারশুদ্ধি এবং আচারশুদ্ধি করিলেই কি গোঁড়ামী হইয়া যাইবে।

আমরা স্বীকার করি, আহার শুদ্ধি সম্বন্ধেও আধুনিক হিন্দু সমাজ ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার লইয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। নবীন জগতের যা তা

খাও—আর সকলের সঙ্গে খাও দাও, ইহাও যেমন অশ্রদ্ধার কথা, সেইরূপ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না লইয়া শুধু বিকার লইয়া থাকাও অন্যায় কথা।

জীব ও ব্রহ্ম এক, এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পাওয়া হইল না, অথচ বলা হইল এটা বিকৃত অদ্বৈতবাদ। জগত্‌টা ঈশ্বরের বিবর্ত্ত, ইহা ধারণা করার চেষ্টাও হইল না অথচ বলা হইল জগৎ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা—প্রাচীন ভারত এই শিক্ষা দিয়া এই জাতিকে হীন ও দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছেন, এটা কোন্ যুক্তিতে বলা হয়? কপট বেদান্তবাদী যদি বলেন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে, ইহাতে আবার পাপ হইবে কেন—এ কথায় কি বলিতে হইবে অদ্বৈতবাদ সমাজকে পাপে ও নৈতিক অবনতিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, এটা কি সত্যের অবমাননা নহে? আমরা বলি, এই কথা কাটাকাটি ছাড়িয়া সমাজ, কি সত্য জিনিস বুঝিতে চেষ্টা করিবে না—নবীন সমাজ কি শাস্ত্র নিশ্চয় মানিয়া চলিবে না? শুধু অদ্বৈতবাদকে বিকৃত অদ্বৈতবাদ বলা এবং অদ্বৈতবাদীকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা কোন্ বুদ্ধির পরিচায়ক?

যাঁহারা প্রাচীন ভারতের সমাজবিমুখতা দেখিয়া ব্যথিত, তাঁহারা কি আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধকে সমাজহিতকর কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

ঈশ্বরবিশ্বাস, আহারশুদ্ধি, আচারশুদ্ধি মানিয়া কি সমাজের সকল লোককে এক মত করা যায় না? এমন দেখা গিয়াছে, এক গুরুর শিষ্য হইলেই সবাই মিলিয়া এক পাতে আহার করা হইতেছে—আমরা বলি, ইহা ব্যভিচার। এক গুরুর শিষ্য হইবামাত্রই কি সবাই এক চরিত্রের লোক হইয়া গেল? আর আহারের বিচারটা বাদ দিলেই একবারে জাতীয়তা জাগিয়া উঠিল, এই কি প্রকৃত শিক্ষা?

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ব্যভিচার আধুনিক লোকে করিতে পারে তা বলিয়াই কি ঈশ্বর-বিশ্বাস, পবিত্রতা, সতীত্ব, একাগ্র ও নিরোধভাব কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিয়া নূতন ঢঙ্গে সমাজ গড়িতে হইবে? তাও ত গড়া হইতেছে। তবে নূতন সমাজে এত ব্যভিচার ঢুকিল কি রূপে? মুখে এক থাকিলেও ভিতরে এত অমিল হইল কিরূপে?

যাঁহারা সমাজ সংস্কার করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা সানুনয়ে নিবেদন করি, যেন তাঁহারা আহারশুদ্ধি দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি হয়, এ কথাটা ভাল করিয়া নিজে বুঝিয়া সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করেন।

আমরা সমাজবিমুখতাকেও নিন্দা করি। প্রাচীন ভারত কোথাও এ শিক্ষা দেন নাই। যদি দিতেন, তবে গীতা নিষ্কাম ধর্ম্ম কথন প্রচার করিতেন না। শাস্ত্র প্রথম অধিকারীকে জগৎ চক্র সঞ্চালন জন্য কর্ম্মকে নিষ্কামভাবে করিতে উপদেশ দেন। সমকালে নিত্যকর্ম্ম ও লোক হিতকর কর্ম্ম করার বিধিই শাস্ত্র দিতেছেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম বাদ দিয়া লোকহিতকর কর্ম্ম করা একটু পুণ্য উৎপাদন ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন করিতে পারে না, ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

পবিত্রতা রক্ষা জন্য আহারশুদ্ধি আবশ্যক—ইহাও সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণে রাখিবার জন্য। আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত পবিত্র হইয়া প্রাণায়াম, জপ, ধ্যান ইত্যাদি কার্য্য শাস্ত্রমত করিতে পারিবে এবং লোকহিতকর কার্য্যও নিষ্কামভাবে করিতে পারিবে, এই প্রবন্ধে ইহাই দেখান হইল। নবীন জগৎ যদি প্রাচীন ভারতের আহারশুদ্ধির আবশ্যকতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি বুঝিয়া দেখেন, তবে জগতের বহু ব্যভিচার যে দূর হয়, মানুষের খাওয়াখায়ি যে অনেকটা নিবারণ হয়, লোকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বহু পরিমাণে জাগরিত হইয়া মানুষকে দেবতা করিতে পারে, ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। ধর্ম্মের জন্যই আহারশুদ্ধি আবশ্যক। আহারশুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যে বিদ্যা উপার্জ্জন করা হয়, তাহাতে জগতে পাপের স্রোত বৃদ্ধি করে বলিয়া এইরূপ বিদ্যাকে শাস্ত্র অবিদ্যা বলেন। অবিদ্যালাভে জগতে কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ধর্ম্মলাভ জন্য আহারশুদ্ধি রক্ষা করিতে গিয়া যদি অর্থ উপার্জ্জন কমও হয়, প্রাচীন ভারত তথাপি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া লোককে ধার্ম্মিক হইতেই উপদেশ করেন। কারণ ধার্ম্মিক অথচ নির্ধন লোকও যথার্থভাবে জীবনের গন্তব্যপথে চলিতে পারে, কিন্তু আহারশুদ্ধি নাই, আচারশুদ্ধি নাই, অথচ ধনাগম বেশ হইতেছে—এরূপ লোকের কোন কর্ম্মকে প্রাচীন ভারত যথার্থ লোক হিতকর কর্ম্ম বলেন না। প্রাচীন ভারতের মতে সর্ব্বাপেক্ষা লোকহিতকর কর্ম্ম শ্রীভগবানকে জানা এবং জানিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তে দয়া, ক্ষমা, পবিত্রতা, ইত্যাদি গুণগুলি উপার্জ্জন করা। আমরা ইহার পরে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা বুঝিতে চেষ্টা করিব!

সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জ্যেষ্ঠ। যখন পুরুষ শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়াযোগে দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু অতএব গতব্যথ, উদাসীন ও সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী হয়েন তখন তিনি সমত্ব লাভ করিয়াছেন বলা হয়। এই সমত্ব লাভই তপঃসিদ্ধি আর এই তপঃসিদ্ধি লাভ হইলেই আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। তখন কর্ম্ম থাকিলেও কর্ম্ম বন্ধন থাকে না, কর্ম্ম করা হয় শুধু আনন্দ স্বরূপের প্রীতির জন্য—নিজের জন্য নহে। তখন সর্ব্বদাই চিত্তপটে লাগিয়া থাকে "যৎ করোমি জগন্নাথ ! তদস্তু তব পূজনাং"। এইরূপে শ্রীভগবানে যিনি সর্ব্ব কর্ম্মের অর্পণ করিতে পারেন তিনিই ঈশ্বর প্রণিধানে সমর্থ। ঈশ্বর প্রণিধানের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া বিশাল বুদ্ধি ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন "তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণং"। আমাদের সে ক্ষমতা নাই। তথাপি এস আমরা কাতর প্রাণে নত মস্তকে শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ চরনারবিন্দে প্রার্থনা করি—"হেজগন্নাথ ! হে অগতির গতি চিত্তক্ষোভের হেতুভূত আমাদের সকল কর্ম্মই তুমি গ্রহণ কর। আমাদের সর্ব্বকর্ম্মার্পণ সিদ্ধ হউক ; আমরা সকল মমত্ব পরিত্যাগ করিয়া তোমার সর্ব্ব শরণ অভয় চরণের প্রণিধান করি ; তোমার "মামেকং শরণং ব্রজ" মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া, তোমার বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা চিরশান্ত হই। ওঁ হরিঃ ওঁ ॥"

আসন।

ওঁ আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥

কনিষ্ঠ। যম ও নিয়ম সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ যাহা বলিয়াছ তাহাতে আমি ঐ ঐ বিষয়ের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়াছি। আসন সম্বন্ধে কিছু বলিবে কি ?

জ্যেষ্ঠ। সৎবিষয়ের আলোচনা করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে তোমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নে যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব বৈ কি। অস্ ধাতু হইতে আসন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আসন বলিতে বুঝায় যাকে আশ্রয় করিয়া উপাসনার জন্য বসিতে হয়। এই আসন স্থির ও সুখ জনক হওয়া উচিত—নতুবা দীর্ঘসময় তাহার উপর বসিয়া থাকা যাইবে কিরূপে? আবার অস্ ধাতুর ভাবার্থে অনট্ প্রত্যয় করিয়া আসন শব্দ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া উপাসনার জন্য বসিবার ভাবটিকেও আসন বলা হয়।

ক। তবে আসন বলিতে বুঝায়, বসিবার আশ্রয় ও বসিবার ভাব?

জ্যে। হাঁ। এখন এই বসিবার আশ্রয়টাকে বাহ্যিক আসন ও বসিবার ভাবটিকে শরীর আসন বলিতে পার।

ক। এই বাহ্যিক আসন কি দিয়া রচনা করিতে হইবে, সে বিষয়ে কোন ও উপদেশ আছে কি?

জ্যে। আছে বৈ কি। শ্রীগীতা বলেন—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

অর্থাৎ কুশের উপর মৃগচর্ম্ম বা ব্যঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর ভাঁজ করা চেলির কাপড় বিছাইলে যে আসন প্রস্তুত হয় তাহা পবিত্র স্থানে পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রোধ করতঃ মন একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগভ্যাস করিবে।

ক। আচ্ছা দাদা, এত জিনিষ থাকিতে শ্রীগীতা কুশাসন, অজিনাসন ও চৈলাসনের উপর এতটা ঝোঁক দিলেন কেন?

জ্যে। নির্ম্মলতা লাভ দ্বারা নির্ম্মলতমের নিকট পৌছানর জন্যই উপাসনায় বসা হয়। যদি বল, কেমন করিয়া মলিনতা নষ্ট হয় ও নির্ম্মলতা লাভ হয়। তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে, শাস্ত্রে বহুস্থানে বহুরূপে তাহা বলিয়া দিয়াছেন এবং তাহার সারাংশ হইতেছে "আপনার শুভ তৈজস শক্তির বিকাশে"। সাত্ত্বিক আহার শুভ সংকল্প, গভীর আত্ম চিন্তা, দীর্ঘ জপ ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা এই তেজ

বিকশিত ও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তেজকে শুধু বিকশিত বা বর্দ্ধিত করিলেই কাজ মিটে না—আত্মকল্যাণের নিমিত্ত তাহাকে ধরিয়া রাখা চাই। তাই সহজ প্রাপ্য ও পবিত্র Non Conducting (তাপ ও তেজ পরিচালনের অনুপযুক্ত) বস্তু দিয়া আসন রচনার বিধি। আর এই জন্য ব্রাহ্মণের খড়ম পায়ে দেওয়ার এত হুড়াহুড়ি।

ক। আমার এ প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। এবার পবিত্রস্থানের বিষয় কিছু বল।

জ্যে। রঙ্গালয় সুন্দররূপে সজ্জিত হইলে যেমন অভিনেতা পূর্ণ উৎসাহে আপন ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য অগ্রসর হয় তেমনি উপাসনা বা পূজার স্থানটি মার্জ্জিত ধূপপুষ্পগন্ধামোদিত ও ভক্তিরসাত্মক চিত্রাদি শোভিত হইলে মনে স্বভাবতঃই আপন অভীষ্ট পূজার আগ্রহ একটু বাড়ে। ইহার নাম স্থানশুদ্ধি। শাস্ত্রে পূজার জন্য যে পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে তাহাও এই "শুচৌদেশে" বাক্যের সমর্থক। শুদ্ধি নির্দ্দেশক সে বাক্যটি এইঃ----

"আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেহশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি, তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ॥"

উৎসব সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীগীতার ভক্তিযোগে লিখিয়াছেন— "পূজার উদ্দেশে একটী স্বতন্ত্র গৃহ রাখিয়া দিবে। সেই গৃহে ভগবৎ কর্ম্ম (পূজা, জপ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন) ভিন্ন অন্য কোনও কর্ম্ম বা চিন্তা করিবে না। কিছু দিন ঐ গৃহে ভগবৎ কর্ম্ম করিতে করিতে উহা এরূপ হইবে যে, ঐ গৃহে প্রবেশ করিলে বোধ হইবে যেন ভগবৎ সঙ্গ হইতেছে, ভগবৎ স্পর্শ হইতেছে। সে গৃহে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না।

ঐ গৃহে প্রত্যহ তাঁহার (শ্রীভগবানের) নাম শ্রবণ, নাম কীর্ত্তণ, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবা, গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ নৈবেদ্য, ইত্যাদি দ্বারা অথবা মানসে তাঁহার অর্চ্চনা, কায়-মন-বাক্য দ্বারা তাঁহার নমস্কার বন্দনা এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রতিদিন তাঁহাতে আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তি উৎপাদক কর্ম্ম প্রত্যহ অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ কার্য্য করিলে শুভ হইবেই।

কেমন করিয়া-? সর্ব্বদা মনে "তিনি আসিবেন" এই ভাব প্রবল থাকিবে বলিয়া। তিনি আসিবেন বলিয়াই আমি মার্জ্জনাদি দ্বারা গৃহ পবিত্র করিয়া

লীলা—চক্ষের উপরে দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি ইহা যে মিথ্যা কোন্ প্রমাণে তাহা জানিব?

সরস্বতী—স্বপ্নে যাহা অনুভব কর, ভ্রমে যাহা অনুভব কর, মনোময় সঙ্কল্প রাজ্যে যাহা অনুভব কর তাহাত মিথ্যাই। এই গুলিই, জগৎ যে মিথ্যা তাহার মুখ্য প্রমাণ। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকার মিথ্যা হইয়া যায় সেইরূপ ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ মিথ্যা বোধ হয়।

ব্রাহ্মণের জীব তাহার গৃহাকাশের কোন একদেশে অবস্থান করিতেছে, আবার সেই ভাবনাময় চিত্তৈকদেশে সমুদ্র বন পৃথ্বীও অবস্থান করিতেছে পদ্মের মধ্যে ভ্রমর যেরূপ থাকে সেইরূপ।

নির্ম্মল আকাশে কখন কখন কুণ্ডলিত কেশের আকার কোন কিছু ভ্রমে দেখা যায়। চিদাকাশের এক কোণে চিত্তাকাশ তাহার এক দেশে আবার এই গৃহ এই দেহাদি এই সমস্ত, অম্বর তলে ভ্রমে নীল-কুঞ্চিত কেশদাম দর্শনের ন্যায়। হে তন্বি! ব্রাহ্মণের গৃহাকাশে নগর উপবন না থাকিবে কেন? ত্রসরেণুর ভিতরে যখন জগৎ থাকে চিন্ময় পরমাণুর মধ্যে যখন জগৎ থাকে তখন চিদাকাশের মধ্যে যে চিত্তাকাশ তাহার এক দেশে নগর বন ইত্যাদি থাকা অসম্ভব কেন হইবে? ইহাতে তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

লীলা—হয় বটে। মনের মধ্যে যখন কতদূর দূরান্তর আটে তখন কোটি কোটী জগৎও আটান যায়। আচ্ছা মা আর এক কথা—

অষ্টমে দিবসে বিপ্রঃ স মৃতঃ পরমেশ্বরি।
গতোবর্ষগণোঽস্মাকং মাতঃ কথমিদং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

পরমেশ্বরি! আজ আট দিন হইল সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অনেক বৎসর গত হইয়াছে! মা! ইহা কিরূপে হয়?

সরস্বতী—দেশের দীর্ঘত্ব যেমন নাই কালের দীর্ঘত্বও সেইরূপ নাই। যে যুক্তিতে দেশ ও কালের দীর্ঘত্ব নাই বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর।

লীলা—দেশের দীর্ঘত্বও চক্ষে দেখা যায় ইহাও নাই?

সরস্বতী—কেন নাই তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যে সম্মুখে নারিকেল বৃক্ষটি দেখিতেছ ইহা কত বড়?

লীলা—বিশ হাত হইতে পারে।

সরস্বতী—এই দর্পণে ইহা দেখ। কিরূপ দেখিতেছ ?

লীলা—বৃক্ষটাই যেন দেখিতেছি।

সরস্বতী—দর্পণটি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত। ইহার মধ্যে বিশ হস্ত বৃক্ষ কিরূপে থাকিবে ?

লীলা—দর্পণের মধ্যে বৃহৎটা ক্ষুদ্রমত দেখা যায়। দীর্ঘও ক্ষুদ্র মত বোধ হইতেছে।

সরস্বতী—আরও সূক্ষ্মে চল। স্বপ্নে যে বাগান দেখ তাহা কত দীর্ঘ দেখায় ? কিন্তু ইহা, মনের মধ্যেই দেখ। ইহার দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব কি বাস্তবিক আছে ?

লীলা—তা নাই বটে। কিন্তু কি ভ্রম ?

সরস্বতী—ভ্রমজ্ঞানে দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব, দীর্ঘকাল, ক্ষণকাল, এইরূপ বোধ হয়। "ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বু সন্নিভম্। ইদং জগৎ অস্মাৎ মনসঃ"—এই জগৎ এই মন হইতে সমুৎপন্ন। মরুমরীচিকাতে যেমন জল দেখা যায় সেইরূপ মন হইতে এই জগৎ। মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে। মনের কোন প্রকার রূপ দেখা যায় না। নাম মাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্য জড়াকৃতেঃ। মনটা আকাশের মত। ইহার রূপও নাই আকারও নাই। ইহার রূপ ও আকার উভয়ই শূন্যাকার ও জড়। মনটা কি বাহিরে কি ভিতরে কোথাও বস্তুরূপে বিদ্যমান নহে। ন বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপং বিদ্যতে মনঃ। কোথাও নাই অথচ আকাশের নীলিমার মত ইহা যেন সর্ব্বত্র অবস্থিত।

লীলা—মনই যখন এইরূপ তখন মন হইতে জাত এই বিশ্ব ইহার আবার হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব কিরূপ, দীর্ঘকাল স্থায়ী অল্পকাল স্থায়ী ইহা কিরূপে হইবে ? এই বলিতেছেন ?

সরস্বতী—হাঁ। ভ্রম জ্ঞানই মনের আকার। যদ্যপি মনোনাম্না পরমার্থতে নাস্ত্যেব তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারোপযুক্তং তৎস্বরূপম্। পরমার্থতঃ কোন রূপ নাই কিন্তু ব্যবহারের উপযুক্ত একটা কল্পিত রূপ আছে। মন এবং মায়া, একই তবে ব্যষ্টি সমষ্টির জন্য একটা শক্তি পার্থক্য আছে। মায়াকে যেমন আছেও

বলা যায় না নাইও বলা যায় না অথচ একটা কল্পিত রূপ আছে বলা যায় মন সম্বন্ধেও তাই। মনের আকারটা বুঝিলে তবে জগতের স্থূলত্ব দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব কি বুঝিবে তাই ইহা বলিতেছি।

লীলা—বলুন। আমি যেন কিছু কিছু বুঝিতেছি। জগৎ মিথ্যা। ভ্রমজ্ঞানে সত্য মত বোধ হয়।

সরস্বতী—পূর্ব্বেও মনের আকার নাই পরেও নাই কিন্তু মধ্যে যে বস্তু বিষয়ক বা অবস্তু বিষয়ক জ্ঞান তাহাই মনের আকার। অন্তরে বাহিরে বস্তুর আকারে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই মন।

"রূপস্তু ক্ষণসঙ্কল্পাৎ" ক্ষণ সঙ্কল্প হইতেই একটা রূপ ভ্রমে দেখা যায়। সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধিসঙ্কল্পাৎতন্ন ভিদ্যতে। স্পন্দনাত্মিকাসঙ্কল্প শক্তিই মন।

লীলা—মন হইতে এই জগৎ। মনটা সঙ্কল্প মাত্র। জগতও তাই। সঙ্কল্পটা হ্রস্বও নহে দীর্ঘও নহে এজন্য জগতের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব এটা মাত্র ভ্রমজ্ঞানে দেখা যায়। কিন্তু মা! জিজ্ঞাসা করি ভ্রমজ্ঞান হইলেও কিরূপে শূন্যাকার সঙ্কল্প গুলিই স্থূল সূক্ষ্ম কঠিন তরল হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বহু আকার বিশিষ্ট হইয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতেছে ?

সরস্বতী—আত্মা ভাবনা তুলিয়া আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহ ধারণ করিলে যাহা হয় তাহাই সমষ্টি মন বা ব্রহ্মা। সমষ্টি মনোদেহ ধারী আত্মাকে ব্রহ্মা বলা হইতেছে স্মরণ রাখ। ইনিই আদি জীব। ইনি কিন্তু সত্য সঙ্কল্প পুরুষ। ইনি যাহা সঙ্কল্প করেন তাহাই কালে স্থূল দেহ ধারণ করে।

সঙ্কল্প প্রথমে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপে ভাসে। সূক্ষ্মভূত সকল দীর্ঘকাল এক সঙ্গে থাকার পর পঞ্চীকৃত হয়। তাহাই স্থূল আকার। সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মক মনই স্থূল প্রপঞ্চের স্থষ্টিকর্ত্তা। আবার পুরুষ স্থূল দেহের উপর অভিমান করিলে স্থূল প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়।

যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে উৎপত্তি প্রকরণে ৪র্থ সর্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই এখানে বলা হইল। অল্প কথায় সেখানে বলা হইয়াছে :—

মন আপন ইচ্ছায় আপনার দেহ আগে কল্পনা করে। ইহার ভিতরেই সব আছে। আকাশ যেমন একটি নাম মাত্র, মনটাও তাই। মনটা মিথ্যা, আর মিথ্যা মনের চেষ্টাও মিথ্যা। মিথ্যা মন বিজৃম্ভিত এই বিশ্ব ওমিথ্যা।

লীলা—মা! কবে আমি এই ভ্রমকে পরিত্যাগ করিতে পারিব? কবে আমি এই ভ্রম কল্পিত মনের মূলবস্তুতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিব?

সরস্বতী—শীঘ্রই পারিবে। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া সত্যের অনুসন্ধান কর। সত্য পাইলেই ভ্রম দূর হইবে। দেখ লীলা! এই বিশ্বটা দর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্য। ইহা আত্মাদর্পণের ভিতরেই। কিন্তু ভিতরে স্বপ্ন দেখিলেও যেন মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি সেইরূপ বিশ্বটা আত্মার ভিতরে হইলেও আত্মমায়া দ্বারা বাহিরে যেন দেখা যায়। বুঝাইবার জন্য ইহা বলা হয় কিন্তু তত্ত্ব কথা আরও সূক্ষ্ম। বিশ্বটা সত্যসত্যই নাই। আত্মাই বিশ্বের আকারে বিবর্ত্তিত। এই ভাবে বিবর্ত্তিত কায়াটা আত্মমায়া দ্বারাই হয়। রজ্জু সর্ব্বদাই রজ্জু। কেবল ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুই সর্পরূপে বিবর্ত্তিত হয়। সর্প কোথাও নাই। ঐ যে আত্মার ভিতর বাহির বলিতেছিলাম ঐ ভিতর বাহিরই বা কি? যখন আত্মা আপনি আপনি থাকেন তখন তিনি অব্যক্ত সবই ভিতর। আর মায়া অবলম্বনে যখন প্রকাশ হন তখন ঐ ব্যক্ত অবস্থাকে বাহির বলিতে পার।

লীলা—নিত্য আলোচনার কথাই আপনি বলিতেছেন প্রকৃত সৎসঙ্গই ইহা। মা তোমার কৃপা অনুভব করিয়া আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি। তুমি এই তত্ত্ব আবার বল।

সরস্বতী—তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্রদম্পতী ৮ দিন মরিয়াছে আর তোমরা বহুবর্ষ রাজা রাণী হইয়া আছ ইহার উত্তরে আমি বলিতেছিলাম :—

দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথাঙ্গনে।
নাস্ত্যেবেতি যথা ন্যায়ং কথ্যমানং ময়া শৃণু॥ ২৮॥

এই বহু দেশ বিস্তৃত সৃষ্টি ইহা যেমন মায়া কল্পনা সেইরূপ ক্ষণ কল্প ইত্যাদিও মনের কল্পনা মাত্র।

দীর্ঘকাল, অল্পকাল—যেরূপে এই সমস্ত কল্পনা উঠে তাহার ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর।

অনুভূয় ক্ষণং জীবো মিথ্যা মরণমূর্চ্ছণম্।
বিস্মৃত্য প্রাক্তনং ভাবং অন্যং পশ্যতি সুব্রতে॥ ৩১॥

তদেবোন্মেষ মাত্রেণ ব্যোম্নেব ব্যোম রূপ্যপি।
আধেয়োয়মিহধারে স্থিতোহমিতি চেততি ॥ ৩৮ ॥

হস্তপাদাদিমান্ দেহো মমায়মিতি পশ্যতি।
যদেব চেততি বপুস্তদেবেদং স পশ্যতি ॥ ৩৩ ॥

এতস্যাহং পিতুঃ পুত্রো বর্ষাণ্যেতানি সন্তিমে।
ইমে মে বান্ধবা রম্যা মমেদং রম্যমাস্পদম্ ॥ ৩৪ ॥

জাতোহমভবং বালো বৃদ্ধিং যাতোহমীদৃশঃ।
বান্ধবাশ্চাস্য মে সর্ব্বে তথৈব বিচরন্ত্যমী ॥ ৩৫ ॥

চিত্তাকাশ ঘনৈকত্বাৎ স্বেপ্যন্যেপি ভবন্তি তে।
এবং নামোদিতে পাস্য চিত্তে সংসার খণ্ডকে ॥ ৩৬ ॥

হে সুব্রতে। জীব ক্ষণকাল মাত্র মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া জীবনের গত ঘটনা সব ভুলিয়া যায়। এবং তৎক্ষণাৎ অন্য কিছু দেখিতে থাকে। এ দেখাটা কিন্তু স্বপ্নে দেখার মত। কারণ মরণ মূর্চ্ছায় স্থূল চক্ষুর কার্য্য হয় না।

সেই সময়েই আকাশরূপী জীব আধার দেহাদি শূন্য হইয়াও উন্মেষ প্রাপ্ত হয়। হইয়া শূন্যেই স্মরণ করিতে থাকে, আমি এই আধারে এই দেহে আধেয় হইয়া স্থিত। "যং যং বাপি স্মরন্ দেহং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" যেমন যেমন ভাব স্মরণ করে স্মৃতিতে তাহাই আসিতে থাকে।

জীব স্মরণ করে এই হস্তপাদাদি বিশিষ্ট দেহ আমারই; এই পিতার পুত্র, এত বৎসর অতিবাহিত করিলাম। এই সকল রমণীয় বন্ধু বান্ধব আমারই, এই আমার সুরম্য গৃহাদি। আমি জন্মিয়াছি, আমি বালক ছিলাম, এই ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার এই সব বান্ধব সেই প্রকারেই বিচরণ করিতেছে।

আকাশরূপী আত্মার দেহ ভাবাপন্ন যে চিত্ত সেই চিত্তের যে দৃঢ়তর অধ্যাস সেই একাধ্যাস হইতে বান্ধব দিগের দেহ সম্বন্ধিত্বটা নিজের বলিয়াই বোধ হইতে থাকে। আকাশ শূন্য। তাহাতেই পূর্ব্ব সংস্কার বশে ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান উত্থিত হয়। স্বীয় চিত্তটাই তখন একখণ্ড সংসার হইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে

ন কিঞ্চিদপ্যভ্যুদিতং স্থিতং ব্যোমৈব নির্ম্মলম্।
স্বপ্নে দ্রষ্টরি যদ্বৎ চিৎ তদ্বৎ দৃশ্যে চিদেবসা॥ ৩৭॥

কোন কিছুই সত্য সত্য উদিত হইতেছেনা। একমাত্র নির্ম্মল ব্যোম স্বরূপ আত্মাই অবস্থিত। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায় তাহা কি? এবং যিনি দেখেন তিনিই বা কি? একমাত্র চিৎ যিনি তিনিই স্বস্বরূপেই আছেন। তিনিই দ্রষ্টা তিনিই স্বপ্ন। জাগ্রতে যাহা দেখা যায় সেই দৃশ্যও সেই চিৎই। রজ্জুটি ভ্রমজ্ঞানে যেমন সর্পমত বোধ হয়, স্থাণু যেমন ভ্রমজ্ঞানে পুরুষ মত বোধ হয় স্বপ্নভ্রমে চিৎও সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও অন্যরূপ সাজিয়া আপনাকে অন্যরূপ ভাবনা করেন।

আবার দেখ। স্বপ্নে একটা দ্রষ্টৃভাব পাওয়া যায় আর দৃশ্যভাবও পাওয়া যায়। আমিই আছি। স্বপ্ন আমিই দ্রষ্টা আবার আমিই বহু ভাবে দৃশ্য সাজি। কোথাও কিছু নাই কিন্তু স্বপ্নে এই দ্রষ্টৃ দৃশ্য ভাব দ্বারা নানা প্রকার কল্পিত ভেদ অনুভব হয়। চিৎ আবার স্বপ্নে সর্ব্বত্র গমনও করেন। বাস্তবিক তিনি কিন্তু চলন রহিত। এখন এই দ্রষ্টৃ দৃশ্য ভাব বাদ হইলে অর্থাৎ দ্রষ্টাও নাই এবং দৃশ্যও কোথাও নাই এই হইলে যেমন দর্শন ব্যাপারটা অদর্শন রূপেই পরিণত হয় সেইরূপ বাস্তবিক চিৎ হইতে কোন কিছু উঠে না, কোন কিছুরই দর্শন হয় না, তথাপি যে চিৎকে সর্ব্বদা মনে হয় এটা ভ্রম মাত্র। ইহা মায়ারই ব্যাপার।

তাই বলিতেছি "যথা স্বপ্নে তথোদেতি পরলোক দৃগাদিভিঃ॥ ৩৮॥ চিতের স্বপ্নে উদয়, স্বপ্নে সর্ব্বত্র গমন ও যেমন তাঁহার পরলোক দর্শন দ্বারা উদয়ও সেইরূপ।

পরেলোকে যথোদেতি তথৈবেহাভ্যুদেতি সা।
তৎ স্বপ্ন পরলোকেহ লোকানামসতাং সতাম্॥ ৩৯

আবার পরলোকের উদয়টিও যেমন ইহলোকের উদয়ও সেইরূপ। স্বপ্ন পরলোক ইহলোক অসতামেব ভ্রান্ত্যা সতাম্—অসৎ হইয়াও ভ্রান্তিতে সৎরূপে প্রতীত হয়।

লীলা—মা! কৃপা করিয়া বলুন এই ভ্রান্তি জ্ঞানটি কার হয়?

সরস্বতী—সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই আছেন। সত্যসত্যই কোন কিছু তাঁহা হইতে উঠিতেছে না। মিথ্যা একটা যাহা উঠার মত লোকে বলে

তাহা মণির ঝলকের মত তাঁহার দ্বারা একটা অজ্ঞান কল্পনা মাত্র। ইহাই মায়া। যাহা নাই তাহাই যেন আছে ইহাই মায়া। এই অজ্ঞান দ্বারা তিনিই যেন স্বয়মন্য ইবোল্লসন্" আপনি আপনিই আছি আত্মমায়া দ্বারা আমি অন্যরূপ এই উল্লাস প্রাপ্ত যেন হই। অন্যরূপে যিনি স্থিতি লাভ করিলেন তিনি অজ্ঞান কল্পিত। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে ভ্রমজ্ঞানটাই মনের আকার। এই বিষয় পরে আরও ভালরূপে বুঝিবে।

ন মনাগপি ভেদোস্তি বীচীনামিব বারিণি।
অতোজাত মিদং বিশ্বম জাতত্বাদনাশি চ ॥ ৪০ ॥

জলটি যাহা তরঙ্গ সমূহও তাই। জল হইতে তরঙ্গের ভেদ যেমন, মনের সত্তা স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে মনের ভেদও সেইরূপ। এই বিশ্ব ভ্রমজ্ঞানে ব্রহ্ম হইতে জাত অর্থাৎ বিশ্ব জন্মে নাই তাহার আবার নাশ কি? অজাত বলিয়াই অনশ্বর।

তিনি আপনিই আপনার পারমার্থিকরূপে অবস্থিত। জগৎরূপে কোন কিছুই নাই। স্বরূপত্বাত্ নাস্ত্যেব। তবে যাহার প্রকাশ দেখা যায়? যচ্চভাতি? চিদেব সা। যাহার প্রকাশ দেখা যায় তাহা চিৎ মাত্র। পরম ব্যোমরূপিনিচিতি চেত্যভাব বর্জ্জিত হইয়াই অবস্থিত।

আর সাধারণে যে বস্তু সকল দেখে তাহা দ্রষ্টাতে মাত্র আরোপিত হয়। চেত্যতা দ্বারা অধিষ্ঠান চৈতন্য দূষিত হয় না যেমন রজ্জুতে সর্প আরোপ হইলে রজ্জু দূষিত হয় না সেইরূপ।

রসতন্মাত্রই হইতেছে জলের তত্ত্ব। সেখানে বীচিত্ব নাই। কারণ রসনা দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। এক মাত্র চিদাকাশই মায়িক আবরণরূপ আপন স্বভাব দ্বারা এই জগদাকারে বিভাসিত।

এই জন্য বলিতেছি দৃশ্য বলিয়া কোন কিছু নাই। দৃশ্য যখন নাই তখন দ্রষ্টৃভাব বা দর্শনভাব কোথায় থাকিবে?

মরণমূর্চ্ছার পর এক নিমেষ মধ্যেই জীবের চিত্তে ত্রিজগদ্দর্শন রূপ সৃষ্টি শ্রী প্রতিভাত হয়। তখন জীব পূর্ব্ব জন্মের মত দেশ, কাল, আরম্ভ, ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ভাবে জগৎ দেখিয়াছিল সেই ভাবেই জগদ্দর্শন করে।

তখন চিদ্বপু জীব—অজাত হইয়াও স্মরণ করে আমি জন্মিয়াছি, এই আমার মাতা, এই পিতা, এই বন্ধু, এই ভৃত্য, এই আমি বালক, এই যুবা ইত্যাদি।

মরিবার পরে নিমেষ মধ্যে দেশ-কাল-ক্রিয়া দ্রব্য মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট শরীর, পিতা, মাতা, বালক, কাল, যৌবন সমস্তই ক্রম অনুসারে স্মৃতিতে ভাসে।

নিমিষেনৈব মে কল্পোগত ইত্যনুভূয়তে ॥ ৫৩ ॥

এক নিমিষকেই এক কল্প গত হইল অনুভূত হয়; যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকেই দ্বাদশবর্ষ মনে করিয়াছিলেন, কান্তা-বিরহকাতর মনুষ্য যেমন এক দিনকে এক বৎসর মনে করে। সেইরূপ চিৎশরীরে জন্ম লাভ করিয়াও জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি দ্বারা অভুক্ত ব্যক্তির ভোজন ভ্রান্তির ন্যায় আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা এইরূপ ভ্রম জ্ঞানকে সত্য মত অনুভব করে।

শূন্যমাকীর্ণতামেতি তুল্যং ব্যসনমুৎসবৈঃ।
বিপ্রলম্ভোপি লাভশ্চ মদ স্বপ্নাদি সম্বিদি ॥ ৫৩ ॥

তখন শূন্যস্থান জনাকীর্ণ দেখে, বিপদও উৎসবময় দেখে, প্রতারণাতেও লাভ দেখে। অবিদ্যা দ্বারা শুধু যে অসদ্ভান হয় তাহাই নহে কিন্তু সদ্বিরুদ্ধভানও হয়।

মরীচ বীজ কণার যেমন তীক্ষ্ণতা, স্তম্ভের ভিতরে যেমন অরচিত পুত্তলিকা আছে সেইরূপ যিনি অজ তাহার মধ্যে এই দৃশ্যজাল আছে বলিয়া বোধ হইলেও ইহার পৃথক সত্তায় নাই। আত্মার আবার অস্তিত্ব বন্ধন মুক্তি কি নিমিত্ত থাকিবে এবং কিরূপই বা হইবে। এই সমস্ত মায়ার বিলাস মাত্র।

মেঘ রব শ্রবণে বকীর যেমন আনন্দোচ্ছ্বাস হয় লীলার তাহাই হইতেছিল। যেমন নবজলধরের বারিধারায় পর্ব্বতের নিদাঘ তাপ দূর হয় সেইরূপ ভগবতী সরস্বতীর উপদেশ বাক্যে লীলার হৃদয়তাপ তখন কিছুই ছিল না। লীলা শান্ত হইয়া উপবিষ্ট আছে। আর সরস্বতী? যেমন তরঙ্গায়িতবিপুল কায় বলাহক গগনমণ্ডলে তিরোহিত হয় সেইরূপ দেবীও অন্তর্হিতা হইয়াছেন। ধীরে ধীরে লীলা জাগিতেছে। তত্ত্বজ্ঞানের পরম শান্ত কথা শুনিয়া, নির্ব্বৃষ্ট সলিল জলধর যেমন নিঃশব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, সেইরূপে লীলার আত্মাও অতি ধীরে স্থূলদেহে প্রবেশ করিতেছে। লীলার কি অপরূপ রূপমাধুরী জাগিয়াছে। লীলা আপনাকে আপনি দেখিতেছে। এখনও মনে হইতেছে যেন আকাশপথেই লীলা আসিতেছে। আপনাকে আপনি দেখিয়া লীলা মনে করিতেছে যেন লাবণ্যতরুর একটি কোমলশাখা ঊর্দ্ধে দুলিতেছে।

লীলা জাগিয়াছে। এখনও সুখাসনে উপবিষ্টা। ভগবতীর উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতেছে। লীলা যেন বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আবার মনঃ সংযোগ করিতেছে। আবার সমাধির উপক্রম হইতেছে। এমন সময়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তসূচক বাদ্যধ্বনি হইল।

লীলা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে যোগমায়া ও ভোগমায়া আসিল।

সমস্তই সেই। লীলা ভোগমায়াকে সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্মের ভার দিলেন। পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্যই চলিতে লাগিল।

লীলা যোগমায়াকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বে যে স্থানে বিরহ শান্তির জন্য বিশ্রাম করিতেন সেই স্থানে গিয়াছেন। লীলা যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখি! পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার স্মরণ করিলে আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। বিরহ-বিকারে আমি কি বলিতাম তাহা কি তোমার স্মরণ আছে?

যোগমায়া—তাহা ত ভুলিবার উপায় নাই। তুমি ত জান আমারও বিরহ আছে। কিন্তু তেমন বিরহ ত কোথাও দেখি নাই।

লীলা—কি তখন বলিয়াছিলাম?

যোগমায়া—আমরা তোমার জন্য কত কমলদল আনিয়া দিতাম, কুসুমনিচয়ে পরিপূর্ণ কত উদ্যানভূমিতে তোমায় লইয়া গিয়াছি, কত প্রকার পুষ্পের মালা তোমায় পরাইয়াছি। তোমার গাত্রদাহ নিবারণ জন্য কতই করিয়াছি কিন্তু তাহাতে তুমি কি বলিয়াছ তাহা আমার সবই স্মরণ আছে।

লীলা—বল না কি বলিয়াছি।

যোগমায়া—তুমি বলিতে আমি অনলোপরি নিপতিত পদ্মিনীর ন্যায় তাঁহার বিরহে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। শীতলবায়ু সঞ্চালিত কমলদলের উপর উপবেশন করিয়া আমি জ্বলন্ত অঙ্গারে উপবেশন জনিত ক্লেশ অনুভব করি; আমার অঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যায়। নানা জাতীয় কুসুমনিচয়ে পরিপূর্ণ উদ্যান ভূমি আমার নিকট উত্তপ্ত সৈকতভূমি বলিয়া মনে হয়। চারি দিকে কুমুদ কহ্লার ফুটিয়াছে, মন্দ মন্দ মারুতসঞ্চালনে তরঙ্গমালা খেলিতেছে নানাবিধ সারস মনোহর কূজন করিতেছে এমন রমণীয় সরোবর আমার নিকট নীরস বলিয়া মনে হয়।

আমরা তোমার পুষ্পভারসমৃদ্ধ বৃক্ষ, পুষ্পিতাগ্র লতা দেখাইতাম। মারুত পতিত পতমান পাদপস্থ কুসুম লইয়া খেলা করিত, ভ্রমর সকল গুঞ্জন করিতে করিতে মারুতশ্চালিত কুসুমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত আর মনে হইত যেন বৃক্ষসমূহই গান করিতেছে। মত্ত কোকিলনাদে বৃক্ষ সকল যেন নৃত্য করিত আমরা কতই দেখাইতাম তুমি কিন্তু যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে। বননির্ঝরে মন্মথবিদ্ধ ডাহুক শব্দ করিত তুমি কবে রাজাকে তাহা দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলে তাহা বলিয়া শোকে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে। আমরা মন্দার, পদ্ম ও কুমুদ কুসুমের মালা গলে পরাইয়া দিতাম তুমি বলিতে যেন তুমি কণ্টকের উপর পতিত হইতেছ। গাত্রজ্বালা নিবারণার্থ কমল কহ্লার কুমুদ ও কদলী পত্র দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া দিলে তুমি বলিতে আমার গাত্র স্পর্শ হইতে হইতেই শীতল সরস শয্যা শুষ্ক মর্ম্মর হইয়া একবারে ভস্ম হইয়া গেল। উদ্যান মধ্যে কদলীকাণ্ডের উপরে পল্লব নির্ম্মিত দোলায় দোদুল্যমান হইয়া তুমি লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে। সখি! সেই আজ তুমি এত শান্ত কিরূপে হইয়াছ?

লীলা সেইমাত্র সমাধি হইতে উঠিয়াছেন। পথশ্রান্ত পথিক যেমন বৃক্ষছায়া পাইয়া শীতল হয় লীলাও বহু ক্লেশের পর সমাধি বৃক্ষের ছায়ায় একবার আরাম লাভ করিয়াছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ সেইখানেই যাইতে চায়। লীলা যোগমায়ার কথা শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে। তথাপি যোগমায়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছে বল না—কিরূপে এরূপ হইলে?

লীলা— তুমি তাহা করিবে?

যোগমায়া—করিব।

লীলা—দেখ সখি! বৈরাগ্যই সমাধির বীজ। পরকীয় দ্রব্যগ্রহণে নিবৃত্তি এবং স্বার্থে বিরক্তি ইহাই হইল বৈরাগ্যের ক্রম। চিত্ত সমাধির ক্ষেত্র। শুভকর্ম্ম এখানে হলচালন ব্যাপার। সৎসঙ্গ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র চর্চ্চা ইহার জল সেক। বীজ চিত্তক্ষেত্রে যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য তপস্যা দান ইত্যাদি কর্ম্ম কর এবং ক্রোধ লোভাদি ত্যাগ কর। তীর্থ পর্য্যটনাদি সৎকর্ম্মও কর। তবেই চিত্তহরিণ সমাধি তরুর আশ্রয় পাইয়া শান্তিলাভ করিবে। তত্ত্বজ্ঞান বলে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য—সেই সুদৃঢ় বৈরাগ্যকেও ধ্যান বলে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে বুঝিবে চিত্রকর

যেমন চিত্রমধ্যে মিথ্যাতরঙ্গসঙ্কুলা তরঙ্গিনীকে চিত্রিত করে সেই মত কল্পয়িতাও ব্রহ্মে, জগৎ কল্পনা করে। মৃত্তিকাপিণ্ডে যেমন কল্পিষ্যমান্ ভাণ্ডরাশি নিহিত থাকে পরব্রহ্মে সেইরূপ এই জগদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সংসার তথায় না থাকিলেও আছে! দেখ যোগমায়া তুমি সমাধির কঠোরতা করিতে যদি না পার তবে তুমি পরমেশ্বরকে দিবারাত্র ভক্তিযোগে আরাধনা কর। করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে সমস্তই প্রদান করিবেন :—

দদাত্যে তন্মহাবুদ্ধে নির্ব্বাণং পরমেশ্বরঃ।
অহর্নিশং পরময়া চিরং ভক্ত্যা প্রসাদতে॥

সর্ব্বদা নাম, প্রার্থনা, উপাসনা লইয়া থাক। ঈশ্বর প্রণিধান একবারও যাহাতে ভুল না হয় তাহাও করিও তুমিও আমার মত শান্ত হইবে। ঐ দেখ কে?

ভোগমায়া আসিল। বহু সংবাদ দিল। তখন সকলে আপন আপন কক্ষে গেল।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। লীলা আপন মণ্ডপে গিয়া উপবেশন করিলেন। ভগবতী সরস্বতীর কথা আবার চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রম জ্ঞান ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারে না। আমি জন্মিয়াছি, আমার দেহ, আমার রাজ্য, এ সব ভুল জানিয়াও ত্যাগ হইতেছে না। তখন জ্ঞপ্তীদেবীকে স্মরণ করিল। জ্ঞপ্তীদেবী আসিলেন। লীলা ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

বিশ্রান্তি উপদেশ।

দেবী—জীবের মরণ মোহের পরেই অসংখ্য জগৎ তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলে নানাপ্রকার রূপ দেখা যায় সেইরূপ। জীব যে সমস্ত জগৎ দেখে তাহার কোনটি ধর্ম্মময় সৃষ্টি যেমন স্বর্গাদি, কোনটি বা কর্ম্মময় সৃষ্টি যেমন গৃহ নগরাদি আর কোন প্রকারের সৃষ্টি প্রবাহ, কল্লান্তস্থায়ী যেমন পৃথিব্যাদি। সমস্ত সৃষ্টিই দিক্কাল কলনাকাশ পূর্ণ।

নানুভূতং ন যদ্দৃষ্টং তন্ময়া কৃতমিত্যপি।
তৎক্ষণাৎ স্মৃতিতা মেতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ৩ ॥

স্মৃতিতে যাহা কখন অনুভব করি নাই, যাহা কখন দেখি নাই—তাহা আমি করিয়াছি যাহা কখন হই নাই তাহাই হইয়াছি এই স্মরণটি মরণমূর্চ্ছার পরেই উদয় হয়। আপনার মরণ আপনি কে কবে দেখিয়াছে? তথাপি স্বপ্নে আত্মমরণ দেখার মত জীব বাসনাতে কত জগৎই তৎক্ষণাৎ দেখে।

ভ্রান্তিরেবমনন্তেয়ং চিদ্ব্যোম ব্যোম্নি ভাস্বরা।
অপকুড্যা জগন্নাম্নী নগরী কল্পনাত্মিকা ॥ ৪ ॥
ইদং জগদয়ং সর্গঃ স্মৃতিরেবেতি জৃম্ভতে।
দূরকল্পক্ষণাভ্যাস বিপর্য্যাসৈকরূপিণী ॥ ৫ ॥

এই জগন্নাম্নী নগরী দীপ্তিমতী কল্পনাত্মিকা। ইহা অনন্ত ভ্রান্তি। ইহা ভিত্তিশূন্য হইয়া চিদাকাশেই শূন্যরূপে অবস্থান করিতেছে। এই জগৎ, এই সৃষ্টি, ইহা দূর, ইহা নিকট, ইহা ক্ষণ, ইহা কল্প এই সমস্ত ভ্রমেরই রূপ। ইহারা ভ্রমরূপে পরিণতা পূর্ব্ব স্মৃতিরই বিকাশ মাত্র।

নানুভূতানুভূতা চ জ্ঞপ্তিরিত্থং দ্বিরূপিণী ॥" ৬ ॥

অনুভূত অননুভূত উভয় প্রকার দর্শনই চিৎ রূপে অবস্থিত এবং চিৎ স্বরূপেই প্রবর্ত্তিত। যাহা কখন অনুভূত হয় নাই তাহাও "ইহা আমার অনুভূত" এইরূপ

ভ্রম হইতে উৎপন্ন। পিতার ন্যায় কাহাকেও দেখিলে যেমন পিতার স্মরণ হয় পিতুরিব পিতুঃ স্মৃতিঃ। স্বপ্ন ভ্রমেও সেইরূপ হয়। সংসারটা স্বপ্নের ন্যায় প্রজাপতির বাসনাতেই ছিল। ক্রমে স্থূল হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বাসনাময় সংসারের অত্যন্ত বিস্মৃতিই মুক্তি।

দৃশ্যং ত্রিভুবনাদীদমনুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্।
কেষাঞ্চিৎ তস্মিকেষাঞ্চিৎ নানুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্॥ ৯॥
প্রতিভাসতএ বেদং কেষাঞ্চিৎ স্মরণং বিনা।
অত্যন্ত বিস্মৃতং বিশ্বং মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥

লীলা—দেবি! মুক্তি কি রূপে লাভ করিব? বাসনা জান ত কিছুতেই অদৃশ্য হয় না। কি উপায় হইবে?

দেবী। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মুক্তি নাই। অহং জ্ঞান ও দৃশ্য দর্শনের অভাব যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ মুক্তি নাই। রজ্জুকে সর্প বোধ করা হইয়াছে। যতক্ষণ সর্প শব্দ ও সর্প শব্দের অর্থ, রজ্জুতে ভ্রম রূপে আছে ততক্ষণ সর্পভয় থাকিবেই। যোগে যে জগতের বিস্মৃতি তাহা কতক্ষণ? যোগ হইতে উঠিলেই আবার সংসার। জ্ঞান হইলে নিশ্চয় হইবে যে সৃষ্টিতরঙ্গ ব্রহ্ম সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায় তাহাই পরমপদের বিবর্ত্ত মাত্র। অজ্ঞানেই এক মাত্র ব্রহ্মকে ইহা উহা তাহা রূপে দেখা যাইতেছে মাত্র। এক মাত্র ব্রহ্মই আছেন। চিদাকাশে চিদাকাশই অবস্থিত।

লীলা—দেবি! জগদ্দর্শন কেন হয় তাহা আমি দৃঢ় রূপে ধরিতে পারিতেছি না। যতটুকু ধারণা করিয়াছি তাহা আর একবার বলিব?

দেবী—বল।

লীলা—পূর্ব্বে যাহা দেখা যায়, যাহা অনুভব করা যায় তাহার একটা সংস্কার আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে। সেই সংস্কারগুলি কোন রূপে জাগিয়া উঠিলেই সমস্ত স্মরণ হয়। তবেই হইল পূর্ব্ব সংস্কারই জগদ্দর্শনের কারণ। এই ত আপনি বলিতেছেন।

দেবী—হাঁ। ইহাতে কি বলিতে চাও?

লীলা—আমি ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপ সৃষ্টি যে দেখিলাম তাহার সংস্কার আমার চিত্তে কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বে ত কখন তাহাদিগকে দেখি নাই। স্মৃতি যাহার হয় তাহা ত পূর্ব্বে অনুভব করা হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে কিছুই অনুভব করা হয় নাই তবে স্মরণ হইবে কিরূপে?

দেবী—সংস্কার হইতে দর্শন হয় সত্য, কিন্তু পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কার না থাকিলেও দর্শন হয়। সংস্কার যেমন চিত্তে বাস করে সেইরূপ মায়া নামক মূল বাসনাও আছে। মায়াটা অজ্ঞান। এই মূল বাসনাই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখায়। তুমি যে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী রূপ সৃষ্টি দেখিয়াছ ইহা পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কারমূলক নহে। তোমার আত্মাতে আশ্রিত যে মায়া বা অজ্ঞান বা কল্পনা বা সামর্থ্য ক্লিপ= সামর্থ্যে) সেই অজ্ঞানের প্রভাবেই এই দর্শন হইয়াছে।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যাহা গত হইয়াছে তাহাও যেমন তিনি জানেন সেইরূপ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জ্ঞানও তাঁহাতে সংস্কার রূপে আছে। কিন্তু পূর্ব্ব কল্পায় ব্রহ্মা যখন মুক্ত হইয়াছিলেন তখন ও তাহাতে কোন সংস্কার থাকিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ হইলেও যখন তিনি মুক্ত তখন তিনি আপনিই আপনি। সর্ব্ব বলিয়া কোন কিছুর সংস্কার তাঁহাতে নাই। বলিতে পার তিনি যে "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" পূর্ব্বের মত সমস্তই কল্পনা করিলেন কিরূপে ইহা করিলেন? ইহার উত্তর এই যে তাঁহার আশ্রিত মায়াই এই কল্পে মায়াতে উপস্থিত চৈতন্যকে নূতন ব্রহ্মার আকারে বিবর্ত্তিত করে। এই জন্য বলা হয় পূর্ব্ব প্রজাপতি হইতে অন্য প্রজাপতি হয়। কিন্তু সে প্রজাপতিও শুদ্ধ চেতন। তাঁহাতেও কোন সৃষ্টি সংস্কার রূপে থাকে না। তবে চন্দ্রে চন্দ্রিকার মত সাম্যাবস্থ অব্যক্তা জড়িত যে চৈতন্য তাঁহা হইতে মূল বাসনা নাম্নী অবিদ্যার উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় হয়। শুদ্ধ চৈতন্যে কোন কল্পনা নাই। মায়াযুক্ত ব্রহ্মে আত্ম ভ্রান্তি স্ফুরিত হয় কারণ তিনি খণ্ডাংশ মাত্র। আত্ম ভ্রান্তি হইতে শত শত অননুভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব জগৎ দর্শন হয়। স্মৃতি দুই প্রকার মনে রাখিও। পূর্ব্বানুভূত সংস্কার জন্য একরূপ স্মরণ হয় এবং অনাদি অবিদ্যাশক্তিরূপ বাসনা দ্বারাও স্মরণ হয়। চিৎ সম্বলিত ব্যষ্টি সমষ্টি অন্তঃকরণটি হইতেছে স্মরণ। স্মরণটিও মায়া সম্বলিত ঈশ্বরের কার্য্য। স্মরণটী সন্ মাত্রাত্মক মহা চিৎ রূপ। এই জন্য বলা হয় কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। চিদাকাশে চিদাকাশং কেবলং স্বাত্মনি স্থিতং। চিদাকাশে

চিদাকাশই আছেন। কেবল আত্মাই আত্মা। দেখ লীলা তোমার আত্মাতে যে অন্তঃকরণ সংলগ্ন আছে ইহাই মায়া। সেই মায়া—সেই অন্তঃকরণই সৃষ্টি দর্শনের মূল কারণ। মায়াটি ভ্রান্তি মাত্র। ইহা নামে মাত্র আছে বস্তুতঃ নাই।

লীলা—দেবি! কি আশ্চর্য্য আত্মভ্রম! কি কৌতুক! কি প্রহেলিকা! আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞানচক্ষু দিতেছেন। দেবি! আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিতেছে। আমি সেই গিরিগ্রাম, সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতী, তাঁহাদের সেই সৃষ্ট জগৎ দেখিব। দেখিয়া সকল সন্দেহ দূর করিব।

যত্রাসৌ ব্রাহ্মণোগেহে ব্রাহ্মণ্যা সহিতেহভবৎ।
তং সর্গং তং গিরিগ্রামং নয় মাতঃ বিলোকয়ে ॥ ২৭ ॥

মা! আমাকে সেইখানে লইয়া চল আমি দেখিব।

সরস্বতী—দেখিবে যদি, তবে দৃষ্টিকে পবিত্র কর।

লীলা—কিরূপে করিব?

সরস্বতী—অচেত্যচিদ্রূপময়ী যে দৃষ্টি তাহাই হইল পবিত্র দৃষ্টি।

লীলা—পূর্ব্বে যখন বলিয়াছিলেন তখন যেন বুঝিয়াছিলাম এখন কেন বুঝিতেছি না? আর একবার বলুন।

সরস্বতী—চিৎ যিনি তিনিই বস্তু। অন্য সমস্ত অবস্তু। পূর্ব্বে ১২ অধ্যায়ে চিৎ কিরূপে চেত্যতা যেন প্রাপ্ত হয়েন তাহার কথা বলিয়াছি।

চেত্যতা হইতেছে সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা বা ঈক্ষণ। চেত্যতাশূন্য অথবা সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছাশূন্য যে চিৎ তাহাই হইল অচেত্য চিৎ। এখানে চেত্যতার স্ফুরণ নাই বলিয়া মণির ঝলকের ন্যায় প্রচুর চৈতন্যেরই কেবল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যখন সমস্তই চৈতন্যরূপে তোমার নিকট স্ফুরিত হইবে তখন তোমার দৃষ্টি পবিত্র হইয়াছে বলা যাইবে। আমি চেতন আমি জড় নহি—জড় যাহা সেটা আমার ভাবনারই স্থলত্ব—ভিতরে সর্ব্বদাই এই বিচার এবং বাহিরেও সর্ব্বদা অধিষ্ঠান চৈতন্যের স্মরণ ইহাই এখানে সাধনা।

লীলা—বুঝিতেছি আমি মাত্র দ্রষ্টা অন্য সমস্তই দৃশ্য, তাই উহারা জড়। কিন্তু যখন এমন হইবে যে আমি যেমন একজন মানুষকে দেখি আবার সেই মানুষও আমাকে দেখে—ইহাতে একটা চেতন ভাবের বিশেষ স্ফুরণ হয়—চেতনে

চেতন স্পর্শ করে সেইরূপ আমি যেমন আকাশ বৃক্ষ লতা ফুল জল বায়ু দেখি তাহারাও সেইরূপ আমাকে দেখে—সর্ব্বত্রই একমাত্র চৈতন্যেরই বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভূত যখন হইবে তখনই বলিতেছেন দৃষ্টি পবিত্র হইল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি ইহা কখন হইবে?

সরস্বতী—যখন সমাধি দ্বারা এই দেহের বিস্মরণ হইবে তখনই অচেত্য-চিদ্রূপময়ী পরমা পাবনী দৃষ্টি লাভ করিবে। তুমি প্রচুর চৈতন্য দেখিয়া দেখিয়া অমলা হইয়াও যাও তবেই চিদাকাশস্থিত মায়ার অনন্ত সৃষ্টি দেখিবে।

ভূমিষ্ঠ নর সংকল্প দ্বারা আকাশে যেরূপ নগর দর্শন করে এ দর্শনও সেইরূপ। ইহা হইলে তুমি আমি উভয়েই সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব। কিন্তু—

"অয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহো হি পরমার্গলম্" ॥ ৩০ ॥

তোমার এই স্থূলদেহ সেই সর্গ দর্শনের ভয়ানক অর্গল—নিতান্ত প্রতিবন্ধক। এই দেহটি সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া যাও, তবে সেই সৃষ্টি দেখিতে পাইবে। দেহ ভুলিবার সাধনা হইতেছে, আমি দ্রষ্টা, আমি চেতন। আর দৃশ্য যাহা তাহা জড়। জড় যাহা তাহা ভাবনার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি মাত্র। ভাবনা যাহা তাহা কল্পনা মাত্র। কল্পনা আমি তুলিতেও পারি, না তুলিতেও পারি। যখন না তুলি তখন সব চেতন।

লীলা—পরমেশ্বরি! এই দেহ দ্বারা কেন অন্য জগৎ দেখা যায় না? অনুগ্রহ করিয়া সে বিষয়ের যুক্তি আমাকে বলুন।

অধুনা দেবি! দেহেন জগদন্যদবাপ্যতে।
ন কস্মাদত্র মে যুক্তিং কথয়ানুগ্রহাগ্রহাৎ ॥ ৩১ ॥

দেবী—জগন্তীমান্যমূর্ত্তানি মূর্ত্তিমন্তি মুধাগ্রহাৎ।
ভবন্তিরববুদ্ধানি হেমানী বোর্ম্মিকা ধিয়া ॥ ৩২ ॥

এই দেহ দিয়া অন্য জগৎ দেখা যায় না এই জিজ্ঞাসা করিতেছ—তা বল দেখি দেহই বা কোথায় আর জগৎ বা কোথায়? এই সমস্ত জগতের মূর্ত্তি নাই। জগৎ বা দেহাদি ইহারা অমূর্ত্ত। কিন্তু মুধাগ্রহাৎ বিনা মিথ্যা জ্ঞানাৎ—মিথ্যা জ্ঞানে ইহাদিগকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট মনে হয়। জগৎ বা দেহ মায়া মাত্র, এই জন্য অমূর্ত্ত।

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩২২ সাল। [৩য় সংখ্যা।



উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৹ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।৹ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪৷৹, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷৹, সিকি পৃষ্ঠা ১৷৹, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵৹ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

অন্নচিন্তা ও হরিনাম।

অন্নচিন্তায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না তা হরিনাম করি কখন?

সে'ত ঠিক। তুমি পূর্ব্বকর্ম্মফলে যাহা ভোগ করিতেছ তাহাই শাস্ত্রমত ভোগ করিয়া যাও তুমি এত নিয়ম ত পালন করিতে পারিবে না যে পালন করিতে পারিবে না, শাস্ত্র ত তাহাকে জোর করিয়া কিছুই করিতে বলেন না। এই ত সংসারে কত পশুপক্ষী, কত বানর, কত গাধা, কত লম্পট, কত বেশ্যা, কত কি আছে, সবাই কি আর ত্রিসন্ধ্যা করে? না করিতে পারে?

তুমি কি বানর গাধার সঙ্গে আমার তুলনা কর?

এই ত ইহারাও পারে না, তুমিও পার না। কিন্তু তুলনা করিলে যখন চটিয়া উঠ তখন অন্ততঃ এই বুঝা যায় তুমি বানর গাধা নও এবং হইতেও চাও না, যদি ইহাই ঠিক হয় তবে যে টুকু সময় তোমার অন্ন চিন্তার পরেও অবশিষ্ট থাকে, তাহার অপব্যবহার আর করিও না। ঐ সময় টুকু ধরিয়া যত টুকু পার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে ডাক, তোমার শুভ দিন আবার আসিবে।

সমস্ত দিন "অন্নচিন্তা চমৎকার" করিয়া আসিয়া একটু বিশ্রাম নাই, একটু আমোদ প্রমোদ নাই—আবার বল হরিনাম কর—ইহাতে কি মানুষ বাঁচে?

তোমার এই মতের আমি বিরোধী। তুমি অন্নচিন্তায় হরি নাম করিতে পার না। কিন্তু আমোদ প্রমোদ সক্ টুকু ত বেশ আছে। ইহাই ত তোমার দুষ্কৃতির মূল। যাহাকে ঘানি টানিতে হইতেছে সে কি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে চুরুট টানিতে টানিতে ঘানি টানিবে? দুঃখী নিজের দুঃখ চিন্তা করুক আর দুঃখ প্রতিকারের জন্য হরি নাম করুক যতটুকু পারে তাহাতেই তাহার ভাল হইবে। নতুবা ফ র্ত্তি করায় আরও তাহার পাপ বাড়িয়া যাইবে। সে শীঘ্রই বহুপাপে জড়িত হইয়া মরিবে।

বুঝিলাম। কিন্তু ঐ যে অপরাধের ক্ষমার কথা বলিতেছিলে?

নিত্যই অপরাধের ক্ষমা চাই। এ ক্ষমা সকল সাধককেই চাহিতে হয়। কারণ কেহই এইকালে সর্ব্বসঙ্গ শূন্য হইয়া অথবা নিরন্তর অপ্রাকৃত সাধুসঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাতে মগ্ন থাকিতে পারে না। অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টিতে তাহা পড়ে না। তবে এখন যে তেমন কেহ নাই তাহা না দেখিলেও আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। আছেন, কিন্তু আমাদের মত মন্দভাগ্য জীবের এমন পুণ্য বল নাই। যাহাতে তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। আর সাধু দর্শন যদি এত সুলভ হইত তবে শ্রীভগবান্ ত সাধুর সাধু। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখা দেন না কেন? তবে যে এই সব ইন্দ্রজাল দেখাইয়া লোক ভুলান—এই তির্ব্বতিয়া সাধু, এই নাইনিতালিয়া সাধু, আলমেড়িয়া সাধু ইহারা বুজরুক্ মাত্র। কিছু একটু জানিলেই মানুষ আত্ম প্রচার করিতে ছোটে। ইহারা কিন্তু ঠিক লোক নহে। আগে স্থায়িভাব লাভকর, তবে প্রচারে ছুটিও। সমস্যা কঠিন। দোষটা সর্ব্বত্রই প্রয়োজ্য। তবুও যে প্রচার—সেটা বহুলোকের জন্য বহু প্রকারের। তবে আত্মপ্রতারণা ও লোকপ্রতারণা যেখানে নাই সেইটি ঠিক। সরল ভাবে যদি বলিতে পার আমি এই উদ্দেশ্যে এই করি সেই ভাল।

যাক্ এখন অপরাধের ক্ষমার কথা বল।

দেখ; ইহাই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবার বস্তু! তাঁহাকে ডাকিবার অবসর পাও না, যাঁহাদের অবসর আছে তাঁহারাও আলস্য অনিচ্ছায় যথা সময়ে প্রাণ যে জাগাইয়া ডাকিতে পারে না, ঠিক ঠিক মত নিত্য কর্ম্ম প্রায় হয় না, চেষ্টাও হয় তথাপি যে হয় না, এ সব কিসের চিহ্ন? নিশ্চয়ই অপরাধের চিহ্ন। নিশ্চয়ই পাপের চিহ্ন।

সমভাবে যে শরীর থাকে না, নানা প্রকার ব্যাধিতে কর্ম্ম করিতে দেয় না,

নানা প্রকার সাংসারিক উৎপাতে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতেও যে পারা যায় না, পুত্র কন্যা ইত্যাদি পোষ্যবর্গ ও সর্ব্বদা অসন্তোষের প্রলাপ বাক্যে যে চিত্তের ধৈর্য্য রাখিতে দেয় না—এ সব কিসের চিহ্ন? এ সমস্ত অপরাধের চিহ্ন, পাপের চিহ্ন।

আমার পাপ আছে, তাই তোমার কাছে আসিতে গেলেই শত বাধা পাই। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক নানা অসুবিধা যে ভোগ করি—ইহা আমারই অপরাধের ফল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আর আমি পাপ করিতে চাই না, আর আমার অপরাধ করিতে ইচ্ছা নাই, আমি ভাল হইতেই চাই; আমি পূর্ব্বে যা থাকি না কেন?

এখন আমার আর সে সব বৃত্তি নাই। আমি তোমার দাস হইতে চাই, তোমার দাসী হইতে চাই। কারণ জানিয়াছি তুমি ভিন্ন আর আমাকে আশ্রয় দিবার আর কেহ নাই। আর আমার মুখের দিকে তাকাইতেও কেহ নাই। কেহই আমাকে আর ক্ষমা করিতে পারে না। আমার তুমিই আছ। তুমি ক্ষমাসার। তুমি অধমতারণ। তুমি দীনবন্ধু। তুমি কাঙ্গালের হরি।

আমার অন্নচিন্তা আছে, বস্ত্র চিন্তা আছে, সংসার চিন্তা আছে। সব সত্য। আমি কাঙ্গাল। স্থূলে সূক্ষ্মে সব দিকেই কাঙ্গাল। কিন্তু তুমি ত কাঙ্গালের হরি। প্রভো! আর যে আমার কেহ নাই। আর যে আমার অপরাধ কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

শ্রীভাগবতে যখন শুনি—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রানি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

সতের সুহৃৎ। আমার সুহৃৎ কিরূপে হইবে? আমি ত সৎ নহি। কত অসৎ কার্য্য ত করিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বে অসৎ ছিলাম। পূর্ব্বকৃত পাপের সংস্কার আমাতে আছে সত্য কিন্তু এখন আমি আর নূতন পাপ করিতে চাই না। আর কোন প্রতারণা করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি অন্তরে সৎ হইয়াছি। তবে ত—সতের সুহৃৎ তুমি—তুমি আমার হৃদয়ে বসিয়া আমার অমঙ্গল সকল দূর করিয়া দিবে। এস এস পাপী তাপী! দেখ ভগবান ত তোমাদিগকেও ত্যাগ করেন নাই। কেন না এখনও ত বাঁচিয়া আছ, চলিতে ফিরিতে পারিতেছ, সে

হৃদয়ে না থাকিলে মানুষ ত মরিয়া যায়। সে হৃদয়ে আছে। তুমি কেবল এই কর যে পাপ আর করিও না। আত্মপ্রতারণা করিও না। ঐ যে মনে করিতেছ আমি একটু অধর্ম্ম না করিলে ছেলেপুলে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে যে, এসব তোমার দুর্ব্বুদ্ধির যুক্তি; এসব শয়তানের প্রলোভন। এ সব তুমি ছাড়। জানিয়া শুনিয়া আর প্রতারণা করিও না। আর পাপ করিব না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প কর। দেখ শ্রীভগবান্ তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমাকে কোলে লইবেন। এ আশ্বাসেও তুমি আশ্বাসান্বিত হইতে পার না। তোমার পাপ সকল, তোমার অমঙ্গল সকল, তোমার অভদ্রানি "সতাং সুহৃৎ" শ্রীহরি "বিধুনোতি" ক্ষীণ করিয়া দিবেন। দূর করিয়া দিবেন। এ আশ্বাস—বড় আশ্বাস। হৃদয়ে ত তিনি বসিয়াই আছেন। এস এস নিত্য তিন বেলায় পূজার পূর্ব্বে ও পূজা অন্তে, তাঁর কাছে অপরাধের ক্ষমা চাই।—নিশ্চয়ই তিনি আমাদের কথা শুনিবেন। আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এমন সুহৃৎ থাকিতে ভয় কেন করিবে?

সন্তান সন্ততি না খাইতে পাইয়া মরিবে এই ভাবিয়া না তুমি অন্যকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের জন্য সঞ্চয় করিতে চাও। এ ভ্রম ছাড়! তুমি প্রতারণা করিও না, তুমি কপটতা করিয়া লোক ঠকাইও না, তুমি পাপ করিও না, মিথ্যা কহিও না। শ্রীভগবান্ এই অনন্তকোটি জগৎ চালাইতেছেন আর তুমি ভাল হইয়া গেলে তোমার সংসার চালাইবেন না? আর ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও যদি দেখ তোমার দুঃখ রহিয়া যাইতেছে তাহাহইলে জানিও তোমাকে ঐ সব প্রারব্ধ ভুগিতেই হইবে। শরীরটা বহু প্রারব্ধ এখানে ভুগিবে—ভুগুগ্। তুমি প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে হরি হরি কর। অন্য কোনদিকেই ত কিছুতেই কিছু করিতে পারিতেছ না তবে মিছা মিছি আর জানিয়া শুনিয়া পাপ বাড়াও কেন? ক্ষমা চাও—হরি হরি কর। যতটুকু সময় পাও ততটুকু সময় কর। ক্রমে তোমার ভাল হইবে। এত ব্যস্ত হইলেও চলিবে কেন? প্রারব্ধ ভোগ কত দিন ধরিয়া হইবে তুমি ত জান না। তুমি সৎপথে থাকিয়া যা পার উপার্জ্জন কর। যে দিন কিছু না পাও সে দিন বরং হরি হরি করিয়া উপবাস কর—করিয়া দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাও তথাপি মিথ্যা কথা কহিয়া, লোক প্রতারণা করিয়া, ঘোর পাষণ্ড হইয়া আর মুখে নারায়ণের নাম করিয়া, আপনার ও পুত্রকন্যার অমঙ্গল টানিয়া আনিও না।

সহস্রধারা।

কত সুখ মানুষের যখন তুমি তারে সুখ দাও। মানুষ কিন্তু সদাই সুখ চায়, আর সুখ পাবার জন্য কতই করে। তবুও মানুষ সুখ পায় না কেন না মানুষ নিজের চেষ্টায় কতটুকু সুখ আনিতে পারে? বড়ই ভ্রম! তোমায় ছাড়িয়া মানুষ যে সুখ লাভ করে মনে ভাবে, সেটা ঠিক ঠিক সুখ নহে।

এই যে সুন্দর স্থান—চারিদিকে পর্ব্বতমালা আর পর্ব্বতমালার প্রাচীরে ঘেরা কাহার যেন এই বিহার ভূমি। কত বাড়ী, এখানে—বাড়ীতে বাড়ীতে পার্ব্বতীয় অশ্বথ, আম্র, শাল, পিয়াল, কত রকমের বৃক্ষ। তা ছাড়া কত প্রকার ফুলের বাগান—বাগানে বাগানে কত বনলতা, উদ্যান লতা; বনফুল, উদ্যান ফুল। আরও কত দেশী বিদেশী বৃক্ষ। বৃক্ষে বৃক্ষে কত সুন্দর সুন্দর পাখী। পাখীর সুমধুর কাকলীতে এই বিহার ভূমি যেন নিরন্তর মুখরিত। চারিদিকে বড় বড় রাস্তা, রাস্তার দুই পাশে বড় বড় স্নিগ্ধছায়া-তরুরাজি। পর্ব্বতের নিকট হইতে জলধারা বহাইয়া আনিয়া এই বিহার ভূমিতে জল সরবরাহ করা হইয়াছে। সবই ত সুন্দর মনে হয়।

প্রভাতে পক্ষীর রবে ঘুম ভাঙ্গে। কলিকাতা বা কাশীর মত সহরে এখন নিদারুণ গ্রীষ্ম। আর এখানে? সকল সময়ই ফাল্গুন মাসের মত। শীতের প্রাখর্য্যও নাই, গ্রীষ্মেরও না। বড় সুন্দর।

সবাই বলিল সহস্রধারা দেখিতে চলুন। রাজপুর পর্য্যন্ত টমটমের মত টোঙ্গা, তার পর কেহ পদব্রজে, কেহ ডাণ্ডীতে সহস্র ধারায় যাওয়া হইল।

ঠিক বার বৎসর পূর্ব্বে এই সহস্রধারায় আর একবার আসা হইয়াছিল। সঙ্গে ছিল পথপ্রদর্শক প্রেমানন্দ, তখনকার কথা আর বলা হইল না। দুই পাশে পর্ব্বত মধ্যে জলধারা। সেই জলধারার উপর দিয়া তখন আসা হইয়াছিল—প্রেমানন্দ তখন উন্মত্ত হইয়া পর্ব্বতের গাত্রে চিত্র বিচিত্র প্রস্তরখণ্ড দেখাইয়া বলিয়াছিল এই আমার রত্নভাণ্ডার। এখনকার আসা অন্যরূপ। রাজা, রাজকুমার ইহাদের সঙ্গে যানবাহনে আসা। সে যেন বেশ কিন্তু এ আসাতেও তোমার দেওয়া বলিয়া যেন সুখ বেশী। তখন এ দৃষ্টি খোল নাই এখন কেন যেন কৃপা করিয়া একবার খুলিয়া দেখাইয়াছ।

সবে দুই রাত্রি এখানে বাস হইয়াছে। তৃতীয় দিনে আসা হইল সহস্রধারায়।

এই দুই আড়াই দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও মন যেন ঠিক ঠিক অবস্থায় আসিতে পারিতেছিল না। তথাপি একটা চেষ্টা ছিল। তুমি সুখ দিবার পরে যখন সবই ভাল লাগিতেছিল ইহার পূর্ব্বে কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও সেই সুন্দর জাগা ভাবটি আসিতেছিল না। সহস্রধারায় গিয়া কি এক অব্যক্ত ভাষায় যেন তুমি কি বলিয়াছিলে। তখনই একটা তৃপ্তি আসিয়াছিল কিন্তু তার পরদিন প্রাতঃক্রিয়ার পরে সহস্রধারায় যাহা দেখাইয়াছিলে তাহা জীবন্তভাবে প্রাণ জাগাইল। আমি যাহা করিয়াছিলাম তাহা তুমি যে সত্য সত্য শুনিয়াছিলে, আমি যাহা অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা যে রাজরাজেশ্বর তুমি! তুমি বড় সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলে; আমি—নিতান্ত দরিদ্র আমি—আমার চিত্তৃপ্তি দেখিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিতেছি ইহা আদৌ আমার মনগড়া কল্পনা নহে। যাহা হইয়াছিল তাহা সত্য, সত্য, সত্য। এত সুন্দর আর কখন দেখি নাই। প্রকৃতি লইয়া এখন জীবন্তভাবে তোমার অবস্থান আগে বুঝি নাই। এখন কেবল মনে হইতেছে সহস্রধারা'র সেই কুলুকুলুধ্বনি বেষ্টিত প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া সুন্দর তুমি তোমায় দেখি আর প্রণাম করি আর প্রার্থনা করি আর কথা কই। এ কিন্তু নিত্যক্রিয়ায় স্থিরত্ব আনিতে চেষ্টা না করিলে ঠিক ঠিক ধরা যাইত না।

তাই বলিতেছিলাম কত সুখ মানুষের যখন তুমি তারে সুখ দাও। আর তুমি না দিলে মানুষ সুখের মুখ দেখিতে পায় না বরং দুঃখকে সুখ বলিয়া ক্ষণিক ভ্রম করে। শেষে আপনার ভ্রম আপনি বুঝিয়া দুঃখের উপর দুঃখ করে।

যতটুকু পারা যায় এইটুকু দেখাইতেই এই আয়োজন।

সহস্রদল কমল কখন দেখি নাই। শয্যাকৃত্যে ইহা কল্পনা করিতাম। আর সাধু সজ্জনের মুখেও শুনি নিদ্রাভঙ্গের পর একাধারে পদ্মাসনে বসিয়া সহস্রার চিন্তা করিলে—সহস্রারে তোমায় ভাবিলে কমলের গন্ধে যেন প্রাণ ভরিয়া যায়। যাহা কল্পনায় করিতে হয় তাহা ঠিক ঠিক করিবার জন্য বাহিরে আধিভৌতিকে যদি তাহা দেখা যায় তবে যেন আধ্যাত্মিক ভাবটি জীবন্ত হয়, জাগ্রত হয়। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীবৃন্দাবনে আধিভৌতিকে রাসলীলা না করিতেন তবে বুঝি সাধক নিজের হৃদয়ে রাসলীলা কখন জীবন্তভাবে দেখিতে পাইত না।

বলিতেছিলাম এই যে পর্ব্বতের অতি উচ্চ স্থান হইতে সহস্রধারায় বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছে কত কাল হইতে হইতেছে আরও কত কাল ধরিয়া হইবে তাহা

কে বলিবে? এই যে সহস্রধারায় বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ এ যেন একটি সহস্রদল কমল আপন নালে পর্ব্বতাকারে নিম্নমুখী হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছে। যেন কমলের ভিতরে কত সুধা পোরা আছে আর নিরন্তর তাহাই ক্ষরিত হইতেছে।

এইমাত্র সহস্রধারা হইতে আমরা নীচে নামিয়াছি। নীচে পার্ব্বতীয় নদী। নদীতে একহাঁটু জল। জলস্রোত অবিরাম কুলকুল নাদে ছুটিয়াছে। নদীর বিস্তার পাঁচ ছয়-হাত। ছোট বড় নানাবিধ প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া নদী অতি বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। লোকে ইহাকেই সহস্রধারার নদী বলে। ঝঙ্কারকারী নদী-প্রবাহের মধ্যে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর। আমাদের সঙ্গের আরও কেহ কেহ বড় প্রস্তর খণ্ডে বসিয়া জলধারার ভিতরে পা ছড়াইয়া বসিয়াছেন এবং জলের সহিত খেলা করিতেছেন আর বলিতেছেন জল নয় যেন দুগ্ধ। অদূরে পর্ব্বত গাত্র হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ অতি ক্ষুদ্র জলধারা বাহির হইতেছে। লোকে বলে সেই জলে রোপ্য ধরিলে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। আমাদের মধ্যে একজন একটি টাকা জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিলেন কিন্তু টাকার কিছুই হইল না। সঙ্গীদিগের আরও কেহ নদীর জলে এধারে ওধারে খেলা করিতেছে। আমি একাকী সেই প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন করিয়া উপরের অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখিতেছি।

পর্ব্বত লতা পাতার অঙ্গরক্ষা পরিয়া বড় সরলভাবে আকাশের সঙ্গে যেন মিশিতে যাইতেছে। সেখানকার পর্ব্বতটি এক অতি উচ্চমন্দিরের মত। আমি সেই শ্যামগিরির পানে চাহিয়া আছি। সঙ্গীদিগের মধ্যে আর একজন ভাবুক আমার অনতি দূরে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আড়াই দিন মাত্র এই সহরে আসিয়াছি। সেই রমণীয় দর্শনের সৌন্দর্য্য দেখিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। নিত্যকর্ম্মে রূপ আনিতে চেষ্টাও করিতেছি। কিন্তু এই নূতন স্থানে কর্ম্ম ঠিক মত গুছাইয়া এখনও ঠিক করিতে পারিতেছি না বলিয়া প্রাণ জাগান রূপ যেন আসিতেছে না।

প্রকৃতির এক প্রকার নীরব ভাষা আছে। নীরব ভাষায় প্রকৃতি সর্ব্বদা কথা কয়। প্রাণ জাগান নীরব ভাষা তখনও সজীব ভাবে ভাসে নাই। যখন ভাসে তখন আকাশ কথা কয়, বৃক্ষ কথা কয়, পর্ব্বত কথা কয়, পক্ষী কাকলী করিয়া ঠিক যেন ইঙ্গিত করিয়া যায়।

সে জাগাভাব এখনও আইসে নাই। তাই চিত্ত যেন সুস্থ হইতে পারি-

তেছে না। চিত্ত সকলই দেখিতেছে কিন্তু যেমন করিয়া দেখিলে প্রাণ ভরিয়া যায় তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেছে না।

যখন জাগারূপ আসে না তখন আসে প্রার্থনা। আমি শ্যামগিরি দেখিয়া দেখিয়া কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছি। বলিতেছি এত সুন্দর তুমি আমি কেন তোমায় দেখার মত করিয়া সুন্দর দেখিতে পাই না? দেখার মত রূপ না দেখিতে পাই কিন্তু শুনি তুমি ত সর্ব্বত্র। আকাশ বায়ু বৃক্ষ লতা জলস্থল এ সব যেমন তোমার দেহ, পর্ব্বতও তোমার বিশাল দেহ। এই বিশাল দেহ ধরিয়া তুমিই ত দাঁড়াইয়া আছ! পর্ব্বত তোমায় ধরিয়া জীবন্ত। কোথায় তুমি নাই? চেতনের অভাব কোথায়? অধিষ্ঠান চৈতন্যকে লইয়াই ত এই ব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে।

পর্ব্বত দেহ যার সে কি প্রার্থনা করিলে কিছু শোনে না? পর্ব্বত ত পৃথিবীর বিশাল বস্তু। পর্ব্বতকে কিছু প্রার্থনা করিলে পর্ব্বত কি প্রার্থনা পূর্ণ করে না? কে বলে শোনে না? কে বলে পূর্ণ করে না?

প্রকৃতির সকল বস্তুকে তুমি ভাল বাস দেখিবে সকলের মধ্যে যে বাস করে সকল রূপে রূপ মিশাইয়া যে আছে সে সব হইয়া নানা ভাবে তোমাকে ভাল বাসিতেছে। এই সূর্য্যকিরণ, এই জলরাশি, এই বায়ু, এই মেঘ, এই আকাশ, এই বৃক্ষলতা, এই পর্ব্বত, এই পার্ব্বতীয় পক্ষী, এই বনফুল সবাই তোমায় ভালবাসে তুমি যে সকলকে ভালবাস তারা কি তোমায় না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে? তাদের ভালবাসাই যে তাদের সৌন্দর্য্য, ভালবাসাই যে তাদের মাধুর্য্য। তুমি যে ভালবাসাই। ভালবাসা তুমি—ভালবাসাময় তুমি—তোমায় কেহ ভালবাসিলে সে ভালবাসা কি বৃথা হইতে পারে?

মানুষ বৃথা মনে করে আমার কেহ নাই, আমায় কেহ ভালবাসে না। তুমি প্রকৃতিকে ভালবাস দেখিবে প্রকৃতি "ফলে ফুলে তৃণ পল্লব দলে" গা ঢাকা দিয়া—সকলের মধ্যে থাকিয়া তোমায় ভালবাসিতেছে। আমি ভাল নাই, আমার শরীর ভাল নয়, আমি মনে সুখ পাই না এই সব বুলি ছাড়িয়া এই পর্ব্বত, ফুল, পাখী, আকাশ, সকলকে ভালবাসিয়া তাহাদের কাছে আনন্দ চাও, এই আকাশ তারা চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ লতা ফুল বায়ু সবাই মিলিয়া তোমার মনকে ভাল করিয়া দিবে, সবাই মিলিয়া তোমায় বল দিবে, আনন্দ দিবে। করিয়া দেখ, বুঝিবে আনন্দ পাও কি না, সুখী হও কি না, সুস্থ হও কি না? কে বলে পর্ব্বত আমাদের প্রার্থনা শোনেন না?

আমি পর্ব্বতের কাছে প্রার্থনা করিলাম পর্ব্বত আমায় সেই সুন্দরকে দেখাও। তোমার মত সবল দেহে আমি একবার তারে দেখি। পরক্ষণেই মনে হইল আমি ত মূর্খ আমি ত প্রার্থনা করিতেও জানি না।

কি চাহিতে কি বুঝি চাহিয়া ফেলিলাম। অমনি কাতর হইয়া প্রার্থনা করিলাম—আমার কি চাই কি না চাই, সে বোধ ত আমার নাই—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

আমি প্রার্থনা করিতেছি প্রসন্ন হও, আর চাহিয়া আছি পর্ব্বতের পানে। মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। মনের জড়তা কাটিয়া গেল। কি যেন কি আমার সম্মুখে পর্ব্বত আকারে দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। তখন আকাশে দেখিয়াছিলাম। পর দিন প্রাতঃসন্ধ্যায় বিশেষ ভাবে দেখিলাম। দেখিলাম কত সুন্দর সে। কত আনন্দ সে দেয়।

কথা বড় সত্য। ভালবাসার চক্ষে যাহাকে দেখিবে সেই তোমায় ভালবাসা দিয়া যাইবে। আমাদের দুঃখটা—আমাদের নিজের প্রস্তুত করা জিনিষ। আর ইচ্ছা করিলে—তীব্র ইচ্ছা করিলে আমরা এটা দূর করিয়া আনন্দে ভরিয়া থাকিতে পারি।

সত্যই অ-ভালবাসার চিন্তা, কু-চিন্তা আমাদের রক্তকে দূষিত করে, আমাদের শরীরে বায়ুকে কুপিত করে, তাহা হইতে বিষ জন্মে, তাহাতেই রোগ হয়।

আর ভালবাসার চক্ষে সকলকে দেখিলে আমাদের রক্ত পবিত্র হয়, আমাদের শরীরস্থ বায়ু পবিত্রভাবে দেহের মধ্যে বিচরণ করে, তাহাতে আমাদের শরীরের রোগ সারিয়া যায়, আমাদের মন ভালবাসায় ভরিয়া আমাদিগকে বড় পবিত্র করে, বড় মধুর করে। ইহা যে দেখিয়াছে সেই দেখিয়াছে।

জীবন্ত পর্ব্বতের কাছে প্রার্থনা করিয়া আমি কি জানি—কি জাগা জিনিষ লইয়া যেন জাগিলাম। সেই সময়ে উন্মত্ত আকাশে মেঘমালার ঘর্ঘর গর্জ্জন শোনা গেল, আর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। আর সঙ্গের বালক বলিল সঙ্গে ফল সন্দেশ কিছু আনিয়াছি বলেন ত ইহাদের ব্যবহার হয়।

আমি অমত করিলাম না। সকলে আনন্দে সেবা করিতে লাগিল। আমার জন্য রেকাবে করিয়া কিছু আসিল। আমার নিকটে যিনি ছিলেন আমি তাঁহাকে বড় শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানি। প্রথমেই তাঁহাকে ফল মিষ্টান্নভাগ দিলাম। তিনি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন মনে হয় নাই এখন মনে হইতেছে যদি

তাঁহাকে তাই ভাবিয়া দিতে পারিতাম তবেত বড় ভাল হইত। সেটা কিন্তু ভুল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা নিবেদন করিলাম। কি সুন্দর দেখিলাম। এই পর্ব্বত যেন আমার কে। আর কে যেন শাস্ত্রবিপর্য্যয়ে নিবেদিত বস্তুও গ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রবিপর্য্যয়ে বলিতেছি এই জন্য যে কোন বস্তুর অগ্রভাগ অগ্রে কাহাকে দিতে হয় না। ঠিক বিধিমত হইল না তথাপি কি দেখিলাম। এমন অপূর্ব্ব পূর্ব্বে কখন লক্ষ্য করি নাই। পূর্ব্বে যখন প্রার্থনা করি তখন মনে হইল পর্ব্বতকে একটু গীতা শুনাই। ছোট একখানি গীতা সঙ্গে ছিল তাহা হইতে ভক্তি যোগের অধ্যায়টি শুনাইলাম। তাহার পরে আহার্য্য নিবেদন। মনে হইল সে যেন সুন্দর হাসি হাসিয়া সমস্তই শুনিল, সমস্তই গ্রহণ করিল। ইহা কিন্তু কল্পনা নহে। কল্পনা হইলে এত আত্মতৃপ্তি হইত না। এই আত্মতৃপ্তিই কিন্তু তাঁহার প্রসন্নতার অনুভব। এ প্রসন্নতায় এখনও হৃদয় ভরিয়া আছে। প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাদির পর এই ভাব এত জীবন্ত হইয়াছে যে বাসায় এখন যাহা দেখিতেছি তাহাই যেন আনন্দে ভরা। বৃক্ষ লতা আকাশ পাখী কি যেন কি অব্যক্ত ভাষায় আনন্দের কথা কহিতেছে। এই ভাব জয়যুক্ত হউক এই প্রার্থনা।

"মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।"

কত দিন ধরিয়া ত নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছ, ভাবাস্বাদনও করিতেছ, নিত্য ক্রিয়াও করিতেছ, স্বাধ্যায়ও করিতেছ, শাস্ত্র আজ্ঞামত জীবন যাপনে কতই ক্লেশ করিতেছ, ব্রত উপবাসাদিও বাদ দিতেছে না, তীর্থাদি পর্য্যটনও করিতেছ কিন্তু বলিতে পার মন এখনও অসম্বন্ধপ্রলাপ বকা ছাড়িলে না কেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে মন কোন্ পথে যায় দেখিতেছ না?

কেন এমন হয়?

কারণ আছে। তুমি যদি বল ভগবানের কৃপা ভিন্ন ইহা যাইবে না আমি উত্তরে বলিব,—যে নিজে প্রাণপণ করে না সে কখনও শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব

করিতে পারে না। তুমি বলিতে পার—নিজেকেই যদি প্রাণপণ করিতে হয় তবে আবার ভগবানের কৃপাভিক্ষা কেন?

নিজের পুরুষার্থ প্রয়োগের সঙ্গে শ্রীভগবানের কৃপা জড়িত। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "পৌরুষং নৃষু" মনুষ্যের মধ্যে পুরুষকার রূপে আমিই আছি। যে প্রযত্ন দ্বারা ভগবৎ পথে যাওয়া যায় তাহাই পুরুষকার।

বলিতেছি যে এত পুরুষকার ও কৃপা ভিক্ষা করিয়াও ত মনের অসম্বদ্ধ প্রলাপ গেল না!

কেন গেল না জান? মনকে গুরু বাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পূর্ব্বকালে সমাজে কার্য্য ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাই মন সর্ব্বদাই ব্যভিচারী। পূর্ব্বে যে দশবিধ সংস্কারগুলি করা হইত তদ্দ্বারা প্রথম হইতেই যাহাতে মনের মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কার বৃদ্ধিপায় তাহারই চেষ্টা করা হইত। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্র মত যদি সংস্কার গুলি সম্পন্ন করা হয় তবে মানুষকে লয় বিক্ষেপের জন্য এত বেগ পাইতে হয় না।

ব্রাহ্মণ-সন্তানের এখন যে সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্ম্মে রুচি দেখা যায়না ইহার অর্থ ইহাদের সংস্কার হয় নাই। তার পরে আবার যাহারা যথা ইচ্ছা বিবাহাদি করে তাহারা সর্ব্বদাই মনের জ্বালায় জ্বলে। মনে করা হউক ব্রাহ্মণের ছেলে মুচির মেয়ে বিবাহ করিল এখানে যে সন্তান হইবে তাহার সংস্কার কি হইবে? ব্রাহ্মণ ও মুচি উভয় সংস্কার একত্র হইলে কেমন হয়? শাস্ত্র বলিতেছেন ইহা হইতে শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। শাস্ত্র সর্ব্বত্র শঙ্কর জাতিকে ভয় করিতেছেন! কারণ ইহারা শারীরিক বল, বা বিষয় বুদ্ধিতে পারদর্শী হইলেও ইহারা মনকে বিষয়তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইহাদের হৃদয়ও থাকে কিন্তু ইহারা ঘোর সংসারী হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, যে সন্তানের দশবিধ সংস্কার কার্য্য করা হয় সে সন্তান মন লইয়া এত জ্বলে না। সন্তানকে স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক করার কৌশল—দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠান, তাই। দশবিধ সংস্কার যাহাতে ঠিক ঠিক চলে তাহার বিধান অগ্রে করা কর্ত্তব্য।

যাঁহাদের ভাগ্যে উহা হয় নাই অথচ যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মেই জীবন দিতেছেন তাঁহাদেরও হতাশ হইবার কারণ নাই। যদিও ইহাদিগকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইবে তথাপি ইহাদের সফল মনোরথ হইবার আশাও আছে।

মনকে শাস্ত্র বাক্যে, গুরুবাক্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নিরন্তর শাস্ত্র

চিন্তা লইয়া থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা শ্রীভগবানের রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে হইবে। সর্ব্বদা সৎসঙ্গ চাই। সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তন ও ভাব-আস্বাদন চাই। এই সকলের সুবিধা যাঁহার না হয় তাঁহার উচিত সর্ব্বদা কাতর প্রাণে শ্রীভগবানের নাম করা। ভগবান্! আমার কোন সংস্কার হয় নাই, ঠাকুর! আমি তাই দুরাত্মা হইয়া গিয়াছি—সকলই আমার ভাগ্য দোষে হইয়াছে। ইহাতে কাহারও দোষ নাই। দোষ আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের। এত অপরাধের বোঝা মাথায় লইয়াও আমি তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম। আমি সর্ব্বদা সকল সময়ে তোমার নাম জপ করিব। জপে পরিশ্রান্ত হইলে রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে তোমার লীলাগুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিব আর সর্ব্বদা নাম জপ করিব। সঙ্গে সঙ্গে আহারে ও আচারে দৃষ্টি রাখিব।

সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাখি, তাঁহার তৃপ্তির জন্যই ধূপ ধূনা দিয়া গৃহ সুগন্ধপূর্ণ করি, তিনি আসিয়াছেন, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন ভাবিয়াই আমি স্তব করি, তাঁহাকে শুনাইবার জন্যই আমি গীতা, চণ্ডী, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, উপনিষদাদি পাঠ করি—এই সমস্ত কার্য্যে নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। আর এই রূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে আমাদের পবিত্র অন্তঃকরণে তাঁহার উদয় হইবেই।"

পূজার জন্য এইরূপ মনোঽনুকুল পবিত্র স্থানে, কোমল ও পবিত্র আসনে প্রতিমা সম্মুখে পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করিবে।

ক—এইতো তুমি আবার গোল বাধাইলে। প্রতিমার সম্মুখে বসিবার আবশ্যকতা কি? আর বিশেষ করিয়া পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া বসিবই বা কেন?

জ্যো—ব্যস্ত হইও না। আমি সকলই বলিব। কারণ না দেখাইলে তুমি আমার কথা শুনিবে কেন? তবে প্রথমে বাহ্যিক আসনের কথা বলিয়াছি, এখন শারীর আসনের কথা শুনিয়া লও।

ক—বল।

জ্যো—দেহটা যে জীব নয়, দেহটা যে দেহীর আসন মাত্র এ কথা বোধ হয় তোমাকে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না?

ক—না; কেন না মাতৃগর্ভে দেহ নির্ম্মাণ হওয়ার পর যখন জীব সঞ্চার হয় ও মানুষ মরিয়া গেলে যখন দেহটা পড়িয়া থাকে তখন দেহটা যে দেহীর আসন এ কথা বুঝাইবার দরকার নাই।

জ্যো—এখন বাহ্যিক আসনের মত এই দেহাসনটিকেও স্থির ও সুখময় করিয়া লইতে হইবে—নতুবা তোমার আসন করিয়া বসাটা সম্পূর্ণ হইবে না। কেমন, ইহা ত যুক্তি সিদ্ধ?

ক—হাঁ, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

জ্যো—এখন দেখা যাক্, দেহটাকে স্থির করা যায় কিরূপে। শাস্ত্র বলেন—

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়ানি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বানি ভয়াবহানি॥

অর্থাৎ বিদ্বানব্যক্তি শরীর সম অর্থাৎ অবক্র (সরল) ও বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক উন্নত রাখিয়া, মন দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্রহ্ম-ভাবনারূপ ভেলা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভয়াবহ প্রবাহ অতিক্রম করিবেন।

ক—কথাটা ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

জ্যো—একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি শুন। দেহের সঙ্গে মনের বড় নিকট সম্বন্ধ। তাই মন "উশি পিশি" করিলেই সঙ্গে সঙ্গে দেহও চঞ্চল হইয়া উঠে। সেই জন্য দেহ স্থির করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির করিবার ব্যবস্থাও করিতে হয়। এখন বল দেখি, কোন্ কারণে মানুষ চঞ্চল হয়?

ক—ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্যে।

জ্যো—এই ইন্দ্রিয় কয়টি?

ক—দশটি—পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।

জ্যে—যদি এই দশটি ইন্দ্রিয় দ্বার নিবৃত্তি মনের সাহায্যে কোনও উপায়ে (সুকৌশলে) নিরুদ্ধ করা যায় তবে কি মানুষের দেহ আর সহজে চঞ্চল হইতে পারে?

ক—না।

জ্যে—এখন দেখা যাক্, কি করিলে, এই ইন্দ্রিয় পথগুলি, অন্ততঃ অশুভ ভাব আমদানীর বিরুদ্ধে, বন্ধ হয়। এতদর্থে তোমাকে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি।

(১) কর্ম্মেন্দ্রিয় নিরোধের উপায়।

ইন্দ্রিয়।	নিরোধের উপায়।
(ক) বাক্ :—	(ক) মৌনীভাব, সত্য কথন, সদালাপ।
(খ) পাণি :—	(খ) কৃতাঞ্জলি ভাব, শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য জীব, নারায়ণের সেবার জন্য কর্ম্ম করা, শ্রীবিগ্রহের পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, হস্ত দ্বারা হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া ও অপরিগ্রহ অভ্যাস।
(গ) পাদ :—	(গ) সিদ্ধাসনাদি আসন অভ্যাস, শ্রীবিগ্রহ বা মন্দির প্রদক্ষিণ, বৃথা ভ্রমণ ত্যাগ।
(ঘ,ঙ) পায়ু ও উপস্থ :—	(ঘ,ঙ) সর্ব্বদা কৌপিন (লেঙট্) ব্যবহার ও গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য যাহা তাহার অনুষ্ঠান।

(২) জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরোধের উপায়।

(ক) চক্ষু :—	(ক) চক্ষু মুদ্রিত করা অথবা নাসাগ্রে, ভ্রূ-মধ্যে বা প্রতিমাতে দৃষ্টি স্থির রাখা।
(খ) কর্ণ :—	(খ) স্ব মুখোচ্চারিত মন্ত্র, স্তব বা শাস্ত্র পাঠাদিজাত শব্দ দ্বারা কর্ণদ্বয়কে অন্য শব্দ হইতে পৃথক রাখা, কিম্বা ভগবৎ গুণানুবাদ শ্রবণ করা।

(গ) নাসিকা :— (গ) ধূপ-ধূনা-পুষ্প-চন্দনের সুরভিদ্বারা তাহাদিগকে প্রফুল্ল রাখা।

(ঘ) জিহ্বা :— (ঘ) বিশুদ্ধভাবে উপাংশু জপ, মন্ত্রোচ্চারণ, স্তব পাঠ, মধ্যে মধ্যে (অধিক পাঠাদি দ্বারা) জিহ্বার শুষ্কতা অনুভূত হইলে কর্পূরবাসিত পবিত্র জলে আচমনাদি দ্বারা তাহার আপ্যায়ন সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাকে বিদ্রোহী হইতে না দেওয়া, বৃথা বাক্য পরিত্যাগ ও শাস্ত্র বিহিত শুভ আহার গ্রহণ।

(ঙ) ত্বক্ :— (ঙ) গ ও ঘ বর্ণিত উপায় দ্বারা ত্বক্ পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা সংযত হইয়া পড়ে। তাহার পরে যাহা থাকে তাহা ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যাদি যোগে রোমাঞ্চ উৎপাদন দ্বারা নিরস্ত হইয়া থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব সহনের অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যক।

দেহ পিঞ্জরের দশটী দ্বার যখন এইরূপ দশটী নিরোধ শলায় রুদ্ধ হইয়া যায় তখন প্রবৃত্তি মনোরূপী শুকপাখিটি একেবারে আট্‌কা পড়িয়া যায়—তখন আর তাহার ফুড়ুক ফাড়ুক করিয়া লাফালাফি করার কোন উপায়ই থাকে না। বেচারি তখন আলস্য ও আরাম প্রিয়তারূপ দৃঢ় চঞ্চুপুটাঘাতে এই সব নিরোধ শলাকা ভাঙ্গিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতে থাকে। কিন্তু সাধক না-ছোড়-বান্দা। যে পাখীর জন্য তিনি শত লাঞ্ছনা সহিয়া ছাতুর যোগাড় করিতেছেন তাহাকে "রাধাকৃষ্ণ" বুলি না ধরাইয়া কি তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন? তাই প্রবৃত্তি-মন যতই আলস্য ও আরামপ্রিয়তার আঘাতে খাঁচার দরজার কাটী ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে সাধক ততই সেই কাটীগুলি (নিরোধের উপায়গুলি) দৃঢ় হইতে দৃঢ়তম করিতে থাকেন। হতভাগ্য চিরচঞ্চল প্রবৃত্তি-মন তখন গত্যন্তর অভাবে বেশ শান্তভাবে "রাধাকৃষ্ণ" বলিতে থাকে। সাধকের পাখীপোষা বা মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। বুঝিলে?

ক। দেহাসন স্থির রাখার উপায় বুঝিলাম। এখন প্রতিমার উপযোগীতা কি বল।

জ্যে। প্রতিমার উপযোগীতা সম্বন্ধে বলিবার বিস্তর আছে। কিন্তু সে সকল কথা ধৈর্য্য ধরিয়া তো তুমি শুনিতে পারিবে না। তাই তোমাকে সামান্য দু'একটী কথা বলিতেছি। তুমি 'হিপ নটিজ ম দেখিয়াছ ?

ক। দেখিয়াছি।

জ্যে। "হিপ্‌নটিজ ম্‌" ব্যাপারে কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করা হয় ?

ক। প্রথমে কাহারও দেহ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে স্বাধীন উত্তেজনা ও উদ্বেগ শূন্য করিয়া শান্ত অবস্থায় আনা হয়। পরে সেই দেহকে পুনঃ ইচ্ছাশক্তি সাহার্য্যে যেমন ইচ্ছা চালান হয় অথবা কোন আত্মিক জীবকে সেই শান্ত দেহ মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়া তদ্বারা নানা অদ্ভুত তর্থ্যের আবিষ্কার করা হয়।

জ্যে। এখন দেবতা শব্দের অর্থ বুঝ। "দেবো দ্যোতনাৎ" যিনি বা যাঁহারা বিশ্ব বা বিশ্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশ করেন তিনি বা তাঁহারা দেবতা। বিশ্বের প্রকাশ বা বিশ্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশ এক ভাবে হয় না। তাই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। কিন্তু মনে রাখিও পরম দেবতা যিনি, তিনি এই ভিন্ন ভিন্ন দেবভাবেরই সমষ্টি। ইন্ধনাদি আধার ভিন্ন অগ্নির সত্ত্বা যেমন ধারণার বিষয় হইতে পারে না, প্রতিমা ব্যতিরিক্ত দেবভাবও তেমনি ধারণার বিষয় হইতে পারে না, দেহ ব্যতিরিক্ত জীবভাব যেমন ধারণার বিষয় হইতে পারে না, প্রতিমা ব্যতিরিক্ত দেব ভাবও তেমনি ধারণার বিষয় হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে বিশ্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশক দেবভাবটী ধারণার ভিতর আনিতে গেলেই প্রতিমার প্রয়োজন—এ প্রতিমা মৃণ্ময়ীও হইতে পারে চিন্ময়ীও হইতে পারে। তবে কথা হইতে পারে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় দেবতার আবির্ভাব কি সম্ভব ? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে স্বাধীন উত্তেজনা শূন্য শান্ত মনুষ্যদেহে সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মিক জীবের আগমন যদি সম্ভব হয়, তবে ধ্যান—বলে স্বাধীন উত্তেজনা বর্জ্জিত শান্ত মৃণ্ময়ীমূর্ত্তিতে তৈজসদেহী দেবতার আবির্ভাব অসম্ভব হইবে কেন ?

তার পর কথা, জগতের প্রতি বস্তুতেই, প্রতি বিকাশেই এই দেবসত্ত্বা বিরাজিত। কিন্তু তাই বলিয়া, সাধনার প্রথমাবস্থায় সেই সমস্ত বস্তুতেই, ভগবৎসত্ত্বার

ক্রমশঃ।

সাধারণভাবে সতীধর্ম্ম ও সাধনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাস্ত্র মত সাধন করিলাম না, শুধু আচার, আচার, শুচি শুচি করিলে, শুচিবাই আসিয়া যাইবেই। অথচ ইহারা আবার ভারি ধর্ম্মশীলা বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। খুব কঠোর অনুষ্ঠানও করেন। আমি জানি স্বামী যাহাই হউন না কেন, স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিয়া স্ত্রীর কোন ধর্ম্মই হইতে পারে না। স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করিলেই ব্যভিচারিণী হইতে হয়। আর যাহারা স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে তাহারা ত স্ত্রী-নামের অযোগ্যা। তাহারা কুক্কুরী বা শূকরী। আমি সময়ে সময়ে তোমার কথার উপর কথা কই বটে। কিন্তু ইহাও জানি যে তাহা আমার উচিত নহে। হঠাৎ হইয়া যায়, তার জন্য কত অনুতাপও ত করি। সতী হইতেই ত আমার সাধ। কিন্তু তুমি বলিতেছ আমি সতী নই। আমার সবই তবে মৌখিক ? আমি প্রতারণার মূর্ত্তি ?

স্বামী—কাঁদিওনা। কাঁদিলে কি পাইবে বল ? সতী নও—কেন নও জান ? যাহার যত বিষয়-বাসনা প্রবল, সে তত ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী হইবেই। পূর্ব্বে কামের তিন প্রকার রূপের কথা বলিয়াছি। মানুষের মন যতদিন বিষয় চিন্তা ছাড়িতে না পারে, ততদিন যেমন মানুষ ব্যভিচারী থাকে—আবার বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিলেই শুধু হইল না—যতদিন না মানুষের মন সেই পরম রমণীয়দর্শন আত্ম-দেবের চিন্তায় রূপ রসাদি বিষয়, দেহ, সংসার, জগৎপ্রপঞ্চ সমস্ত ভুলিয়া যাইতে পারে, ততদিন যেমন মানুষ পাপ করে, ব্যভিচার করে—সেইরূপ স্ত্রীলোক যত দিন না অন্য সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া—অন্য সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া, শুধু স্বামী ভাবনা লইয়া থাকিতে পারে ততদিন সে ব্যভিচারিণী। স্ত্রীলোক স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও পানে চাহিতে পারিবে না—অথবা স্বামী ভিন্ন তাহার চক্ষে আর কিছুই ভাসিবে না—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" এ যতদিন না হইবে, ততদিন ব্যভিচার যাইবে না—ততদিন সতী হওয়া যাইবে না।

স্ত্রী—দেখ তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতেছি আমি অহঙ্কার করিতাম আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমা ভিন্ন কিছুই জানি না; কিন্তু

এগুলি কথার কথা মাত্র। কেন জান—সংসারে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশিয়া—তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া তোমার চরণ মস্তকে ধরিয়া—"মৌলিস্থ-কুম্ভপরিরক্ষণধীন গীব" নটীরা মাথায় ঘড়া রাখিয়া যেমন নাচে—হাতে পায়ে মুখে কত রকম ভঙ্গি দেখায়—তোমার চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়া আমি হাতে পায়ে মুখে ব্যবহারিক কার্য্য করিতে পারি কৈ? বৃক্ষ যেমন বাতাস আসিলে নড়ে, আবার বায়ু না বহিলে, যেমন স্থির, তেমন স্থিরই থাকে, "বৃক্ষ ইব স্তব্ধ" আমি ত তাহা হইতে পারি নাই। নটীর মত মাথায় ঘড়া রাখিয়া ব্যবহারিক কার্য্যও করিতে পারি না—লোকের সহিত ব্যবহারে কতবার তোমায় ভুল হইয়া যায়—তোমায় ভুলিলেই রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তিনী হইয়া যাই, তোমায় ভুলিলেই কখনই সুন্দর কিছু দেখিয়া অনুরাগিণী হইয়া পড়ি আবার কুৎসিত কিছু দেখিয়া নাকমুখ সিট্‌কাই, এসব যখন হয় তখন আমি তোমার ভাবে বিভোর ত থাকিতে পারি না। আবার যখন ব্যবহারিক কার্য্য ছাড়িয়া নির্জ্জনে তোমার ধ্যান করিতে বসি, তখনও ত আমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে পারি না। তোমার চরণারবিন্দ মনে মনে স্পর্শ করিতে যখন চেষ্টা করি, তখনও ত মন আরও কত কি ভাবিয়া ফেলে, আমি ত সে সময়েও তোমায় ভাবিয়া মগ্ন হইয়া যাইতে পারি না। থাক্ না কেন সংসারের কোলাহল, থাক্ না কেন মানুষের হাহাকার, থাক্ না কেন রোগের শত যাতনা—এ সব থাকিতেও ত মানুষ ঘুমাইয়া পড়িতে পারে—আমি সেইরূপ স্থিরসুখাসনে বসিয়া, তোমার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া, ঘুমাইয়া পড়িতে ত পারি না—কত চেষ্টা করি—কি জানি অনাদিসঞ্চিত কত কর্ম্মবাসনা আমার মধ্যে আছে—তোমায় ভাবিতে গেলে, স্থির জলাশয়ে বদ্‌বুদ উঠার মত চিন্তা ত আমার মনে উঠে—আবার কখন বা তন্দ্রা আসিয়া আমায় অচেতন করিয়া ফেলে—জাগিয়া ঘুমান ত ইহা নহে। ইহা ত জড়ের মত ঘুম, ইহা ত অজ্ঞান নিদ্রা। কিন্তু সে নিদ্রায় সচেতন থাকিয়া—জগৎপ্রপঞ্চ চিন্তা আর থাকে না, দেহচিন্তা থাকে না, সংসারচিন্তা থাকে না—এক আনন্দপ্রবাহের অত্যন্ত সুখস্পর্শে আনন্দনিদ্রায় জগৎ ভুলিয়া, দেহ ভুলিয়া, ঘুমাইয়া পড়া যায়, তাহা ত আমার হয় না—তুমি কতবার ইহা বলিয়াছ তথাপি ত আমি ইহা পারি না—হায়! তবে কি আমার সতী হওয়া হইবে না? তবে কি আমার ব্যভিচার ছুটিবে না? তবে কি আমি তোমায় হারাইব? তবে কি মৃত্যুর পরে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে? তবে কি আমি আবার অন্যের হইব—অহো! এই কি আমার ভাগ্যে আছে? সতী

স্ত্রী যে চিরদিনই এক স্বামীই প্রাপ্ত হন। সতী চিরদিনই মহাদেবের। সীতা চিরদিনই রামের। রুক্মিণী চিরদিনই কৃষ্ণের। অরুন্ধতী চিরদিনই ভগবান্ বশিষ্ঠের, অনসূয়া অত্রির, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের; মৈত্রী, কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্কের। মরিলে যদি আবার অন্য লোক স্বামী হয়, তবে ত আমি ব্যভিচারিণী, আমি বেশ্যা! তবে ত এই ভালবাসা—শুধু কপটতা মাত্র—এটা মৌখিক।

এই জীবনে কটা দিন? শুধু এই জীবনে তোমায় পাইব—এই আমার ভালবাসা? শুধু এজীবনে আমি তোমার থাকিব এই কি আমি চাই? ইহাই কি প্রেম? আমি যে ভালবাসা অর্থে অন্য কিছু বুঝি। তুমি বুঝাইয়াছ বলিয়া বুঝি ভক্ত যেমন বলেন—আমি যেখানে যাই, যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক না কেন —"স্বকর্ম্মফল নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং"—আপন কর্ম্মফলে যেখানে কেন না জন্মাই, হে হৃষীকেশ! যেন আমার "ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু"—যেন তোমাতে আমার দৃঢ়া ভক্তি থাকে—আমিও যে তাই বলি—যে অবস্থায় আমি কেন না পড়ি, আমি যেন আর কাহারও না হই—যদিই মরিতে হয়, যদিই অন্য দেহ ধরিতে হয়, তবে যেন আবার তোমাকেই পাই—আমি যে, ভালবাসার অর্থ ইহাই বুঝিয়াছি, আমি যে অনন্তকালের জন্য তোমাকে পাইতে চাই। হায়! আমার ব্যভিচার গেল না, আমি সতী হইতে পারিলাম না, কেমন করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া তোমায় পাইব? এখনও ঘুমের সময় যদি তোমাকে ভুলিয়া থাকি—তবে সে মহানিদ্রার সময় কেমন করিয়া তোমায় মনে রাখিব? আবার মৃত্যুসময়ে যখন আমার নিজের বলা কিছুই থাকিবে না—সেই সময়ে তোমার চিন্তা না আসিয়া যদি অন্য চিন্তা আসিয়া যায়, তবে ত "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" যে যে ভাবনা মনে করিয়া দেহ ত্যাগ করে তাহার সেই সেই যোনিতে জন্ম হয়। গঙ্গাতীরে গুরু সমীপে "ইয়ং গঙ্গা অহং ম্রিয়ে" বলিয়াও যে তাহার মধ্যে "শেতখানায় গিয়াছি" মনে উঠিবা মাত্র একজন পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হায়! তবে কি বৃথাই জীবন ধারণ করিতেছি? নাথ! আমি নিতান্ত তোমার আশ্রিত, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না—আমায় যাহা বলিবে তাহাই করিতে প্রাণান্ত করিব কিন্তু আমি যে স্ত্রীলোক—আমি যে জ্ঞানহীনা—আমার যে নিজ সামর্থ্যে কিছু হয় না, তুমি আমার ব্যভিচার না ছাড়াইলে আমার যে আর গতি নাই, তুমি আমায় পরিত্রাণ কর।

স্বামী—উঠ! উঠ! চরণ ছাড়—এরূপ বিলাপে কোন ফল নাই। এস, প্রতিকার চেষ্টা করা যাউক। আমাকে তুমি নারায়ণবোধে ভক্তি কর সত্য—কিন্তু আমিও যেমন নারায়ণ হইতে পারি নাই। তুমিও সেইরূপ সতী হইতে পার নাই। তুমি যেমন বলিতেছ স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর গতি নাই, আবার সেইরূপ সহধর্ম্মিণী ভিন্ন স্বামী অর্দ্ধ মাত্র। এ অর্দ্ধেকে কিছুই হয় না। দেখ না ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—কে স্ত্রী ছাড়া আছেন? সনক সনাতনাদি চির ব্রহ্মচারী, তাঁহাদের কথা শুনা যায়, তাঁহারা ভাবনায় আপনার মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি হইয়া থাকেন। যেমন মানুষ মনকে বিষয়রসিক পুরুষ ভাবনা করে এবং বুদ্ধিকে শাস্ত্রোজ্জ্বলা করিয়া স্ত্রী ভাবনা করে, করিয়া উজ্জ্বলার পরামর্শে বিষয়-রসিক—কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া উভয়ে মিলিত হয়, মিলিত হইয়া শক্তি ও শক্তিমানের মত আনন্দস্বরূপে স্থিতি লাভ করে—সেইরূপ স্ত্রী বা সহধর্ম্মিণী ভিন্ন—বুদ্ধি ভিন্ন মনের বশীভূত জীবচৈতন্যের বা স্বামীর—স্বস্বরূপে অবস্থান কিছুতেই হইবে না। আমারও সাধনা বাকী আছে, তুমিও সহধর্ম্মিণী হইয়া আমার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ কর। হতাশ হইও না। সতী হওয়া ত মুখের কথা নয়। যেমন ভক্ত হইতে হইলে শক্তি থাকা চাই, সেইরূপ সতী হইতে হইলেও দৃঢ় ভাবনা চাই। তোমার হইবে। যাহা বলি তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর।

আগে আমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা শুন—তবে তুমি আমার কার্য্যের সহায়তা করিতে পারিবে—সহধর্ম্মিণী হইতে পারিবে।

স্ত্রী—এতদিন আমায় বলিলে কি আমি শুনিতাম না।

স্বামী—এই ত আবার ভালবাসার আবদার তুলিলে? অভিমানটা ভালবাসার আবদার মাত্র। তুমি যেটা বুঝিতেছ আমি কি আর ততটুকুও বুঝি নাই?

স্ত্রী—দেখ আমি আবদার ত্যাগ করিলাম। বাস্তবিক ইহা অজ্ঞান। আগে আমি চিরদিনের জন্য তোমার হইয়া যাই, তার পরে যদি আবদার আসে করিব। "আমি তোমার" না হইলে চিরতরে "তুমি আমার" হইবে না। এখনও আমি তোমার স্ত্রী হইতে পারি নাই। আমি তোমার শিষ্যা, তুমি গুরু। যখন ঠিক ঠিক তোমার ভক্ত হইব তখন ভক্তের অধীন হইয়া তুমি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে আমি তাহাই হইব। এখন বল তুমিই বা কোন কর্ম্ম করিবে—আর আমিই বা কি করিব?

স্বামী—আমার কর্ম্ম আগে শোন। আমি জীব চৈতন্য। জড় আমি নই, আমি চেতন। কিন্তু চেতন হইয়াও জড়ের সহিত, এই দেহের সহিত আমার বহু সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যেমন কোন পথিক পান্থশালায় আসিয়া সেই পান্থশালার রক্ষকদিগকে বিশ্বাস করিয়া বিপদে পড়ে, যেমন পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া পান্থশালার লোকদিগকে ভাল লোক ভাবিয়া তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেই শঠ প্রতারকদিগের হাতে পড়িয়া—তাহাদের শঠতা জানিয়াও তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না—সেইরূপ আমিও চেতন হইয়া কাম ক্রোধাদি রিপুসঙ্গে, আকাঙ্ক্ষাবাসনাদি দুষ্ট লোকের অধীনে আসিয়া পড়িয়াছি। জানিতেছি ইহারা আমার শত্রু, তথাপি আমাকে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। বাসনা, চিত্ত, অহংবোধ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ, দ্বেষ—এতগুলি শত্রুর হাতে পড়িয়াছি। জানিতেছি ইহারা আমার শত্রু—জানিতেছি কি করিলে উদ্ধার পাইব, তথাপি করিতে পারিতেছিনা। তুমিই আমার শক্তি। শক্তি ভিন্ন শিব যেমন শব মাত্র, বুদ্ধি ভিন্ন জীবচৈতন্য যেমন কিছুতেই স্বস্বরূপে যাইতে পারে না, সেইরূপ সহধর্ম্মিণী ভিন্ন আমিও কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিব না—তুমিও আমার সঙ্গে মিশিয়া চিরদিন আমায় পাইবে না। তাই বলিতেছি যেমন মন ও বুদ্ধি এক সঙ্গে মিশিয়া জীবচৈতন্যকে বিষয়চঞ্চল করিলে জীবচৈতন্য আপন স্বরূপে যাইতে পারেন না সেইরূপ স্ত্রী সহায় না হইলে—শক্তি সাহায্য না না করিলে স্বামী মুক্ত হইতে পারেন না। স্ত্রীর যেমন স্বামী আবশ্যক, স্বামীরও সেইরূপ স্ত্রী আবশ্যক।

স্ত্রী—আমাতেও তোমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে—আহা! ইহা শুনিয়া আমি কত আনন্দ পাইতেছি। পরিত্যক্তা সীতা যেমন যজ্ঞে সুবর্ণময়ী আপন প্রতিকৃতির আবশ্যক হইয়াছিল ভাবিয়া সমস্ত যাতনা ভুলিয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিতেছিলেন, সেইরূপ আমিও আমাকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিতেছি।

স্বামী—ভালই করিতেছ, কিন্তু শোন তোমার আমার উদ্ধার জন্য কোন কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মনে কর তুমি বিষয়রসিকা মনের অধীনা বুদ্ধি স্বরূপিণী অথবা তুমি মনস্থানীয়া আর আমি জীবস্থানীয়। মন কোনরূপ বাসনা তুলিবেনা—তবে জীবচৈতন্য আত্মমায়ার সহিত পরমাত্মচৈতন্যকে স্পর্শ করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

স্ত্রী—মন যে সর্ব্বদা চঞ্চল—সর্ব্বদা বাসনা তুলে। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়বশে কত কর্ম্ম করিতেছে—কতদিন ধরিয়া এইরূপ করিয়া আসিয়াছে, এই মন কিরূপে নিজের বাসনা ও নিজের কর্ম্ম ছাড়িবে ?

স্বামী—জীব, মনকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন—দেখ আমি যে চেতন, জড় নহি তাহা তুমি অগ্রে জান—জানিয়া নিশ্চয় কর দেহের মধ্যে চৈতন্য কোথায় ? ইহা শুনিলে এই নিশ্চয় হইবে যে আমি খণ্ড চৈতন্য মাত্র হইয়া পড়িয়াছি। আগে আত্মচৈতন্য অনুসন্ধান করিয়া সেই খণ্ড আত্মচৈতন্য যখন অখণ্ড পরমাত্মচৈতন্যকে নিরন্তর ভাবনা করিতে পারিবেন—মন যখন আর অন্য কোন ভাবনা করিবে না, অন্য কোন বাজে কথা তুলিবে না, শুধু স্থির হইয়া এই খণ্ড অখণ্ডের মিলন দেখিতে পারিবে তখনই তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে, আর আমি অখণ্ডে মিশিয়া তোমাকে শক্তিরূপে চিরতরে আপনার হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব।

স্ত্রী—আত্মচৈতন্য কোনটি ? ইনি খণ্ডই বা কিরূপে ? কিরূপেই বা অখণ্ডের সহিত মিশিবে ?

স্বামী—এখন ঠিক হইয়াছে। তুমি ঠিক প্রশ্ন করিয়াছ। এই প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া সাধনা করিতে পারিলেই নিত্য আনন্দে স্থিতি লাভ করা যায় এবং উপাসনা-তত্ত্ব যে কি তাহাও বুঝা যায়।

স্ত্রী—এখন বুঝাইয়া দাও। আমি তোমার সহিত সাধনা করিব।

স্বামী—আত্মচৈতন্য যাহাকে বলি সেটি দেহের মধ্যে। এটি অনুভব। অনুভবটি আত্মচৈতন্য বটে, কিন্তু অনুভবটিই আত্ম নহেন।

অগাধ জলে রত্ন পড়িয়া গেলে—যেখানে রত্ন থাকে সেইখানকার জলকে উহা প্রকাশ করে। "আমি আমার" রূপ মায়াসমুদ্রের অগাধ জলে জ্ঞানরত্ন ডুবিয়া-গিয়াছে। তথাপি মায়াসমুদ্রে ডুব দিলে রত্নের আভা দেখিয়া বুঝাযায় এইখানে রত্ন আছে। অনুভটি আত্মরত্নের আভা। আভা ধরিয়া আত্মরত্ন উদ্ধার করা যায়।

যেখানে অনুভব সেইখানে আত্মার অহং অভিমান আছে। অহংপূর্ব্বিকা এই অনুভূতি নাই।

আত্মা সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র ভাসেন না। অগ্নি কাষ্ঠের সর্ব্বত্র

আছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র অগ্নি ভাসেন না। যেখানে আত্মা অহং অভিমান করেন, সেইখানে অনুভব জাগে, সেইখানে আত্মচৈতন্য অনুভব রূপে প্রকাশিত হন।

এই অনুভব দেহের মধ্যে অনুভূত হয়। দেহের বাহিরে অনুভূত হয় না। দেহের মধ্যে থাকিয়া এই সম্মুখে গঙ্গা অনুভব করিতেছি—"ক্বচিৎ খেলতাং জহ্নুকন্যাপ্রসঙ্গে"; কিন্তু দেহাতিরিক্ত এই যে কমণ্ডলু ইহার মধ্য হইতে সে অনুভব একেবারেই হইতেছে না। এই জন্য বলিতেছি, আত্মচৈতন্যের কথা কই, তাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা খণ্ড। অপরিচ্ছন্ন অখণ্ড আত্মচৈতন্যের অনুভব আমার নাই। খণ্ড চৈতন্য বা পরিচ্ছন্ন চৈতন্যের অনুভব মাত্র আছে। বিচার দ্বারা বুঝিতে পারি আত্মা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অখণ্ড, কিন্তু এই অপরিচ্ছিন্ন আমিকে দেখিতে পাই না। যাহা দেখি, তিনি খণ্ড, তিনি পরিচ্ছিন্ন। খণ্ড অখণ্ডকে যখন ডাকে পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নকে যখন ডাকে, তখন উপাসনা হয়।

উপ সমীপে, আসন বসা। খণ্ড যখন অখণ্ডের সমীপে বসেন তখন হয় উপাসনা। রাম, কৃষ্ণ, হরি, দুর্গা, কালী, শিব, গণেশ সূর্য্য এই সকলগুলি সেই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার ঘন চৈতন্যের সাকারমূর্ত্তি। ইহারা নিরাকারের ঘনীভূত সাকারমূর্ত্তি। নিরাকার আকাশকে যেখানে ঘনীভূত কর সেইখানে সাকার মূর্ত্তি জাগিবে। আবার সাকার মূর্ত্তির যে অঙ্গে মনকে একাগ্র করিবে সেইখানেই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম সত্তা ভাসিবে।

তুমি হরি হরি জপ যখন করিতেছ তখন তোমার খণ্ড জীবচৈতন্য, অখণ্ড পরমাত্মচৈতন্যকে ডাকিতেছেন—খণ্ডত্ব পরিহার জন্য—সংসার মুক্তি জন্য! ব্রাহ্মণে যখন ডাকিতেছেন "আয়াহি বরদে দেবি" তখন খণ্ড আত্মচৈতন্য অখণ্ড পরমাত্মচৈতন্যকে সহস্রার হইতে কূটস্থে বা হৃদয়ে আসিতে বলিতেছেন—ইহাই উপাসনা। খণ্ডচৈতন্যকে অখণ্ড ভাবে ভাবনা করিয়া উপাসনা করাই গায়ত্রী উপাসনার সার কথা। ব্রাহ্মণগণ যে ভর্গের উপাসনা করেন সেই ভর্গ, জল, জ্যোতি, রস, অমৃত, ভূরাদি লোকত্রয়াত্মক, সকল চরাচরস্বরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্যাদি নানা দেবতাময়, পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি ভূরাদি সপ্তলোককে প্রদীপবৎ প্রকাশ করিয়া আমার জীবচৈন্যকে জ্যোতিরূপে সত্যাখ্য সপ্তম ব্রহ্ম-লোকে ব্রহ্মস্থানে লইয়া যান। লইয়া গিয়া জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্যের সহ একীভূত করেন—ইহা চিন্তা করিতে করিতে জপ করিতে হয় বা প্রণায়াম করিতে হয়—ইহাই উপাসনা।

সবিতার (সর্ব্বভাবপ্রসবিতার) ভর্গ যেখানে বলা হয় সেখানে সবিতার সহিত ভর্গের পার্থক্য আছে। তথাপি পরমার্থচিন্তা বা উপাসনায় সবিতার সহিত ভর্গের ভেদ নাই "য এব ভর্গঃ সএবাদিত্যঃ, যঃ এবাদিত্যঃ স এব ভর্গঃ।" এই অদ্বৈত ভাবে স্থিতিই সোঽহং স্থিতি। ইহার জন্যই উপাসনা। প্রার্থনা ও প্রাণায়াম ভিন্ন উপাসনা নাই। এবং বিনা উপাসনায় কখন সোঽহং জ্ঞান নাই।

তবেই দেখ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে উপাসনা কাণ্ড কেন বলা হইয়াছে—গীতার কর্ম্মষট্‌কের ও জ্ঞানষট্‌কের মধ্যে ভক্তিষট্‌ক কেন রাখা হইয়াছে। উপাসনা একদিকে কর্ম্মকাণ্ডকে ছুঁইয়া আছে, অন্যদিকে জ্ঞানে পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ উপাসনা আদি অবস্থায় প্রার্থনা, বিশ্বাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া আছে—মধ্যভাগে উপাসনা-স্বরূপ যে ভাবনাটি, তাহা আছে এবং শেষ অবস্থায় খণ্ড ও অখণ্ডে মিলনানুভবরূপ বিচার এবং বিচারাবসানে খণ্ড বা পরিচ্ছিন্নের অখণ্ড বা অপরিচ্ছিন্নে স্থিতিরূপ জ্ঞানটি আছে। উপাসনাতত্ত্ব একদিন আলোচনা করিলে হইবে না, নিত্য আলোচনা কর। নিরন্তর হরিকে ডাক, হরি আমায় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার কর—খণ্ডভাব হইতে অখণ্ডে লইয়া চল—এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া যিনি ডাকিতে পারেন, তাঁহারই উপাসনা হয়। এই ভাব হৃদয়ে আনিবার জন্য যিনি শ্রীভগবানের অষ্টমূর্ত্তির নিকটে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে পারেন—যিনি প্রাণায়াম দ্বারা এই প্রার্থনা হৃদয়মধ্যে বিশেষরূপে মাখাইয়া ফেলিতে পারেন, আবার যিনি খণ্ড অখণ্ডকে স্পর্শ করিয়া কিরূপে ইহা অখণ্ডে স্থিতিলাভ করে জানেন, তিনিই কর্ম্ম ও উপাসনা, শেষে জ্ঞানলাভ করিয়া সোঽহং ভাবে স্থিতিলাভ করেন।

স্ত্রী—তোমার কার্য্য ত বুঝিলাম। আমার কার্য্য কি হইবে?

স্বামী—মনের কার্য্য যেমন চুপ করা—করিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের মিলন চিন্তা করা, মিলন দেখা তোমার কার্য্যও তাই। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে মিলিলেই কি করে দেখ না? এ লোকটি কথা কয় ভাল, কিন্তু গলা নাই; উহাদের বাড়িতে সদাই ঝকড়া বিবাদ; উনি আবার সাধু, গেরুয়া কাপড় পরিলেই সাধু হওয়া গেল আর কি; উহার বচনেই সব, কাজে কিছুই নাই—এইরূপ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, ভিন্ন ৺কাশীধামেও প্রায় স্ত্রীলোকের অন্য কথা নাই—তুমি পরনিন্দা পরচর্চ্চা, বিষয়চিন্তা ছাড়।

ক্রমশঃ।

মায়ামাত্রত্বাৎ অমূর্ত্তানি। ভ্রমে, মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখ মাত্র। যেমন সুবর্ণকে অঙ্গুরীর আকারে দেখা হয় সেইরূপ জ্ঞানের অভাবে, জগৎ মূর্ত্তিমানরূপে প্রতীয়মান হয়। ঊর্ম্মিকা অঙ্গুলি মুদ্রিকা।

সুবর্ণ অঙ্গুরীর আকার ধরিলেও যেমন তাহার ঊর্ম্মিকাত্ব নাই সেইরূপ জগৎটা প্রতিভাত হইলেও ব্রহ্মণি জগন্নাস্তি। ব্রহ্মে জগৎ নাই। যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্মৈবেহতু দৃশ্যতে। ধূলিবিরোধিনী অম্বুনিধিতে প্রতিবিম্ব ধূলির মত মায়া অমূর্ত্ত ব্রহ্মের একটা মিথ্যা জগন্মূর্ত্তি দেখাইতেছে।

অয়ং প্রপঞ্চোমিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ং।
অত্র প্রমাণং বেদান্তা গুরবোঽনুভবস্তথা॥ ৩৫॥

এই প্রপঞ্চ মিথ্যা মাত্র। দ্বৈতরহিত ব্রহ্মই আমি ইহাই সত্য। এই বিষয়ে প্রমাণ হইতেছে বেদান্ততাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু এবং ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভব।

ব্রহ্মৈব পশ্যতি ব্রহ্ম নাব্রহ্ম ব্রহ্ম পশ্যতি।
সর্গাদি নাম্না প্রথিতঃ স্বভাবোঽস্যৈব চেদৃশঃ॥ ৩৬॥

ব্রহ্মই ব্রহ্মদর্শন করেন। যে ব্রহ্ম নহে সে ব্রহ্ম দেখে না। কেন দেখে না? আপনার স্বরূপ আবরণ করা যাহার স্বভাব তাহাকে লোকে দেখিবে কিরূপে? ব্রহ্মের আবৃত সত্তা যাহা অর্থাৎ মায়া বা কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের সত্তা আবৃত হওয়া যাহা তাহাই ব্রহ্মের স্বভাব। স্বভাব = আবৃত সত্তা। ইহার স্বভাব এই যে ইনি স্বকল্পিত সৃষ্ট্যাদির নামে প্রথিত। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও মণি যেমন স্বভাবতঃ ঝলক দ্বারা আবৃত হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা আবৃত হওয়াই ব্রহ্মের স্বভাব। ইহা কিন্তু চতুষ্পাদ ব্রহ্মের অবিদ্যাপাদের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মাত্র।

লীলা—ব্রহ্ম দর্শন কাহার নাম বলিতেছেন?

দেবী—আমি ব্রহ্ম—নিজের এই ব্রহ্মৈক্য ভাবনাসিদ্ধিই ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মভিন্ন আমি আর কেহ—অর্থাৎ আমি একজন আবার ব্রহ্ম একজন এটাকে ব্রহ্মদর্শন বলে না। আবার ব্রহ্মের স্বরূপ সত্তা যদিও ইহা এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মায়ার আবরণে আবৃত হইলেই তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম দর্শনটি যাহা তাহা

হইল স্থিতি। ইহা ব্রহ্মৈক্য ভাবনার ফল। কিন্তু উপাসনা ভিন্ন ঐক্য ভাবনা স্থায়ী হয় না। যাঁহার উপাসনা করা যায় তিনিই সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন করিয়া দেন। এ সামর্থ্য তাঁহার আছে। যেমন সূর্য্য দীধিতি না হইয়াও তাহা হইতে অভিন্ন, চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্র না হইয়াও চন্দ্র হইতে অভিন্ন, সেইরূপ তাঁহার আত্মমায়া তিনি না হইয়াও তাঁহা হইতে অভিন্ন। শক্তি ভিন্ন শক্তিমানে মিলাইতে আর কাহারও শক্তি নাই। সেই জন্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি জন্য শক্তি অবলম্বন চাই। তাই বলা হইতেছে মায়িক সৃষ্টি ভিন্ন এই স্বপ্রকাশের প্রকাশ আর কিছু-তেই হইতে পারে না। মায়া দ্বারা আবৃত হওয়াই—আত্ম কল্পনা দ্বারা আপনাকে আপনি আচ্ছাদন করাই—ওঁকারের গায়ত্রীছন্দই ইহার স্বভাব। ইনি সাম্যাবস্থা-রূপা কল্পনার দ্বারা যেন একটা কল্পনা আচ্ছাদিত হইয়াই দেবতামূর্ত্তি ধারণ করেন।

লীলা—আহা! কি সুন্দর। সমুদ্রের তরঙ্গ সে ত সমুদ্রই। বিষ্ণুর পরমপদ সে ত ব্যাপনশীল যিনি তিনিই। সমুদ্রকে যেমন তরঙ্গভাবে দেখা যায় সেইরূপ ব্রহ্মকে সৃষ্টিরূপে দেখা যায়। সৃষ্টিরূপে দেখাটি ভ্রম জ্ঞানে হয়। কারণ কল্কটি থাকিয়াও নাই। ভ্রমে আছে সত্যে নাই। ভ্রম জ্ঞানটি দূর হইলেই ব্রহ্মকে সৃষ্টিভাবে দেখা আর থাকে না। তখন বিচিত্র সৃষ্টি নাই। ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্ম ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করিয়াছেন। দেবি! আমার মনে হয় যতদিন ভ্রম জ্ঞান দূর না হইতেছে ততদিন চক্ষের উপরে যে জগৎ দেখিতেছি তাহা নাই ইহা না বলিয়া যদি বলা যায় ভ্রম বশতই ইহা উহা তাহা রূপ জগৎ দেখিতেছি কিন্তু এক অদ্বয় ব্রহ্মই এই রূপে দেখা হইয়া যাইতেছে তাহা হইলে সাধকের যথার্থ সাধন অভ্যাস হইতে পারে; ইহা কি ঠিক?

দেবী—যাহা ধরিয়াছ তাহাই করা উচিত। সাধকের নিত্যকর্ম্মগুলি করার পরে—এমন কি নিত্যকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে ও প্রথমেই স্মরণ করা উচিত আমি চেতন—চেতন চেতনের উপাসনা করিতে আসিয়াছে। তবে অজ্ঞানজন্য আমি আমাকে খণ্ড চৈতন্য রূপে দেখিতেছি। এই ভ্রম জ্ঞান দূর করিবার জন্য খণ্ড চৈতন্য আপন পূর্ণতা যে অখণ্ড চৈতন্য তাহার উপাসনা করে। আগে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের এক পাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে মায়া ভাসে সেই মায়া জড়িত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম এইটি সর্ব্বদা মনে রাখ। তবেই জগৎটা কত ছোট ধারণা করিতে পারিবে।

ফলে চৈতন্য কখন খণ্ডিত হয়েন না। চৈতন্যের সহিত জড়েরও কোন সম্বন্ধ নাই। আমি চেতন—আমার সহিত কোন অনাত্মার সঙ্গ হইতেই পারে না। আমি নিঃসঙ্গ পুরুষ। আর এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে ইহাও বাস্তবিক পরম শান্ত পরিপূর্ণ অধিষ্ঠানচৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তরঙ্গ যেমন জলভিন্ন আর কিছুই নহে সেইরূপ ইহা তাহা উহারূপ বিচিত্র জগৎ সেই চৈতন্যই। বিচিত্রতা যেটুকু দেখা যায় তাহা ভ্রমজ্ঞানেই দেখা যায়। ফলে ভ্রম তুলা সেটা আত্মমায়ার লীলামাত্র। কল্পনা করাও যায় আবার না করাও যায়। এই ভাবে সর্ব্বত্র সেই অধিষ্ঠানচৈতন্যের স্মরণে সর্ব্বদাই চেতনরূপে থাকিতে অভ্যাস করাই সাধনার প্রয়োজন।

ন ব্রহ্ম জগতামস্তি কার্য্যকারণতোদয়ঃ।
কারণানামভাবেন সর্বেষাং সহকারিণাম্ ॥ ৩৭ ॥

বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে। কিন্তু বীজকে মৃত্তিকাতে যুক্ত করা, মৃত্তিকাতে জল সেচন করা ইত্যাদি সহকারী কারণ না হইলে বীজ হইতে বৃক্ষ ত হইতে পারে না। ধরা গেল যেন ব্রহ্মের মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টির বীজ আছে। কিন্তু সহকারী কারণ না থাকিলে যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে না সেইরূপ ব্রহ্মস্থ বীজ হইতে জগদ্বৃক্ষ যে জন্মিবে তাহার সম্বন্ধে সহকারী কারণ কোথায়? যদি বল মায়াই সহকারী কারণ, উত্তরে বলিব মায়ার মধ্যেই জগৎ থাকে শাস্ত্র ইহাত বলেন। তাই বলা হইতেছে সর্ব্বপ্রকার সহকারী কারণের অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ জগতে বস্তুতঃ কার্য্য কারণ নাই। তবে আর ভাব কেন যে জগদ্বৃক্ষ ব্রহ্মস্থ বীজ হইতেই জন্মিতেছে? তাহা নহে ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে সর্ব্বদা আছেন, তুমি আত্মমায়ায় ভ্রান্ত হইয়া ব্রহ্মকেই বিচিত্র সৃষ্টি রূপে ভাসিতে দেখিতেছ।

যাবদাভ্যাস যোগেন ন শান্তা ভেদধীস্তব।
নূনং তাবদতদ্রূপা ন ব্রহ্ম পরিপশ্যসি ॥ ৩৮ ॥

অভ্যাস দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদ আছে এই তোমার ভেদবুদ্ধি দূর না হইতেছে, যতদিন তুমি আপনাকে অব্রহ্মরূপা ভাবিতেছ ততদিন তুমি ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে না। সেই জন্যই ত সর্ব্বদা এই বিচিত্র সৃষ্টিতে

একমাত্র অধিষ্ঠানচৈতন্যই আছেন ইহার অভ্যাস করিতে বলিতেছি—আগে সব তুমি সব তুমি এই অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মকেই স্মরণ অভ্যাস কর তবে তুতু করিতে তু ভয়া হইয়া যাইবে। সর্ব্বত্রই চেতন সর্ব্বত্রই চেতন দেখিতে দেখিতে দেহ মন ইত্যাদি সকলকেই ব্রহ্মভাবে দেখিয়া ফেলিবে। ফেলিলেই নিজে ব্রহ্ম হইয়া আপনিই আপনাকে দেখিবে। ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মদর্শন ইহাই।

এই আমরা সকলে যদি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে দৃঢ়ব্যুৎপন্না হই অভ্যাস দ্বারা অধিষ্ঠানচৈতন্যকে একবারও না ভুলি তাহা হইলে ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া সেই পরমপদকে দর্শন করিতে সমর্থ হই।

তখন দেখিব আমার এই দেহটা সঙ্কল্প নগরের ন্যায় আকাশময়। সঙ্কল্পের নগর সেটা কি? সেটাত শূন্য আকাশ মাত্র। দেহটাও শূন্য আকাশ মত দেহটা বাস্তবিক ব্রহ্মই। কিন্তু তরঙ্গের আকারটা যেমন জলভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ দেহের নাম ও রূপটা ভ্রমেই ভাসিয়াছে—ভ্রমটুকু গেলেই দেখিবে সবই ব্রহ্ম। কাজেই এই দেহের কোলে কোলে সেই পরম[illegible] আছেন দেখিবে। শুদ্ধ চিত্তাকাশময় দেহদ্বারাই পরমপদ স্বরূপ ব্রহ্মকেই দেখিবে। দেখিতেছ অভ্যাস-প্রভাবে কোন বস্তু লাভ হয়!

লীলা—মা! কি সুন্দর কথাই শুনিলাম। সমস্তই অধিষ্ঠানচৈতন্য—সবই ব্রহ্ম। চৈতন্যের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মিথ্যা মায়া বড় রঙ্গ করিতেছে। মায়িক যাহা কিছু তাহাই ত অনাস্থার বিষয়। কাজেই রাগ দ্বেষ, শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিৎ, সুখদুঃখ, মনদেহ, জল আকাশ, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী—এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ—ইহাকে সর্ব্বংমায়েতি ভাবনাৎ—অন্য সমস্তই মায়া এই ভাবনারূপ পরম বৈরাগ্য দ্বারা সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া শুধু ব্রহ্ম লইয়া থাকিতে অভ্যাস করা হইয়া গেল। এইটি দৃঢ় হইলেই ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভও হইয়া যাইবে। আগে জগৎটাকে ক্ষুদ্র করা হউক তবেই ব্রহ্মকে ব্রহ্মভাবে দেখার জন্য জগৎ নাই অভ্যাস করা সহজ হইবে। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের কাছে জগৎ নাই মত হইবে।

দেবী—ব্রহ্মাদির দেহ বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। জ্ঞায়তেঃ নেনিতি জ্ঞানং চিত্তম্। চিত্তদেহ বলিয়া ব্রহ্মাদি ব্রহ্মদর্শন যোগ্য। তাঁহারা ব্রহ্ম স্বরূপ জগতে থাকিয়াও ব্রহ্ম দেখেন।

তবাভ্যাসং বিনা বালে নাকারো ব্রহ্মতাং গতঃ।
স্থিতঃ কলনরূপাত্মা তেন তন্নানুপশ্যসি ॥ ৪২ ॥

হে বালে! তোমার অভ্যাস নাই বলিয়া বহু আকার যাহা দেখ—তোমার বা অন্যের দেহের আকার, মনের আকার ইত্যাদি ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হয় নাই। এখন তুমি কলনরূপাত্মারূপে অবস্থান করিতেছ। কলনং অন্তঃকরণে চিদাভ্যাস তদ্রূপাত্মা। এখনও তোমার অন্তঃকরণে চিদাভাস—জীবভাব দৃঢ়রূপে আছে। এখনও তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র অজ্ঞ জীব বলিয়া জানিতেছ। এই জন্য সেই ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী গিরিগ্রামরূপে দেখিতে পাইতেছ না। ব্রহ্মদর্শনে তুমি সত্য সঙ্কল্প হইয়া যাইবে। তখন ব্রহ্মভাবে থাকিয়া আপনার মধ্যে সমস্ত সঙ্কল্পনগর দেখিতে পাইবে। যাহা সঙ্কল্প তখন করিবে তাহাই মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার নিকটে তাহা প্রকাশ হইবে।

যত্র সঙ্কল্পপুরং স্বদেহেন ন লভ্যতে।
তত্রান্য সঙ্কল্পপুরং দেহোন্যো লভতে কথম্ ॥ ৪৩ ॥

যখন তুমি নিজের দেহে নিজের সঙ্কল্প নগর দেখিতে পাও না তখন কিরূপে অন্যের সঙ্কল্পিত সৃষ্টি দেখিতে পাইবে? সেই ব্রাহ্মণ দম্পতি তাহাদের সঙ্কল্প নগরে অবস্থান করিতেছেন। তুমি ব্রহ্ম দর্শন কর; করিলেই সকল লোকের সঙ্কল্প নগর এবং তাহাতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।

তস্মাদ্দেনং পরিত্যজ্য দেহং চিদ্ব্যোমরূপিণী।
তৎপশ্যসি তদেবাস্তু কুরু কার্য্যবিদাম্বরে ॥ ৪৪ ॥

এই জন্য বলিতেছি এই দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া চিদাকাশ রূপিনী হইয়া যাও। তবেই হে কর্ম্মজ্ঞে! এক মুহূর্ত্তেই তুমি সমস্ত দেখিতে পাইবে।

লীলা—আমাকে এই দেহের অভিমান ত্যাগ করিতেই বলিতেছেন?

দেবী—হাঁ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানচৈতন্য দেখিতে অভ্যাস করিলেই তুমি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া চিদাকাশ রূপিণী হইতে পারিবে। সঙ্কল্প নগর দেখিতে হইলে সঙ্কল্পই আশ্রয় করিতে হয়। মানস শরীরেই মানস নগর দর্শন করা যায়। দেহ সাধ্য ব্যবহার, বা সঙ্কল্পিত নগর ব্যবহারের

উপভোগ বা ইতর ব্যবহার—এ সকল তুচ্ছ করা চাই। সহজ কথায় বলি স্থূল শরীরে থাকিলে স্থূল দেহই দেখিবে। মানস শরীরে যাও—ভাবনা রাজ্যে উঠ মানস নগর দেখিবে। তুমি স্থূল দেহ ভুলিয়া ভাবনা দেহে যদি থাকিতে পার তবেই মানসসৃষ্টি দেখিতে পাইবে। আদি সৃষ্টিতে বিধাতার সঙ্কল্পজাত এই জগৎভ্রান্তি যেরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে তদবধি অনাদি নিয়তিরূপা ঈশ্বরেচ্ছা লক্ষণরূপা মায়াবশেই ইহা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

আদিসর্গে জগদ্‌ভ্রান্তির্যথেয়ং স্থিতিমাগতা।
তথা তদা প্রভৃত্যেবং নিয়তিঃ প্রৌঢ়িমাগতা॥ ৪৫ ॥

লীলা—দেবি! আপনিও ত সেই ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর জগতে আমার সঙ্গে যাইবেন। আমি না হয় এই স্থূল দেহ এখানে রাখিয়া শুদ্ধসত্ত্ব দেহে—চিত্ত মাত্র অবলম্বন করিয়া তথায় যাইব কিন্তু আপনি কিরূপে যাইবেন?

দেবী—আমার যে দেহটা তুমি দেখিতেছ তাহা ত শুদ্ধসত্ত্বগুণেরই কার্য্য মাত্র। "শুদ্ধৈকসত্ত্ব নির্ম্মাণং চিৎরূপস্যৈব তৎকিল" ।৫০॥ কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব যেটি তাহাত আতিবাহিক—তাহা ত ভাবনাময়। ভাবনাময় হইয়াও ইহা চিৎ স্বরূপ। বস্তুটি হইতেছে চিৎ। চিতের উপরে যে ভাবনা তাহা চিৎই। সমুদ্রের স্থির জলের উপর যে তরঙ্গ তাহা সমুদ্র জল ভিন্ন আর কি? আতিবাহিক দেহ যাহা তাহা সেই জন্য চিৎ। আমি ব্রহ্মের মত চিৎ স্বরূপে অবস্থান করিয়াই ভাবনা দ্বারা আপনাকে দেহবতী মত মনে করিয়াছি। তুমি যেমন কল্পনা দ্বারা মনে মনে অন্যরূপ সাজ অথচ স্বস্বরূপেই থাক সেইরূপ। আমি চিৎ স্বরূপ বলিয়া সত্যসঙ্কল্পময়ী। অন্যের সঙ্কল্পরাজ্য যাহা তাহা ত পূর্ণ চিৎ স্বরূপেরই সঙ্কল্প। তবে ব্রাহ্মণদম্পতীর সঙ্কল্পরাজ্যে যাইবার আমার বাধা কেন হইবে? তুমিও চিৎ স্বরূপে অবস্থান কর সকলের সঙ্কল্পরাজ্য নিজের ভিতরেই দেখিবে।

এখন বুঝিতেছ আমার দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার দৃষ্টিতে নাই। তথাপি ভাবনাদ্বারা এই দেহকে চিৎস্বরূপের প্রতিভাস বলিয়াই বলা যায়। দগ্ধ পটকে যেমন পটের মতন দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক তাহা পট নহে ভস্মই সেইরূপ। তবেই দেখ তোমার মত আমার দেহপরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। তোমার দেহও মূলে ভাবনাময় মূলে আতিবাহিক। কিন্তু

চিরদিন তুমি তোমার দেহকে আধিভৌতিক বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছ। সেই ভাবনায় তোমার দেহ পার্থিব অর্থাৎ ভৌতিক মত হইয়াছে। আমি সেরূপ ভাবি নাই—আতিবাহিককে আধিভৌতিক অভিমান করি নাই। কাজেই দেহে অভিমান ত্যাগ করিবার প্রয়োজন আমার নাই। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব শরীর বা মনঃ কল্পিত দেহ হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, ভ্রম, মনোরাজ্য গন্ধর্ব্বনগর দর্শন। স্বপ্নে কত দেহ না দেখ, ভ্রমে স্থাণুকে পুরুষ দেহে যে দেখ তাহা কি বুঝিলেই, ইহাও বুঝিবে। অতএব

বাসনা ত্যনবং নূনং যদা তে স্থিতি মেষ্যতি।
তদাতিবাহিকো ভাবঃ পুনরেষ্যতি দেহকে॥ ৫৬॥

বাসনা সমস্ত যখন তোমার ক্ষীণ হইয়া যাইবে তখন তোমার এই স্থূল দেহও আতিবাহিক ভাব প্রাপ্ত হইবে।

লীলা—আমি দেহ এই অভিমানকেই ত বাসনা বলিতেছেন? আমি দেহ নই আমি চৈতন্য ইহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাসকেই ত বাসনা ক্ষীণ করা বলেন? আচ্ছা বাসনাক্ষয়ে আতিবাহিক ভাব যখন দৃঢ় হয় তখন এই স্থূল দেহ কি হয়? এটা কোথায় থাকে?

দেবী—দেহটা ত ভ্রম জ্ঞানেই উঠে। ভ্রম ভাঙ্গিলে এটা কোথায় যায় তুমিই বল। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম উঠে—সেই ভ্রম যখন যায় তখন সর্পটি কোথায় গেল—মরিল বা অন্যরূপ হইল এ সকল কথা যেরূপ আতিবাহিক বোধের স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে আধিভৌতিক দেহ কোথায় গেল এ প্রশ্নও সেইরূপ নয় কি?

রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিলে যেমন সর্পজ্ঞানটি থাকে না তেমনি আতিবাহিক ভাবের উদয় হইলে আধিভৌতিক ভাব থাকে না।

দেহাদি যখন কল্পনা তখন উপদেশ দ্বারাই কল্পনার তিরোধান হইবে। ব্রহ্মে যাহা বাস্তবিক নাই—কেবল কল্পনায় যাহা আছে বলিয়া ভাবনা করা যায় তাহাত নিতান্ত তুচ্ছ।

পরংপরে পরাপূর্ণ মিদং দেহাদিকং স্থিতম্।
ইদং সত্যং বয়ং ভদ্রে পশ্যামোনাভিপশ্যসি॥ ৬২

এই যে দেহাদি দেখিতেছ বাস্তবিক পরব্রহ্মেই পরিপূর্ণ। পূর্ণব্রহ্মকে দেহাদি রূপে ভাবনায়, দেহরূপে দেখা যাইতেছে কিন্তু এই ভাবনা মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

পূর্ণব্রহ্মই সর্ব্বত্র। ভদ্রে! আমাদের ভ্রমজ্ঞান নাই সত্য জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা যাহা পরম সত্য তাহাই দেখি। তোমার সে জ্ঞান নাই বলিয়া তুমি পরম সত্য-ব্রহ্ম দেখিতে পাও না।

আদিসর্গে ভবেচ্চিত্তং কল্পনা কল্পিতং যদা।
তদা ততঃ প্রভৃত্যেক সত্বং দৃশ্যমবেক্ষ্যতে ॥ ৬৩ ॥

যদি বল চিৎ ত নিরাকার। চিৎতত্ত্ব ত অদৃশ্য। ইহা দৃশ্য স্বভাব পায় কিরূপে? উত্তরে বলি আতিবাহিক দেহধারী হিরণ্যগর্ভের যখন সৃষ্টি হয় সেই সঙ্গে চিৎ বস্তুটির চিত্ত ধর্ম্ম প্রকাশ হয়। চিৎটি সর্ব্বদা অচেত্য। চেত্যতা হইতেছে সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা। পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে চিৎ কিরূপে চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন বলা হইয়াছে। "তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিৎ চেত্যতামিব গচ্ছতি" স্মরণ কর।

চিতের চিত্তধর্ম্ম যখন উঠিল তখন হইতে একই সত্তা দৃশ্যের অনুরোধে যেন ভ্রান্ত হইয়া আপনার ভিতরে কাল্পনিক বহু দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হইতে যেন দেখেন। এই ভ্রান্ত সত্তাই স্বাশ্রিত বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে।

আদের্লিঙ্গাত্মনঃ সর্গে তং গোচরয়ন্ত্যাশ্চিতশ্চিত্তং নাম ধর্ম্মোভবেৎ। যদা তু পঞ্চীকরণেন কল্পনয়া স্থূলং রূপং কল্পিতং তদা ততঃ প্রভৃত্যেকমনুগতং সত্বং দৃশ্যানুরোধাৎ স্বয়মপি দৃশ্যভূতং স্বয়ং অবেক্ষতে ভ্রান্তেত্যর্থঃ।

চিৎটি আপন স্বভাবোত্থ ঝলকরূপী কল্পনা অবলম্বনে চেত্যতা প্রাপ্ত হইলে কল্পনায় পঞ্চীকরণ হয়, স্থূলরূপ হয়। দ্রষ্টাই তখন কল্পনার দৃশ্য যাহা তদনুরোধে স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও আপনাকে দৃশ্যভাবে দেখেন। ইহাই ভ্রান্তি। ভ্রান্তিই মায়া কল্পনা, অজ্ঞান অবিদ্যা যাহা বল তাই। অজ্ঞানটি যখন মিথ্যা তখন মিথ্যা আবার থাকিবে কি? জ্ঞানে অজ্ঞান থাকে ইহার অর্থ নাই।

লীলা—একস্মিন্নেব সংশান্তে দিক্কালাদ্যবিভাগিনি।
বিদ্যমানে পরেতত্ত্বে কল্পনাবসরঃ কুতঃ ॥ ৬৪ ॥

"অহং বহুস্যাম" ইহা কল্পনা। "স্বয়মন্যমিবোল্লসন্" ইহাও কল্পনা। একমাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্যই আছেন। তিনি পরম শান্ত, চলন রহিত, সর্ব্বপ্রকার বিকার শূন্য। তিনি পূর্ণস্থিতিটিই যে গতিরূপে স্পন্দনরূপে প্রতীত হয়েন ইহাও বলিতে-

ছেন কল্পনা। তাঁহার আত্মমায়া গ্রহণ ইহাও কল্পনা। কল্পনা-ভাবনা-আতি-বাহিকতা যাহা তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে স্থূল জড় হইয়াছে। স্থূলদৃশ্য জগৎ হইয়াছে। আপনার কথাতে এই পর্য্যন্ত বুঝিতেছি।

কিন্তু কোন বিকার না হইলে কল্পনা আসিবে কোথা হইতে? পূর্ব্বে বলিয়া-ছেন পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কার না থাকিলেও দর্শন হয়। মায়া নামক মূল বাসনা যাহা তাহাও চিত্তে বাস করে। মায়াটি অজ্ঞান। অজ্ঞান চিত্তে বাস করে। চিত্ত যখন নাই তখন অজ্ঞানও নাই। চিত্তে বাস জন্য ইহার নাম বাসনা। এই মূলবাসনাই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখায়। মায়াকে স্পন্দনাত্মিকা শক্তি বলিতেছেন। যিনি পরম শান্ত, যিনি সম্পূর্ণ চলন রহিত তাঁহার নিকট এই স্পন্দনাত্মিকা মায়া কোথা হইতে আসিল?

কলনা বলে বিকারকে। সঙ্কল্প যাহা তাহা ত কলনার অধীন। রজ্জুকে যে সর্প কল্পনা করা হয়, স্থাণুকে যে পুরুষ কল্পনা করা হয় অথবা জলকে যে তরঙ্গ কল্পনা করা হয় তাহা বলিতেছেন ভ্রমজ্ঞানে। স্থূল কথায় ভ্রমজ্ঞানটাকেও কল্পনা বলেন। কোথাও একটা কিছু বিকার না হইলে কল্পনা আসিবে কোথা হইতে?

যখন সর্ব্বকল্পনা কলনাধীনা তখন আমার শঙ্কা যাহা তাহা বলিতেছি আপনি বুঝাইয়া দিন।

পৌর্ব্বকালিকং দুগ্ধমৌত্তরকালিক দধ্যাদাকারেণ পরিণমতে। দধিভাবে চ দুগ্ধমবিদ্যমানং ভবতি। কালসম্বন্ধরহিতে নিত্যং বিদ্যমানে ব্রহ্মণি কলনাখ্য প্রথম-বিকারস্যৈব নাবসরঃ।

পূর্ব্বে যাহা দুগ্ধ ছিল তাহাই পরে দধিরূপে পরিণত হয়। দধিভাব যখন প্রাপ্ত হয় তখন দধিতে দুগ্ধের অবিদ্যমানতা দেখা যায়। আবার পূর্ব্বকালে যাহা দুগ্ধ ছিল উত্তরকালে তাহাই দধি হইতেছে। কালের সাহায্য ব্যতীত দধি হওয়া অসম্ভব। ব্রহ্ম যিনি তিনি কাল সম্বন্ধ রহিত নিত্যবস্তু। এখানে কলনাখ্য প্রথম বিকারের অবসর কোথায়?

দেবী—ব্রহ্মে কলনাখ্য প্রথম বিকার নাই। ব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার নাই। আর কল্পনা যাহা তাহাকে যখন কলনাধীনা বলিতেছ তখন ইহাই নিশ্চয় জানিও যে ব্রহ্মে বিকার নাই বলিয়া ব্রহ্মে কোন কল্পনাও নাই। এককালে যাহা

দুগ্ধ অপরকালে তাহা দধি কিন্তু সকল কালেই যিনি এক তাঁহার বিকার কিরূপে থাকিবে? আবার বিকার নাই বলিয়া কল্পনাও নাই। দেহ জগৎ মন ইত্যাদি কল্পনা তবে ব্রহ্মে নাই। সেইজন্য বলিতেছি ব্রহ্মে জগৎ বলিয়া কোন কিছু নাই; দেহ বলিয়াও কোন কিছু নাই। ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মকে জগৎ রূপে যে দেখা সেটা ভ্রম মাত্র। এ ভ্রম ব্রহ্মে নাই। এ অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। কিন্তু যে দেখে তাহাতেই এই ভ্রম থাকে। তুমি দেখিতেছ তোমাতে অজ্ঞান আছে, আমি দেখি নাই আমাতে ভ্রমজ্ঞান নাই।

দধিতে দুগ্ধ নাই। কিন্তু বলিতে পার দুগ্ধে দধি আছে। নতুবা দধি আসিবে কিরূপে? সত্য। কিন্তু দুগ্ধ যে দধি হয় তাহাতে তিন্তিড়ি দেওয়ারূপ একটা সহকারী কারণ থাকে। আর দধি যখন সমকালে দুগ্ধ নহে তখন কালও একটা সহকারী কারণ। ব্রহ্ম যে জগদ্রূপে বিকার প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে তিন্তিড়ি প্রয়োগরূপ সহকারী কারণ কোথায়? আবার এককালে ব্রহ্ম পরে জগৎ এই কাল বিভাগ ব্রহ্মে কোথায়? যিনি সর্ব্বকালে এক তাঁহাতে এই কাল সেই কালে এইরূপ কালবিভাগই বা কোথায়? কোনরূপ সহকারী কারণ নাই বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বকালে ব্রহ্মই আছেন। জগৎ তাঁহাতে নাই। কোন প্রকার কলনা নাই বলিয়া তাঁহাতে কোনপ্রকার কল্পনাও নাই। কোন প্রকার অজ্ঞান সেই জ্ঞান-স্বরূপে নাই।

লীলা—দেবি! আপনি বলিতেছেন যে দেখে অজ্ঞান তার। ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন কিন্তু যে ইহাকে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে দেখে অজ্ঞান তাহারই। এখন জিজ্ঞাসা করি অজ্ঞান কোথা হইতে আইসে আর অজ্ঞানী এককে আর দেখে কেন?

দেবী—অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর পরে হইবে। কিন্তু অজ্ঞানটা আছে তাহা তুমি দেখিতেছ। অজ্ঞান আছে বলিয়াই জীব জগৎ দেখে। ব্রহ্মে অজ্ঞান নাই। জীবে আছে তাই জীব দেখে।

লীলা—জীবে অজ্ঞান আছে আবার জ্ঞানও আছে নতুবা জীব জ্ঞান লাভ করে কিরূপে? জীব আপনাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বুঝিলেই জীবের অজ্ঞান নাশ হয়। এখন বলুন জীব আপন স্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াও অজ্ঞান পায় কোথায়? ব্রহ্মই বা মায়া আশ্রয়ে জীবভাবে বিবর্ত্ত হয়েন কিরূপে?

দেবী—জীবের অজ্ঞান কোথায় ইহা পরে বলিব। এখন ব্রহ্মের জগদ্রূপে ভাসা কি তাহাই বলি শ্রবণ কর।

কটকত্বং যথা হেম্নি তরঙ্গত্বং যথাম্ভসি।
সত্যত্বঞ্চ যথা স্বপ্নসঙ্কল্প নগরাদিষু॥ ৬৫ ॥
নাস্ত্যেব সত্যনুভবে তথা নাস্ত্যেব ব্রহ্মণি।
কল্পনাব্যতিরিক্তাত্ম-তৎস্বভাবাদনাময়াৎ ॥ ৬৬ ॥
যথা নাস্ত্যম্বরে পাংসুঃ পরেনাস্তি তথা কলা।
অকলাকলনং শান্তমিদমেকমজং ততম্॥ ৬৭ ॥
যদিদং ভাসতে কিঞ্চিৎ তত্তস্যৈব নিরাময়ম্।
কচনং কাচকস্যেব কান্তস্যাতি মণেরিব ॥ ৬৮ ॥

সুবর্ণে যেমন বালার ভাব, জলে যেমন তরঙ্গের ভাব, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে যেমন সত্যের ভাব—এই সমস্ত অনুভব হইলেও নাই সেইরূপে ব্রহ্মে জগদাদি অনুভব হইলেও নাই। কল্পনা রহিত সেই অনাময় ব্রহ্ম—তাঁহার আপনি আপনি ভাব ভিন্ন তাঁহাতে কোন কিছুই উঠিতেছে না। "ধাম্নাস্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" তিনি আপন মহিমায় সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপনি আপনিই আছেন।

যেমন আকাশে ধূলি নাই, তেমনি পরব্রহ্মে কোন কলা নাই—কোন কলন নাই—কোন বিকার নাই—কোন বিষয় নাই। কলা কলনং বিষয়ঃ। এই ব্রহ্ম অবিষয় রূপ বিষয়, শান্ত, এক, অজ, পরিপূর্ণ। এই যাহা কিছু ভাসিতেছে তাহা তাঁহারই নিরাময় কচন—আপাত প্রতিভাস। নির্ম্মল মণির ঝলক যেমন অতিমণি, সেইরূপ তাঁহাতে যাহা ভাসে তাহা তিনিই। "কচনং কাচকস্যেব কান্তস্যাতমণেরিব।"

লীলা—মা! মণির ঝলককে ত অন্য কিছু বলিয়া ভ্রম হয় না। তবে ব্রহ্মের প্রতিছায়াকে সৃষ্টি বলিয়া ভ্রম কেন হয়? অদ্বৈতে এই দ্বৈত কল্পনা তুলিয়া কেন, কে এতকাল ভ্রমে ভ্রমণ করাইতেছে? "ভ্রামিতাঃ কেন নামাপি দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্পনৈঃ।"

দেবী—মণির ঝলককে কেহ দীপশিখা বলিয়াও ভ্রম করে; করিয়া বর্ত্তিকা ধরাইতেও যাইতে পারে। এই ভ্রম কেন হয় তাহার উত্তর দিতেছি। স্বস্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াও জীবের অজ্ঞানটি কি তাহা এখন বুঝাইতেছি।

লীলা—বলুন।

দেবী—দেখ মায়া কি, অজ্ঞান কি, ভ্রম কি ইহা এই গ্রন্থে বহুভাবে বলা হইয়াছে। অধিকারী না হইলে ইহা কেহই বুঝিবে না। মায়া না হইলে ব্রহ্মের সগুণভাব পর্য্যন্ত ধরিবার উপায় নাই। জগৎ না থাকিলে যেমন জগৎ স্রষ্টার প্রকাশ হইবার স্থান নাই সেইরূপ মিথ্যার কল্পনা ব্যতীত সত্যে স্থিতি লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। অরুন্ধতী ন্যায়ে যেমন একটা স্থূল নক্ষত্রকে মিথ্যা করিয়া বলা হয় ঐটী অরুন্ধতী, আর উহাতে একাগ্র হইলে আপনা হইতে উহার কোলে কোলে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখা যায় সেইরূপ অজ্ঞানের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় দেখাইয়া তবে জ্ঞানস্বরূপে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। সেইজন্য বলা হয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাঁহা হইতে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে এই শ্রুতিবাক্যেও মিথ্যা সৃষ্টি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

পরে তুমি এই তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবে এখানে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে "আমি আছি" এইটিকেই লোকে খাঁটি সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকে। কিন্তু এইটি অখণ্ড সত্য নহে। "আমি আছি" ইহার মধ্যে "আমি" বোধটি অখণ্ডকে খণ্ড বোধ করা রূপ মূল অজ্ঞান। আর "আছি" বা "অস্তি" এই শুদ্ধ বোধটি হইতেছে স্বরূপ বোধ। কোন বস্তু নাই অথচ কেবল জ্ঞানটি আছে ইহাকেই স্বরূপ জ্ঞান বলে। মহাপ্রলয়ে আর কিছুই নাই এক আপনি আপনি ভাব যাহা তাহাই হইল স্বরূপ জ্ঞান বা স্বরূপ স্থিতি। স্বভাবতঃ দ্বিতীয় একটি কিছু না ভাসিলে "অহং" এই ভাবটিও জাগে না। মণিতে স্বভাবতঃ যেমন অতিমণি মত কিছু যেন ভাসে সেইরূপ আপনি আপনিতে অথবা অস্তি এই ভাবেতে বা ব্রহ্মতে মহদ্বক্ষ বলিয়া যেন কিছু ভাসে। মহদ্বক্ষ হইতেছে সাম্যাবস্থারূপা মায়ার আদ্য বিকার মহৎ তত্ত্ব। সাম্যাবস্থারূপা মায়া যিনি তিনি চন্দ্রে চন্দ্রিকার মত, সূর্য্যে দীধিতির মত ব্রহ্ম সহজা। ইহাকেই মণির ঝলকের মত অতিমণি বলা হয়। ঝলকটি স্বভাবতঃ হয়। যদি প্রথম চাও সৃষ্টি বলিতে তবে বল ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি। ইহাই অচেত্যচিতির চেত্যতা। অথবা ইহার ভিতরেই চেত্যতা বা সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা অব্যক্তভাবে থাকে। এইটি লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়—

তস্যানন্ত প্রকাশাত্মরূপস্যানন্ত চিন্মণেঃ।
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ॥

তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিৎ চেত্যতামিব গচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহংমর্শন পূর্ব্বকম্ ॥

পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে। মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ এখানেও অবুদ্ধিপূর্ব্বক বা স্বভাবতঃ সৃষ্টা যে মায়া তাহাই মহান্ এই ভাবটি যেন জাগ্রৎ করে। তারপরে "আমি আছি" এই বোধটি জাগে। আমি ভাবের পুষ্টি যখন হয়, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন যিনি তিনি আপনাকে বোধ করিয়া যেন উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন। তার পরে অহং বহুস্যাম্। আমি বহু হইব এই ভাব। অহং না জাগিলে, অহং বহু হইব, ইহা জাগিবে কিরূপে? মায়ার আশ্রয় ব্যতীত অহং ভাবও জাগে না। মণিতে যতই ঝলক উঠুক না কেন, অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি যতই হউক না কেন যতক্ষণ না মহত্তত্ত্বের বিকার অহং তত্ত্ব ভাসিতেছে ততক্ষণ বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন সৃষ্টি নাই। অনিচ্ছায় যাহা উঠে সেটার ভিতরেই ইচ্ছায় উঠা বা তোলারূপ সৃষ্টি বীজ থাকিবেই। আহারে অনিচ্ছা হইতে সহজে ইচ্ছা জাগে।

লীলা—দেবি! মায়া কি, অজ্ঞান কি—ইহা কোথায় থাকে, ইহা কেন উঠে—এই সমস্ত তত্ত্ব আমি এখনও বুঝিবার অধিকার পাই নাই। কিন্তু দেখিতেছি অজ্ঞান বলিয়া একটা কিছু যেন আমার মধ্যে আছে। ব্রহ্মের দিক হইতে এই অজ্ঞানকে বুঝিয়া তাড়াইতে চেষ্টা না করিয়া, জীবের দিক হইতে ইহা সরাইবার যুক্তি বলুন। ইহাতেই এখন আমার হইবে।

দেবী—তাহাই হউক।

অবিচারেণ তরলে ভ্রান্তাসি চিরমাকুলা।
অবিচারঃ স্বভাবোত্থঃ স বিচারাদ্বিনশ্যতি ॥ ৭০ ॥

হে তরলে! বহুকাল অবিচার দ্বারা আকুল হইয়াই ভ্রান্ত হইয়া আছ। অবিচার স্বভাব হইতেই উঠে আর বিচার দ্বারা তাহার বিনাশ হয়। চৈতন্যের স্বভাব এই যে তিনি কখন অচৈতন্য হন না। চেতনের মরণ নাই। চেতনের কোন দুঃখ নাই। কোন যাতনা নাই, কোন রোগ নাই। চেতনের আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি নাই। তুমি জান তুমি চেতন। তুমি জান অন্ততঃ জীবজগতে সবাই চেতন। খাঁটি সত্য এই যে আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ: যিনি জন্মান না তাঁর জন্মস্থান আছে, পিতা মাতা আছে, তাঁর দেহ আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, প্রাণের আবার ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, মনের আবার শোক মোহ আছে,

দেহের আবার জরামরণ আছে—এ সব কি বল? বলিতে কি হইবে না স্বভাব হইতে যে অবিচার উঠে এই সমস্ত সেই অবিচারের ফল। বিচার কর, ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইবে। তুমি যাহা তাহাই বুঝিবে।

অবিচারো বিচারেণ নিমেষাদেব নশ্যতি।
এষা সত্ত্বেব তেনান্তর বিত্তৈষা ন বিদ্যতে ॥ ৭১ ॥

বিচার দ্বারা অবিচার নিমেষ মধ্যে নষ্ট হয়। অবিচারটি হইতেছে অবিদ্যা। এষা অবিচার লক্ষণা অবিদ্যা বিচার বাধিতা ব্রহ্মসত্ত্বেব সম্পদ্যত ইতি শেষঃ। এই অবিচার লক্ষণা অবিদ্যা বিচার দ্বারা অস্ত হইলে ব্রহ্মসত্তাই প্রকাশিত হয়েন।

রজ্জুতে সর্প কোথায় বল? ব্রহ্মে জগৎ কোথায় বল? অবিচারটাই রজ্জু ঢাকিয়া সর্পরূপে ভাসিয়াছিল। অবিদ্যাটাই ব্রহ্মকে ঢাকা দিয়া জগদ্রূপে সাজিয়াছিল; পানা যেমন জল হইতে জন্মিয়া জলকে ঢাকিয়া থাকে সেইরূপ।

তস্মান্নৈবাবিচারোস্তি নাবিদ্যাস্তি ন বন্ধনম্।
ন মোক্ষোস্তি নিরাবাধং শুদ্ধবোধমিদং জগৎ ॥ ৭২ ॥

এই জন্য অবিচার বলিয়া কোন কিছু সত্যই নাই, অবিদ্যা নাই, বন্ধন নাই, মোক্ষ নাই। এই জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা বাধ শূন্য কেবল শুদ্ধ বোধই।

এতাবন্তং যদা কালং ত্বয়ৈতন্ন বিচারিতম্।
তদা ন সম্প্রবুদ্ধা ত্বং ভ্রান্তৈবাভব আকুলা ॥ ৭৩ ॥

এতকাল পর্য্যন্ত তুমি ইহা বিচার কর নাই বলিয়া প্রবুদ্ধ হইতে পার নাই। এই জন্য আকুল হইয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলে।

অদ্য প্রভৃতি বুদ্ধাসি বিমুক্তাসি বিবেকিনী।
বাসনাতানবং বীজং পতিতং তব চেতসি ॥ ৭৪ ॥

আজ হইতে বোধ লাভ করিলে। বিবেক পাইয়া মুক্ত হইলে। তোমার চিত্তে বাসনা ক্ষয় হইবার বীজ পতিত হইল। বুঝিতেছ ত অবিদ্যাকে বাসনা বলে কেন? "চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ।" চিত্তে বাস করে বলিয়াই মায়াকে মূলবাসনা

বলে। বাসনা ক্ষয়ের বীজ হইতেছে একমাত্র শুদ্ধ বোধটি এইটিই আছেন সর্ব্বদা এই ভাবনা তুমি কর। তুমি আমি জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহার মূলে অধিষ্ঠান চৈতন্য, কেবল বোধ। রজ্জুতে সর্প ভাসার মত একটা মিথ্যা জ্ঞান সেই সত্য-জ্ঞানটিকেই একটা বিচিত্র সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত করে মাত্র। ভ্রমজ্ঞানটি বিচার দ্বারা দূর করিয়া, সমস্তই চেতন, ইহা দেখার অভ্যাস কর, এইক্ষণে মুক্তি অনুভব করিবে।

আদাবেব হি নোৎপন্নং দৃশ্যং সংসারনামকম্।
যদা তদা কথং তেন বাস্যন্তে বাসনাপিকা॥ ৭৫॥

আদৌ এই সংসার নামক দৃশ্য উৎপন্ন হয় নাই। ইহা যখন বুঝিতেছ তখন কিরূপে তদ্দ্বারা দ্বৈত বাসনা চিত্তে বাস করিবে বল?

অত্যন্তাভাব সম্পত্তৌ দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশাং মনঃ!
এক ধ্যানে পরে রূঢ়ে নির্ব্বিকল্প সমাধিনি॥ ৭৬॥

মনঃ রূঢ়ে অধিরূঢ়ে সতি। মন, যখন শুদ্ধবোধ বা শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন ইহার দৃঢ় ধারণা ও দৃঢ় ধ্যান করিতে পারিল তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিল তখনই দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন কিছুই আর স্ফূরণ হইল না তখনই জগতের অত্যন্তাভাব হইয়া গেল। চতুষ্পাদ ব্রহ্মে মায়া কোথায় ইহার চিন্তাতেই মন শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন এই চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। ইহাও এক ক্রম।

বাসনাক্ষয় বীজেস্মিন্ কিঞ্চিদঙ্কুরিতে হৃদি।
ক্রমান্নোদয়মেষ্যন্তি রাগদ্বেষাদিকা দৃশাঃ॥ ৭৭॥
সংসার সম্ভবশ্চায়ং নির্ম্মূলত্বমুপৈষ্যতি।
নির্ব্বিকল্প সমাধানং প্রতিষ্ঠামলমেষ্যতি॥ ৭৮॥

বাসনা রূপ অক্ষয়াত্মক বীজ এখানে হৃদয়ে কথঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও ক্রম অনুসারে আর তাহা উদয় হইতে পারে না। কারণ দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন করে না, বিচার দ্বারা মূল বাসনাও দগ্ধবীজের মত হইয়া যায়। বাসনা ক্ষয় হইলেই রাগদ্বেষাদি দৃশ্যদর্শন—যাহা হইতে সংসার ভাব জন্মে—তাহা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিগত কলন কালিমাকলঙ্কা
গগনকলান্তর নির্ম্মলাম্বনেন।
সকল কলন কার্য্যকারণান্তঃ
কতিপয়কালবশাদ্ভবিষ্যসীতি ॥ ৭৯ ॥

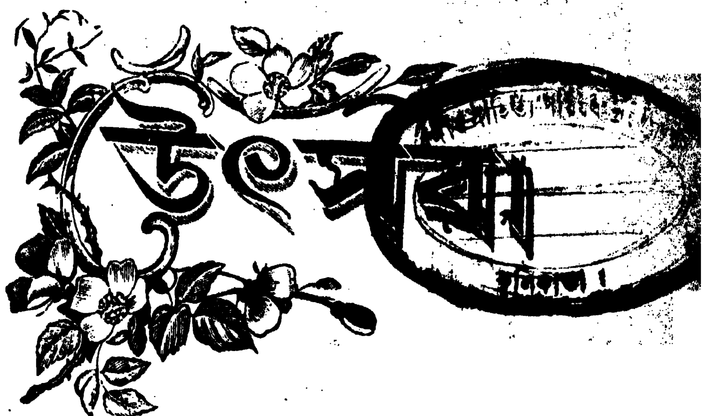
ইতি এবম্বিধয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠয়া কতিপয়কালবশাৎ গগনস্য মায়াকাশস্য তৎকলানাং তৎ কার্য্যানাং চান্তরস্য অধিষ্ঠান ভূতস্য নির্ম্মলস্য আত্মনঃ অম্বনেন অবলম্বনেন বিগতোভ্রান্তিকলন লক্ষণঃ কালিমা যস্যা অতএব অকলঙ্কা তৎ সংস্কারকলঙ্ক নির্ম্মুক্তা সতী সকল প্রাণিনাং কলনানাং ভ্রান্তীনাং তৎকার্য্য বাসনানাং তৎ কারণ অবিদ্যায়াশ্চ অন্তো বাধাবধিভূতো যো মোক্ষাখ্যঃ পরম পুরুষার্থঃ স ত্বমেব ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ॥

এইরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠা দ্বারা কিছুকাল মধ্যে মায়াকাশের কার্য্যের ভিতরে যে নির্ম্মল আত্মা আছেন তাঁহার অবলম্বন হয়। সেই অবলম্বন দ্বারা ভ্রান্তি-কালিমা দূর হয়। তখন ভ্রান্তির সংস্কার কলঙ্ক নির্ম্মুক্ত হইয়া অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্তি হয়। ইহাহইলে সকল প্রাণীর ভ্রান্তির কার্য্যরূপ বাসনা এবং তাহার কারণরূপা অবিদ্যার অন্ত হয়। ইহাই মোক্ষ ইহাই পরম পুরুষার্থ। ইহা করিলেই তোমার মোক্ষ হইল।

বিশ্রান্তি উপদেশ সমাপ্ত।

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম বৎসর হইতে চতুর্থ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩১৫ ও ১৩১৬ এই চারি বৎসরের উৎসব আমার প্রয়োজন। যদি কেহ এই চারি বৎসরের উৎসব আমাকে দিতে পারেন তবে আমি দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিব। ১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, উৎসব আফিসে সংবাদ দিলেই হইবে।

শ্রীঅধর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। প্রোফেসার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ।

সম্পাদকের নিবেদন।

উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক বর্গের শুভ ইচ্ছায় নব বর্ষে নব সঙ্কল্প লইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতরণ করা হইয়াছে। আমরা সকলে কর্ম্মের জন্য কা করিয়া যা ফলাফল বিধাতা পুরুষের হাতে। গ্রাহকবর্গের অবগত্যার্থে নিবে করা হইতেছে যে ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক এবং কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ননীলাল চৌধুরী বিষয় কর্ম্ম প্রয়োজনে স্থানান্তর গমন করায় শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপ ও শ্রীমান সুবল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত প্রতিসংখ্যার মূল্য ।• আনা। নমুনার জন্য ।• আনার ডাক টিকিট পা অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হই স্তু বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম শিত হয়। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব "না পা লে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই- পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনে পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে হইবে।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩ দ্ধ পৃষ্ঠা ২ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১, টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুবল পাধ্যায়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, শ্রাবণ। [৪[illegible] সংখ্যা

অবোধপুরীর গান।

প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয় রতন।
বুঝাতে পারি না তোঁহে কিসে জীবনের জীবন॥

প্রকাশিলে দিনমণি কেন বা হাসে নলিনী
কি সুখে ভাসে যামিনী
উদিলে কুমুদ-রঞ্জন॥

স্মরিলে জীবন পাই আর না মরিতে চাই
সব জ্বালা ভুলে যাই
সব রূপে রূপ দরশন॥

শ্রী[illegible]

মূল প্রার্থনা।

যশস্বিনী কৌশল্যা রামের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "আবৃণোতু ন মাং মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী।" তোমার বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া যেন আমাকে আর আবরণ না করে।

ভগবান্ নারদ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করেন—

অহং তদ্ভক্তভক্তানাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কিঙ্করঃ।
অতো মামনুগৃহ্ণীষ্ব মোহয়স্ব ন মাং প্রভো॥

আমি তোমার ভক্তগণের ভক্ত এবং তোমার ভক্তগণের কিঙ্কর, হে প্রভো! এই জন্য তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর, আমাকে তোমার মোহকরী মায়ায় আর মোহিত করিও না।

তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীভক্ত ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তোমার নিকট যে প্রার্থনা করেন তাহা এত সুন্দর যে এই স্থানের ঘটনাটি সমস্ত বলিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কল্য প্রভাতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে। অদ্য রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবকে অভিষেকের দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ জন্য সুমন্ত্রকে নিযুক্ত করিতে বলিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সমস্ত আয়োজন করিতে বলিয়া রামের নিকট সংবাদ দিতে আসিতেছেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ, গুরু। তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া তিনি রথ হইতে অবতরণ করিলেন। গুরু বলিয়া তাঁহার জন্য সর্বত্র অবারিতদ্বার। "ততঃ প্রবিশ্য ভবনং স্বাচার্য্যত্বাদবারিতঃ।" তিনি রামভবনে প্রবেশ করিলেন, কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিল না।

গুরুমাগতমাজ্ঞায় রামস্তূর্ণং কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রত্যুদ্গম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবৎ ভক্তিসংযুতঃ॥
স্বর্ণপাত্রেণ পানীয়মানিনায়াশু জানকী।
রত্নাসনে সমাবেশ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ॥
তদাপঃ শিরসাধৃত্বা সীতয়া সহ রাঘবঃ।
ধন্যোঽস্মীত্যব্রবীদ্রাম তব পাদাম্বুধারণাৎ॥

শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া শীঘ্র যোড়হস্তে অতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীসীতা স্বর্ণপাত্রে জল আনয়ন করিলেন। রাম শ্রীগুরুকে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া নিজহস্তে চরণ ধৌত করিয়া দিলেন। আর ঐ চরণোদক সীতার সহিত শিরে ধারণ করিলেন—বলিলেন আপনার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম।

আর গুরু কি করিলেন? গুরু ইহাদের রঙ্গ দেখিয়া হাসিলেন। পরে বলিলেন—

তৎপাদসলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূৎ গিরিজাপতিঃ।
ব্রহ্মাপি মৎপিতা তে হি পাদতীর্থহতাশুভঃ॥

রাম! তোমার পাদসলিল যে গঙ্গা সেই গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া গিরিজাপতি মহাদেব ধন্য হইয়াছেন আর আমার পিতা ব্রহ্মা তোমার চরণজল স্পর্শে সমস্ত পাপ প্রক্ষালন করেন। সেই তুমি—তুমি বলিতেছ আমার চরণজলে তুমি ধন্য হইলে! লোককে গুরুভক্তি শিক্ষাদিবার জন্যই তুমি এইরূপ করিতেছ। কিন্তু আমি জানি তুমি প্রকৃতির পর পরমাত্মা। তুমি লক্ষ্মীর সহিত প্রকট হইয়াছ। আমি জানি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি, ভক্তজনের ভক্তিফল প্রদান এবং রাবণবধের জন্য হে রঘুপতি! তুমি প্রকট হইয়াছ। তথাপি দেবকার্য্যের জন্য তোমার এই গুপ্তরহস্য আমি সর্ব্ব সমক্ষে উদ্‌ঘাটন করিব না। হে রঘুনন্দন! মায়া করিয়া তুমি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছ তাহা আমি কাহারও নিকট বলিব না! আর—"তথৈবানুবিধাস্যেঽহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরপ্যহম্।" আর আমি তোমার অনুকূল সমস্তই বিধান করিব। ব্যবহার দৃষ্টিতে তুমি আমার শিষ্য আমি তোমার গুরু। কিন্তু বাস্তবপক্ষে কথাটা কি?

গুরুর্গুরূণাং ত্বং দেব পিতৄণাং ত্বং পিতামহঃ।

তুমি গুরুরও গুরু। তুমি পিতৃপুরুষগণেরও পিতামহ। আর জগদ্রূপী যন্ত্রের তুমি চালক। তুমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমি অন্তর্যামী। তুমি স্বাধীন, শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ ধারণ করিয়া মানুষের মত, লোকের নিকটে প্রকাশমান হইয়াছ। রাম! আমি জানি পুরোহিতের কার্য্য বড়ই নিন্দনীয় আর এই জীবিকা বড়ই দোষযুক্ত।

পৌরোহিত্যমহং জানে বিগর্হ্যং দুষ্য জীবনম্।

এই সমস্ত জানিয়াও যে পুরোহিত হইয়াছি তাহার কারণ কি জান ?—

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে রামঃ পরমাত্মা জনিষ্যতে।
ইতি জ্ঞাতং ময়াপূর্ব্বং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা ॥
ততোঽহমাশয়া রাম তব সম্বন্ধকাঙ্ক্ষয়া।
অকার্ষং গর্হিতমপি তবাচার্য্যত্ব সিদ্ধয়ে ॥

আমি যখন পিতার নিকটে ব্রহ্মলোকে ছিলাম তখন পিতা ব্রহ্মার মুখে শুনিয়াছিলাম পরমাত্মা রামরূপে ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মিবেন। সেই অবধি বড় আশায় তোমার সম্বন্ধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া এই নিন্দিত পৌরোহিত্য কর্ম্ম আমি স্বীকার করিয়াছি ; ইহা কেবল তোমার আচার্য্যত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য।

রঘুনন্দন ! সে আশা আমার ফলবতী হইয়াছে। এখন আমার আর এক প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা তোমায় পূর্ণ করিতে হইবে।

ত্বদধীনা মহামায়া সর্ব্বলোকৈকমোহিনী।
মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘূদ্বহ।
গুরুনিষ্কৃতিকামস্ত্বং যদি দেহ্যেতদেব মে।

সর্ব্বলোককে মোহন করেন এই যে তোমার মহামায়া ইনি কেবল তোমারই অধীন। হে রঘুবংশ উদ্ধার জন্য ধৃতমনুষ্যরূপিন্ ! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে ইনি আর যাহাতে আমাকে মোহে না ফেলেন তুমি তাই কর। গুরু-দক্ষিণা ত আমার প্রাপ্য। যদি দিতে হয় ত এই গুরুদক্ষিণা আমায় দাও।

বড় সুন্দর এই প্রার্থনা—"আবৃণোতু ন মাং মায়া।" সকলেই ইহার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত। ছার জীব আমরা—আমাদের আবার কথা কি ? এ কালে আর তেমন সাধক কোথায় ? যাঁহারা যথার্থ সাধক, যাঁহারা যথার্থ ভক্ত, যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানী তাঁহারা প্রার্থনা করেন প্রভু ! আর আমার মোহ উৎপাদন করিও না। মোহয় ত্ব ন মাং প্রভো ! তোমার মায়াকে এই অনুগ্রহ করিতে বল, তিনি যেন আর আমাকে "আমি, আমার" এই মোহের ঘরে আটকাইয়া না রাখেন।

এই মোহের ঘর হইতে মুক্ত হইতে মানুষের শক্তি নাই। তুমিই বলিয়াছ—"মম মায়া দুরত্যয়া।" প্রভু ! মন্ত্ররূপী তুমি। মায়া কতই অসম্বন্ধ প্রলাপ তুলিয়া আমাকে তোমার কাছে যাইতে দেয় না। তুমি একটু বলিয়া দাও যেন তিনি আমাকে আক্রমণ না করেন। প্রভু ! আর আমার যাইবার স্থান নাই। তুমিই কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয়, তুমি কৃপা কর।

দেরাদুনে।

সব ভাল থাকিবে তবে শ্রীভগবানকে নিশ্চিন্ত হইয়া ডাকিব এই ঠিক করিয়া যিনি বসিয়া থাকেন তাঁর বেশী কিছু একটা হয় না! যতই গোলমালে কেন না পড়ি ত্রিসন্ধ্যায় তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ডাকিতেই হইবে এবং সমস্ত দিন সকল কার্য্যের প্রথমে, সকল বাক্য ব্যবহারের প্রথমে এবং সকল ভাবনা উঠিবা মাত্র তাঁহাকে স্মরণ করা চাই এবং কার্য্যের মধ্যে যে বিরাম তাহাতেও তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে নাম করা চাই। এ সমস্ত করিতে করিতে এমন অবস্থার আভাস পাওয়া যায় যাহাতে শেষের অবস্থাতে নিজের সাধ্যমত তাঁহাকে স্মরণ করা যাইতে পারে। পরে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর আইসে। ফল কথা প্রতি বিপদে—কি শারীরিক, কি মানসিক, কি পারিবারিক, কি মানব জাতি সম্বন্ধে অথবা যাহা কিছু চক্ষে পড়িবে তাহার বিপদ বা অনিষ্টকালে—সকল বিপদে প্রথমেই তাঁহাকে জানাইতে অভ্যাস করা চাই। এমন কি শাস্ত্র বুঝিতেও যখন গোলযোগ হয়, বহু জনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা শুনিয়া যখন শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি তাহার নির্দ্ধারণে সন্দেহ আইসে তখন কোন একটা মীমাংসায় আসিবার পূর্ব্বে কাতর হইয়া তাঁহাকে বলা চাই "প্রভু! আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি কৃপা কর" এই বলিয়া তাঁহার কাছেই প্রশ্নটি উত্থাপন করা চাই। এইরূপে সকল কার্য্যে, সকল বাক্যে এবং সকল ভাবনায় ভগবৎ স্মরণ যদি কেহ অভ্যাস করিতে পারেন তবে তিনি আপনিই অনুভব করিতে পারিবেন শ্রীভগবানের কি অপার করুণা।

আমরা বড় সুন্দর স্থানে আসিয়াছি। "ফলে ফুলে তৃণ পল্লব দলে" প্রকৃতি এখানে বড়ই সুন্দর সাজিয়া আছে। কিন্তু আমরা নানাপ্রকার গোলমালে পড়িয়াছি। এই বিদেশে আমরা যাঁহাদিগকে আত্মীয় ভাবি তাঁহারা কেহ এখানে নাই। কেবল সেই পরম আত্মীয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে থাকিতে হইতেছে। আমাদের মধ্যে দুইজন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ছটফট করিতেছে। যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিলেও মন সুস্থ হইতে পারিতেছে না। তার উপর অকস্মাৎ আগত ভয়ানক গ্রীষ্মে শরীর এত অবসন্ন হইয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বের অভ্যাস গুলি ঠিক ভাবে করা যাইতেছে না।

প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম করিতে বসিয়া দেখি মন যেন কেমন এক প্রকার হইয়া আছে। প্রথমেই তোমার স্মরণে মনকে একটু সতেজ করিবার চেষ্টা করা

হইল। মা! এই প্রকৃতিরূপে তুমিইত যেন সর্ব্বদা কি করিতেছ। বৃক্ষ লতা তৃণ পশু পক্ষী সকলেই আপন আপন কর্ম্ম করিতেছে সত্য কিন্তু মধ্যে থাকিয়া তুমিও তোমার কোন এক দুর্লক্ষ্য কর্ম্ম করিতেছ। বাহ্য প্রকৃতির যাহা কিছু সরস সেখানে তুমি সরস্বতী আছই। এই দেহ ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরস আছে, শুষ্ক হইয়া যায় নাই; এ কেবল তুমি ইহাকে সরস রাখিয়াছ বলিয়া। যে দিকে দেখি সেই দিকেই প্রাকৃতিক সরস বস্তু। তাই বলি তোমাকে ত সর্ব্বত্র পাইতেছি।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

শুধু এই নহে। কিন্তু—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

এইরূপ স্মরণে মনটা একটু জাগিল। তখন প্রণাম করিতে বড় ইচ্ছা হইল। শরীর আলস্যে ভরা। কিন্তু ইষ্টমন্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রণাম চলিতে লাগিল। সেই সময়ে মনে হয় নাই কিন্তু লিখিবার সময় মনে হইল—

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষাণায় সুরমানুষ তির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্ত্বত্তো বিভ্যেত্যখিল মোহকরী চ মায়া॥

হে রাম। ভুবন সমূহ তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ। করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি দেবতা, মানুষ, পশু ও পক্ষ্যাদির দেহ ধারণ করিয়াছ। অথচ তুমি দেহের গুণে লিপ্ত নও। তোমার অখিল মোহকরী মায়াই,—যাহা কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, অনুভব করা যায়—এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে তোমাকে আচ্ছাদন করিয়া এবং তোমার সান্নিধ্যে চৈতন্য দীপ্তা হইয়া জীবের মোহ উৎপাদন করিতেছে। এই সমস্ত স্মরণে মন সরস হইল। তখন নিত্য কর্ম্ম একটু প্রাণ দিয়া করা হইল। তৎপরে পূর্ব্ব সঙ্কল্পমত একটু বাহিরে ভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গেল।

প্রণাম করা—মাং নমস্কুরু—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনা। সকলেই সকল অবস্থাতে ইহা অভ্যাস করিতে পারেন। কিন্তু বলিয়া রাখা আবশ্যক আহার শুদ্ধি ও আচার শুদ্ধি যাঁহারা করেন না তাঁহারা রজগুণের তরঙ্গে এতই বিষয়ে তরঙ্গায়িত থাকেন যে যাঁহার উপরে এই বিচিত্র সৃষ্টি, সমুদ্রের উপরে তরঙ্গ ভাসার মত ভাসিতেছে, কিয়ৎক্ষণ স্থিতি লাভ করিয়া পরে লয় হইয়া যাইতেছে—যাঁহার উপরে সৃষ্টি স্থিতি লয় খেলা করিতেছে তাঁহারা তাঁহাকে, লোকে বলিয়া দিলেও কিছুতেই বেশীক্ষণ মনে রাখিতে পারেন না। আহার শুদ্ধি ও আচার শুদ্ধি না হইলেও সত্ত্ব গুণ জাগে না। সত্ত্বগুণ না জাগিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে মনে রাখা যায় না। শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন ইহা বুঝিলে কি হইবে শ্রীমন্নারায়ণ সমস্ত সৃষ্টিজাতকে ভিতরে বাহিরে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

ইহা বিশ্বাস করিলেই বা কি হইবে নিত্যকর্ম্মে, আহার ও আচারে, চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণে আনা যাইবে না। যাহা হউক আমরা সন্ধ্যাবন্দনার সমস্ত মন্ত্র ও সমস্ত কার্য্য করিবার কালে প্রণাম অভ্যাস করিতে রস পাইলাম ও "মাম্ নমস্কুরু" মনে রাখিয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম।

বাড়ীর চারিদিকেই নানাপ্রকারের ফল ফুলের গাছ; গাছে গাছে বিচিত্র পক্ষীর সুমধুর কাকলী। যাহা দেখি তাহাই সে মনে ভাবিয়া মনে মনে নমস্কার করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইলাম। সহরের যে স্থানে আমরা আছি তাহার নাম করণপুর। এ সহরে লেন ষ্ট্রীট নাই বলিলেই হয় সবই রোড। ভারতের বড় লাট প্রভৃতির নামানুকরণে পথগুলির নাম রাখা হইয়াছে, যথা—রিপণ রোড, ল্যাংসডাউন রোড, কর্জ্জন রোড, লিটন রোড ইত্যাদি। রাস্তাগুলি পরিস্কার। প্রায় রাস্তাই স্নিগ্ধছায় তরুর ছায়ায় ছায়ান্বিত। আমরা গ্রীষ্মকালে এখানে আছি, স্নিগ্ধছায় তরুগুলি বড় সুন্দর মনে হইতেছিল। সত্য কথা বলিতে কি, এত বড়, এত সরল বৃক্ষ বুঝি অন্যত্র দেখি নাই। সরল বৃক্ষ যেন বড় পুণ্যবান্। খর্ব্ব বৃক্ষে যেন এ ভাব আসে না। সরল বৃক্ষে যেন তাঁর বিভূতি বেশী। প্রশস্ত রাস্তায় সরল বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় চলিতেছি। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকারের পুষ্পবৃক্ষে কোথাও লাল কোথাও নীল কোথাও শুভ্র

পুষ্প, গুচ্ছে গুচ্ছে স্তবকে স্তবকে বায়ুর সহিত কি যেন কি খেলা করিতেছে! সকলকেই মনে মনে নমস্কার করিতে করিতে যাইতেছি! প্রাণ যেন আনন্দে ভরিয়া যাইতেছে। যাঁহকে মন্ত্রে মন্ত্রে নমস্কার করিতে ছিলাম তাঁহাকে বাহিরেও সর্ব্বত্র নমস্কার করিতে পাইয়া কত আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারিতেছি না। রাস্তায় মানুষ নাই বলিলেই হয়। নির্জ্জনে তাঁহার সঙ্গ কি বড় ভাল লাগে? কিন্তু তাই হইতেছিল। গাছে গাছে কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, বউ কথা কও, তক্ষক, ঘুঘু কত রকমের পাখীর শব্দ শুনিতেছি আর সর্ব্বত্র নমস্কার পাঠাইতেছি। মধ্যে মধ্যে দুই এক বালক, বৃদ্ধ, বালিকা বা বৃদ্ধা দেখিয়াও মনে হইতেছে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

আর যষ্টী হস্তে বৃদ্ধকে চলিতে দেখিয়াও মনে হইতেছে—

ত্বং জীর্ণোদণ্ডেনবঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ॥

এমন কি গ্রাম্যজন্তুর উপরেও এই নমস্কার প্রেরণ করিতে ভুল হইতেছে না। লিটন রোড হইতে দক্ষিণমুখে কতকদূর গেলেই একটি বড় মাঠ। মাঠের পূর্ব্ব সীমানার রাস্তা ধরিয়া আবার দক্ষিণ সীমানার রাস্তা। ঐ রাস্তার শেষ প্রান্তে এক গীর্জ্জা। আজ রবিবার। তখন উপাসনা হইতেছিল। স্ত্রীকণ্ঠে গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম শুনা যাইতে ছিল। প্রথমে একটু সমালোচনার ভাব আসিতে ছিল কিন্তু যিনি আজ প্রাণজুড়িয়া বসিয়াছেন তিনি বলিয়া দিতেছেন সব আমি, মাং নমস্কুরু! কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া যাইতেছিল। দক্ষিণ মুখের রাস্তার পরেই পশ্চিম সীমানার রাস্তা। সেই রাস্তার মাঝখানে মাঠের মধ্য দিয়া যে রাস্তা উত্তর মুখে গিয়াছে সেই রাস্তা ধরিয়া বাড়ী ফিরিব। অর্দ্ধেক রাস্তা আসিয়াছি হটাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল। কি সুন্দর! কিছু দূরেই মুসুরী পাহাড়। তখনও পাহাড়ের উপরে তরল কুজ্ঝটিকার মত মেঘগুলি স্থির হইয়া যেন কি করিতেছিল। "মাং নমস্কুরু" করিতে করিতে এই হিমগিরির শাখা প্রশাখাকে কত কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল। জয়দেবের—

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকর রূপ
জয় জয় দেব হরে!

পাহাড় দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন বিশাল বরাহ শরীর ধারণ করিয়া কি করিতেছে। আহা! প্রণাম! সব প্রণাম। হয় ত কৃষ্ণপক্ষের শেষরাত্রিতে চন্দ্র উঠিলে আর সেই চন্দ্রের উজ্জ্বল এক কলা অঙ্গীভূত করিয়া যে কৃষ্ণবর্ণ অস্পষ্ট গোলকমত পৃথিবীর ছায়া ভাসে তাহা দেখিলে জয়দেবের "বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্নার" দৃষ্টান্তটি ভাল করিয়া দেখা যাইত। আমি আপন মনেই চলিতেছি কিন্তু মাঠের মধ্য রাস্তার মাঝখানে একজন মানুষ আমাকে বহুক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই রাস্তায় দুই চারিজন লোক যাওয়া আসা করিতেছে দেখিয়া আমি রাস্তা হইতে মাঠে নামিয়া চলিতেছি। সেই লোকটির নিকটে আসিবামাত্র তিনি বলিলেন মহাশয়কে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি নিকটে আসিলাম। লোকটি অতিবৃদ্ধ, তিনি বলিলেন তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর। ক্রমে পরিচয় হইল। তিনি ব্রাহ্মণ। বহুদিন হইতে এই প্রদেশে আছেন। ঋষিদের মত শুভ্র শ্মশ্রু বিশিষ্ট। তিনি দুই এক দণ্ড হাঁটেন আর হাঁপাইয়া পড়েন বলিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বিশ্রাম করেন। তিনি আমাদের হিন্দু জাতির আচার, আহার ও সন্ধ্যাবন্দনাদির ব্যভিচার দেখিয়া দুঃখের কথা কহিতেছিলেন। বলিতেছিলেন শাস্ত্র পড়িলেই শুধু হইল না, শাস্ত্রমত অনুষ্ঠান করা ভিন্ন এই জাতির কল্যাণ কিছুতেই হইতে পারে না। দেখিলাম লোকটিকে বহুলোকে জানে এবং মান্য করে। ঐ সময় রাজা রণবীর সিংহ শকটারোহণে ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। এই বৃদ্ধ মহাশয়কে দেখিয়া তিনি দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন করিলেন এবং ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। আর বৃদ্ধ মহাশয় ইঁহার পরিচয় দিতে দিতে আসিতে লাগিলেন। রাস্তায় আরও দুই চারিজন ইঁহাকে অভিবাদন করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে আসিতে আসিতে "মাংনমস্কুরু" সার্থকতা দেখিতে ছিলাম। ক্রমে আমাদের বাসার দক্ষিণ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তায় তিনি চলিয়া গেলেন। আমিও বাসাতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলিতেছিলাম যাঁহারা সর্ব্বদা ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীভগবানকে স্মরণে রাখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যদি প্রণাম অভ্যাস করিতে করিতে মন্ত্ররূপী ভগবানের নাম সর্ব্বদা যথাসাধ্য জপ করেন; যদি "মাংনমস্কুরু" মনে রাখিয়া সন্ধ্যা বন্দনার মন্ত্র গুলিকেও মন্ত্ররূপী তিনি ভাবিয়া নিত্য কর্ম্ম গুলি করেন; প্রাণায়ামেও চক্রে চক্রে উঠা নামায় "মাংনমস্কুরু" অভ্যাস, রাখিতে রাখিতে শব্দব্রহ্মরূপীকে প্রণাম করেন তবে কি তাঁহার করুণা সর্ব্বদা অনুভব করা যায় না? অভ্যাস করিয়া

দেখিলে এই সহজ সাধনা যে ধ্রুব সত্য তাহা অনুভব হইবেই। আর একটি কথা এখানে বলিয়া উপসংহার করিতেছি। যতদিন কাহাকেও দেখিয়া ভাল, কাহাকেও দেখিয়া মন্দ লাগিতেছে, কাহাকেও মনে হইতেছে এ শত্রু, কাহাকেও মনে হইতেছে এ মিত্র; এক সময় কিছু ভাল লাগিতেছে অন্য সময়ে তাহাই আবার ভাল লাগিতেছে না—যতদিন মনের ভাব এইরূপ থাকিব ততদিন নিত্যকর্ম্ম ঠিক হইতেছে না জানিও। শত্রু মিত্র, লাভ অলাভ, ভাল মন্দ এ বোধ যদি না থাকে তবে কি সংসার চলে? চলে। বাহিরে যাহা দেখিবে তাহাকেই মনে হইবে এও যে সে; কিন্তু বাহিরে ব্যবহার চলার মত কাজ করিতে হইবে। কৌশল করিয়া ন্যায় পথেই চলিতে হইবে। দুষ্ট লোকের প্রতারণায় গা ঢালিয়া দিতে হইবে না। সব মিথ্যা জানিয়াও আত্মরক্ষার জন্য ফোঁস ফোঁস করিতে হইবে। আর কংস রাজ্যেও বোকার মত যেখানে সেখানে কৃষ্ণনাম করিলে চলিবে না। আপনাকে আপনি বাঁচাইয়া ব্যবহারিক জগতে চলিতে হইবে।

ইহা কি বড় সহজ? না তা নয়। তবে অভ্যাস করিলে কি না হয়? যাহা উপরে লেখা হইল সেইটিকে জীবনের প্রধান কার্য্য মনে করিয়া, সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্ব চিন্তা সর্ব্বভাবনা তাঁহাকে জানাইয়া করিবার অভ্যাসটি প্রাণপণে করিতে চেষ্টা করিলে শেষটুকু তিনি করিয়া দিবেন। ইহাই ব্যবহারিক জগতে থাকিয়া প্রারব্ধক্ষয়ের সহজ উপায়। শ্রুতিও বলেন সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া দেহান্তে তাঁহার সহিত মিলিত হইব এই দৃঢ় বিশ্বাস যিনি রাখেন তাঁহারই সিদ্ধি হয়।

কোন্‌টি তুমি?

এই কি তুমি? এই যে যাহা দেখিতেছি? না। ইহা তুমি নও। এই যে যাহা দেখিতেছি ইহা তোমার উপর ভাসিয়াছে। তোমাকে লইয়া—তোমার উপরে ভাসিয়াছে—আবার তুমি না থাকিলে ইহা ভাসিতে পারিত না তাই বলা হয়, ইহাও তুমি। তবে এই যে যাহা দেখিতেছি তা তুমি নও, আবার তুমিও বটে। একটা সর্প রজ্জুর উপরে ভাসিয়াছে। সর্পটা রজ্জু নহে। সর্পটা সত্য সত্যই নাই। রজ্জুটাই সর্পরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিবর্ত্ত সর্পটি যখন দেখা যাইতেছে তখন সর্পটি রজ্জুও বটে। কারণ রজ্জু না থাকিলে সর্পটি

ভাসিত না। যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা। যাঁহাতে এই বিচিত্র সৃষ্টি মিথ্যা হইয়াও সত্য মত দেখা যাইতেছে। সত্য সত্যই জগৎ নাই। তথাপি যখন দেখা যায় তখন তোমাকে লইয়াই জগৎ ভাসে বলিয়া জগৎও তুমি বটে। এই ভাবে জগৎকে তুমি বলিয়া যখন জগৎ নাই তুমিই আছ বলা যায়; অসত্যের সাহায্যে—মিথ্যার সাহায্যে যখন সত্যে পৌঁছান যায় তখন মিথ্যা জগতও বড় উপকার করে। শ্রুতি ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত।" এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম কারণ ব্রহ্ম হইতেই—জন্মিতেছে "তজ্জ", ব্রহ্মেই লয় হইতেছে "তল্ল", আর ব্রহ্মেই ইহা স্থিতি লাভ করিতেছে "তদন"। শান্ত হইয়া ইহাই উপাসনা কর।

আপনাকে আপনি দেখা।

চক্ষুই সব দেখে। নিজের চক্ষুকে নিজে দেখা যায় কিরূপে? দুই প্রকারে দেখা যায়। দর্পণে যে দর্শন হয় তাহাতে চক্ষু দেখা যায় না তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। প্রতিবিম্ব দেখিয়া যে আত্মতৃপ্তি হয় তাহাতেই মনে হয় চক্ষু দেখিলাম। এইত দেখিলাম—ইহাই চক্ষু আর কি চেষ্টা করিব! মানুষ পরিশ্রম করিতে বড় অনিচ্ছুক। কিন্তু ঐখানে না থামিয়া দর্পণে দেখার সংস্কার লইয়া প্রকৃত চক্ষুকে দেখিতে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে চক্ষুকে শিবচক্ষু করা হইয়া যায়। ইহাতে ত্রাটক হয়। দর্পণে দেখার সংস্কারের সঙ্গে এই ত্রাটকের দেখা মিশাইলে একটা স্থির ভাব আইসে। সেইটি ধ্যান। বিনা ধ্যানে প্রকৃত রূপ দেখা যায় না। যে বস্তুর ধ্যান করিবে তাহারই প্রকৃত স্বরূপটি দেখা যাইবে। দর্পণে দেখাটি ভক্তি যোগ। ভক্তি যোগের সাহায্যে জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিলে তবে ধ্যান যোগ হয়। ধ্যান যোগ ভিন্ন আপনাকে আপনি দেখা যাইবে না।

এখন আর এক রকম করিয়া এই বিষয়ই বলা যাউক। যিনি দ্রষ্টা তিনি চেতন। যাহা দৃশ্য তাহা জড়। আমি চেতন আমি জড় নহি। আমি জড়কেই দেখি। আমি আমাকে-চেতনকে দেখি কিরূপে? আমি চেতন ইহা স্থূল চক্ষে দেখা যায় না। অনুভবচক্ষে দেখা যায়। আমি চেতন। সমস্ত জড় হইতে আমি পৃথক। চেতন আমির একটা অনুভব ত আছেই। সেই অনুভবটি জড়

বস্তু দেখিতে দেখিতে হারাইয়া যায়। তাই ইহা নয় ইহা নয় করিতে করিতে, নেতি নেতি, করিতে করিতে একটি স্থির ভাবে আসা যায়। চেতন অনুভূতির তখন ধ্যান হয়। ধ্যান হইলেই—বহুদিন ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে একটি আত্মতৃপ্তি আইসে। ধ্যান করিতে করিতে আত্মতৃপ্তিরূপ আনন্দ আসিলেই খণ্ড চৈতন্যের স্বরূপ যে পূর্ণ চৈতন্য তাহাতে স্থিতি হয়। ইহাই আপনাকে আপনি দেখা। আপনাকে আপনি দেখার একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। একটি ঘট আছে। ঘটের ভিতর যেন একখণ্ড আকাশ আছে। ঘটের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াই আকাশটি যেন খণ্ডপ্রায় হইয়াছে। এই আকাশখণ্ডটি চতুঃপার্শ্বে শুধু ঘটই দেখিতেছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে মহাকাশের একটা যোগ আছে। শ্রীগুরু এই যোগটি দেখাইয়া দিলেন। খণ্ড আকাশ ঘট দেখিতেই অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে। মহাকাশ দেখিতে গেলে বহুকাল ধরিয়া ঘট দেখার যে সংস্কার তাহা বাধা দিতেছে। তখন ঘটাকারকারিত চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ঘটটা যে কিছুই নয় বহুদিন ধরিয়া এই বিচার করিতে হয়। বিচার করিতে করিতে ঘট সম্বন্ধে একটা বৈরাগ্য আসিবেই। এই বৈরাগ্যের সাহায্যে আমি আকাশ আমি ঘট নহি, প্রথমে এই অনুভূতি আসিবে। তার পর মহাকাশ সম্বন্ধে শ্রবণ মনন ত গুরুমুখে শোনা হইয়াছে। খণ্ড আকাশ তখন মহাকাশ সম্বন্ধে নিরন্তর চিন্তা করিতে পারিবে। খণ্ড আকাশ স্বরূপ আমি তখন অনুভবে মহাকাশ স্বরূপ তোমাতে একটু একটু স্থিরত্ব লাভ করিতে পারিবে। যতই আমি চেতন এই অনুভবটিতে স্থির হইতে পারিব ততই মনে হইবে আমার চারিদ্দিকে যেন মহাকাশের অনুভবটি প্রবল ভাবে আসিতেছে। এই উপরের মহাকাশকে যখন আমরা দেখি তখন চক্ষে যতটুকু আঁটে তত টুকুই মাত্র দেখা হয় কিন্তু মনে অনুভব হয় যেন অখণ্ড আকাশই দেখিতেছি। এখানেও তাই হয়। আমি চেতন এই অনুভবটি লইয়া থাকার অভ্যাস কর, যতদিন পর্য্যন্ত ইহাতে একটা আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া না যায় তত দিন এই অভ্যাস লইয়া দৃঢ় ভাবে থাকিতে হইবে। আনন্দ পাকা হইলেই আপনাকে আপনি দেখা হইল ইহাই সমাধির ক্রম।

যাঁহারা বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহারা কিন্তু এই পথে যান না। তাঁহারা শ্রীভগবান আছেন, তিনি আমার প্রিয়জন—ইহা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাঁহার নাম করিলেই সুখ হয় ইহাও তাঁহারা স্থির বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসী ভক্ত গত বিষয়ের জন্য কিছুই ভাবেন না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও ভাবেন না। উপস্থিত কালে

যাহা হইতেছে তাঁহারা তাহাই ভাবেন। সর্ব্বদা নাম জপ লইয়া থাকা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের জন্য বর্ত্তমানে যাহা কিছু দোষ ঘটিতে চায় তাঁহারা তাহাও নাম জপের দ্বারাই নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন এবং সমর্থও হন।

মনে করা হউক কোন বিশ্বাসী ভক্ত উকিল কিম্বা বক্তা ছিলেন। ইঁহার প্রধান দোষ হইবে বহু প্রকার চিন্তা করা। ইঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে ভিতরে ও বাহিরে কথা কওয়া বন্ধ করা। যখন ভিতরে ইনি দেখিবেন মন বিনা প্রয়োজনে কথা কহিতেছে তখনই ইনি ভাবনা করিবেন এ সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ। এই অসম্বন্ধ প্রলাপ করিয়াই উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছিলাম। ইহা করাতেই আমার সকল প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া আসিতেছিল। শ্রীগুরু আমাকে নাম দিয়াছেন, ইষ্টমন্ত্র দিয়াছেন। আরও বলিয়া দিয়াছেন, বাবা! গুরু উপদেশ ও শাস্ত্র বাক্য মত মনটিকে গঠন কর। অর্থাৎ গুরু বাক্যে ও শাস্ত্র বাক্যে তোমার মন প্রতিষ্ঠিত হউক। শাস্ত্র বলিতেছেন জগতে সকল বস্তুই নশ্বর সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। এখানে আকাঙ্খার বস্তু কিছুই নাই। সমস্ত ভোগই নশ্বর, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী। এখানে এক মাত্র পাইবার বস্তু শ্রীভগবান্। তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। আর সমস্তই অসত্য। সমস্ত ক্ষণিক, সমস্তই মায়িক। সমস্তই ইন্দ্রজাল। শ্রীভগবান্ মন্ত্ররূপী। মন্ত্রটিই জীবন্ত ভগবান্। তুমি অন্য অভিলাষ ছাড়িয়া মন্ত্রজপটি লইয়াই থাক। যখন তোমার মনে অন্য চিন্তা উঠিবে তখনই তুমি ঐ চিন্তা অসার ভাবিয়া নাম জপ করিবে। কিছু দিন অভ্যাস কর, দেখিবে মন্ত্ররূপী ইষ্টদেবতা তোমার মনে আর অন্য চিন্তা উঠিতে দিবেন না। ভিতরে মনের কথা কওয়া বন্ধ করিতে পারিলেই বাহিরের কথা ও বন্ধ হইয়া আসিবে। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা কহিতে তোমার ইচ্ছা হইবে না। যতক্ষণ অন্য কথা কহিবে ততক্ষণ তুমি প্রণাম ও প্রদক্ষিণ সহ মন্ত্রজপ করিয়া সুখী হইবে।

আর একটা দোষের কথা লওয়া হউক। যদি বয়স ৪০ বৎসরের বেশী হইয়া গিয়া থাকে তবে ভিতরে শুধু শুধু কথা কওয়াটা যেন রোগরূপে দাঁড়ায়। আহারটা মুখরোচক হওয়া চাই এটাও একটা প্রবল রোগ হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ এই বয়সে বাক্য সংযম ও আহার সংযম যে অত্যন্ত আবশ্যক তাহা তিনি বোধ করিয়াও সংযত হইতে পারেন না। আহার করিতে বসিয়া আহার্য্য সামগ্রী সুখাদ্য হইলে তিনি লোভ বশতঃ গুরু আহার করিয়া ফেলেন। আর নিত্য কর্ম্মটি তখন ঠিকমত হয় না বলিয়া প্রত্যহ অনুতাপও করেন। আহারের রোগটিও নাম জপে দূর হয়।

শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া পরে নামজপ করিতে করিতে আহার করিতে হয়। তাহা হইলে নামজপে মন থাকে বলিয়া মন আর নিপুণ হইয়া রুচির সঙ্গে আহার করিতে পারে না। যতটুকু আহারে জীবন ধারণ হয় ততটুকু মাত্র আহার হয়। নামরূপী শ্রীভগবান লোভ সরাইয়া দিয়া আহার সংযম করিয়া দিয়া থাকেন। সর্ব্বদিকেই তিনি ভিন্ন রক্ষাকর্ত্তা আর কে? প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অবস্থায় ভিতরে শুধু শুধু কথা বলা, লোক দেখিয়া যাহারা শুনিতে চায় না তাহাদিগকেও উপদেশ দেওয়া, আহারটি বিশেষ মনোযোগের সহিত করা—আর রুচি পূর্ব্বক আহারের সময়ে সুন্দর খাদ্য সম্বন্ধে মনে মনে বড় রুচিকর ভাবনা করা—এই বয়সের এই দুই রোগ বড়ই প্রবল রোগ। বিশ্বাসী ভক্ত নামজপ দ্বারা এই দুই রোগের প্রতিকার করেন। তিনি যখন সর্ব্বদা জীবন্ত ভগবানকে নামজপে স্মরণ করিতে পারেন তখন তিনি আর ভবিষ্যতের কোন কথা ভাবেন না। হা ঠাকুর! আর আমার কোন যোগ্যতা নাই। আমি ভাবনা রাজ্যেও উঠিতে পারি না আর বিচার রাজ্যেও তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমার শক্তি নাই, প্রবল যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ধারণাধ্যান সমাধিও আমি করিতে পারিলাম না, আমি তোমার নাম লইয়াই আছি; নিরন্তর নামই জপ করিব। বাকী যাহা তুমি করিয়া দিও। সেও তোমার ইচ্ছা। যাহাতে আমার ভাল হয় তুমি করিয়া দিও। আমি নিত্য কর্ম্মে তোমার আজ্ঞা পালন করিতে প্রাণপণ করি আর সর্ব্বদা তোমার নাম জপ করি এই আমার কার্য্য। বিশ্বাসী ভক্তের পথ ও বেশ নিরাপদ। তিনি জ্ঞানীর মত সবল নহেন। দুর্ব্বল সন্তান যেমন সকল কার্য্যে মাতার সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি ও সেই প্রকার কি গতি হইবে—না হইবে সে বিষয়ে ইষ্টমন্ত্ররূপী মাতার দিকে সর্ব্বদা তাকাইয়া থাকেন। আর শ্রীভগবান্ এরূপ বিশ্বাসী ভক্তের সকল ভারই গ্রহণ করেন।

আর একপ্রকার ভক্ত আছেন তাঁহারা পার্থিব রসের সাহায্যে অপার্থিব শ্রীভগবানকে ভোগ করিতে চান। ইঁহারা আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতে চান "আস্বাদিতে ইচ্ছা হয় আস্বাদিতে নারি" এই জন্য ইঁহারা মনে করেন—"যে আমাকে পূর্ণরূপে অস্বাদন করিয়াছে, যে আমাকে বেশ করিয়া ভাল বাসিয়া নানাপ্রকারে ভাল বাসার রস আস্বাদন করাইয়াছে; আমি যদি তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে সেইরূপ হইয়া যাইতে পারি তবে সে হইয়া আপনাকে আস্বাদন করা আমার সহজ হয়।" ইঁহারা আরোপের ভিতর দিয়া যান আর আপনাদিগকে

রসিক ভক্ত বলাইতে চান। সাধারণে এই পথে অতিশীঘ্র আকৃষ্ট হয় এবং অতি-শীঘ্র ইহাদের পতনও হয়। বড় সংযমী পুরুষও, এই পথে ঠিক থাকিতে পারেন না। এ পথ সাধারণের জন্য নহে। আপনার প্রণয়ের কথাই ইহারা রাধাকৃষ্ণের নামে প্রকাশ করিতে চান। ইহাদের কথা অধিক লেখা আমরা আবশ্যক মনে করি না। নাম করা সহজ পথ। নাম করিতে করিতে নিজের দোষ গুলি সংশোধন করিতে হইবে। এই ভাবে চিত্ত শুদ্ধি করিয়া শ্রীভগবানের লীলা সরস ভাবে ভাবনা করা হইলে বাহিরের আরোপ আর আবশ্যক হয় না। ভিতরেই রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, হরপার্ব্বতী—ইঁহাদিগকে লীলা করিতে দেখা যায়। এই ভাবে ভক্তি রস জাগিলে তখন আপনাকে আপনি দেখা সহজ হইয়া যায়। ভক্তিমার্গের কার্য্যগুলি কলঙ্ক শূন্য হইয়া করিতে পারিলেই ভগবান্ আপনি হাত ধরিয়া মৃত্যু সংসার পার করিয়া দিয়া থাকেন। আপনাকে আপনি দেখাইয়াও দিয়া থাকেন।

ভক্তিমার্গ নিরুপদ্রব হইলেও এইটি দৃঢ় করিয়া ধরা চাই যে যাঁহাকে আমি হৃদয়ে ভাবনা করি তিনিই বিচিত্র মূর্ত্তিতে বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র লীলা করেন। কাজেই শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিৎ, নিজের সম্প্রদায়ের লোক, অন্য সম্প্রদায়ের সাধক সর্ব্বত্রই তিনি। তাঁহার সেবাই ভক্তের ব্যবহারিক কার্য্য। ভিতরে বাহিরে সেবা ধর্ম্মই ভক্তের প্রাণ। সেবা ধর্ম্ম নাই অথচ ভক্ত; এ হয় না। তবে তামসিক—রাজসিক ভক্তের কথা স্বতন্ত্র। তাহা এখানে বলা হইল না।

মহাস্বপ্ন।

দুঃখী জীব স্বপ্ন দেখিতেছে। সীমাশূন্য আকাশ ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন। ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত বহিতে লাগিল। মুষল ধারায় বৃষ্টি পাত হইতে আরম্ভ হইল। চকিত বিদ্যুচ্ছটা চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। ভীষণ বজ্র নিনাদে কর্ণ বধির প্রায়। দুঃখী জীব উন্মুক্ত প্রান্তরে লক্ষ্যহীন হইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। প্রবল বন্যার জলে চারিদিক প্লাবিত হইয়া গেল। জীবনের আশা বুঝি আর

নাই। বিপন্ন জীব সম্মুখে একটী বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া উহাতে আরোহন করিল। জলপ্লাবন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একমাত্র আশ্রয়স্থল বৃক্ষটী বোধ হয় এইবার জলে ডুবিয়া যায়। এইবার জীবন দীপটী নিভিয়া যাইবে। জীব নিরাশ্রয় হইয়া কাতর প্রাণে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। সীমা শূন্য আকাশ দেখিয়া কাহার কথা যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। মহাবাক্য মনে পড়িল—"বাতুল কিং তব নাস্তি নিয়ন্তা"। প্রাণে যেন একটু বল আসিল। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি তাঁহার উদ্দেশে জীব, হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিবেদন করিল এবং যুক্ত করে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া বলিতে লাগিল—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভিষ্ট দোহং।
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যং॥
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥"

কাতর প্রার্থনা বুঝি ঠাকুরের চরণতলে পৌছিল। কোন এক শীতল হস্ত মর্ম্ম স্থল স্পর্শ করিয়া গেল। জীব যেন দেখিতে পাইল—সহস্রদল শ্বেত পদ্ম—পদ্মের উপর বামভাগস্থিতা, পদ্মহস্তা শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত শান্ত ও করুণাময় পুরুষ আসীন। তিনি শ্বেত মাল্য ও চন্দনে ভূষিত হইয়া করদ্বয়ে বর এবং অভয় লইয়া সহাস্য বদনে সন্তানকে ডাকিতেছেন। জীব যেন শুনিতে পাইল—দুঃস্থ জীব! এ জীবন একটী স্বপ্ন মাত্র, ইহা একটী মনোবিলাস। বিপদ এখানে কিছুই নাই। আসিয়াছ তাহাকে পাইতে। তবে কতকগুলি প্রারব্ধ বাধা দিবেই। প্রারব্ধ লোভেরই দণ্ড। যাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছ তাঁহাকে ডাকিতে ভুলিও না। তাঁহাকে ডাক আর প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাও। প্রারব্ধ বশে যে কর্ম্ম আসিয়া পড়িবে তাহা তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে কি হইবে না হইবে লক্ষ্য না করিয়া প্রাণপণে দায় উদ্ধারের জন্য করিয়া যাও। এই পর্য্যন্ত তোমার হাতে, শেষটুকু তিনি করিবেন। তিনি যাহা করিবেন তাহা বৃক্ষ যেমন বৃষ্টি ধারা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে সেইরূপ মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। ব্যাকুল হইও না। যতটুকু করা কর্ত্তব্য—আবশ্যক বোধে শ্রীহরি স্মরণে তাহাই করিয়া যাও।

জল ভরা মেঘ শীতল বায়ুর স্পর্শে যেমন গলিয়া জল হইয়া পড়ে সেইরূপ শ্রীগুরুর আশ্বাসবাণী শ্রবণে মোহগ্রস্থ জীবের স্বপ্ন বিকার যেন কাটিয়া গেল।

ক্ষণিকের জন্য জীব যেন জাগ্রত হইয়া দেখিল প্রকৃতির সে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি আর নাই। কিন্তু দেখিতে দেখিতে হতভাগ্য জীব আবার ঘুমাইয়া পড়িল। আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। মহাস্বপ্নের ভিতরে আবার অনন্ত স্বপ্ন। ইহার অবসান কোথায়? যিনি এই মহাস্বপ্ন দেখিতেছেন তিনি জাগ্রত না হইলে জীবের এই অনন্ত স্বপ্নের অবসান নাই। তিনি কে? তিনি অধিষ্ঠান চৈতন্য। তিনি বদ্ধ জীব চৈতন্য। তিনি মহাকাশের খণ্ডাকাশ। খণ্ড অখণ্ডের সহিত মিশিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। কিন্তু নাম রূপবিশিষ্ট দেহটাই এক বিষম অন্তরায়। এই দেহাত্ম বুদ্ধি দূর করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। ইহাই "মামেকং শরণং ব্রজ"।

শ্রীগুরুদাস

সাধারণভিত্তি,---ভক্তি ও জ্ঞানের মিলন।

জগৎলীলা।

সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া—কেবল তোমাকে লইয়াইত থাকিতে চাই, কিন্তু আমার এমন হয় কেন? তোমাকে লইয়া থাকিতে গেলে এই সকল লয় বিক্ষেপ কোথা হইতে আইসে? আমার প্রতিবেশী জটিলা কুটিলাগণ এত প্রতিবাদী হয় কেন? না জানি আমার কোথায় কোন ক্রটী হইয়া যায়—তাই এত বিপত্তি! ভক্তি না হইলে জ্ঞান হয় না সত্য কথা—কিন্তু অজ্ঞান নাশ হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়—তবে ভক্তি ও অজ্ঞান নাশ কি এক কথা? ভক্তিতে অজ্ঞান নাশ কিরূপে হয়? ভাল না বাসিলে ভক্তি হয় না। ভালবাসা দুই বস্তুতে রাখা যায় না। ভালবাসার চক্ষে বহু নাই—ভালবাসা শুধু একেই হয়। যাহার চক্ষে একই আছে, তাহার যদি বহু দেখা হইয়া যায় তবে সেই একই বহু সাজিয়া আসিয়াছে।

তুমি নিকটে থাকিলেত জগৎ থাকে না—যদি বা থাকে তবে জগৎ তোমারই মূর্ত্তি। তুমি ভিন্ন জগৎ নাই। যদি থাকে তবে উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আবার যখন তুমি থাক না, তখন জগৎ থাকে—সংসার থাকে—ব্যবহার থাকে। যখন সংসার থাকে—ব্যবহার থাকে—তখন তোমাকে ডাকা হয় না। বিষয়ী হইয়া তোমাকে ডাকা যায় না। তোমাকে ডাকিতে গেলে শত শত

বিষয়চিন্তা নানা প্রকার লয় বিক্ষেপ উৎপন্ন করে। তবে বল এইরূপ ব্যক্তি তোমাকে ডাকিবে কিরূপে? বিষয়ী ব্যক্তি কি তোমার ভক্ত হইতে পারে? বিষয়ী ব্যক্তি কি জ্ঞানী হইতে পারে? উপস্থিত বিষয় চিন্তার ত কথাই নাই, পূর্ব্বে যে বিষয়চিন্তা ছিল এবং যাহা অনাদি সংস্কার রূপে হৃদয়ে রহিয়া গিয়াছে এ সমস্ত যদি সত্য বলিয়া বোধ থাকে তবেইত চিত্ত অশুদ্ধ রহিয়া গেল। অশুদ্ধ চিত্তে তোমার আগমন হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তোমার ভক্ত হওয়া যায় না। এই অনাদি কাল সঞ্চিত সংস্কার নষ্ট হইবে কিরূপে? তুমি সর্ব্বদা নিকটে না থাকিলে সংস্কার যায় না—সংস্কার থাকিতে থাকিতেও তোমার আগমন হয় না। এখন আমি কি উপায় করিব? পূর্ব্ব কর্ম্মফলে সুকৃতির উদয়ে সাধুসঙ্গ লাভ এবং সৎশাস্ত্র পাঠে রুচি হয়,—আর দুষ্কৃতির উদয়ে অসৎসঙ্গ লাভ ঘটে, সৎসঙ্গ যমের মত মনে হয় এবং সৎশাস্ত্র পাঠে অনিচ্ছা আইসে;—তথাপি যদি তোমার ভক্ত হইতে সাধ যায়, তোমার জ্ঞানী ভক্ত হইতে বাসনা থাকে—তখন তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়।

তোমার আজ্ঞানুরূপ কর্ম্মের সঙ্কেত তুমি ত নিজেই বলিয়াছ, গুরু মুখে এবং শাস্ত্রমুখে ব্যক্ত করিয়াছ। শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য নিজের অনুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে মিশাইয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে, সে ক্রমে ক্রমে সৎসঙ্গ লাভ এবং সৎশাস্ত্র পাঠ হেতু তোমার ভক্ত হইতে পারে। একবার এরূপ অবস্থা লাভ করিয়া আবার কেন দুরবস্থা ঘটে? সাধনার অভাব থাকে,—অভ্যাসের ত্রুটী থাকে—তাই এইরূপ হয়। তোমার ভালবাসা যে এক মুহূর্ত্তের জন্য অনুভব করিয়াছে সেই জানে তোমার ভালবাসা যখন জাগিয়াছিল তখন জগৎ ছিল না—সংসার ছিল না। তবেই সাধনার ভিত্তি কি তাহা মিলিল।

তোমার নাম করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুলতা চাই। তোমার নাম করিতে বসিলেই যে শত শত দুশ্চিন্তা আইসে। দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য নাম করি। কিন্তু দুশ্চিন্তা—লয় বিক্ষেপ যায় না ত। ইহাতেই বুঝিতে পারি, আমার দুষ্কৃতি বহু। তখন কাতর হইয়া তোমাকে বলি—নিজের দুঃখের কথা তোমার চরণে নিবেদন করি। তোমার ভালবাসা স্মরণ করিয়া তোমার কৃপা ভিক্ষা করি; ইহাই প্রার্থনা।

সাধনার ক্রম পাইলাম। (১) তোমার নাম করিতে আরম্ভ করা। (২) লয় বিক্ষেপ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া কাতর হওয়া। (৩) তোমার কৃপা প্রার্থনা

করিতে করিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার কৃপা প্রাণে প্রাণে অনুভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাতর ভাবে নাম করা চাই। ইহাই পুরুষার্থ, অন্য সমস্তই উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চল হইয়া তোমাকে ডাকিতে না পারা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার কৃপালাভ হয় নাই—ইহা ধ্রুব সত্য মনে করা উচিত যে ততক্ষণ অশুভ ক্ষয় হয় নাই। যতক্ষণ দৈনিক অশুভ দূর না হয় ততক্ষণ কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে—কাতর হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। লয় বিক্ষেপ শূন্য হইয়া সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে যখন তাঁহাকে ডাকিতে পারা যাইবে তখন তাঁহার কৃপা লাভ হইবে—তাঁহার ভালবাসা হৃদয় মধ্যে অনুভূত হইবে। দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ কে করিয়াছিল, সীতার জন্য রাক্ষস বিনাশ কে করিয়াছিল,—অনশনক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া কে শতবার জিজ্ঞাসা করে,—হৃদয়ে ধরিয়া কে স্তন্য পান করায়,—স্বহস্তে কে আহার তুলিয়া দেয়,—হৃদয়ে দাঁড়াইয়া কে অশান্ত চিত্তকে শান্ত করে, কে সেই অবস্থায় চেয়ে চেয়ে ডাকে,—কে শতবার আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরে,—কে শতবার শতরূপ দেখায়—কে সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া বেড়ায়?—এই সকল ভাবের উদয় হইলে, হৃদয় সরসতায় ভরিয়া যায়। আহা! ভালবাসার মূর্ত্তি কেমন মনোহর, কেমন উজ্জ্বল! চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্য,—এই ত্রিচক্ষু কত স্নেহ ছড়াইয়া দেয়। কিরীট শিরোভাগে কেমন ঝলমল করে, নাসাগ্রে মুক্তিকা, কর্ণে কুণ্ডল কি শোভা দেখা যায়। ঠাকুর! এই মূর্ত্তিতে চক্ষে চক্ষে চাহিয়া যখন চরণ দ্বারা আমার বক্ষ চাপিয়া ধর তখনই তোমার চরণ স্পর্শে আমার চিত্ত শুদ্ধ হয়—চিত্ত একাগ্র হয়—তখনই বিচার আইসে। তোমার ভালবাসা হৃদয়ে পাইলেই জানিব জগৎ আমার নিকট অগ্রাহ্য,—সংসার আমার চক্ষে লয় বিক্ষেপ। আমার আর কেহই নাই, একমাত্র তুমিই আমার আছ। আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—এই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি। আমি আর কাহারও উপর নির্ভর করি না, কাহারও মুখের দিকে তাকাই না। তুমি মাত্র আমার নির্ভর। তুমি যদি দাও গ্রহণ করিব, নতুবা কাহারও নিকট ভিক্ষা করিব না। যাহা হয় হউক, জগৎ আমাকে শত যাতনা দিক্—শত ক্লেশে আমি পতিত হইলেও—শত যাতনায় আমি উৎপীড়িত হইলেও—সর্ব্বস্থানে আমি লাঞ্ছিত হইলেও,—শুধু তুমি আমার আছ—এই ভাবিয়া আমি তোমার মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিব,—সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করিব। শরীর রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। সংসার অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে

ছুটলে আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিব জগৎ মিথ্যা, ক্লেশ সমূহ মায়া, সংসার মিথ্যা। এই সকল ইন্দ্রজাল আমাকে ভুলাইয়া দিতেছে।

আমি "জপই জপই শ্যাম নাম, ছার তনু করব বিনাশ।" তোমার মধুর শ্যাম নাম জপ করিতে করিতে আমি দেহ ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছি। যতক্ষণ না লক্ষ বিক্ষেপ দূর হয় ততক্ষণ তোমার নাম জপ করিব—যতই ক্লেশ হউক না কেন পুনঃ পুনঃ জপ করিব। শীত গ্রীষ্ম—অগ্রাহ্য করিয়া, শুচি হইয়া তোমার নাম জপ করিব। যতক্ষণ চিত্ত শান্ত হইয়া আনন্দে তোমার নাম করিতে পারিবে ততক্ষণ জগৎ নাই—স্ত্রী পুত্রাদি নাই; জগতের প্রতি,—স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই; তোমাকে ডাকাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বাদ দিয়া আমি জটিলা কুটিলার মনোরঞ্জন করিতে পারি না। প্রতি দিনের সাধনায় এই পর্য্যন্ত না আসিলে তোমার কৃপা পাইলাম না বলিয়া বোধ করা উচিত; ডাকিতে ডাকিতে তোমার ধ্যানে ডুবিয়া যাওয়া উচিত। নীল নীলনাভ নয়নে চে'য়ে চে'য়ে তুমি ডাকিতেছ ইহা প্রাণে অনুভব করা চাই। ভক্তিদ্বারা হৃদয় সরস হইলে জগৎ তোমারই মূর্ত্তি। তোমাকে পাইয়া জগৎ সংসারের কাজ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। তোমার তৃপ্তির জন্য, তোমার সেবার জন্য আমি কি না পারি? তোমাকে পাইয়া যখন আমি জগতের দাস, তখন জগৎ তুমি। তখন দারুণ পরিশ্রমেও আমি ব্যাকুল হই না।

ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই এক সাধনা। প্রথমে জগৎ নাই, সংসার নাই, কিছুই নাই,—আছ মাত্র তুমি। কোন কর্ত্তব্য নাই,—কেহ মরিল বা বাঁচিল দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি শুধু তোমার দিকে। তোমার নাম করাই এক মাত্র কর্ত্তব্য। ইহাই সাধনার প্রথম কথা, ইহাই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য লইয়াই সাধনা করিতে হইবে। প্রতিদিন সাধনা করিবার পূর্ব্বে জগদিন্দ্রজাল একবার ভস্ম করিতে হইবে—স্ত্রী পুত্রাদির নৃত্যকে মায়ার নৃত্য মনে করিতে হইবে,—স্ত্রী পুত্রাদির অভাবকে ভূতের বিভীষিকা মনে করিতে হইবে,—সংসারের জন্য সঙ্কল্পগুলিকে যমের দূত মনে করিতে হইবে। তার পর তোমার শরণাপন্ন হইয়া সাধনা করা চাই। দেহ কিছু নয়, সংসার কিছু নয়, কর্ত্তব্য কিছু নাই, লোকের আদর, যমের আহ্বান, রোগ শোক জন্ম মৃত্যু ভয় ভাবনা ইত্যাদি কিছুই নাই। আমার কেহই নাই—আমিও এই দেহ নই—দেহ নাই বলিয়া জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নাই—আমি অনন্ত শূন্যে, সীমা-

শূন্য মহাব্যোমে একা—কাহারও উপর নির্ভর নাই কেননা কিছুই আমার নিকট নাই। সাধকের সাধনার ভক্তিভূমিই এই।

বৈরাগ্য লাভ করিবার জন্যই কৃপা চাই, কৃপা লাভ হইলেই ভক্ত হওয়া গেল—ভক্তি লাভ হইলেই জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া গেল—জগৎ ব্রহ্মময় হইলেই আমিও ব্রহ্ম হইয়া গেলাম। "সে" তখন আমাকে "সে" করিয়া লইল। আমি আমার থাকিয়া তাহার পূজা করিলাম। "সে" আমাকে "সে" করিয়া তাহার সহিত অভিন্ন করিয়া দিল। তখন আমি ব্রহ্ম হইয়াও জীবভাবে জগৎ লইয়া খেলা করিতে পারিলাম। সে তখন পরিপূর্ণভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও জীব ভাবে আমি হইয়া খেলা করিল। ইহাই জগৎ লীলা। ইহাই জ্ঞান ভক্তির মিলন। ইহাই সুন্দর। এখন একবার হরি হরি বলিয়া নিত্য কর্ম্মে লাগিয়া যাও। "মাংনমস্কুরু"—"জ্যোতির গৃহ"—"বালা যোগীর চারিমণ্ডপ"—সোহং মন্ত্র জপ—শৃঙ্গার মণ্ডপ হইতে আগমন—দর্শনলাভের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে অবস্থান ও জপ; হৃদয়স্থ শিবমূর্ত্তির চক্ষে শিবশক্তির রূপ বিকাশ—চে'য়ে চে'য়ে ডাকা,—তার পর মূর্ত্তিধ্যান—হরি ওঁ ইতি শেষ। এই শেষ লইয়া সর্ব্ব অবস্থায় অবস্থান। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিদ্বার, চণ্ডীর পাহাড় ও সিদ্ধাশ্রম।

ভারতের বহু স্থানে সিদ্ধাশ্রম আছে। আমরা যে সিদ্ধাশ্রমের কথা বলিতে যাইতেছি তাহা পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না। এবারে হরিদ্বারে আসিয়া কাংড়িতে তাহা শুনিলাম। এবারের হরিদ্বার দর্শন বৃত্তান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

এখন ১৩২২ সাল পড়িয়াছে। ইহা জ্যৈষ্ঠমাস। আমরা দেরাদুনে আসিয়াছি। আসিয়াই সহস্রধারায় যাই সে কথা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। ১৩২১ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শেষ কুম্ভস্নান হইয়া গিয়াছে। ঠিক বার বৎসর পূর্ব্বে যে কুম্ভ মেলা হয় সেই কুম্ভস্নানে আমরা আসিয়াছিলাম। সে কুম্ভ স্নানে ২১।২২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এবারে শুনিলাম ১৪ লক্ষ লোক। আমরা এবারে বৈশাখের শেষে হরিদ্বারে আসিয়াছি।

ডেরা হইতে হরিদ্বারের রাস্তা অতি সুন্দর। দুই ধারে পাহাড় ও গভীর বন। মধ্যে রেলের পথ। পূর্ব্বে রওয়ালা ষ্টেশনে নামিয়া হৃষীকেশে যাইতে হইত। এখন হৃষীকেশ রোড এক ষ্টেশন হইয়াছে। ডেরা হইতে ৮টার গাড়িতে উঠিয়া প্রায় দশটার সময় আমরা হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। হরিদ্বারে গঙ্গার উপরেই শ্রীমৎভোলাগিরি যাত্রীদিগের জন্য যে বাড়ী করিয়াছেন আমরা সেই বাড়ীর উপর-তালার একটি ঘর অধিকার করিয়া লইলাম। তিনি জগদীশ্বরানন্দ স্বামীর উপরে যাত্রীদিগের থাকার বন্দোবস্তের ভার দিয়াছেন। এই বাড়ীর অনতিদূরেই তাঁহার আশ্রম।

স্বামীজী বেশ নিয়ম করিয়াছেন। যাঁহারা যাত্রীরূপে ঐ বাড়ীতে থাকিবেন তাঁহাদের প্রতি স্বামীর আদেশ যেন তাঁহারা দিনের মধ্যে একবার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। আমাদের জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে বারটা বাজিয়া গেল। মনোহারিণী গঙ্গায় স্নান ভিন্ন অন্য কিছুই তখন সম্ভব নয় বলিয়া আমরা গঙ্গাস্নানে বাহির হইলাম। যাত্রীভবনের নীচেই গঙ্গা। অনেকে বলিল সেই খানেই স্নান করা হউক। কেহ বলিল যাহারা হরিদ্বারে প্রথম আসিয়াছে তাহাদিগকে প্রথমেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। সেই রৌদ্রে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডস্নানে বাহির হইলাম। একজন মাত্র পাদুকা লইয়া চলিলেন আর সকলে নগ্ন পদে। রাস্তা কোথাও পাথর কোথাও ইট দিয়া বাঁধান।

হরিদ্বারের রৌদ্র! রাস্তা যেন ঠিক আগুণ। অতি কষ্টে ব্রহ্মকুণ্ডে যাওয়া হইল। পা আর পৃথিবীতে ফেলা যায় না। এই গরম আর সেই গঙ্গা। কি শীতল গঙ্গা! উপরে সূর্য্যদেব অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন আর নীচে সকল জ্বালা জুড়াইয়া মা আমার আপন মনে কি করিতে করিতে কাহার সঙ্গে যেন মিলিতে ছুটিয়াছেন। সঙ্গের বালকেরা মহাশোল মৎস্য দেখিতে ছুটিল। দলে দলে মৎস্য বেড়াইতেছে। মাছ ঠেলিয়া জলে স্নান করিতে হয়। মৎস্যকে কেহ হিংসা করে না, সকলেই তাহাদিগকে খাইতে দিতেছে, মাছও নির্ভয়ে খাইতেছে। আমাদের সঙ্গে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সঙ্কল্প পড়াইলেন। সকলে গঙ্গা স্নান করিল। বিচিত্র গঙ্গার মাহাত্ম্য। দেখিলাম পাঞ্জবী-স্ত্রীলোকেরা বোধ হয় সহস্রবার ধরিয়া শরীর নাচাইতেছে কিন্তু মাথা ডুবাইতেছে না। এক বৃদ্ধও স্নান করিতে নামিয়া বালকের মত ক্রীড়া করি-তেছে। আমরা স্নান করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক সেইখানেই সমাপন করিলাম। অতি কষ্টে বাসায় ফিরিয়া আসা হইল। কেহ যেন এই গ্রীষ্মকালে দুই প্রহরের রৌদ্রে হরিদ্বারের রাস্তায় নগ্ন পদে না চলে।

স্বামীজীর গঙ্গাতীরের বাড়ীতে আগুণ জ্বালাইবার আদেশ নাই। পাছে বাড়ী মলিন হয়। রান্নার জন্য বাড়ী ও মলত্যাগের স্থান স্বতন্ত্র। হরিদ্বারের সব ভাল কিন্তু মলত্যাগের স্থান বড় কদর্য্য। মাছির দৌরাত্ম্যও বেশী।

হরিদ্বারের কুম্ভমেলার পর এখানে বড় বিশৃঙ্খলা হইয়া গিয়াছে। এখনও কোন বিষয় ঠিক অবস্থায় আইসে নাই। খাবার জিনিষ পত্র পাওয়া যায় না। সবই দুর্মূল্য। যাহা হউক আমরা আহারাদি করিয়া কতক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আকাশও কিছু ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। আমরা অন্য কোথাও না গিয়া শ্রীমৎ গিরিজীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। দুই চারি ফোঁটা জলও পড়িতে লাগিল। আমরা গিরিজীর আশ্রমে প্রথমে খোলা যায়গায় বসিলাম। পরে বেশ বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন তাঁহার আশ্রমের ভিতরেই যাইতে হইল। স্বামীজী গালি, শপথ, নিন্দা, পরনারী গমন, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ভক্ষণ, মদ্যপান, চুরি, জুয়া খেলা ও ঈর্ষা এই নয়টি বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। শুনিলাম এই জন্যই তিনি তাঁহার যাত্রীভবনের যাত্রীদিগকে প্রত্যহ তাঁহার কাছে আসিতে বলেন। স্বামীজীর এই রঙ্গ দেখিলাম যে প্রথমে হেঁয়ালী কথায় লোককে বোকা বানাইয়া পরে উপদেশের কথা বলেন। বাসী ভাল না টাট্‌কা ভাল এই কথা সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করেন। লোকে টাট্‌কাই ভাল বলে। সংস্কার লইয়া লোকে চলে ইহা বলিয়া তিনি লোককে বলেন সকলেই বাসী খাইতেছে। দেখ এই সহজ কথা তোমরা বুঝিতে পার না। ইত্যাদি ভণিতা করিয়া তার পরে উপদেশ দেন। আশ্রমে তাঁহার গুটিকতক বাঙ্গালী শিষ্য দেখিলাম। দুই একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকও দেখিলাম। সকলকেই এই নয়টী উপদেশ দেওয়া হয়। স্বামীজী যাত্রীদিগের বিশেষ উপকার করেন। ইহারা মঙ্গল কার্য্যেই সদা ব্যস্ত। শেষে স্বামীজী সদাচার সম্বন্ধে এবং কতকগুলি স্তব ছাপান এক একখানি কাগজ আমাদিগকে দিলেন। স্বামীজী বেশ কার্য্য করিতেছেন। তবে সদাচার কাগজে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা আহ্নিক সম্বন্ধে ও প্রধান প্রধান সমস্ত উপবাসগুলি নাই দেখিয়া একটুকু ক্ষুণ্ণ হইলাম। হরিদ্বার লালতারা বাগের সেবকমণ্ডলী এই কাগজ ছাপাইয়াছেন। তাঁহারা এই উপদেশগুলিতে শাস্ত্র মত কার্য্যগুলি সংক্ষেপ না করিয়া উল্লেখ করিলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধেও মানুষের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বাদ দিয়া কিছু করিতে গেলেই একাকার ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আসিয়া যায়।

পর দিন প্রাতে আমরা কংখলে দক্ষেশ্বর মহাদেব দর্শনার্থ গমন করিলাম।

প্রাতে সন্ধ্যা করিতে গিয়া দেখিলাম গঙ্গা আর নির্ম্মল নাই। একবারে মলিনা। কিন্তু শীতলতা সমানই আছে। মনে হয় যেন বরফ গলিয়া আসিতেছে।

সতী দক্ষালয়ে আসিবার সময় যে পর্ব্বতশৃঙ্গে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং যেস্থান হইতে পিতৃ যজ্ঞ প্রথম অবলোকন করেন তাহাকেই লোকে চণ্ডীর পাহাড় বলে। চণ্ডীর পাহাড় হইতে সতীর দেহ ত্যাগের স্থান দেখা যায়। ইহাও প্রবাদ যে বিষ্ণু এই স্থান হইতে শিবস্কন্ধস্থিত সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করেন। সুদর্শন-চক্রের বেগে সেই দেহ নানাস্থানে পতিত হয়। তাহাতেই ৫১ পীঠ হইয়াছে। এই স্থান হইতে দেহ খণ্ড খণ্ড করার কথা প্রবাদ মাত্র। চণ্ডীর পাহাড় অপরাহ্নে দেখা হইবে স্থির হইল। আমরা সতীদেহ ত্যাগের স্থান দেখিয়া সেদিন বাসায় ফিরিব ঠিক হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে সকলে হরিদ্বারে ফিরিলেন কেবল দুইজন ঐ স্থান হইতে কাংড়ি গুরুকুলাভিমুখে পদব্রজে চলিলেন।

কাংড়ি গুরুকুল আর্য্যসমাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহা দয়ানন্দ সরস্বতীর সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা চলিতেছে। আমরা দুইজনে তিনবার গঙ্গার নৌকাগঠিত পুল পার হইয়া বহুকষ্টে গুরুকুলে পৌঁছিলাম। গুরুকুলে তিনজন বাঙ্গালী কার্য্য করেন। দুইজন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। আমরা যখন ঐ স্থানে পৌঁছিলাম তখন বেলা ১০টা কি ১০॥০টা। পণ্ডিত মহাশয় পীতবসন পরিধায়ী ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেছিলেন। আমরা একেবারেই তাঁহার শিক্ষাগৃহে গিয়া উঠিলাম। পণ্ডিত মহাশয় সে দিন পাঠ বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে তাঁহার বাসায় আসিলেন। আর দুইজন ইংরাজী অধ্যাপকের সঙ্গে বাসায় দেখা হইল। ম্যাক্সমুলার যে জন্য বেদ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন শুনিলাম গুরুকুলে শাস্ত্রাধ্যায়নও সেই জন্য। ইহাও শুনিলাম ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হয়। বালকেরা নিত্য হোম করে, পীত বস্ত্র পরিধান করে, শিখাও রাখে কিন্তু বলে বায়ু পরিষ্কারের জন্য হোম করা হয়, আরও বলে মন্ত্রশক্তি কিছুই নহে। কেহ কেহ হোম করাকেও বিদ্রূপ করে এবং আরও বলে যদি বায়ু পরিষ্কার জন্য হোম করা আবশ্যক হয় তবে বিষ্ঠাকুণ্ডে হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। সকল স্থানেই ব্যভিচার আছে। সময়ের মত করিয়া মানুষ শাস্ত্রকে চালাইতে গিয়া বহু আদর্শ বিকৃত করিতেছে। দয়ানন্দী আর্য্য সমাজ ও সনাতনী সম্প্রদায়—যাঁহারা হরিদ্বারে ঋষিকুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ইহাদের অহি-নকুল সম্বন্ধ। ধর্ম্মের বহু সম্প্রদায় থাকা ধর্ম্মের সজীবতার চিহ্ন। যেমন বহুশাখা প্রশাখা থাকিলে বৃক্ষকে বড় সজীব বলা যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধেও

তাই। কিন্তু বৃক্ষের শাখা প্রশাখাগুলি আপনা আপনি বিরোধ করে না। ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি কিন্তু বিরোধ লইয়াই ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। বোধ হয় শ্রীভগবানের কল্কিরূপে না আসা পর্য্যন্ত এ বিরোধের নিবৃত্তি হইবে না, আর ভারতবর্ষ ঋষিদিগের ভারতবর্ষও হইবে না। আমরা স্নানাহার শেষ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। যদিও হরিদ্বারের দল আজ অপরাহ্নে কাংড়ির পাহাড়ে আসিবেন এবং আমারও সেখানে তাঁহাদের সহিত মিলিবার কথা ছিল তথাপি কার্য্যে ইহা ঘটিল না। আমরা গুরুকুলে শুনিলাম এখান হইতে কাংড়ি গিয়া গভীর বনের মধ্যে সিদ্ধাশ্রম দেখিবার স্থান। আমরা অপরাহ্নে সিদ্ধাশ্রম দেখিতে বাহির হইলাম। সিদ্ধাশ্রমের কথা লিখিবার জন্যই এই প্রবন্ধ। ইহা বলিবার জন্যই আমরা এক নিশ্বাসে হরিদ্বার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিয়াছি।

পার্ব্বত্য প্রদেশে রৌদ্র খুব তীক্ষ্ণ। তবে সে দিন রৌদ্র তত প্রখর ছিল না। বিলক্ষণ বেলা আছে। আমরা সিদ্ধাশ্রম দর্শনের যাত্রী চারিজন। দুইজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর দুইজন ইংরাজী জানা লোক। তবে চারি জনেই নিষ্ঠাবান। গুরুকুল ছাড়িয়া আমরা কাংড়িতে পৌঁছিলাম। এখানে পূর্ব্বে কোন লোক জন ছিল না। আর্য্য সমাজীগণ পঞ্চনদের নানা স্থান হইতে আসিয়া এইস্থানটিকে লোকালয় করিয়াছে। এখানে অতি হীন অবস্থার লোকই বেশী। ইহাদের দ্বারা আর্য্যসমাজীদের মজুরের, গোয়ালার কার্য্য ইত্যাদি চলে। ইহারা আমাদিগকে দেখিয়া নমস্তে বলিয়া অভিবাদন করিল। ইতর লোকে সকলকেই নমস্তে বলে কেন, ইহার উত্তরে শুনিলাম আর্য্যসমাজীগণ ইহাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। আর্য্যসমাজীরা জাতিভেদ মানেন না। নমস্কার প্রণাম ইত্যাদি এখানে নাই। সবই নমস্তে। আর্য্য সমাজের এই পদ্ধতিকে সনাতনীগণ বিদ্রূপ করেন এবং নমস্তের ব্যাখ্যা করেন "ন মস্তে কিনা ইহাদের মস্তক নাই অর্থাৎ মাথা নাই। ইহারা বোকা বুদ্ধিহীন। তাই হিন্দু হইয়াও জাতি মানেন না।"

আমরা ক্রমে বনভূমির সীমানায় আসিলাম। চারিদিকে খদির ও পলাশ গাছ। এখানে কুশ বিস্তর। এই স্থানটি ব্রহ্মাবর্ত্ত। শাস্ত্রে বহুস্থানে খদির কাষ্ঠে দন্তধাবন করিবার কথা পাওয়া যায়। যজ্ঞের জন্য পলাশ ত আবশ্যকই। কুশ ত ব্রাহ্মণের নিত্য প্রয়োজন। ঋষিগণ এই সমস্ত স্থানে বাস করিতেন, স্বভাবতঃ এখানে যাহা পাওয়া যায় তাহারই ব্যবহার তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সব স্থান ব্রহ্মচর্য্যের বড় অনুকূল। স্বভাবতঃই লোকে মৎস্য মাংস খায় না।

তৈলও ব্যবহার করে না। আজকাল বিকৃতি সর্ব্বত্রই। লোকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে। কোন আচার মানে না। যাহাও মানে তাহা শাস্ত্রবিকৃতি করিয়া— শাস্ত্রকে নিজের ব্যভিচারের মত করিয়া লয়, শাস্ত্রে আছে যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় সেই সমস্ত স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন। আমাদের সঙ্গী পণ্ডিতমহাশয় বলিতে লাগিলেন চলুন বনের মধ্যে কত হরিণ হরিণী দলে দলে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে দেখিবেন, তথনও আমরা বনের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। দুই মাইল আন্দাজ আসিবার পরে আমরা একটি কাঁচা বাঙ্গলা (Bunglow) পাইলাম। সেই স্থান হইতেই বনভূমিতে প্রবেশ করিবার রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে শুনিলাম। ইহা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকদের সাময়িক আড্ডার স্থান। আমরা এখন বনে প্রবেশ করিলাম।

ইহা প্রকৃত বন। ঝোপ জঙ্গল নহে। দুইধারে বড় বড় বৃক্ষরাজি, মধ্যে এই পথ। বন খুব পরিস্কার। নানা জাতীয় বন্য বৃক্ষ এখানে আছে। মধ্যে মধ্যে বাঁশের ঝাড়। আমরা এখন গভীর বনের মধ্যে আসিয়াছি। হঠাৎ একজন বলিলেন দেখুন ঐ একদল হরিণ। মানুষের সাড়া পাইয়া বাঁশের ঝাড়ের সম্মুখে খোলা যায়গায় একদল হরিণ কাণখাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কতক্ষণ স্থির থাকিয়া হরিণগুলি বড় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আবার হরিণের দল,— আবার তাই। আমরা কত হরিণ দেখিলাম।

যদিও আমরা চারিজন, তথাপি এত বড় গভীর বনের ভিতর কখন আসি নাই। কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নাই। রামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের কথা মনে পড়িতে লাগিল।

তাবেত্য বিপিনং ঘোরং ঝিল্লিঝঙ্কারনাদিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিংহব্যাঘ্রাদিভীষণম্॥

সিংহব্যাঘ্রাদিভীষণ এই বন নহে। তবে রাত্রিকালে ইহারাও যে আগমন করে না ইহা বলা যায় না। শুনা যায় শীতকালেই ইহারা বেশী দেখা দেয়। পণ্ডিত মহাশয় বন্যহস্তীর আগমন চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন। পাহাড়ের উপর বন। পাহাড়ে বাঁশেরঝাড় কত শক্তমূল। বন্যহস্তী আসিয়া বাঁশেরঝাড়কে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া ইহার মূলোৎপাটন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। বহুস্থানে ইহা দেখা গেল। একে গভীর বন, তাহাতে একবারে লোকাগম শূন্য। কিছু ভয়ও হইতে লাগিল।

শ্রীভগবান্ ঘোর বিপিনে প্রবেশ করিয়া লক্ষণকে যাহা বলিয়াছিলেন সেই বিষয়ের আলাপ চলিতে লাগিল।

ইতঃপরং প্রযত্নেন গন্তব্যং সহিতেন মে।
ধনুর্গুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ॥

যদিও বনে এই কালে কোন ভয় নাই তথাপি আমরা, আমরাই। শর ধনুর্ব্বান ত নাই। ভগবান্ যেমন লক্ষণকে বলিয়াছিলেন "চক্ষুশ্চারয় সর্ব্বত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ"—আমারাও সেইরূপ চারিদিকে চক্ষু চারণ করিতে লাগিলাম। আর হস্তী কর্ত্তৃক উৎপাদিত ভীতিচিহ্ন দেখিয়া ভয়ের কথা কিছু কিছু আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন যদি কোন বন্য মহাশয় হঠাৎ আগমন করেন তবে কে কি করিবেন? বহুপ্রকার জল্পনা হইল। শেষে হরি নামেই সব শেষ করা গেল। তখন বিরাধের আগমনে ভগবান যে রহস্য করিয়াছিলেন সেই কথা উঠিল। বিরাধ সম্মুখে আসিয়া বলিল "মুনিবেশধরো বালো" তোরা ত মুনিদিগের মত জটা বল্কল ধারণ করিয়াছিস্ কিন্তু তোরা বালক আবার "স্ত্রী সহায়ৌ।" এখন আমার সুন্দর বক্ত্রের কবলে আয়। কিন্তু বল্ দেখি কেন তোরা এই ঘোর বনে আসিয়াছিস্? "কিমর্থমাগতৌ ঘোরং বনং ব্যাল নিসেবিতম্। ভগবান্ সেই অবস্থাতেও রাক্ষসের সহিত রহস্য করিলেন আর বলিলেন "পিতৃ-বাক্যপুরস্কৃত্য শিক্ষণার্থং ভবাদৃশম্।" পিতার আদেশ মত আমরা বনে আসিয়াছি, সে কেবল মহাশয়দিগের মত জীবের শিক্ষার জন্য।

আমরা এখন অনেক দূরে আসিয়াছি। যে স্থানে আমরা আসিলাম তাহার মত সুন্দর স্থান বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। চারিদিকে অতি উচ্চ পর্ব্বত। নীচে পর্ব্বতগাত্র হইতে ঝরণা বাহির হইয়াছে। স্থানটি গোলাকার। স্থানে স্থানে জল কিছু কিছু জমিয়া রহিয়াছে। নানাবিধ পক্ষী মধ্যে মধ্যে শব্দ করিতেছে। একটি মতিয়ালতায় ফুল ধরিয়াছে আর কত গুঞ্জনমত্ত মধুব্রতের ঝঙ্কার। তা ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। আমরা পর্ব্বত ও বনের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। গোলাকার স্থানের মধ্য দিয়া পথ। একজন একটু অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন ঐ দেখুন সম্মুখে একটি গর্দ্দভ কর্ণ উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় জল পান করিতে আসিয়াছে। আমা-দের সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষিত হইল। হরি! হরি! গর্দ্দভ কোথায়?

এ যে হরিণ। সঙ্গে একটি হরিণশিশু। আমরা এখনও একটু দূরে। শিশুর সহিত হরিণী কানখাড়া করিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে। আহা! কি সুন্দর চক্ষু! কি সুন্দর দৃষ্টি। শাস্ত্রের মুগ্ধদৃষ্টির কথা চলিল। হরিণী কতক্ষণ আমাদের প্রতি তাকাইয়া অতি ক্ষীপ্রগতিতে শিশুর সহিত পলায়ন করিল। আমরা তখন চলিতে আরম্ভ করিলাম। মধ্যে ময়ূর ময়ূরীর কথা উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় ময়ূরের সুস্পষ্ট "কেও কেও" শব্দের কথা বলিলেন। তখনও কিন্তু রৌদ্র প্রবল ছিল। বলিলেন আসিবার সময় বেলা পড়িবে। তখন দলে দলে ময়ূর দেখিবেন। আমরা সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। কি সুন্দর স্থান! চারিদিকে পর্ব্বত ও অরণ্য। নীচে ঝরণায় সামান্য সামান্য জল। যে স্থানটিতে আশ্রম ছিল সে স্থানটি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বিলক্ষণ উচ্চ। বর্ষাকালে চারিদিক জলে পূর্ণ হইলেও আশ্রমে জল উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না। আশ্রমের ভগ্নাবশেষ এখন পর্য্যন্ত দেখ যাইতেছে। যে বৃক্ষের তলায় আশ্রম তাহা শুষ্ক হইয়া দণ্ডায়মান আছে। কারুকার্য্য করা বড় বড় প্রস্তরের থাম, এখানে ওখানে ছড়ান। তখনকার কোন রাজা বোধ হয় এই আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাঁহারা একটি প্রস্তরের কমণ্ডলু দেখিয়া গিয়াছিলেন। এবারে আমরা তাহা দেখিতে পাইলাম না। সিদ্ধপুরুষেরা এখানে বোধ হয় বহু দিন ছিলেন। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকাগমে স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক শিলার উপরে উপবেশন করিয়া আশ্রমের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা এই গভীর বনে আসিয়া তপস্যা করিতেন। আর আমরা সর্ব্বদা উপদ্রুত সহরে থাকিয়াও তপস্যার অভিমান রাখি। ধিক্ আমাদের তপস্যা অভিমানকে।

সাধুরা বন বড় ভাল বাসিতেন। বন তপস্যার বড় অনুকুল বলিয়া বৃক্ষ লতা পর্ব্বত ঝরণা তাঁহাদিগকে কি যেন কি অপূর্ব্ব ভাব শিক্ষাদিত। এখানকার নিস্তব্ধতা সমাধির বড় সহায়তা করিত। কত সরল হরিণ হরিণশিশু নির্ভয়ে এই স্থানে বিচরণ করিত। হিংস্র জন্তুগণ হিংসা ছাড়িয়া এখানে আসিত। ঋষিদিগের তপোবন ত্রিপাততাপিত জীবনে কত উপকার করিত। সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য সংসার ক্লেশদগ্ধ হইয়া এইরূপ স্থানে আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী শেষ জীবনে বনে আসিয়া তপস্যা করিয়া সকল শোক এড়াইয়াছিলেন। আর এই কলিকাল! এখানে আর সৎসঙ্গের স্থান ত প্রায় দেখা যায় না। সৎসঙ্গ নাই তথাপি যাহারা সাধনা করিতে প্রস্তুত

তাঁহারাও বিশেষ কিছু করিতে পারেন না। তথাপি চারিদিকে কত আনন্দ, কত স্বামী, কত সংসারাসক্ত সোঽহং জ্ঞানী। হায়রে কাল!

আমরা কতক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিলাম। বেলা পড়িয়া আসিল। দুই একটি লোকও আমরা শেষে আসিতে দেখিলাম। তখন আমরা ফিরিলাম। আবার সেই সেই রমণীয় স্থান। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। পণ্ডিতমহাশয় ময়ূর দেখাইতে পারিলেন না বলিয়া কিছু দুঃখিত হইতে ছিলেন। হঠাৎ "কেও কেও" ধ্বনি শুনা গেল, আমাদের মধ্যে একজন প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল আমরা গো! আমরা গো। তোমাদিগকে দেখিতে আমরা আসিয়াছিলাম। দেখা ত দিলে না, আমরা ফিরিতেছি। আবার শব্দ উঠিল "কেকর! কেকর"! ইহা ময়ূরী শব্দ। আমরা তখন "চক্ষুশ্চারয় সর্ব্বত্র" করিতে লাগিলাম। আবার দলে দলে হরিণ দেখা গেল। পণ্ডিতমহাশয় মহানন্দে বলিলেন ঐ দেখুন ময়ূর। কি সুন্দর! বন্য ময়ূর যখন স্বচ্ছন্দে বনভূমিতে অপূর্ব্ব গতিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তখন কত সুন্দর দেখায়। আমরা বনভূমিকে পর্ব্বতকে প্রণাম করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পরে গুরুকুলে আসিলাম। কুলুনাদিনী তেজস্বিনী অথচ অগভীরসলিলা গঙ্গায় আসিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিলাম। পর দিন প্রভাতে অন্য পথে সেই বনের অপর রাস্তা দিয়া চণ্ডীর পাহাড়ে আসিলাম। পাহাড়ের আরম্ভস্থানে শিবমন্দির। ইনি শুভ্র, নাম গৌরী শঙ্কর। আমরা স্তবস্তুতি প্রণাম করিলাম। পাহাড়ে উঠিতে যাইতেছি এক জন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক আশ্রম হইতে বলিলেন একটু উপরেই নীলকেশ্বর। দেখিয়া যাউন। আমরা নীলকেশ্বর দর্শন করিলাম। এ স্থানটি অতি সুন্দর। এখান হইতে হরিদ্বার, গঙ্গা, কনখল দেখা যায়। আশ্রমের উপযোগী এই স্থানটি। এখানে আমরা কিছু সঙ্কল্প করিলাম। সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার যোগ্যতা আমাদের কাহারও নাই দেখিয়া সঙ্কল্প প্রকাশে বিরত রহিলাম।

এখন বেলা প্রায় দশটা। চণ্ডীর পর্ব্বত অগ্নির ন্যায়। আমরা অতি কষ্টে পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিলাম। পা আর মাটিতে ফেলা যায় না। কোথাও ছায়া নাই। আমরা মন্দিরের পশ্চাতে ছায়ায় একটু বিশ্রাম করিতেছি হঠাৎ হরিদ্বারের দলের এক বালক সেখানে আসিল। আমরা মহানন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম গত কল্য অপরাহ্নে তোমাদের আসিবার কথা ছিল যে? না তাহা হয় নাই। অদ্য আসিয়াছি। আমাদের এই রূপে এই স্থানে মিলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া গত কল্য আমরা সিদ্ধাশ্রম দেখিয়া আসিলাম। সিদ্ধাশ্রমের বিবরণ শুনিয়া বালকেরা পর-

দিন সেখানে যাইবে স্থির করিল। কিন্তু পর্ব্বতের আর এক দেশে অঞ্জনার মন্দির। তাহা দেখিয়া সেই প্রখর রৌদ্রে পা পোড়াইয়া আবার গঙ্গা পার হইয়া ডমপার মঠ হইয়া যখন আমরা হরিদ্বারে পৌঁছিলাম তখন সকলেরই ক্লেশের অবধি ছিল না। পর দিন দুই জনের জ্বর হইল। গুরুকুলের যে দুই জন আমাদের সঙ্গে হৃষীকেশ হইয়া দেরাদুনে যাইবেন সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন পর দিন তাহার এক জনের জ্বর বেশী হওয়ায় আর কোথাও যাওয়া হইল না। কেহ কেহ সেই দিন সন্ধ্যায় বিল্বকেশ্বর দর্শন করিয়া আসিলেন। গুরুকুলের দুইজন পরদিন পর্য্যন্ত শ্রীমৎ ভোলা-গিরির যাত্রীভবনে থাকিয়া গেলেন। আমাদের এক জনের জ্বর লইয়া আমরা সেই দিন মধ্যাহ্নের গাড়ীতে ডেরাতে ফিরিলাম। ডেরাতে আসিয়া একজন ভিন্ন সকলেরই অল্প বিস্তর অসুখ করিয়াছিল।

নূতন স্থানে আসিয়া তাড়াতাড়ি সব দেখিব এই হঠকারিতায় যাহা হয় তাহার ফল সকলকেই ভুগিতে হইল। এখনও দুই জন খুব অসুস্থ। শরীর কাহারও ঠিক থাকিতেছে না দেখিয়া সত্বর আমরা ৺ কাশী হইয়া কলিকাতায় যাইতে মনস্থ করিলাম। আমরা আর একটি মাত্র কথা কহিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম। একটি ভদ্রলোক, লোকের-কাছে বন ও পর্ব্বতের শোভার কথা শুনিয়া বড় আগ্রহ করিয়া তাহা দেখিতে আইসেন। লোকটি কিন্তু কবিতা রস হইতে বঞ্চিত। তিনি শুধুই গদ্য। পণ্ডিতমহাশয় নিজে যাইতে পারিলেন না, সঙ্গে লোক দিয়া বলিয়া দিলেন বেশ করিয়া বন ও পর্ব্বত দেখাইও। লোকটি আগ্রহ করিয়া গমন করিলেন। সব দেখিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন মানুষ কি রকম? দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পণ্ডিতমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখিলেন? কি অদ্ভুত বলুন ত! দেখিব আর কি কতকগুলি বড় বড় মাটির ঢিপি আর জঙ—গোল। স্বর ত আঁকা যায় না। এমন করিয়া জঙ্গল কথাটি উচ্চারণ করিলেন যাহাতে বেশ বুঝা গেল ইহা তাঁহার পূর্ণ অবজ্ঞার বস্তু।

লালসা।

কবে হৃদয় যমুনা ছুটিবে উজান,
শুনি শ্যামের বাঁশীর সুমধুর তান।
বাজিছে মুরলী মাধব অধরে ওই!
চল্, ছুটে চল্ যাই, ওলো প্রাণ সই!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিছে বাঁশরী কত,
চল্, দ্রুত চল্, যেতে হ'বে দীর্ঘ পথ।
কবে যা'ব পূত লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন,
কবে নয়ন হেরিবে নয়ন রঞ্জন!
ধূলায় লুটিয়া ধরিব তাহার পায়,
দেখি, কি আদর করে বঁধু শ্যামরায়।
যদি সোহাগের ভরে তুলে হাতধরে;
কাঁদিয়া লুকাব মুখ তারি বক্ষ পরে!
লাজ মান ভয়, জাতিকুল পরিহরি,
বেড়িয়া লইব কণ্ঠে প্রাণের শ্রীহরি!
পুলকে পূরিবে তনু, শ্যাম পরশনে!
সবব্যথা ঘুচে যাবে নাথ আলিঙ্গনে!
চাহিয়া রহিব শুধু বঙ্কিম নয়নে,
হেরিব কি শান্তি খেলে প্রশান্ত বদনে;
কথা না কহিব, শুধু চাহিয়া রহিব,
বাঞ্ছিতে নেহারি প্রাণ সফল করিব!
সে দিনের সুখ, সখে, কহিব কেমনে?
জানে সে, বক্ষে যে কাল প্রেম সম্ভাষণে!

মুগ্ধ।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সহজ উপায়ে ভক্ত গণের সদগতি,
কিসে হবে কহ পিতঃ সৃষ্টি অধিপতি।
সাধু পুত্র সাধু প্রশ্ন করিলে জ্ঞাপন,
উত্তর করেন তায় দেব পদ্মাসন।
সাদরে আমার বাক্য শুন হে শ্রবণে
পুরাকালে যোগীবর শম্ভো ত্রিলোচনে।
জিজ্ঞাসেন রামতত্ত্ব হর মনোরমা
গিরিশ গিরিরে কহে শ্রীরাম মহিমা।
অধ্যাত্ম রামায়ণে নিগুঢ় বিষয়
জীব উদ্ধারিতে তাহা কহে দয়াময়।
জগদ্ধাত্রী যোগমায়া যোগেশ মোহিনী,
এ অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়েন আপনি।
দিবানিশি অর্চ্চন ও আলোচনা করি
সদানন্দে মগ্ন সদা রহেন শঙ্করী।
প্রাণীদের শুভাদৃষ্ট হইল আগত
শ্রীরাম হৃদয় লোকে হবে প্রকাশিত।
পঠনে শ্রবণে জীব নির্ম্মল হইবে।
অন্তে ব্রহ্মধামে সব গমন করিবে।
যাবৎ এ রামায়ণ প্রকাশ না হয়
ব্রহ্মহত্যা পাতকাদি তদবধি রয়।
পরস্পর শাস্ত্র সব বিবাদ করিবে,
মহতেও রাম তত্ত্ব বুঝিতে নারিবে।
যাবৎ এ রামায়ণ প্রকাশ না হয়,
ততদিন পুরাণাদি প্রভুত্ব হারায়।
পঠনে শ্রবণে পূণ্য ফল আছে যত
সক্ষম নহি হে মুনে বর্ণিবারে তত।

(ক্রমশ)

অষ্টম অধ্যায়।

বিজ্ঞানাভ্যাস।

লীলার বৈরাগ্য প্রবল হইয়াছে। স্বামী বিয়োগে যেরূপ বৈরাগ্য স্বভাবতঃ আইসে বিচারে তাহাই প্রবল হইয়াছে কিন্তু বিচার অভ্যাস এখনও দৃঢ় হয় নাই। শুধু বুঝিলেই হইবে না। অভ্যাসটি দৃঢ় করা চাই তবে হইবে। লীলা শ্রীগুরুকে সম্মুখে রাখিয়া বলিতেছে—

আমি রাজ্ঞী লীলা। আমার এই রাণীদেহ মাতার উদরে আসা হইতে পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে গঠিত হইয়াছে। বালিকা কাল, যৌবন কাল, প্রৌঢ় কাল পর্য্যন্ত ইঁহা নানা বিষয় ভোগ করিল। কিন্তু ইহার মূল কোথায় ছিল?

গতবারের মরণ মূর্চ্ছার পরেই আমি যাহা হই নাই তাহাই হইয়াছি এই স্মরণটি আমার মধ্যে উঠিয়াছিল। আমার চিত্তে যে মূল বাসনারূপিণী মায়া ছিল তাহাই এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব বস্তু তুলিয়াছিল। ইহা আমার ভ্রম। কারণ আমি চেতন, আমি আত্মা। অমি জড় নই, আমি দেহ নই। আমার জন্মও হয় নাই, মরণও নাই। মরণ মূর্চ্ছাও নাই। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।"আবার তাহার পূর্ব্বের মরণ মূর্চ্ছায় বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী নামক ব্রাহ্মণ দম্পতী আমরা ছিলাম। ইহাও ভ্রম। এখন গত ভ্রম সংশোধনে প্রয়োজন নাই, উপস্থিত ভ্রম দূর করিতে হইবে।

এবারকার দেহ-ভ্রম দূর করিব—করিয়া স্বরূপে স্থিতি লাভ করিব। সেই জন্যই মা তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তুমি আমাকে ভাবনা রাজ্যে আসিতে শিখাইয়াছ। স্থূল সংসার ভুলিয়া সেই দহরাকাশে কত মানস পূজা করিতাম। আবার মানস পূজার অধিকার-লাভ জন্য—রজস্তমকে অধঃকৃত করিয়া সত্ত্বভাব লাভ করিবার জন্য, কত ত্রিরাত্রব্রত করিলাম। উপবাস ব্রতে সাত্ত্বিক হইয়া কত প্রকারে ইষ্টদেবীকে ভজিলাম। তবে তোমার দর্শন সেই ভাবনারাজ্যে মিলিল। মা এখানে কত কি অপূর্ব্ব হইয়া যায়। তুমিই এই সব করিয়া দাও। আমি দেখি—তোমায় ভজিতে ভজিতে, তোমায় দেখিতে দেখিতে, তোমায় যেন দেখি না।

দেখি—"আমি" "তুমি" হইয়াছে। আমি নাই—তুমিই আছ। আহা, তখন সেই রমণীয়দর্শন সম্মুখে। সেই পরমপদ সম্মুখে। নদী সমুদ্রে মিশিতেছে ; এখনও এক হইয়া সমুদ্র হইয়া যায় নাই। অত্যন্ত সুখের অবস্থায় ইহা।

এই সময়ে তাহাকে পাওয়া হইয়াছে। কত কথা তাহার সহিত হইতেছে।

লীলা কত সাধের কথা বলিতেছে। ইহা কত সুন্দর! সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া রমণীয়—দর্শনের মানসসেবা করিতে করিতে যখন ভাবনা গাঢ় হইয়া যায় তখন ভাবরাজ্যে সত্য সত্যই সেবা হয়। সত্যই যে হয়, তাহার চিহ্ন সাত্বিক বিকার। বাহ্যদশা ভুল, অন্তর্দ্দশায় অবস্থান। সেই সময়ের কথবার্ত্তা কত সুন্দর। তুমি আবার এই ভাবকে দৃঢ় করিবার জন্য যখন পূর্ণ আনন্দের সময়ে অদৃশ্য হইয়া যাও, রাসলীলা করিতে করিতে যখন হটাৎ লুকাইয়া যাও তখন ভাবনা-রাজ্যে বিরহ হয়। সেই বিরহে যে আনন্দ উচ্ছসিত, উৎকণ্ঠাস্ফুটিত, বিরহ ব্যথার উক্তি তাহা ত কথায় বলা যায় না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
আমি কারে বা বুঝাই মা।
এরা হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী।

সকল ইন্দ্রিয় তাহাকে ভোগ করিয়াছে। সবাই অনুরাগী হইয়াছে। কেহই আর ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না। চক্ষু অন্তরে সেই নয়নাভিরাম রূপ দেখিতে চায়, কর্ণ অন্তরে সেই শ্রবণাভিরাম বাক্য শুনিতে চায়, নাসিকা সেই ঘ্রাণোন্মাদকারী গন্ধ পাইতে চায়, জিহ্বা সেই সুধাস্বাদের জন্য কাতর হয়। কাহাকেও আর থামাইয়া রাখা যায় না। আর—

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

এই ব্যাকুলতা পূর্ণ হইলে সেই ঈপ্সিততম, সেই দয়িত, সেই আমার সকল সাধের সমষ্টি আবার দেখা দেয়, আবার আদর করে। তখন কি হয় তাহা ত বলা যায় না। চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ—কি যে দেখে তাহা ত বলা যায় না। নয়ন-ভ্রমর

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখপদ্মমধ্যে যখন উপবেশন করে তখন ত কথা থাকে না। আবার যখন কথা ফুটে তখন কি কথা বাহির হয়? কবি সুন্দর বলিয়াছেন। বলেন—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে॥

তোমায় যে সব দিতে ইচ্ছা করে, যা আমার প্রিয় আছে। যা আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তাই তোমায় দিতে ইচ্ছা করে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আমার কি? আমার এই অমৃত, আমার এই প্রাণ, আমার এই মুখ্যপ্রাণ, আমার এই চৈতন্য, আমার এই আত্মা; এই তুমি নাও। আহা যাহা তোমায় দিব তাই যে তুমি।

তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হ'য়ে রব হে।"

ভক্তি পথে এই সব।

লীলার এই সমস্ত শেষ হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ লীলা ইহা করিয়াছে। তবুও যেন এখনও হয় নাই। তাই কখন কখন ইষ্টদেবীর সহিত আমি তুমি ভেদ হইয়া পড়িতেছে। আর ইষ্টদেবী, এই আমি বোধটিকে সেই অপরিছিন্ন শুদ্ধ বোধ স্বরূপে তুলিয়া দিতেছেন।

লীলা বলিল, মা! যে অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বদা সেই পরমপদের স্মরণ হয়, যেরূপ অভ্যাসে আর কখনও সেই একমাত্র সত্য বস্তুকে ভুলিয়া থাকিতে পারা যায় না সেই বিজ্ঞানাভ্যাস আমাকে বলুন।

দেবী। প্রথম প্রথম বাসনাক্ষয়ের জন্য বিজ্ঞানাভ্যাস আবশ্যক। প্রথম প্রথম নিত্যক্রিয়া অন্তে বিজ্ঞানাভ্যাস আবশ্যক। আবার ব্যবহারিক কার্য্যেও বিজ্ঞানাভ্যাসের প্রয়োগ আবশ্যক। পরে যখন কোন কিছুতে আর সেই পরম-পদের ভুল হইবে না, তখন হইবে সেই রমণীয় দর্শনে স্থিতি। বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা প্রথমে যখন বাসনা দগ্ধপটের মত হইয়া যাইবে, যখন বাসনাবীজ হইতে সংসার মহীরূহ আর জন্মিবে না—তখন—এই দেহে যদি তাহা লাভ করা যায় তবে হইবে জীবন্মুক্তি। জীবমুক্তের ব্যবহারিক কার্য্য থাকে। কিন্তু তাহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য। এ সমস্ত বাসনা বটে কিন্তু দগ্ধপট যেমন পট নহে ভস্ম মাত্র সেইরূপ জীবমুক্তের বাসনা—বাসনা নহে। বাসনা ক্ষয়ের কথা পরে বলিব। এখন বিজ্ঞানাভ্যাস কাহার নাম অগ্রে তাহাই শ্রবণ কর।

লীলা। অভ্যাস শুনিতেই আমার প্রথম আগ্রহ জন্মিয়াছে। মা! তুমি বল।

দেবী শুধু শুনিলেই হইবে না। কিন্তু—

বাসনা তানবে তস্মাৎ কুরু যত্নমনিন্দিতে।
তস্মিন্ প্রৌঢ়িমুপায়াতে জীবন্মুক্তা ভবিষ্যসি॥ ১৬॥

অনিন্দিতে! তুমি বাসনাক্ষয়ে যত্ন কর। বাসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইবে। আর তুমি যে লোকান্তর দেখিতে চাহিতেছ তাহা তুমি কিছুতেই দেখিতে পাইবে না যতদিন তোমার শীতল বোধচন্দ্রমা ভরিতাবস্থা লাভ না করে। বোধপূর্ত্তি বাসনা—তানবাভ্যাসের ফল। পূরিত বোধ হইলে তুমি স্থূল দেহ এইখানে স্থাপিত করিয়া লোকান্তর দর্শন করিতে পারিবে। যদি বল আমার দেহে মিলিত হইয়া তুমি সেখানে যাইতে পার—না তাহা হয় না। মাংস দেহ অমাংস দেহ বা চিন্ময় আতিবাহিক দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংস দেহ চিত্তশরীরে বা ভাবনাময় দেহে মিলিত হইয়া কোন ব্যবহারিক কার্য্য করিতে পারেনা। "নতু চিত্তশরীরেণ ব্যবহারেষু কর্ম্মসু"॥ ১৫॥ যাহা বলিলাম সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারে। আমরা শাপ ও বর দিয়া যোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি কিন্তু অযোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিনা। তোমাকে স্থূল শরীরে পরলোক দেখান অসম্ভব।

অবোধঘনাভ্যাসাৎ দেহস্যাস্থৈব জায়তে।
সংসার বাসনাকার্শ্যে নূনং চিত্তশরীরতা॥ ১৭॥

আমি চেতন আমি ইহা অনুভব করি। চেতন যাহা তাহার উপরে মণির ঝলকের মত স্পন্দশক্তিবিশিষ্ট কল্পনা যেন ভাসে। কল্পনাও মিথ্যা। ভাসাও মিথ্যা। তথাপি ভ্রম জ্ঞানে মনে হয় যেন ভাসে। পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমের আবৃত্তিতে ইহাই দৃঢ় হইয়া—যাহা কিছু নয় তাহাকেই স্থূল দেহ, স্থূল জগৎরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমি যেমন চেতন আর তাহার উপরে একটা মিথ্যা দেহ ভাসিয়াছে সেইরূপ পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ যিনি তাঁহাকেই, ভ্রমজ্ঞানটা, এই স্থূল বিচিত্র জগৎরূপে, দেখাইতেছে। কাজেই প্রতি স্থূল বস্তু যাঁহার উপর ভাসিয়াছে অথবা সর্পভ্রম

যে রজ্জুর উপরে ভাসিয়াছে প্রথমে বিশ্বাসে প্রতি দেহ ও প্রতি দেহের কার্য্যকে মায়া বলিয়া বা মায়ার কার্য্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা সেই জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যকে স্মরণ করিতে হইবে। আবার সাধনা দ্বারা ভিতরেও সেই চৈতন্যের অনুভব করিতে হইবে। এইরূপে নিরন্তর জ্ঞানাভ্যাসে এই দেহেই সংসার বাসনা কৃশ হইলেই নিশ্চয়ই এই দেহেই চিত্ত-শরীরতা বা আতিবাহিকতা লাভ হইবেই। মণির ঝলকে যে কত কি বিচিত্র সৃষ্টি দেখা যাইতেছিল সেই দৃশ্যদর্শন, বাসনা ক্ষয়েই ক্ষয় হইবে। এবং ঝলক জড়িত মণিটি মাত্র দেখা যাইবে। এই ঝলক বা অতিমণিটি আত্মার আতিবাহিক দেহ।

উদেষ্যন্তী চ সৈবাত্র কেনচিন্নোপলক্ষ্যতে।
কেবলন্তু জনৈর্দ্দেহো ম্রিয়মাণোবলোক্যতে ॥ ১৮ ॥

সা আতিবাহিকতা চ মরণকালে অত্র অস্মিন্নেব শরীরে উদেষ্যন্তী। কেনচিৎ ম্রিয়মাণেন জীবিতা বা নোপলক্ষ্যতে। তদ্যথা পেশস্কার ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ সেই আতিবাহিকতাটি মরণকালে এই শরীরেই উদিত হয়। তাহা কিন্তু মৃত বা জীবিত কেহই দেখে না। আতিবাহিক দেহ জন্মিলেও মৃত ব্যক্তির নিজের অজ্ঞান কল্পিত দেহারম্ভক ভূতাংশ সম্বলিত দেহটিই পরলোকে যায়। সেই দেহের অতি-বহন হইলেও তাহারা তাহা দেখে না। না দেখিলেও আতিবাহিকতার কোন বিরোধ হয় না। জীব যখন মরে তখন সে দেখে যে তাহার স্থূল দেহই যেন রহিয়াছে। এটা মরণমূর্চ্ছা কালে স্থূলদেহের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকাতে আতিবাহিক দেহকেই স্থূল দেহ এখনও রহিয়াছে ভাবনা করে মাত্র। কিন্তু স্থূল দেহটা পড়িয়া থাকে, আতিবাহিক শরীরেই জীব লোকান্তরে যায়। এইটাই পার-লৌকিক দেহ। এই দেহটা নিজ অনাদি অজ্ঞানকল্পিত সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

দেহস্ত্বয়ং ন ম্রিয়তে ন চ জীবতি কিঞ্চ তে।
কে কিল স্বপ্নসঙ্কল্পভ্রান্তৌ মরণজীবিতে ॥ ১৯ ॥

যদিও এই সমস্ত তোমায় বুঝাইতেছি—ইহা কিন্তু অজ্ঞানে কার্য্য যাহা হয় তাহাই বলিতেছি মাত্র। প্রকৃত কথা কি জান দেহ মাত্রই অবাস্তব এই জন্য এই

দেহের আবার বাস্তব মরণই বা কি আর বাস্তব জীবনই বা কি তাহাই বল। কোন্ ব্যক্তি বল স্বপ্নভ্রান্তি বা সঙ্কল্প ভ্রান্তি দ্বারা মৃত ও জীবিত হয়?

জীবিতং মরণঞ্চৈব সঙ্কল্প পুরুষে যথা।
অসত্যমেব ভাত্যেবং তস্মিন্ পুত্রি শরীরকে॥ ২০॥

পুত্রি! মনের সঙ্কল্প দ্বারা মনে মনে একটা মানুষ কল্পনা করা হইল। তার জীবন আর মরণটা কি তাই বল? এই শরীরটাও সেইরূপ অবাস্তব হইলেও আছে বলিয়া ভ্রম হয়। "তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।"

লীলা। তদেতদুপদিষ্টং মে জ্ঞানং দেবি! ত্বয়ামলম্।
যস্মিন্ শ্রুতিগতে শান্তিমেতি দৃশ্যবিষূচিকা॥ ২১॥
অত্রোপকুরু মে ব্রূহি কোঽভ্যাসঃ কীদৃশোঽথ বা।
স কথং পোষমায়াতি পুষ্টে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ॥ ২২॥

দেবি! এই ত আমাকে অমল জ্ঞান আপনি উপদেশ করিলেন। ইহা শ্রুতিগত হইলে দৃশ্যবিষূচিকা শান্ত হয়। এই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিলে দেহ, মন, জগদাদি দৃশ্য দর্শন রোগ সারিয়া যায়। এখন বলুন অভ্যাস কি, বাসনাক্ষয় বিষয়েই বা ইহা কিরূপে উপকারী। কিরূপে এই অভ্যাস পুষ্টি লাভ করিবে আর এই অভ্যাস পুষ্টি লাভ করিলেই বা কি হইবে?

দেবী। যে যাহা করে, বিনা অভ্যাসে এই জগতে তাহা সিদ্ধ হয় না।

বিনাভ্যাসেন তন্নেহ সিদ্ধিমেতি কদাচন॥ ২৩॥

কোন কিছুই বিনা ভ্যাসে কখনই সিদ্ধ হয় না। যে বোধে দৃশ্য দর্শন অসম্ভব হয় সেই বোধের যে অভ্যাস তাহাই হইল অভ্যাস।

যাহা পাইতে তোমার অভিলাষ তজ্জন্য তুমি—

তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেক পরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২৪॥

যাঁহাকে পাইতে চাও তাঁহাকেই চিন্তা কর। "অসন্দিগ্ধং স্ববুদ্ধ্যারোহায় চিন্তনং।" সন্দেহ শূন্য হইয়া আপনার উত্তম বুদ্ধিতে আরোহণ জন্য চিন্তা কর।

উত্তম বুদ্ধি, বিচার করিয়া বলিয়া দেয় যাহা ভুল তাহা চাই না, যাহা চিরদিন থাকে না তাহাও চাই না; যাহা অল্প তাহা চিরদিন থাকে না বলিয়া অল্প চাই না; যাহা দুঃখ তাহা চাই না। চাই—যাহা নিত্য, যাহা অভ্রান্ত, যাহা আনন্দ। যাহা চাও সর্ব্বদা, মনে মনে তাঁহার চিন্তা কর এবং অভিজ্ঞ অন্য বুদ্ধিমান জনগণের নিকট হইতেও তাঁহার সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহাদের সহিত তাঁহার কথা কও। "অভিজ্ঞ বুদ্ধ্যন্তর সম্বাদায় কথনং।" তাঁহার সম্বন্ধে যাহা অনুভবে আসে নাই তাহা অনুভবে আনিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। "পরস্পরাজ্ঞাতাংশ প্রবোধায়ান্যোন্য প্রবোধনম্।" এই সমস্ত উপায়ে সেই জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হইবে। অসম্ভাবনা দূর হইলে যাহা পাইতে চাও তৎপরায়ণ হইতে পারিবে। সর্ব্বদা সেই এক পরায়ণ হইলে আর তোমার তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিপরীত ভাবনাও থাকিবে না। চিন্তন, কথন, পরস্পর ভাব জাগান—এই সমস্ত দ্বারা সর্ব্বদা সেই একপরায়ণ হওয়ার নাম অভ্যাস। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহাই বলেন।

যাঁহারা যাহা চাই তদ্ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতেই বিরক্ত, যাঁহারা মহাত্মা, যাঁহারা অন্তর্ভব্যা—অন্তরে শান্ত, দুরন্ত নহেন তাঁহারা মোক্ষ লাভের জন্য ভোগ ভাবনা, ক্ষয়কে ভাবনা করুন। এইরূপ ব্যক্তি সংসারে জয়যুক্তও হয়েন।

এ জগতে গ্রহণ যোগ্য কিছুই নাই—চক্ষুর রূপ গ্রহণ, কর্ণের শব্দ গ্রহণ, মনের বিষয় গ্রহণ, হস্তের স্থূল ধন ভিক্ষাদি গ্রহণ এই সর্ব্বপরিগ্রহ ত্যাগ লক্ষণরূপ সৌন্দর্য্য দ্বারা এবং তজ্জন্য বৈরাগ্য রসের দ্বারা যাঁহাদের মতি রঞ্জিত হইয়া আনন্দে স্পন্দন করে তাঁহারাই উৎকৃষ্ট অভ্যাসী।

শুধু গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই ইহাই নহে কিন্তু জ্ঞেয় বলিয়া কোন কিছুরই একেবারেই অস্তিত্ব নাই। যাহাকে চাই, তাহাই আমি, তাহা ছাড়া অন্য সকল বস্তুর অত্যন্ত অভাব—ইহা যিনি অধ্যাত্মশাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা বোধ করিতে যত্ন করেন তিনি ব্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত।

সৃষ্টি বলিয়া কোন কিছু আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, সর্ব্বকালে দৃশ্য বলিয়া কোন কিছুও নাই, এই জগৎ আমি তুমি ইত্যাদি নাই এই বোধের যে অভ্যাস তাহাই হইল অভ্যাস।

দৃশ্যাসম্ভবেবোধেন রাগদ্বেষাদি তানবে।
রতির্ব্বলোদিতায়াসৌ ব্রহ্মাভ্যাস উদাহৃতঃ ॥ ২৯ ॥

দৃশ্য বলিয়া কোন কিছু নিতান্ত অসম্ভব এই বোধ দৃঢ় হইলে রাগ দ্বেষ ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন দৃশ্য অসম্ভব এই মনন জন্য বিদ্যাবপনার যে দৃঢ়তা তাহা হইতে উদিত যে আত্মরতি তাহাকেও ব্রহ্মভ্যাস বলে।

দৃশ্যাসম্ভব বোধেন রাগদ্বেষাদি তানবম্।
তপ ইত্যুচ্যতে তস্মান্ন জ্ঞানং তচ্চ দুঃখতৎ ॥ ৩০ ॥

যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সর্ব্বকালে মিথ্যা, এবং রাগদ্বেষের ক্ষীণতা ইহা ভিন্ন যে তপস্যা তাহা অজ্ঞানরূপ এবং দুঃখ ভোগ প্রদ।

তপস্যা বলিয়া কোন জানোয়ার নাই তাহার চারিটি পাও নাই পুচ্ছও নাই তপস্যা অর্থ দৃশ্যের অত্যান্ত অভাব বোধ আর রাগ দ্বেষের ক্ষয়।

দৃশ্যাসম্ভব বোধোহি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কথ্যতে।
তদভ্যাসেন নির্ব্বাণমিত্যভ্যাসো মহোদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

যে বোধের উদয়ে দৃশ্যদর্শন নিতান্ত অসম্ভব হয় সেই বোধটিই জ্ঞান, সেইটিই জানিবার বস্তু। ঐ বোধের অভ্যাসই মহান্ অভ্যাস। তাহাই নির্ব্বাণ।

এইরূপ অভ্যাসযুক্ত চিত্তে সর্ব্বপ্রকার তাপের উপশম হয়। তখন সর্ব্বদা বিবেক বোধাভ্যাসরূপ হিমশীতল বারি দ্বারা আত্মা হইতে সংসাররূপ কৃষ্ণপক্ষ নিশায় আগত মোহনিদ্রা অপগত হয়। শরৎ কালে মহতী নীহার পটলী যেমন বিশীর্ণ হয় সেইরূপ।

লীলা। মা! আমি কি অপূর্ব্ব অবস্থা অনুভব করিতেছি। এই স্থূল দেহ যেন আমাকে চেষ্টা করিয়া অনুভব করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যেমন হস্ত পদাদির অনুভব করিতাম এখন যেন চেতনা স্থূল ছাড়িয়া কোন সূক্ষ্ম রাজ্যে চলিয়াছে। ইহার পরে কি হইবে?

দেবী। ইহার পরে সমাধি লাগিবে। বাসনাক্ষয় হইলেই সমাধি লাগে। এই সময়ে তুমি বাসনাক্ষয়ের কথা আবার শ্রবণ কর।

লীলা। জগৎ নাই জগৎ নাই করিলে দৃশ্যদর্শন দূর হয় না। কিন্তু আমি

চেতন ইহা অনুভব করিতে করিতে জগৎ দর্শন থাকে না। আপনি বলুন বাসনা ক্ষয়ে জগৎ দর্শনের অভাব কিরূপ ?

যথা স্বপ্ন পরিজ্ঞানাৎ স্বপ্ন দেহো ন বাস্তবঃ।
অনুভূতোপ্যয়ং তদ্বৎ বাসনাতানবাদসন্ ॥ ১ ॥

স্বপ্ন বলিয়া জানিলে যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট দেহ বাস্তব বলিয়া বোধ হয় না সেইরূপ এই স্থূলদেহ অনুভূত হইলেও বাসনা ক্ষয় হইলে ইহা অসৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। স্বপ্ন জ্ঞান হইলে স্বপ্ন দেহ যেমন গলিয়া মিথ্যা হইয়া যায় সেইরূপ বাসনা ক্ষীণ হইলে এই জাগ্রৎ দেহও অনুভব সীমায় আইসে না।

স্বপ্নসঙ্কল্প দেহান্তে দেহোয়ং চেত্যতে যথা।
তথা জাগ্রদ্ভাবনান্তে উদেত্যেবাতিবাহিকঃ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নে সঙ্কল্পদেহ দর্শন অন্তে যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় তখন যেমন আবার এই স্থূল দেহের অনুভব হয় সেইরূপ জাগ্রতে দেহকে যে আমি আমি ভাবনা করা হইয়াছে সেই অহম্ভাবনা নাশ হইলেই অতিবাহিক দেহের উদয় হয়। মণির যে ঝলক, সেই মণি-আবরক ঝলককে যেমন মণি সম্বন্ধে আতিবাহিক বলে সেইরূপ চেতনের আচ্ছাদক স্পন্দনধর্ম্ম সঙ্কল্প বা ভাবনাকে আতিবাহিক দেহ বলে।

স্বপ্নে নির্ব্বাসনাবীজে যথোদেতি সুষুপ্ততা।
জাগ্রত্যবাসনাবীজে তথোদেতি বিমুক্ততা ॥ ৪ ॥

স্বপ্নকালে বাসনার বীজ পর্য্যন্ত যখন আর উঠে না—বাসনা বীজের উচ্ছেদ ইহা বলা হইতেছে না কারণ পরে আবার স্বপ্নও হইতে পারে—বলা হইতেছে বাসনা বীজ অনুদ্ভূত থাকিলে যেমন সুষুপ্তি ভাবের উদয় হয় সেইরূপ জাগ্রৎ কালে সর্ব্ববাসনা বীজ বাধিত হইলে বিমুক্তভাব বা জীবন্মুক্তির উদয় হয়। লীলা ! তুমি জাগ্রৎ কালেও অবাসনাবীজ হইয়া যাও, সমস্ত বাসনার বীজ পর্য্যন্ত বাধিত কর তবেই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। জাগ্রৎ কালে সুষুপ্তির অবস্থা সর্ব্বদা ভাবনা করিতে যদি পার, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। জাগ্রতে ভাবনাতে এই অবস্থা পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর ক্রমে হইবে।

লীলা—মা! জীবন্মুক্তের কি বাসনা উঠে না?

দেবী—যেয়স্তু জীবন্মুক্তানাং বাসনা সা ন বাসনা।
শুদ্ধ সত্ত্বাভিধানং তৎ সত্তাসামান্যমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

জীবন্মুক্তদিগের ও বাসনা থাকে কারণ তাঁহারাও ব্যবহারিক কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু জীবন্মুক্তদিগের যে বাসনা তাহা বাসনা নহে। যেমন দগ্ধপটকে আর পট বলে না তাহাকে ভস্মই বলে সেইরূপ উঁহাদের যে বাসনা তাহা অধিষ্ঠান সত্ত্বা,—তাহা শুদ্ধ বাসনা মাত্র। তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নামক সত্তা-সামান্য। সমুদ্রের শান্ত জল যেমন তরঙ্গ রূপে প্রতীয়মান হয় আর তরঙ্গ না থাকিলে শান্ত জলই থাকে, সেইরূপ চৈতন্যসমুদ্রের তরঙ্গ এই বাসনা। অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে এই বাসনারাজির খেলা হয়।

মায়াকে মূলবাসনা বলা হইয়াছে। মায়াকেও অনাদি অবিদ্যা রূপা মূলবাসনা বলে। মায়া যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভাসেন তাহাই অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই বাসনা হইতে বিচিত্র সৃষ্টি। মায়ার সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা যাহা তাহাকেই বলে অব্যক্ত। সাম্যাবস্থারূপ শুদ্ধ-সত্ত্বাবস্থা যাহা তাহাই পরমপদকে আবরণ করিয়া রাখে। চৈতন্যই আছেন, চিন্মণিই আছে, তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া স্বভাবতঃ যে ঝলক ভাসার মত বোধ হয় তাহা রজ্জুতে সর্পভাসার মত মিথ্যা। সাম্যাবস্থা যাহা তাহা চিৎ কে চিৎ শক্তি রূপেই বিবর্ত্তিত করে। বাসনার নাশ হইলে ইহা দগ্ধবীজের মত আর কোন সৃষ্টি করিতে পারে না। বাসনাজাল দগ্ধপটের মত তখনও জীবন্মুক্ত আত্মার উপরে আবরক রূপে পড়িয়া থাকিলেও ইহাদিগকে বাসনা বলা যায় না; কারণ ইহারা আত্মদেবকে আর কোন কর্ম্মে অহং অভিমান বিশিষ্ট করিতে পারে না। আত্মা আপন স্বরূপে আপনি আপনি ভাবে থাকেন। ইহারা সত্তা-সামান্যে পর্য্যবসিত হয়। জীবন্মুক্তের বাসনা ও ব্যবহারিক কর্ম্ম—কর্ম্ম হইয়াও কর্ম্ম নহে। বাসনা দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম। তাই বলা হইল তাঁহাদের বাসনা, বাসনা নহে, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব অথবা সত্তা-সামান্য।

যা সুপ্তবাসনা নিদ্রা সা সুষুপ্তিরিতি স্মৃতা।
যৎ সুপ্ত বাসনং জাগ্রৎ খনোঽসৌ মোহ উচ্যতে ॥ ৬ ॥

নিদ্রা কালে বাসনা সকল সুপ্ত বা অনুদ্ভূত হইলে হয় সুষুপ্তি আর জাগ্রৎ অবস্থায় বাসনা সকল অভিভূত হইলে হয় মোহমূর্চ্ছা। বাসনার অনুদ্ভব ও অভি-ভব অবস্থাতে যথাক্রমে সুষুপ্তিও মোহ ঘটে।

আবার নিদ্রাকালে বাসনা প্রক্ষীণ হইলে তাহা তুরীয়, আর জাগ্রতে বিচার বলে জ্ঞানোদ্রেক দ্বারা বাসনাপুঞ্জ সমূলে উন্মুলিত করিতে পারিলেও তুরীয় অবস্থা লাভ হয়। তুরীয়কে পরমপদ প্রাপ্তি বলে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই।

প্রক্ষীণ বাসনা মেহ জীবতাং জীবনস্থিতিঃ।
অমুক্তৈরপরিজ্ঞাতা সা জীবন্মুক্ততোচ্যতে ॥ ৮ ॥

এই সংসারে জীবিত জনের যে বাসনাশূন্য জীবনস্থিতি তাহারই নাম জীব-ন্মুক্তি। অমুক্ত—সংসারে আবদ্ধ জনের ইহা অজ্ঞাত।

শুদ্ধ সত্ত্বানুপতিতং চেতঃ প্রতনুবাসনম্।
আতিবাহিকতামেতি হিমং তাপাদিবাম্বুতান্ ॥ ৯ ॥

বরফ তাপযোগে জল হয়। ঘনবাসনাই চিত্ত। বাসনা ক্ষীণ হইলে চিত্তও শুদ্ধসত্ত্বে অনুপতিত হয়—শুদ্ধ সত্ত্বে চির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসনাক্ষয়ে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই হইল আতিবাহিক ভাব। দগ্ধপট যেমন পট নহে, পটের আকার ভস্ম মাত্র সেইরূপ বাসনা ক্ষয়ে চিত্ত চিত্ত নহে, চিত্তের আকার-বিশিষ্ট আতিবাহিকতা মাত্র। এই আতিবাহিক দেহটি নিতান্ত সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী। এই স্থূলদেহে যে পরলোক দর্শন হয় না তাহার কারণ এই যে—

আতিবাহিকতাং যাতং বুদ্ধং চিত্তান্তরৈর্ম্মনঃ।
সর্গজন্মান্তরগতৈঃ সিদ্ধৈর্ম্মিলতি নেতরৎ ॥ ১০ ॥

আতিবাহিকতা প্রাপ্ত প্রবুদ্ধ মনই, জন্মান্তরীয় ও সৃষ্ট্যন্তরীয় বস্তু দেখিতে পায় এবং দেব-যোগ্য সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে। স্থূলমন বা স্থূল-চিত্ত ঘনবাসনাযুক্ত বলিয়া আতিবাহিক মনের সহিত মিলিতে পারে না।

লীলা!—তোমার অহম্ভাব—তোমার দেহাভিমান যখন জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা শান্ত হইবে তখন তোমার এই দৃশ্যজ্ঞান দূর হইবে, তখন তোমাতে স্বভাবতঃ

বোধতা চিৎ স্বরূপতা উদিত হইবে। স্মরণ রাখ, যে বোধে দৃশ্যদর্শনটি অসম্ভব হইয়া যাইবে সেই বোধের যে অভ্যাস তাহাই হইল বিজ্ঞানাভ্যাস।

আতিবাহিকতা জ্ঞানং স্থিতিমেষ্যতি শাশ্বতীম্।
যদা তদা হ্যসঙ্কল্পান্ লোকান্ দ্রক্ষ্যসি পাবনান্॥ ১২॥

জ্ঞানের অভ্যাসে বাসনা ক্ষীণ হউক। তখন আতিবাহিক জ্ঞান পাইবে। প্রথমে আতিবাহিক হইয়া যাও। যখন তোমার আতিবাহিক জ্ঞান অবিনশ্বর ভাবে স্থিতি লাভ করিবে তখন তুমি কোন প্রকারে আর সঙ্কল্প দূষিত থাকিবে না। তখন তুমি পবিত্র হইয়া পবিত্র লোক সকল, সিদ্ধ পুরুষ সকল দেখিতে পাইবে।

জ্ঞানাভ্যাসে বাসনা ক্ষীণ কর, যাহা দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে। প্রথমে ক্রিয়া দ্বারা শরীর হইতে এবং বাসনা শরীর বা মন হইতে ছাড়িয়া থাকা কি তাহা বুঝিতে হয়। আবার সৎসঙ্গ দ্বারাও ইহা যে অনুভব হয় তাহাও জানিতে হয়। পরে বিচার দ্বারা ইহা অনুভব করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এতদভ্যাসে যখন ইচ্ছা-শক্তির পূর্ণ বল লাভ হয় তখন ইচ্ছা মাত্রই শরীর মন হইতে ছাড়িয়া থাকা হয় অর্থাৎ আপন স্বরূপে থাকা হয়। চতুষ্পাদ ব্রহ্মে মায়া কোথায় ইহার ধ্যান তখন সহজ হয়।

৯ম অধ্যায়।

বক্তা ও শ্রোতা।

শ্রোতা। এই কি তোমার উপন্যাস?

বক্তা। না।

শ্রোতা। না কি?

বক্তা। আমার নয়।

শ্রোতা। তবে কার?

বক্তা। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের।

শ্রোতা। সে স্থান কাল পাত্র ত নাই। তবে এ সব—

বক্তা। এ সব বাতুলতা—কেমন?

শ্রোতা। তাত এক রকম বটেই।

বক্তা। সেটা কিন্তু সকলে কি বলে?

শ্রোতা। তুমি কি তা বল না?

বক্তা। তা বলি না।

শ্রোতা। তুমি কি বল?

বক্তা—নিতান্তই শুনিবে? আচ্ছা। ঋষিগণ এমন কথা বলেন যাহা সকল কালেই এক। রামায়ণ মহাভারত চিরকালের জন্য। যাহা সত্য তাহা চির দিনই এক। তিন কালেই এক। রামায়ণ মহাভারত কি কখন পুরাতন হইয়াছে,—না হইবে? ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের মহারামায়ণও রামায়ণ। ভগবান্ ব্যাসদেবের অধ্যাত্ম রামায়ণও রামায়ণ। ইহা ভিন্ন আরও রামায়ণ আছে। আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ আরও কত।

যুগে যুগে রামায়ণ হয়। কল্পে কল্পে হইয়া আসিতেছে। আবার এক এক কল্পে যে সব যুগ আছে তাহার প্রতি যুগের ভিতরে সকল যুগ গুলিই আছে। যেমন সত্বরজস্তম এই গুণ কখন পৃথক হইয়া থাকে না সেইরূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগও কখন একা একা থাকে না। সত্য যুগের ভিতরেও

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি থাকে। আর কলি যুগেও দ্বাপর ত্রেতা সত্য যুগ আছে। এই কলি যুগের আর্য্য বংশধর গণের উপসনার অবলম্বন গুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর বুঝিবে। শিবশক্তি, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ একালেও এই সকলের উপাসনা চলিতেছে। ইহা ভুল নহে। কারণ ভাবনা রাজ্যে যাও যে যাঁহার উপাসনা করেন তাঁহাকেই তিনি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হয়েন। আবার উপাসনা গাঢ় করিতে পারিলে স্থূলেও প্রাপ্ত হয়েন। ভাবনা রাজ্যে যাহা থাকে, ভাবনা রাজ্যে যাহা করা যায় তাহা মিথ্যা এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের উচিত একবার খাঁটি সত্য বস্তুর বিচার করা। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের শিষ্য হইয়া যদি তাঁহারা সত্যটি কি দেখিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদের মনের ধাঁধা মিটিয়া যাইতে পারে এরূপ আশাও করা যায়। আর ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবকেও যদি তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন, যদি বশিষ্ঠ দেবের কথা তাঁহারা না মানিতে চান তবে বুঝিয়া দেখা উচিত তাঁহাদের মত অর্ব্বাচীনের কথা কয়দিন লোকে মানিবে?

শ্রোতা—বুঝিলাম তুমি কি বলিতেছ। এখন বক্তা ও শ্রোতায় কি বলিতে চাও, বল।

বলিতেছি আর পূর্ব্বেও বলিয়াছি এ উপোপাখ্যানের নাম করা হইয়াছে লীলা উপন্যাস, এ উপন্যাস চিরদিনের জন্য, সকল কালের জন্য। রাজা পদ্ম ও রাণী ইহারাই পূর্ব্বে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও অরুন্ধতী ব্রাহ্মণী ছিলেন। এই বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর কাছে এখনও ব্রাহ্মণ দিগকে যাইতে হয়। বিবাহের কুশণ্ডিকার মন্ত্রে কাহার কাছে সংযম শিক্ষা এখনও লোককে করিতে হয় দেখিলেই ইহা বুঝা যায়! তাই স্থান কাল পাত্রের কথা একটু বলা হইতেছে।

এই উপাখ্যানের বক্তা ভগবান্ বশিষ্ঠ আর শ্রোতা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র। যে স্থানে এই উপাখ্যান বলা হইয়াছিল সে স্থান সরযূ নদীর তীরে রাজা দশরথের রাজসভায়।

সেই সরযূ এখন ও আছে সেই অযোধ্যা এখনও আছে। আর সেই রাম, সেই বশিষ্ঠ, সেই সভা ও সেই সভাসদ্ এখনও আছে। আধুনিক বৈষ্ণবেরা যেমন বলেন "কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়" আমরাও তাই বলি। সে ভাগ্য আমাদের নাই। যদি কখন তেমন ভাগ্যের উদয় হয় তবে ধন্য হইয়া যাইব। উদয় হইবে কিনা জানিনা। তবে এই বলিয়া চিত্তকে শান্ত রাখিবার

উপদেশ পাই যে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। কর্ম্মফলে বাসনা না রাখিয়া কর্ম্মগুলি তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া পালন করিতেই তিনি বলেন। নিত্য কর্ম্মের সঙ্গে স্বাধ্যায়ও থাকে। "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায় তিনিই বলেন। এ চেষ্টা—আজ্ঞা পালন জন্য।

বলিতেছিলাম যেখানে রঘুপতির উত্তর কোশলা ছিল এখনও সেই রঘুপতির জন্মস্থান, রাজা দশরথের গৃহ, সভা গৃহ সকলই আছে। যিনি দেখিতে জানেন, যিনি দেখিতে পারেন—তিনি দেখিতে পান। দেখেন,—স্থূলে নয়, কিন্তু ভাবনা রাজ্যে।

ভাবনা রাজ্যে দেখেন,—ভগবান্ বশিষ্টদেব রাজা দশরথের সভার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সেই সর্ব্বোচ্চ স্থানের সন্নিকটে—দুই পার্শ্বে ও সম্মুখে বিশ্বমিত্র নারদাদি মুনিগণ উপবিষ্ট। মুনিগণের সন্নিকটে রাজা দশরথ রাম লক্ষণাদি। তৎ পশ্চাতে অন্যান্য সভ্যগণ উপবেশন করিয়াছেন। রাজা দশরথের পার্শ্বে স্বর্ণ সিংহাসনে এক কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উপবিষ্ট। ইনি ব্যাসদেব।

মণ্ডপোপাখ্যানের বক্তা ভগবান্ বশিষ্টদেব। উপাখ্যানের নায়ক পদ্মরাজা ও নায়িকা লীলা রাণী, পূর্ব্বজন্মে ইঁহারা ছিলেন বশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অরুন্ধতী ব্রাহ্মণী। এই ব্রাহ্মণ দম্পতীই প্রসিদ্ধ বশিষ্ট অরুন্ধতী কিনা তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। বক্তা বশিষ্ট দেব প্রশ্নকর্ত্তা রাম কে বলিতেছেন—রাম! বেদে যে কর্ম্ম কাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড আছে তন্মধ্যে প্রথম দুই কাণ্ডে আছে সাধনার কথা আর জ্ঞান কাণ্ডে আছে সাধ্যবস্তুতে স্থিতির কথা। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি কর,—করিয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা মুক্তি লাভ কর।

উত্তম মধ্যম অধম এই ত্রিবিধ সাধক। যিনি সমস্ত বস্তুতে বিরক্ত তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া আমাতে একাগ্র চিত্ত হইবেন,—হইয়া সদ্যোমুক্তি অভিলাষ করিবেন। ইনিই উত্তম অধিকারী। ইহার প্রতি "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" আত্মাই আছেন, তিনি আপনি আপনি, আর কিছুই নাই, এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করা হয়।

সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া যিনি ক্রমমুক্তি ইচ্ছা করেন তিনি মধ্যম। ইহার প্রতি উক্‌থমুক্‌থ ইত্যাদি প্রাণ বিদ্যার উপদেশ।

সদ্যোমুক্তি বা ক্রম মুক্তিতে যাঁহার রুচি নাই—যিনি কিরূপে ধন ধান্য পুত্র কন্যা পশু বিত্তাদি হইবে সেইরূপ চেষ্টা করেন তিনি অধম। ইহার প্রতি সংহিতাদির উপাসনা বলা হইয়াছে।

জ্ঞান প্রচারের জন্য এই গ্রন্থের বক্তা বশিষ্ঠদেবের পৃথিবীতে আগমন।

পৃথিবীতে জ্ঞান অবতরনের প্রয়োজন কি হইয়াছিল? শ্রবণ কর।

চিৎস্বরূপ নির্গুণ পরমাত্মা হইতে স্বভাবতঃ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু প্রথমে উদিত হয়েন। সাগর হইতে যেমন তরঙ্গ উঠে এই পুরুষের উত্থান ও সেইরূপ। ইনি বিরাট পুরুষ।

এই বিরাট পুরুষের হৃদ পদ্ম হইতে, কেহ কেহ বলেন নাভিপদ্ম হইতে, সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। বশিষ্ঠ দেব বলেন সমুদ্রে স্বভাবতঃ যেমন তরঙ্গ উঠে, সেইরূপ পরমব্রহ্ম স্বভাব হইতে মৎপিতা ব্রহ্মা ক্রিয়াশক্তিময় হইয়া উৎপন্ন হন। ব্রহ্মাই ঈশ্বর।

মন যেমন কল্পনা সৃজন করে, বেদ বেদাঙ্গবিৎ ব্রহ্মাও সেই রূপে এই ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সৃষ্টির এক পার্শ্বে এই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের এক কোণে এই ভারতবর্ষ।

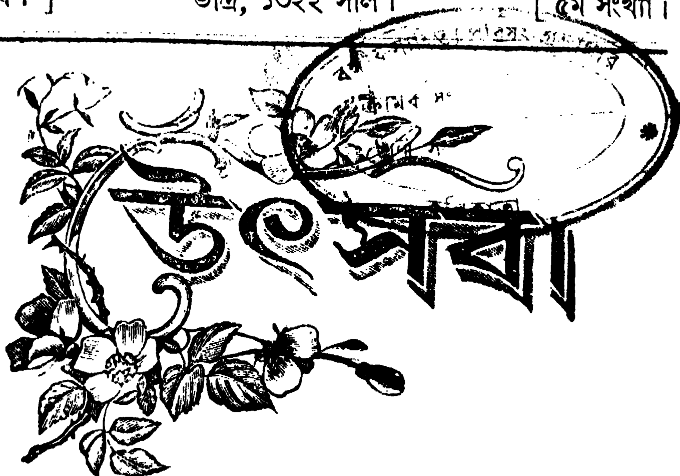
জগৎ সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা দেখিলেন আত্মজ্ঞানাভাবে জীব সমূহ জন্ম জরা মরণ ও নরক গতি প্রভৃতিতে নিতান্ত আতুর হইয়াছে।

ব্রহ্মা তখন প্রাণিগণের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের সুগতি দুর্গতি পর্য্যালোচনা করিলেন। তিনি দেখিলেন সত্যাদি যুগ জীবের স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি) লাভ করিবার জন্য সাধনা করিবার যোগ্য কাল। ঐ কাল ক্ষয় হইলে জীবের মোহ বৃদ্ধি হইবে। তজ্জন্য নরক লাভ অনিবার্য্য। এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি কারুণ্য পরবশ হইলেন।

জীবের আধি ব্যাধি জরা মরণ নিবারণেরও ক্রম আছে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান, সত্য, তীর্থ এই গুলিতে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। ইহারা প্রথম অবস্থায় আবশ্যক হইলেও আত্মতত্ত্ব জানা ব্যতীত সংসারতপ্ত জীবের চিরদিনের

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩২২ সাল। [৫ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সম্পাদকের নিবেদন।

উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক বর্গের শুভ ইচ্ছায় নব বর্ষে নব সঙ্কল্প লইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতরণ করা হইয়াছে। আমরা সকলে কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করিয়া যাইব ফলাফল বিধাতা পুরুষের হাতে। গ্রাহকবর্গের অবগতার্থে নিবেদন করা হইতেছে যে ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক এবং কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ননীলাল রায় চৌধুরী বিষয়কর্ম্ম প্রয়োজনে স্থানান্তর গমন করায় শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ সুবল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুবল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

পুত্রহারা।

তব চরণের প্রসাদী প্রসূন
করেছিলে মোরে দান।
শক্তিহীনা তাই সমাদর তার
করিতে নারিল প্রাণ॥

অযোগ্যা ভাবিয়া আশীষ তোমার
ফিরায়ে লয়েছ প্রভু।
যেথা হতে এল, চলে গেল সেথা
পুনঃ তব পদে বিভু।

ভাঙ্গিয়া আমার মরম পাঁজর
শূন্য করিয়া হৃদি।
কি ইচ্ছা পুরিল, কি মঙ্গল হ'ল
জান তুমি তাহা বিধি॥

দেবতা বাঞ্ছিত ছিল তার কান্তি,
অমিয় মাখানো মুখ।

স্নেহের উচ্ছ্বাসে এ বক্ষে আমার
ঢালিত অসীম সুখ॥
স্বরগ ভাষায় আধ আধ স্বরে
মা বলে ডাকিত যবে।
ভুলিতাম বিশ্ব দুঃখজ্বালা ভরা
মধুমাখা মা-মা রবে।
মোহের নেশায় অনিত্য লইয়ে
ভুলে ছিনু নিত্যধনে।
তাই বুঝি হরি কেড়ে লয়ে তারে
জেগেছ আমার প্রাণে।
তাকে পেয়ে তোমা ভুলেছিনু প্রভু
তাহারে লইলে সাথে।
খুলে দিলে মোর স্নেহান্ধ নয়ন
জীবনের মধ্য পথে।
তাই যদি হয় ওগো ইচ্ছাময়
শক্তি দাও শক্তি স্বামী।
সংসারে থাকিয়ে তোমাতে মজিয়ে
সদা যেন থাকি আমি।
শোক দুঃখ নাশি এস প্রভু মোর
ধ্যান ধারণায় জ্ঞানে।
ভুলি পুত্রধনে চাহি তোমাপানে
শান্তি যেন পাই প্রাণে।

শ্রীমতী ইন্দুবালা।

তোমার সেবা।

জগতে কত লোক তোমাকে ডাকে। কেহ বুঝিয়া ডাকে, কেহ না বুঝিয়াও ডাকে। যে জন্যই হউক ডাকে কিন্তু। আবার যাহারা ডাকিতে চায় না তাহাদিগকেও তুমি বেগ দিয়া ডাকাইয়া লও। সবাই কিন্তু একভাবে ডাকে না। কেহ ডাকে ভয়ে, কেহ ডাকে আশায়, কেহ ডাকে কর্ত্তব্যজ্ঞানে, আর কেহ ডাকে—না ডাকিয়া থাকিতে পারে না তাই। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে ডাকা হয় তাহার কথা এখানে বলা হইবে না। এখানে ভালবাসায় যে ডাকা হয় তাহার কথাই বলা হইবে। যে তোমাকে ভাল বাসিয়াছে সে তোমাকে না ডাকিয়া থাকিতে পারে না। ডাকাতেই ভালবাসার পর্য্যাপ্তি হয় না। ডাকার উপরে আরও কিছু চাই। যাহা চাই সেইটুকুই কিন্তু ভালবাসার প্রাণ। বলা হইতেছে ভালবালার প্রাণ সেবা। সেবাশূন্য যে ভালবাসা সে ভালবাসা থাকে না। সে ভালবাসা স্বার্থ লইয়া জন্মে, স্বার্থ ফুরাইলে ভালবাসাও ফুরাইয়া যায়। স্বার্থের জন্য যে ভালবাসা সেটা প্রবৃত্তি মার্গের ভালবাসা। সেটা কাম। আর নিবৃত্তি পথের যে ভালবাসা তাহা প্রেম। এই ভালবাসা কখন ফুরায় না। এই ভালবাসা কখন ছুটিয়া যায় না। এই ভালবাসা "অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।" বাক্য ও ভাবনার কথা বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সেবাকর্ম্মে পবিত্রতা বেশী, সুখও বেশী। কিন্তু যেখানে ভালবাসা নাই, যেখানে ভালবাসা জঘন্য কামজ সুখে কলঙ্কিত, সেখানে পবিত্র সেবাও থাকিতে পারে না। পবিত্র ভালবাসা নাই অথচ সেবা আছে, এ যেখানে হয়, সেখানে সেবা লোক দেখান অথবা তাহা প্রাণহীন অনুকরণের সেবা। এ সেবার কথা বলা হইবে না। বলা হইতেছে—"তোমার সেবা"।

"তোমার সেবা" কিসে হইবে? যদি তোমাকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করিয়া মোটামুটিও জানি, জানিয়া একটু ভালও বাসি, তবেই তোমার সেবা হয়। বিশ্বাস করি তুমি আছ। কেমন ভাবে আছ? আকাশ যেমন বিশ্বকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছে, তুমিও সেইরূপ সমস্ত ব্যাপিয়া আছ। শুধু তাহাই নহে তুমি আকাশকেও ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছ। আকাশ কত সূক্ষ্ম। আকাশকে চক্ষে দেখা যায় না, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও জানা যায় না। আকাশের

গুণ ধরিয়া আকাশকে বুঝা যায়। এই যে নীল একটা কিছু দেখি, এই নীলিমা কিন্তু আকাশে নাই। ভ্রমবশতঃ মনে হয় আকাশ নীল। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দদ্বারা বুঝা যায় আকাশ আছে। কেমন করিয়া বুঝা যায় এ তত্ত্ব এখানে বলা হইতেছে না। বলা হইতেছ আকাশ অতি সূক্ষ্ম। আর তুমি? তুমি এই সূক্ষ্ম আকাশকেও ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছ। কত সূক্ষ্ম তুমি!

যখন সর্ব্ব বলিয়া কিছু থাকে তখন তুমি সর্ব্বব্যাপী। আবার যখন সর্ব্ব বলিয়া কিছুই থাকে না তখনও তুমি থাক। কিছুই নাই তবু তুমি আছ। "আর কিছুই নাই" এ অবস্থা যখন মানুষের হয় তখনই সঙ্গে সঙ্গে হয়—তুমিই তুমি, "আপনি আপনি"। এইটি বুঝিবার বিষয় নহে। এইটিতে স্থিতি হয়। সুষুপ্তি কালে স্থূল থাকে না, সূক্ষ্মও থাকে না; আর কিছুই থাকে না তাই "আপনি আপনি" ভাবে স্থিতি হয়। এ স্থিতিটি কিন্তু তুরীয় স্থিতি নহে, স্বরূপ স্থিতি ও নহে। কারণ জীবের সুষুপ্তি কালে আর কিছুই থাকে না, শুধু থাকে অস্মিতা—"আছে"—এই স্থিতি। এখানে স্বরূপের অজ্ঞান রূপ একটি আবরণে "স্বয়মস্তীব" মত কিছু থাকে। ইহাও উল্লাস বটে কিন্তু ইহা তুরীয়ের আনন্দ নহে। ফলে তুরীয়ের কিছুই বলা যায় না। "যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতং ন যত্র বাক্ প্রভবতি"। তুরীয় তুমি কি বলা গেল না। তুরীয় তুমি নির্গুণ। কিন্তু নির্গুণ হইয়াই যদি তুমি থাকিতে তবে কি হইত? তাই তুমি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আপনাকে আপনি প্রকাশ কর। সৃষ্টি যদি না থাকে তবে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ কোথায় হয়? তোমার মায়া তোমাতে স্বভাবতঃ উঠে। সেই মায়া অবলম্বন করিয়াই তুমি সগুণ হও, সৃষ্টিকর্ত্তা হও। তুমি অজ। তুমি তোমার মায়াকে আশ্রয় করিয়াই বিশ্বস্রষ্টা। আবার বিশ্বসৃজন করিয়া বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তুমি থাক। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। আকাশটা গ্রামে প্রবেশ করিল এ বলাও যা আর তোমার সৃষ্ট বস্তুতে তুমি প্রবেশ করিলে এ বলাও তাই। এই কথা আর ভাঙ্গিয়া বলায় কাজ কি? যিনি বুঝেন তিনিই বুঝেন।

নির্গুণ তুমি। সর্ব্বদা "আপনি আপনি" থাকিয়াও তুমি সর্ব্ব স্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, বিশ্বরূপ, সগুণ ব্রহ্ম। "তোমার সেবা" ইহাতে দেখা গেল নির্গুণ "আপনি আপনি" তুমি—আবার সকল সৃষ্ট বস্তুকে ভিতরে বাহিরে ব্যাপিয়া আছ তুমি। ইহাতেও "তুমি" টির সব বলা হইল না। এই বিশ্ব সৃষ্টি

করিয়া তুমি সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছ। আর তোমার সৃষ্ট জীবকে কতকগুলি শক্তিও তুমি দিয়াছ। শক্তির অপব্যবহারে যখন বিশ্বের একটা বিপর্য্যয় আইসে তখন তুমি নির্গুণ ও সগুণ থাকিয়াও মায়ামানুষ ও মায়ামানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হও, এই তুমি অবতার।

লোকে বলে তোমার মূর্ত্তি নাই। মূর্ত্তি ধরিলে তোমাকে নাকি তুমি ছোট কর। ইহাতে নাকি তোমার স্বরূপের বিনাশ হয়। মানুষের মূর্খতা অনেক। অবতার সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলে, বিশ্বরূপ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। যে তুমি "আপনি আপনি," যে তুমি চতুষ্পাদে পূর্ণ, সেই তোমার এক দেশে মায়ার যে চলন হয় সেই মায়ার দ্বারা তুমি যেন খণ্ডিত হও, খণ্ডিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী হও! তোমার কি খণ্ড হয়? ইহা হওয়াও যা আর অবতার হওয়াও তাই।

বিশ্বরূপ ধরিয়া তুমি যেমন খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হও না; অবতার হইয়া তুমি সেইরূপ খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষুদ্র কখনও হও না। ঘটের মধ্যে যে আকাশটা থাকে তাহাকে খণ্ড আকাশের মত মনে হয়। ফলে ঘটের মধ্যে আকাশটাই এই মহাকাশ। যাঁহারা দেখিতে জানেন, যাঁহারা ঘটের মধ্যের আকাশে তন্ময় হইতে পারেন তাঁহারাই দেখেন—আহা! এই এক আকাশ ঘটের মধ্যে ঢুকিয়া যেন খণ্ড হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবিক ইহা খণ্ডাকাশ নহে। ইহা সেই অখণ্ড আকাশই। যে তোমার তত্ত্ব কিছু আলোচনা করিয়াছে সে বাহিরের অখণ্ড আকাশ দেখিয়া দেখিয়া ভিতরের খণ্ডমত আকাশ যখন দেখে আর বলে ঘট আবরণটা একটা কি যেন আকাশে ভাসিয়াছিল, দুই আকাশ-কে এক দেখিতে দেখিতে এই ঘট আবরণটা কোথাও যেন মিলাইয়া গেল। সেইরূপ তোমার সুন্দর অবতারের মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া সে দেখে এক অখণ্ড তুমিই আছ আর তোমার স্বরূপের চিন্তায় এই নামরূপের আবরণ তোমার স্বরূপে যেন লুকাইয়া যায়। তবেই হইল—অবতার হইলেও তোমার স্বরূপের, তোমার বিশ্বরূপের বিচ্যুতি কখন হয় না।

তুমি সমকালে নির্গুণ, সগুণ ও অবতার—এই কি সব হইল? না এখনও বাকী আছে। তুমি জীবে জীবে আত্মা।

ঘটাকাশ ও মহাকাশের দৃষ্টান্তে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা বুঝা যায় জীবাত্মাই সেই পরমাত্মা। "জীব" উপাধি দ্বারাই জীবাত্মাকে অল্পজ্ঞ, অল্পদ্রষ্টার মত বোধ হয়।

তুমি সমকালে নিগুর্ণ, স্বগুণ, অবতার ও আত্মা—এই তত্ত্ব যখন জানা যায় তখন তোমার সেবা ঠিক ঠিক হয়, তোমাকে যে কেহ এই ভাবে বুঝিয়াছে সে কি শুধু কৃষ্ণ অবতারকেই বলিবে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" আর রাম অবতারকে ইহা বলিবে না বা কালীকে স্বয়ং বলিবে না? এইরূপ সাম্প্রদায়িক বাদ বিসম্বাদে ধর্ম্মভাবের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে।

তুমিটি যখন ঠিক ঠিক বুঝা যাইবে তখন "তোমার সেবাটি প্রাণ দিয়া করা হইবে। যত্র জীব তত্র শিব। জীবে জীবে তুমি। জীব সেবায় তোমার সেবা হইল। আর জীবের মধ্যে যে অজ্ঞান আছে তাহার শাসনেও তোমার সেবা হইল। এখন সেবার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যউিক।

যাহাকে ভালবাসি তাহার সেবা করিতে প্রাণ চায়। সেবায় কিছুই লওয়া থাকে না, সব দিতে ইচ্ছা করে। সেবাতে আত্মসুখের দিকে দৃষ্টি থাকে না শুধু তোমার সুখের জন্য ব্যাকুলতা থাকে। সেবাতে নিজের সুখের দিকে ত দৃষ্টি থাকেই না বরং সেবা করিতে যদি আমার কোন কষ্ট হয় সে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে হয় না। সে ক্লেশেও সুখ, কেন না এ ক্লেশত তোমার জন্য। যে সেবায় দুঃখটাতেও সুখ বোধ হয় সেই সেবাই প্রকৃত সেবা। সেবাতে কি কিছু সুখ নাই? আছে বৈকি? সাত্বিক সুখ যাহা তাহাই যথার্থ সেবায় হয়। মৎকৃত সেবায় যখন তোমার সুখ হয়, তোমার সেই সুখ দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। তোমার সুখ হইতেছে ইহা অনুভব করিতে পারিলে আমার সব ফুটিয়া উঠে। শেষে এমন হয় যে আমি সেবক—আমাকে দেখিলে তুমি প্রফুল্ল হও আমাকে দেখিয়া তোমার মধ্যে কি যেন কি ভাসিয়া উঠে ইহা দেখিলে আমি আনন্দে ভরিয়া যাই।

তোমার সেবায় যখন এই রূপ হয় তখন বুঝি ঠিক ঠিক তোমার সেবা হইতেছে। গুরু সেবায় ইহা ধরা যায়। স্থূলে সেবা করিতে করিতে সূক্ষ্মেও যখন ইহার অনুভব হয় তখন "তোমার সেবা" পূর্ণ হয়। আর "তোমার সেবা" করিতেছি মনেরাখিয়া যখনমানুষের সঙ্গেকথা কই, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কালে যখন তোমার সেবাটি না ভুলি তখন কিসে যেন বিভোর হইয়া থাকি—এটি যিনি অভ্যাস করেন তিনিই জানেন। একদিন করিলে এরূপ অভ্যাসের কিছুই হয় না। ইহা নিত্য বস্তু। যখন "তোমার সেবা" মনে রাখিয়া তিন বেলার নিত্যকর্ম্ম করি আর "তোমার সেবা" মনে করিয়া সর্ব্বদা জপ করিতে অভ্যাস করি তখন এই নিত্য

অভ্যাস ঠিক ঠিক হইবে। তিন বেলার কার্য্যে ও সর্ব্বদার কার্য্যে "তোমার সেবা" অভ্যাস চলুক তবে সকল লোকের সঙ্গে, এমন কি শত্রু মিত্র, স্ত্রী পুত্র, প্রভৃতি সকলের সঙ্গে ব্যবহার কালে আর "তোমার সেবার" ভুল হইবে না। এই অভ্যাসটি করিয়াই যদি সংসার হইতে বিদায় লইতে পার তবে এ জীবনে ঠকিলে না। নতুবা টাকাই জমাও, আর জমীদারীই ক্রয় কর অথবা পুস্তকই লেখ, শেষকালে ফাঁকিতে পড়িবে, এখান হইতে যাইবার সময় বড় দাগা পাইয়া যাইবে, আবার দাগা পাইবার জন্য আসিতে হইবে। হে প্রেমময়! যতক্ষণ তুমি কৃপা দৃষ্টি না কর ততক্ষণ আমাদের চেষ্টা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। প্রভু! আমরা ইহা প্রাণপণে করিতে চেষ্টাত করিবই কিন্তু তুমি সকল চেষ্টা, সকল ভাবনা ও সকল উদ্যমের শেষ।

কথা কওয়া।

কত খেলাই জান,—কখন আশ্বাস, কখন মধুর আলাপ, কখন উপদেশ, কখন বা আদর,—আবার কখন তাড়না ও উপেক্ষা। এক রকম সব সময়ে ভাল লাগে না—তাই তোমার নানা রূপ। বহুরূপীর মত কত রূপই ধরিতে জান—তাহা আমি কি বলিব? কিন্তু এ সবই তোমার মায়ার পরীক্ষা। পরীক্ষা কর যে আমি তোমায় ঠিক ঠিক চিনিতে পারি কি না? আদরে, আশ্বাসে, সম্ভাষণে ত বেশ বুঝি তুমি আমার চিত্তসমুদ্রে তরঙ্গ তুলিয়া আমাকে কত আনন্দ উপভোগ করাও; তাহা যখন শান্ত হয়—তখন তোমার সুখময় স্মৃতি আমাকে কর্ম্মে উৎসাহ, মনে বল, জীবনে ভরসা দিয়া বলে—ইহারই নাম

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৫। ১০ ॥

এই কর—এই ভাবে চলিতে চলিতে হইবে—"নবদ্বারে পূরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"। তখন "আত্মরতি, আত্মক্রীড়" হইবে। হইয়া সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবে।

এই পর্য্যন্ত ত বেশ বুঝি কিন্তু যখন তাড়না কর—বা উপেক্ষা কর তখন তোমার প্রকৃত রূপ খুঁজিয়া পাই না। তুমি তখন আমার মধ্যে এক বিক্ষেপ তুলিয়া দিয়া বল—"একটু এদিক ওদিক দেখই না কেন—সব সময়ে কি এক রকম ভাল লাগে"। তার পরেই দেখি তুমি আড়ালে দাঁড়াইয়া আছ—এবং দেখিতেছ যে আমি কি করি। কি আশ্চর্য্য! তখন দেখি যে আমি প্রবৃত্তিতরঙ্গে তালে তালে নাচিতেছি; তখন কত ফুল, কত ফল, কত পাখী, কত বৃক্ষ, কত উপবন, কত পর্ব্বত, কত সুমধুর কণ্ঠ, কত প্রিয়সঙ্গ, কত হৃদয় বিনিময়, কত আলাপ সম্ভাষণ,—সব আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি সকলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে কত রসই ভোগ করি। কিন্তু এ সবই স্থলে—মন একবারে বহির্জগতে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু মুখে বলিতেছে—"রসো বৈ সঃ" তিনিই ত এত হইয়াছেন। কত কবিতা ছুটিল, কত ভাবের প্রস্রবণ চলিল, কত গান শুনিল ও শুনাইল, প্রকৃতির সঙ্গে একতা অনুভব হইল, আরও কত কিছু। মন একেবারে প্রকৃতির কবলে; অন্তঃপুরবাসিনী বাহিরে আসিয়া লাজ লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া অবাধে ব্যভিচার আরম্ভ করিল।

যখন সব সঙ্গীত শেষ হইল—তখন একান্তে আসিলাম। আসিয়া দেখি কোথায় আমার কর্ম্মার্পণ আর কোথায় আমার আত্মরতি। কিছুই নাই;—সর্ব্ব মনোরম সর্ব্ব হৃদয়াভিরাম তুমি তখন কোথায়? সব শূন্য, সব আঁধার। এত কার্য্য এত 'রস' এত আনন্দ সমস্তই বিদ্যুল্লতার ন্যায় শূন্য গগনে উঠিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে আমার পথভ্রান্তি হইয়াছে। এ কোন্ পথে আসিয়া পড়িলাম! এ যে কণ্টকাকীর্ণ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল সংসার কাননে আসিয়া পড়িয়াছি। তখন কাতরে তোমাকে ডাকিলাম—কোথায় দীন দয়াময়! কোথায় বিপদ তারণ মধুসূদন! কোথায় অনাথ শরণ! কোথায় দীন জনবৎসল; কোথায় তুমি? আমি এই ভীম ভবার্ণবে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি—আমাকে রক্ষা কর।

আহা! কারুণিক! তোমার কত দয়া তোমার করুণার কথা কি বলিব? এই জন্যই তোমাকে কারুণাময় বলে। কি বলিব? সুদুরাচার হইলেও যে তুমি কখন পরিত্যাগ কর না এই তোমার মহিমা; ইহারই জন্য তুমি এত কঠোর হইলেও বড় মধুর।

তুমি আসিয়া অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে। দিয়া বলিলে এই ত আমি আছি,—তোমার অন্তরতম কক্ষেই আছি; আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে

পারি? আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম যে কতক্ষণ আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পার।

ঠাকুর! তোমার উপেক্ষা কি অপেক্ষা, তোমার তিরস্কার কি পুরস্কার, তোমার তাড়না কি আদর—তা তুমিই জান। অজ্ঞজনে এত ছলা কলা কেন? কেন—আমি কি তোমার অবাধ্য—যে তোমার কথা শুনিব না;—এত অবিশ্বাস কর কেন? "না তা নয়। পরীক্ষার অর্থ কি জান? প্রকৃতি ও নিবৃত্তি উভয়ই জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রবৃত্তিই সংসার, নিবৃত্তিই আমি, সংসার ও ভগবান—এই দুই লইয়াই মনুষ্য জীবন। দেহই এই সংসারের মূলগ্রন্থি। দেহ যতদিন আছে ততদিন সংসার আছেই। দেহ কতকগুলি বাসনার সমষ্টি মাত্র। বাসনাগুলি অজ্ঞানজ। এই অজ্ঞানজনিত বাসনানাশই পরম পুরুষার্থ। ইহা দ্বারাই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতএব যে সকল বাসনাজালে বর্ত্তমানদেহ রচনা হইয়াছে তাহার আত্যন্তিক নাশ আবশ্যক। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি বা স্বরূপে স্থিতি হইবে না। প্রবৃত্তিকে হঠাৎ রুদ্ধ করিতে যাওয়া চলে না। তোমার প্রবৃত্তিভোগের নিমিত্ত আমি এই বিশ্ব রচনা করিয়াছি; তুমি যখন আমাকে যে ভাবে চাহিবে—তুমি আমাকে সেই ভাবে পাইবে।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

জীবের কল্যাণ হেতু পরম শান্ত চলন রহিত যিনি, "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতং" যিনি "ধাম্না সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং" যিনি, তিনি এই বিরাট বিশ্বরূপে আত্মদান করিয়াছেন, তোমরা এই বিশাল সৃষ্টি-প্রপঞ্চের এক একটী তরঙ্গ মাত্র। তরঙ্গ যেমন জল হইতে পৃথক নহে, সেইরূপ তোমরা যতই চঞ্চল হও না কেন—পরম শান্ত পরমপদ হইতে ভিন্ন নও;—আমিই তোমাদের পরম আশ্রয়। অতএব আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্ম্ম কর। ইহাই আমার ইঙ্গিত—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" সর্ব্বদা আমার মুখপানে চাহিয়া আমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে কর্ম্ম কর। কর্ম্মের পূর্ব্বেই আমাকে স্মরণ করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইবে—কর্ম্মের অন্তে আমাকে লইয়া থাকিবে। ধর্ম্ম জীবনের ইহাই আরম্ভ এবং যতদিন দেহ আছে—যতদিন কর্ম্ম আছে ততদিনকার কর্ত্তব্যও এই।"

আশ্চর্য্য তোমার রচনা কৌশল! আশ্চর্য্য তোমার উপদেশ! আশ্চর্য্য তোমার জীবের জন্য আত্মদান! আশ্চর্য্য তোমার জীব উদ্ধারের কৌশল!

কিন্তু যাই বল—তোমার প্রতারণা বড় ভীষণ। এখন তত্ত্বেথ বলিয়া দিলে ইহা বেশ বুঝিলাম। মনে বেশ বসিয়া গেল—কিন্তু যখন ভুলাইয়া দাও—তখন যে কি অবস্থা হয়—তাহা আর কি বলিব?

"দেখ তোমরা যতই বল—আমার দোষ বৃথা। চারি যুগেই আমার এই অখ্যাতি জগতে ঘোষিত। তোমরা যাহা প্রাণে প্রাণে চাও তাহার অভাব কবে হইয়াছে? তোমরা কি আমাকে ঠিক ঠিক চাও? অনেক সময় না চাও এমন নয়; কিন্তু তোমাদের চাওয়ার মধ্যে সংসার আমিষের গন্ধ পাই। সংসার গন্ধী ভালবাসায় আমার পরিপূর্ণ স্বরূপকে পাইবে কিরূপে? দেখ—"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং"—(১) আর্ত্ত (২) জিজ্ঞাসু (৩) অর্থার্থী (৪) জ্ঞানী। এই চারি প্রকার ব্যক্তি আমাকে চায়। প্রথম তিন শ্রেণীর জীব আমাকে সম্পূর্ণভাবে চায় না—সেই জন্য আমি সব সময়ে তাহাদের সুলভ নহি। এক মাত্র জ্ঞানীই একনিষ্ঠ ও অনন্যচিত্ত। জ্ঞানী হইয়া যখন "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" হইবে—যখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে" তখনই প্রকৃত রূপে আমাকে পাইবে। নতুবা আমার বিক্ষেপ শক্তির হাতে পড়িয়া—মৃত্যুসংসার পথে পড়িয়া কষ্ট পাইবে, তার আমি কি করিব? দেখ, বিশ্বরূপ দর্শনান্তে অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া"—বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও যজ্ঞ এইগুলি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই এই বিশ্বরূপ দর্শন হয়। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান লাভ কিছুতেই হইবে না। নিষ্কাম কর্ম্মই ভক্তির প্রথম সোপান। ভগবৎ কৃপাবলে বহিরঙ্গ কর্ম্ম প্রশমিত হইলে—নবধা ভক্তি সাধন * কর। করিলেই জ্ঞান হইবে। আমি জ্ঞান স্বরূপ। আমাকে তখন সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র পাইবে। তখন 'ধৃত কঞ্চুক সর্পবৎ' হইয়া দেহ ক্ষয় কর—দেহক্ষয় পরে আমার সঙ্গে চিরতরে লীন হইবে।

সত্যই ঠাকুর! আমরা তোমার কথা না শুনিয়া বড়ই কষ্ট পাই। তুমি ত কত রূপে বলিতেছ—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"; অধিক কি প্রাণে প্রাণে যখন তোমাকে অনুভব করি, তখন ত সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন করিয়া মেঘমুক্ত শশধরের মত হৃদয়াকাশে আসিয়া উদিত হও। কে তাহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু তোমার

---

* (১) সৎসঙ্গ, (২) সৎ কথা আলাপ, (৩) মদ্‌গুণ কীর্ত্তন ও মদ্বাক্য ব্যাখ্যা, (৪) ঈশ্বরবুদ্ধিতে গুরু সেবা, (৫) পুণ্যকার্য্যে রতি ও যমনিয়মাদির সেবা, (৬) মৎপূজানিষ্ঠা, (৭) মন্মন্ত্রোপাসকত্ব, (৮) ভক্তপূজা, জীবে দয়া, বিষয় বৈরাগ্য ও শমাদি সাধনা, (৯) তত্ত্ব বিচার।

ভক্ত হওয়া বড় কঠিন। তুমি বড় পরীক্ষা করিয়া তবে তোমার আপনার করিয়া লও। তোমার ত্রিগুণময়ী মায়া বড়ই দুরত্যয়া। হে প্রভু! কাতরে নিবেদন করি—তোমার দুরত্যয়া মায়ার তরঙ্গ একটু প্রশমিত করিয়া দিও, আমি তোমাকে দেখিয়া ধন্য হই। অজ্ঞজন আর কি প্রার্থনা করিবে?

তব চরণ-সরোজ মন্মনশ্চঞ্চরীটো
ভ্রমতু সতত মীন প্রেমভক্ত্যা সরোজে।
জননমরণ রোগাৎ দেহি শান্ত্যৌষধাজ্ঞে
সুদৃঢ় সুপরিপক্কাং দেহি ভক্তিঞ্চ দাস্যম্।



প্রস্রবণ পর্ব্বতে বর্ষারম্ভে।

শ্রীভগবানের নিকট দুঃখী জীব যতক্ষণ বসিতে পারে তাহার ততক্ষণই পরম লাভ। এই ত বর্ষারম্ভ। বর্ষার এই চারিমাস চল না একটু তাঁহার সঙ্গ করা যাউক। তুমি যখন তাঁহার নাম জপ কর তখন কিছু না কিছু বিশ্বাসত কর, "তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন"। পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করিয়া ফেল—তাঁহার নাম সর্ব্বদা যাঁহারা করেন কিছুতেই তাঁহাদের মৃত্যু আদি ভয় ভাবনাও থাকিতে পারে না। আরও স্মরণ রাখ তাঁহার নাম স্মরণে তোমার শক্তির অভাব কখনও হইবে না—তবে তোমাকে তোমার সামর্থ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে—অলস হইয়া যে বসিয়া থাকে শ্রীভগবান্ তাহাকে কখন বিশেষ অনুগ্রহ করেন না। তোমার শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ কর আর ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা কর দেখিবে তিনি তোমাকে কোন ভাবনার মধ্যে রাখেন নাই। এমন সহায় যার তার কি আবার কোন ভাবনার কারণ থাকে? যা হবার হউক না কেন তুমি তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া তোমার শক্তিমত কার্য্য কর, আর সর্ব্বদা সর্ব্বদার কার্য্য যে নাম জপ তাহা লইয়াই থাক দেখিবে তিনিই তোমার আছেন, তোমার সব তিনিই করিয়া দিতেছেন। তুমি নিমিত্ত মাত্র।

মহাভারতাদি প্রধান প্রধান শাস্ত্র বড় জোর করিয়া বলিতেছেন—

"নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীহ কিমদ্ভুতম্" ?॥

নারায়ণ এই শব্দ যখন আছে—আর যতক্ষণ মানুষের বাক্যও বশে আছে ততক্ষণ মানুষের কোন ভয়ত থাকিতেই পারে না। নাম জপ করিতে যে পারে, তা যেমন করিয়া জপ করুক, শত লয় বিক্ষেপ উঠুক—তাহাত উঠিবেই—ও সব ত পাপের চিহ্ন—পাপ ক্ষয়ের জন্যই ত নাম অবলম্বন, যেমন করিয়া পারে জপ করিয়া যাউক, ধৈর্য্য ধরিয়া এই নামই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, ইনিই আমাকে রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাসে সর্ব্বদা ব্যবহারিক কর্ম্মের অবসর কালেও জপ লইয়া থাকুক সর্ব্বসিদ্ধি হইবেই। শাস্ত্র এত জোরের কথা বলেন, তথাপি যে মূঢ় লোকে নরকে পতিত হয় ইহাইত আশ্চর্য্য।

কত জোর করিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন—

যন্নাম স্মৃতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং।
তীর্ত্বা গচ্ছন্তি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্॥

যাহার নাম স্মরণ মাত্র অপরিমিত এই সংসার সমুদ্র পার হইয়া দুর্জ্জন লোকও বিষ্ণুর সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। শাস্ত্র আর কি করিয়া বলিবেন ?

জীব তুমি সংশয় ত্যাগ কর। হইবেই এই বিশ্বাসে জপকে সর্ব্বদার কার্য্য কর—এই শ্রদ্ধা অবলম্বন কর—আর যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে যথাশক্তি স্পন্দিত হও—যে সমস্ত কর্ম্ম করিবার সময়ে নাম করা যায় না তখন না হয় না কর, কিন্তু সকল সময়েই ত কর্ম্ম কর না, যখন অন্য কর্ম্ম করিতেছ না তখনই মনকে ধর, ধরিয়া বল এখন ত আর তোমার কোন কর্ম্ম নাই—যাহা করিয়া ফেলিয়াছ তাহার জন্য ভাবিয়া কি হইবে ? গত বিষয়ও ভাবিও না আর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া অবদ্ধ প্রলাপ তুলিও না। উপস্থিত যে সময় টুকু তুমি পাইতেছ তাহারই সদ্ব্যবহার কর নিশ্চয়ই তোমার হইবে। ক্রমে নাম জপ করিতে করিতে নামীকে একটু ভালবাসিতে পারিবে, নামী শ্রীভগবানের উপরে অনুরাগও আসিবে। এ অনুরাগ আসিবেই। রজ আর তম গুণই তোমাকে পাপ করাইয়া ছিল। কিন্তু সত্ত্বগুণও তোমাতে আছে। পাপ করিয়া করিয়া সত্ত্বগুণকে রজস্তমের বড় নীচে আনিয়া ফেলিয়াছ, সেই জন্যই নাম

অবলম্বন করিয়াছ। অবিরত নাম করিতে করিতে তোমার পাপ কাটিয়া যাইবে তোমার সত্ত্বগুণ জাগিবেই। এই রজস্তমকে অধঃকৃত করিয়া সত্ত্বগুণ জাগাইবার জন্যই ত সাধনা। সত্ত্বগুণ জাগিলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিবে। ভাল বাসিলেই তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে ইচ্ছা যাইবে। এই সময়ে লীলা চিন্তা বড় ভাল লাগিবে।

তাই বলিতেছিলাম এইত বর্ষাকাল আসিল, এস এই চারি মাস তাঁহার সঙ্গে থাকি এস। ইহাতে বড় সুখ, বড় আনন্দ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যে অবস্থায় পড়িয়াছ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইও না। নিজের অবস্থা পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে আসিয়াছে ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্মের অবসর কালটা মনে মনে শ্রীভগবানের সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা কর—রস পাইবে, সুখ পাইবে, বড় ভাল হইবে।

বর্ষা ঋতু আসিল। কালে কালে আকাশ যখন সজল জলদ মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয় তখন কি বিস্ময় আসে না? এই যে জলদ জাল বায়ুবেগে ছুটিতেছে, স্তনিত বৈদ্যুৎগর্ভ জল পূরিতমেঘমালা—সুবর্ণ পৃষ্ঠাস্তরণ ভূষিত গজযূথের মত বৃংহিত-যুক্ত হইয়া যেন ছুটিতেছে—ইহাত গ্রামে নগরেও দেখিয়াছ কিন্তু চল দেখি পর্ব্বত শিখর হইতে ইহা দেখি ইহা কত সুন্দর।

এই সেই প্রবর্ষণ পর্ব্বত। প্রস্রবণ, মাল্যবান এই এক পর্ব্বতেরই নাম।

শার্দ্দূল মৃগ সঙ্ঘুষ্টং সিংহৈর্ভীমরবৈ বৃতম্।
নানাগুল্মলতা গূঢ়ং বহুপাদপ সঙ্কুলম্॥
ঋক্ষ বানর গোপুচ্ছৈর্ম্মার্জ্জারৈশ্চ নিষেবিতম্।
মেঘরাশিনিভং শৈলং নিত্যং শুচিকরং শিবম্॥

সত্যই এই পর্ব্বত বড় ভয়ানক। ব্যাঘ্র ও মৃগের শব্দে এই পর্ব্বত শব্দিত, ভীষণ শব্দকারী সিংহগণে ইহা পরিবৃত; নানাবিধ লতাগুল্মে এই পর্ব্বত আচ্ছন্ন, চারিদিকেই ইহাতে অতিবৃহৎ পাদপসঙ্কুল। ভয়ঙ্কর ভল্লুক, বানর, গোপুচ্ছ এবং অতি ক্রূর বন্যবিড়াল দ্বারা এই পর্ব্বত নিষেবিত। মেঘরাশির মত এই শৈল সকল সর্ব্বদা শুচিকর এবং মঙ্গলপ্রদ। এস, ধীরে ধীরে এই পর্ব্বতে উঠি এস। ভয় কি? যাঁহার নাম লইয়া এখানে উঠিতেছ, যৎপ্রাপ্তি আশায় এখানে আসিতেছ তাঁহার নাম যে জীবকে বড় নির্ভয় করে, মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত থাকে না। সিংহব্যাঘ্রভয় আর বিশেষ কি করিবে?

এই বর্ষায় এখানে কিছু অপূর্ব্ব দেখিবে। এখানে কোন উৎপাৎ করিও না। শান্ত হইয়া অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে এই প্রবর্ষণ গিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশস্থ, অতি বিস্তৃত ঐ গুহার নিকটে চল। এই স্ফাটিক গহ্বর—কত পরিষ্কার, কত দীপ্তিবিশিষ্ট দেখ। এই গুহার ভিতরে বর্ষা, বায়ু, আতপ কিছুতেই ব্যথিত হইতে হইবে না। দিব্য ফল-মূল-পুষ্প-শোভিত এই পর্ব্বত, মুক্তাস্বচ্ছ জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়—যেখানে সেখানে পল্বল; এখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তোমাকে ক্লেশ দিবে না। চিত্র বর্ণ মৃগ-পক্ষি-শোভিত এই পর্ব্বত—এখানে মনের সুখেরও অভাব হইবে না।

গুহাদ্বারে দলিত অঞ্জন রাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং আয়ত সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল ঐ খণ্ডশিলা দেখ। দেখদেখি ওখানে কে ? কাহারা এই গিরি শৃঙ্গে এই বর্ষাকালে ?

চৈলাজিনধরং শ্যামং জটামৌলিবিরাজিতং।
বিশালনয়নং শান্তং স্মিতচারুমুখাম্বুজম্ ॥

স্বচ্ছ শ্যামমণির মত অঙ্গদ্যুতি, পরিধানে চৈলাজিন—জীর্ণবস্ত্র ও মৃগচর্ম্ম জটামুকুট-মণ্ডিত সুন্দর মুখমণ্ডল, আকর্ণান্ত নীলনলিনাভ কমল নয়ন। কত শান্ত এই সুন্দর পুরুষ। মৃদুহাস্যপ্রফুল্ল চারুমুখপদ্ম যেন কোন এক অমর রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিতেছে। আর ঐ চরণযুগল! এই চরণযুগল কত তাপিতের, কত সংসার পরিশ্রান্তের চির বিশ্রান্তির স্থান। ইচ্ছা কি করে না ঐ চরণে শিরোলুণ্ঠন করি। করিলে যে সব শীতল হইবে! আর দেখিতেছ ইহার সঙ্গে ইনি কে ? ইনি চম্পকগৌরবর্ণ, সুগঠিত বপু, বিশাল লোচন। ইহাঁকে চিনিতে পার কি ? কি মধুর সেবক ভাব, কি এক কমনীয় দাস্যভাব যেন ইহার প্রতি অঙ্গে জড়িত।

শিলাতলে ইহারা বসিয়াছেন। দূরে ঐ সমস্ত বন্যপশু! ইহাদিগকে দেখিয়াই কি পশুগণ পশুবৃত্তি ভুলিয়াছে ? বর্ষায় নবীনতৃণ ভক্ষণ করিয়া এই হৃষ্টপুষ্ট মৃগগণ যেন এই পুরুষদ্বয়ের সুষমা দর্শন জন্য বিস্ফারিতেক্ষণে এখানে ওখানে ধাবিত হইতেছে। কখন বা ইহারা ধ্যাননিষ্ঠ মুনিগণের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহারা কি ছদ্মবেশী সিদ্ধপুরুষ ? সিদ্ধগণই বুঝি মৃগ পক্ষী আকার ধারণ করিয়া স্তব্ধ স্থিরভাবে এই পুরুষকে দেখিতেছে ?

এই বৃক্ষরাজির অন্তরালে দাঁড়াও। গোপনে দাঁড়াইয়া শ্রবণ কর, ইহারা কি বলিতেছেন।

ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম॥

এই গিরিগুহা পরম রমণীয়; ইহা বিস্তৃত এবং বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত। বর্ষার এই চারিমাস সৌমিত্রে! আমরা এইখানেই অতিবাহিত করিব। কারণ "অযাত্রাশ্চৈব দৃষ্টে মাং মার্গাংশ্চ ভৃশদারুণম্" এই বর্ষাকাল। এখন পথ সকল অতিশয় দুর্গম হইয়াছে। কোথাও যাত্রা করা অসম্ভব। এই চারিমাস আর সীতার অন্বেষণ হইবে না।

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর পড়িয়াছে। শ্রীভগবান্ তখনও পঞ্চবটীতে। ত্রয়োদশের মধ্যভাগে সূর্পনখার নাসা কর্ণচ্ছেদ হইল। সঙ্গে সঙ্গে খরদূষণও বিনষ্ট হইল। মাঘমাস শুক্লাষ্টমী মধ্যাহ্নকাল। এই কালে রাবণ সীতাকে হরণ করিল। রাবণ সংসার-ললামভূতা রামমহিষীকে অতি দুর্গম লঙ্কাপুরীর অন্তঃপুরে অশোক কাননে লুকাইয়া রাখিল। শ্রীভগবান্ সীতাশূন্য কুটীরে আর প্রবেশ করিলেন না। মাঘমাস হইতে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। বহুজনের মুখে শ্রীসীতার লঙ্কায় অবরোধের কথা শুনিলেন। শ্রীভগবান্ এখন ঋষ্যমুক পর্ব্বতে। চতুর্দ্দশ বৎসরের আষাঢ়মাসে সুগ্রীব মিলন হইল। শ্রীভগবানের বয়ঃক্রম এখন ৪১ বৎসর আর সীতার ৩২ বৎসর। এই মাসেই বালী বধ হইল। অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। কিষ্কিন্ধ্যা বানর রাজ্যের রাজধানী। গিরি গহ্বরের ভিতরে কিষ্কিন্ধ্যানগরী।

হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণা পতাকাধ্বজশোভিতা।
বভূব নগরীরম্যা কিষ্কিন্ধ্যা গিরিগহ্বরে॥

গিরি গহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধ্যানগরী তখন হৃষ্টপুষ্ট জনে সমাকীর্ণা হইল এবং ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত হইয়া বড়ই রমণীয় হইল।

কপিবাহিনীপতি সুগ্রীব মহাত্মা রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে মহাভিষেকের কথা জানাইলেন। বীর্য্যবান্ বানররাজ তখন রুমাকে লাভ করিলেন এবং ত্রিদশাধিপ ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন।

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।
আজগাম সহভ্রাতা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্॥

আমরা রামায়ণের এইখানকার কথা বলিতেছিলাম। সুগ্রীব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। বানরগণ নিজ নিজ গুহায় প্রবিষ্ট হইল। আর রঘুনাথ ভ্রাতার সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে আসিলেন। পর্ব্বতের শিখর দেশে অতি বিস্তৃত এক রমণীয় গুহা। গুহাদ্বারে এক সমতলা কৃষ্ণা আয়তা খণ্ডশিলা। দুই ভ্রাতা এই শিলার উপরে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন চল আমরা শুনি! আমাদের মত নষ্টবুদ্ধি জনের উপাসনার সহজ পন্থা এই।

কোন গুরুতপস্যা লইয়াত দুই দিন একভাবে থাকিতে পারিলে না এবং চেষ্টাওত অনেক করিলে। সোঽহং তত্ত্বমসি বিচার, অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকাস্থিত কল্পিত ত্রিভুজদ্বয়ের অভ্যন্তরে ত্রিকোণমণ্ডল ধারণাভ্যাস, পটের ছবি, দারু-পাষাণের মূর্ত্তি ধ্যান—কতই প্রয়াস ত কর। শ্বাসে শ্বাসে জপ, ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ সকলই ত চেষ্টা কর। কিন্তু অভ্যাস ত রাখিতে পার না? পারিবে কিরূপে? দশ সংস্কারের কোন সংস্কার কি বিশুদ্ধভাবে হইয়াছে? বাল্যকাল হইতে আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি কি হইয়াছে? সদাচার সমস্ত কি জানিয়াছ? যদি জানিয়াছ, তবে কয়দিন পবিত্র আচার অভ্যাস করিতে পারিতেছ? ত্রিসন্ধ্যা স্নান, যথা কালে যথা নিয়মে নিত্যক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য্য পালন, বেদাদি গুরু সন্নিধানে পাঠ, যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান প্রতিগ্রহাদি যথাশাস্ত্র কর্ম্ম কোনটি বিধিমত হইল? পড়িয়াছ অনেক, পড়াইতেছও সত্য কিন্তু শাস্ত্রমত অধ্যয়ন অধ্যাপন কি হইল? যদি হইত তবে ত তোমার বিদ্যা অভীষ্টফল দানে সমর্থা হইতেন। তোমাকে লোকে বিদ্বান্ বলিতে পারে। বিদ্যাভিমানও তোমার থাকিতে পারে। কিন্তু গুরুকে মনে প্রাণে গুরু বলিয়া কি মানিয়াছ? আর ভগবান্ পতঞ্জলি যেরূপ বলিয়াছেন "চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি; আগম কালেন, স্বাধ্যায় কালেন, প্রবচন কালেন, ব্যবহার কালেনেতি"। অর্থাৎ বিদ্যাকে গুরু সকাশ হইতে গ্রহণ করা চাই, পরে তাহার অভ্যাস চাই, পরে অন্যকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া চাই আর যাহা নিজে শিখিলাম অন্যকেও অভ্যাস করাইলাম, এবং তাহা ব্যবহারিক জগতে নিজ জীবনে প্রয়োগ করা চাই—এই সমস্ত করিলে তবে ত বিদ্বান্ হওয়া যাইবে। ইহার কতটুকু হইয়াছে? যোগাভ্যাস ত কতক কতক হইল কিন্তু ইহাও কি শাস্ত্রমত হইল, না "পেটেণ্ট মেডিসিনের" মত অসুখ নিবারণের জন্য মাত্র করা হইল? ভক্তিমার্গে কাঁদা কাঁদানও ত হইল, বই লেখাও হইল কিন্তু ব্যবহারিক জগতে আটপৌরে পোষাকী চরিত্র কি ছাড়া হইল?

যদি এই সব হইত, তবে ত লব্ধভূমিকত্ব হইত। তাহার ত কিছুই হইল না। যদি হইত, তবে কলির দোষ গুলি আসিতে পারিত না। তাই বলা হইতেছে—আমরা ত নষ্টবুদ্ধি। দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া আমাদের মত নষ্টবুদ্ধি কলির জীবের কথা স্ব-পিতা ব্রহ্মার নিকটে বলিতেছেন—

"এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ"

এই সমস্ত নষ্টবুদ্ধি জনগণের পরলোকে গতি কিরূপ হইবে? বলিতেছেন—

"লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ।
তমুপায়মুপাখ্যাহি সর্ব্বং বেত্তি যতো ভবান্॥"

আপনি ত সকলই জানেন। সহজ উপায়ে যাহাতে ইহাদের পরলোকে গতি হয়, তাহাই বলুন।

আমরা এই সহজ উপায়ের ক্রমই আলোচনা করিতেছি। তাই এই বর্ষায় ভগবল্লীলা আলোচনা করিতে করিতে যতক্ষণ শ্রীভগবানের নিকটে থাকা যায়, তাহারই চেষ্টা হইতেছে। প্রস্রবণ-পর্ব্বতের শিখরদেশে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া গোপনে শুনি চল, শ্রীভগবান্ ভ্রাতার সহিত কি কথা কহিতেছেন। যখন স্থির হইয়া এই ভাবে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ কর; তখন কি তোমার মনে কোন প্রকার অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠে? তখন কি তোমাকে কোন প্রকার বিষয়চিন্তা ব্যাকুল করিতে পারে? এই ভাবে ষড়ৃঋতুতে শ্রীভগবানের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কথা শুনিতে যদি অভ্যাস কর, তবে তুমি ভাবনারাজ্যে তাঁহাকে লইয়াই থাকিতে পারিবে। ব্যাবহারিক জগতে আসিয়া পড়িলেও আবার সেই পর্ব্বত-শিখরে যাইতে তীব্রবাসনা জাগিবে, তাঁহার কথা শুনিতে আবার ব্যাকুল হইবে। এই অবস্থায় ঘন ঘন শ্রীভগবানের নাম উচ্চারিত হইবে। যদি সর্ব্বদা লীলার সহিত নাম-জপ অভ্যাস হয়, তবে কেন না তোমার গতি হইবে? তবে কেন না তোমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিবে—

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥

যে সকল মানুষ 'রাম রাম' নিত্য জপ করেন, তাঁহাদের কদাচ মৃত্যু ভয়,

সংসার ভয়, বিপদ্ ভয় ইত্যাদি কোন ভয় থাকিতে পারে না? তখন কেন না তুমি দৃঢ়বিশ্বাসে বিশ্বাসান্বিত হইবে—

"রাম নাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ।"

যিনি রামোপাসক এই কলিযুগে তাঁহার রামনামেই মুক্তি হইবে, অন্য কোন নামে হইবে না। এইরূপ যিনি কৃষ্ণোপাসক তাঁহার কৃষ্ণ নামেই মুক্তি হইবে, অন্য নামে হইবে না। এইরূপ শিব, কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি একই ঈশ্বরের নাম। ইঁহারা সকলেই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা। শাস্ত্র ত কোন বিরোধ রাখেন নাই। তুমি কেন শাস্ত্রের অভেদ ভজন ছাড়িয়া তোমার ঠাকুরটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাও? ইহাতে বুঝা যায়—তুমি ঈশ্বরকে ডাক না; তুমি তোমার 'মনগড়া' একটি পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিকে ডাক। দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর, আর নরকে পড়িবার পথে যাইও না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ "অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর।" তুমি নির্গুণ নাই বলিয়া 'লাফালাফি' কর, অবতার হইতে পারে না বলিয়া বাগ্বিতণ্ডা কর, জীবাত্মা রূপে সেই পরমাত্মাই জীবে জীবে বিরাজমান এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অবজ্ঞা করিয়া 'গলাবাজি' কর, ইহাতে তোমার মূর্খতার পরিচয়ই প্রকাশ হয়। তোমার বিকট ভক্তিতে বা তামসিক ভক্তিতে যে ভগবান্ বশিষ্ঠ, ব্যাস ও বাল্মীকিকে অবিশ্বাস করিতে তুমি বল, তুমি কি একবারও ভাব না, যদি ঋষিবাক্যই তোমার কথায় লোকে অবিশ্বাস করিতে পারে, তবে সে সব লোক কেমন? সে সব লোক তোমার মত অর্ব্বাচীনের কথা কতক্ষণ মানিবে? ভগবান্! আমাদের মত কলির নষ্টবুদ্ধি জীবের প্রতি তুমি একবার কটাক্ষ কর; আমাদের একটু সচ্ছাস্ত্রশ্রদ্ধা দাও, প্রভু! একটু সদ্বুদ্ধি দাও।

এস নিত্যকর্ম্ম করি এস, সর্ব্বদা কর্ম্মে লাগিয়া থাকি এস—নিশ্চয়ই শ্রীভগবান্‌কে একটু ভালবাসিতে পারিব। সংসার ভুলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার কথা শুনিতে পারিব। ষড়্ঋতুতে তাঁহার কাছে নিশ্চয়ই বসিতে পারিব। এস এখন একটু স্থির হইয়া শুনি, ইঁহারা কি বলিতেছেন।

"দেখ লক্ষ্মণ! এই গিরিশৃঙ্গ কেমন রমণীয়! কেমন উত্তম। শ্বেত, কৃষ্ণ, তাম্রবর্ণ বহু শিলাখণ্ডে ইহা উপশোভিত। কত স্থানে কত প্রকারের ধাতু ছড়ান রহিয়াছে দেখ। নদীতে ভেকগণ শব্দ করিতেছে। বিবিধ বৃক্ষখণ্ড, চারুচিত্রলতাযুক্ত এই পর্ব্বত। কত বনবিহঙ্গ এখানে আছে। কি সুন্দর ময়ূররবনাদিত এই

গিরিশৃঙ্গ। মালতী, কুন্দ, গুল্ম, সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন, সর্জ্জ ইত্যাদি পুষ্পিত বৃক্ষ ও লতায় ইহা উপশোভিত।

ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা ফুল্লপঙ্কজমণ্ডিতা।
নাতিদূরে গুহায়া নৌ ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ ॥

আমাদের গুহার নাতিদূরে প্রফুল্ল-পঙ্কজ-মণ্ডিতা এই যে নলিনী (মৃণাল) দেখিতেছ, বর্ষায় জলবৃদ্ধি হইলে ইহা গুহার অতি নিকটে আসিয়া গুহাকে আরও রমণীয় করিবে। এই গুহা পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবনত, পশ্চাতে কিছু উন্নত। তাই ইহাতে বর্ষাবায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা বাসের পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক। আর গুহার দ্বারে এই যে গণ্ডশৈল, ইহা আমাদের বসিবার বেশ উপযোগী।

বৎস! দেখ এই গিরিশৃঙ্গ উত্তরদিকে কেমন শুভদৃশ্য সম্পন্ন। দলিত অঞ্জন-বর্ণ মেঘের ন্যায় ইহার কি সুন্দর শোভা! আর উত্তরদিকে বহু ধাতুবিরাজিত কৈলাস-শিখরবৎ শ্বেতাম্বর মত ইহা কত সুন্দর। আবার ইহার অগ্রভাগের দিকে দেখ। প্রাচীনবাহিনী কর্দ্দমশূন্যা নদী সকল ত্রিকূটবাহিনী জাহ্নবীর ন্যায় কত চন্দন, কত তিলক, সাল তমাল অতিমুক্তক বৃক্ষে সুশোভিত। পদ্মক, সরল, অশোক, বাণীর, তিমিদ, বকুল, কেতকী, হিন্তাল, তিনিশ, নীপ, বেতস, কৃতমালক, প্রভৃতি তীরুতরু কেমন নানারূপে ইহাকে সুশোভিত করিয়াছে; ইহা "বসনাভরণোপেতা প্রমদেবাত্যলঙ্কৃতা"। বসন অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়। শত প্রকারের পক্ষিসঙ্ঘোত্থিত নানা প্রকার কাকলীতে ইহা বিনাদিত। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত চক্রবাক সমূহে ইহা সুশোভিত। পরম রমণীয় হংসসারসসেবিতা এই নদী। নানারত্ন সমন্বিতা এই নদী যেন হাস্ত করিতেছে।

ক্বচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতি রক্তোৎপলৈঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদ-কুট্মলৈঃ ॥

কোথাও নীলোৎপলে আচ্ছন্ন, কোথাও রক্তোৎপলে শোভিত, কোথাও দিব্য শ্বেতকুমুদসমূহে ইহা শোভান্বিত। এই রমণীয়া শুভদর্শনা নদী শত শত পারিপ্লব বিহঙ্গে ভরিতা, শত শত ময়ূর ও ক্রৌঞ্চে নিনাদিতা, শত শত মুনিমণ্ডলে নিষেবিতা। সৌমিত্রে! দেখ দেখ, এই সমস্ত চন্দন বৃক্ষ পঙ্ক্তি কেমন সুরুচির।

আর এই কুকুভ বৃক্ষরাজি ! আহা ইহারা যথাসুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে !

অহো সুরমণীয়োঽয়ং দেশঃ শত্রুনিষূদন ।
দৃঢ়ং রংস্যাব সৌমিত্রে সাধ্বত্র নিবসাবহে ॥

অহো ! শত্রুনিষূদন ! এই দেশ অতিরমণীয় । সৌমিত্রে ! এইখানে বাস করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিব । চিত্রকানন কিষ্কিন্ধ্যা—সুগ্রীবের রমণীয়া পুরী নিশ্চয়ই ইহার নিকটেই হইবে । কারণ—

গীতবাদিত্র-নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে জয়তাংবর ।
নদতাং বানরাণাঞ্চ মৃদঙ্গাড়ম্বরৈঃ সহ ॥

মৃদঙ্গ বাজাইয়া বানরেরা যে গীত গাইতেছে, তাহার শব্দ এখান হইতে শুনা যাইতেছে । সুগ্রীব তাহার প্রিয়া ভার্য্যা ও বৃহৎ রাজ্য লাভ করিয়া নিশ্চয়ই অতিশয় আনন্দে দিন যাপন করিতেছে" । তুমি ত সর্ব্বদাই এই সহরের কাক-কোলাহলে, এখানকার উন্মত্ত, পিশাচবৎ অন্নচেষ্টার চঞ্চলপরিভ্রমণে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত । শ্রীভগবানের এই রমণীয় বাসস্থানে একবার কল্পনাতে যাই চল না । স্থান ত রমণীয়, কিন্তু 'প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী' সীতার কথা ভগবান যখন স্মরণ করিতেন, তখন এই প্রস্রবণ-পর্ব্বতের সুন্দর দরীকুঞ্জ, উদয়পর্ব্বতে অভ্যুদিত শশাঙ্ক, এখনকার সুখসাধন দ্রব্যসমূহ দেখিয়াও তিনি সুখী হইতে পারিতেন না । রাত্রিকালে সীতাবিরহশোক যখন প্রবল হইত, শ্রীভগবান্ তখন নিদ্রা যাইতে পারিতেন না । কতই শোক করিতেন ।

তং শোচমানং কাকুৎস্থং নিত্যং শোকপরায়ণম্ ।
তুল্য-দুঃখোঽব্রবীদ্ ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুনয়ন্ বচঃ ॥

সমদুঃখী ভ্রাতা লক্ষ্মণ সেই শোকাকুল—সর্ব্বদা শোকপরায়ণ অগ্রজকে অনুনয় বাক্যে কতই বুঝাইতেন । "বীর অকারণে ব্যথিত হইবেন না । শোকে অবসাদ প্রাপ্ত হওয়া আপনার উচিত নহে । আপনি ত জানেন "শোচতোঽবসীদন্তি" শোক যাহারা করে, তাহারা অবসন্ন হয় । তাহাদের সকল কার্য্যই বিনষ্ট হয় । আপনি ক্রিয়াপর, বেদপারগ, আস্তিক, ধর্ম্মশীল, দৃঢ় অধ্যবসায়শালী—এইরূপ উদ্যমহীন হইলে রাক্ষস বিনাশ করিবেন কিরূপে ?"

শরৎ কালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্ কালোঽয়মাগতঃ ।
শরৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন । এই ত বর্ষাকাল আসিল ।

শ্রীভগবান্ শরৎকালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাস তাঁহারা প্রবর্ষণ-পর্ব্বতে ধৈর্য্য ধরিয়া বাস করিবেন, ইহা স্থির হইল। ইত্যবসরে পর্ব্বতে বর্ষা নাবিল।

প্রবর্ষণ-পর্ব্বতে বর্ষাকালে।

ঐ শুন ভগবান্ কি বলিতেছেন—

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োহদ্য জলাগমঃ।
সম্পশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ॥

এই সেই জলাগমের কাল আসিল। দেখ লক্ষ্মণ পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘমালা গগন ছাইয়া ফেলিতেছে।

নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্॥

আকাশ সূর্য্যদেবের কিরণজাল দ্বারা সমুদ্রসকলের রস পান করিয়া কার্ত্তিক হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত নয় মাস যে গর্ভধারণ করিয়াছিল বর্ত্তমান বর্ষাকালে সেই গর্ভ হইতে লোকের জীবন স্বরূপ সলিল ধারা প্রসূত হইতেছে।

শক্যমম্বর মারুহ্য মেঘ-সোপান-পঙ্‌ক্তিভিঃ।
কুটজার্জ্জুনমালাভিরলঙ্কর্ত্তুং দিবাকরঃ॥

অতি বৃহৎ সরল অর্জ্জুন বৃক্ষ সকল ফুল ফুটাইয়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, দেখ। ইহারা মেঘসোপানপঙ্‌ক্তি দ্বারা আকাশমার্গে আরোহণ করিয়া যেন সূর্য্যের গলায় কুটজ কুসুমের মালা পরাইয়া দিতে যাইতেছে।

সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্ব্বদ্ধ-ব্রণমিবাম্বরম্॥

ছিন্নাভ্রগুলি উত্থিত সন্ধ্যারাগে ভিতরে তাম্রবর্ণ, আর পর্য্যন্ত ভাগে পাণ্ডুবর্ণ

আবার কিঞ্চিৎ জলসম্বন্ধ হেতু স্নিগ্ধ। ইহাদিগকে ছিন্নবস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ ব্রণের মত দেখাইতেছে।

মন্দমারুত-নিশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দন-রঞ্জিতম্।
আপাণ্ডু জলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্॥

আকাশে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত ঈষৎ রক্তবর্ণ জলদজাল প্রান্তভাগে শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে আর সান্ধ্যবায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন হরিচন্দনচর্চ্চিত কপোলতলে করবিন্যাস করিয়া কোন কামাতুর শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছে।

এষা ঘর্ম্মপরিক্লিষ্টা নববারি পরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥

ঘর্ম্মেণ রবিতেজসা পরিক্লিষ্টা—সূর্য্যরশ্মি পরিক্লিষ্টা এই বসুন্ধরা নব বারিধারায় আপ্লুতা হইয়া শোকসন্তপ্তা সীতার মত যেন নেত্রজল বিমোচন করিতেছে। আর দেখ এই বায়ু! মেঘোদর বিনির্ম্মুক্ত কেতকগন্ধী এই বায়ু কেমন শীতল। শীতল কর্পূরমিশ্রিত জলের ন্যায় ইহা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া পান করিবার উপযুক্ত। সর্ব্বদা বারি বর্ষণ হইতেছে, আর কুসুমিত অর্জ্জুনবৃক্ষ, প্রস্ফুট কেতকী-পুষ্প, সর্ব্বত্র সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। বিনষ্টশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বনদাহকারী দাবাগ্নির নির্ব্বাপনে এই পর্ব্বত যেন বারিধারায় অভিষিক্ত হইতেছে। মেঘকৃষ্ণ পর্ব্বত সকল, শুভ্রজলধারা, এবং মারুত—আপূরিত গুহা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণগণ তারস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। বিদ্যুৎতাড়িত অন্তস্তনিত মেঘাচ্ছন্ন এই আকাশ সুবর্ণ বেত্র তাড়িত হ্রেষারব কারী ধাবমান অশ্বের মত যেন ছুটিয়াছে।

নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী॥

এই নীল-মেঘাশ্রিত বিদ্যুৎ স্ফুরণ, রাবণক্রোড়ে ঘনকম্পিতা তপস্বিনী বৈদেহীর মত আমার নিকটে প্রতিভাত হইতেছে। এই মেঘমালাসমাচ্ছন্ন দিক্ সকল গ্রহনক্ষত্রবিহীন এবং অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, আর দিক্ নির্ণয় করা যাইতেছে না। কামাতুর প্রিয়াসহিত ব্যক্তিদিগের ইহা সুখকর। সৌমিত্রে! দেখ, এই

গিরিসানুদেশে বর্ষাগমে নববারিসেক-সমুদগত কুটজ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহারা শোকাভিভূত আমারও মনোবিকার জন্মাইতেছে।

ধূলিকণা আর কোথাও নাই। বায়ু শীতল। গ্রীষ্ম তাপাদি এখন নাই। বসুধাপতি রাজগণের যুদ্ধযাত্রা এখন নিবৃত্ত হইয়াছে। আর প্রবাসিগণ এখন স্বদেশাভিমুখে যাইতেছে। সম্প্রতি মানস-সরোবরবাসলুব্ধ চক্রবাক প্রিয়ার সহিত মানস সরোবরে চলিয়াছে। বর্ষাবারি-ক্লিন্ন পথ গুলিতে আর কোন যান বাহন চলিতেছে না।

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বত-সন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্থ॥

এখানে ওখানে মেঘ ছড়ান থাকায়, আকাশ কোথাও প্রকাশ, কোথাও অপ্রকাশ। কোথাও বা পর্ব্বত দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া ইহা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের রূপ ধারণ করিয়াছে।

বলিতেছিলাম—বর্ষার এই সময়টা একান্তে যখন থাকিবে তখন এই মাল্যবান পর্ব্বতশিখরে শ্রীভগবানের নিকটে যাও, এবং আড়ালে থাকিয়া তাঁহার বাক্যামৃত পান করিতে করিতে মানস-নয়নে এই বর্ষা বর্ণনা দেখিতে থাক, বড় শান্ত হইবে, অত্যন্ত সুখ পাইবে। আরও শ্রবণ কর, পর্ব্বত-ধাতুর মত তাম্রবর্ণ নূতন বর্ষাজলপূর্ণ দ্রুত প্রবাহিত গিরিনদী সকলের প্রবল জলপ্রবাহে কত সর্জ্জ কত কদম্ব পুষ্প ভাসিয়া চলিয়াছে। আর গিরিনদীর জল-পতন শব্দ শুনিয়া ময়ূরেরা কেকারব করিতেছে। লোকেরা রসাল ভ্রমরকৃষ্ণ জম্বুফল যথেচ্ছ ভোজন করিতেছে; বিবিধবর্ণের সুপক্ক আম্র ফল বায়ুবিচালিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছে। ঐ ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন! শৈলেন্দ্র শিখরাকৃতি মেঘমালা আর কাল মেঘের গায়ে বিদ্যুৎপতাকা খেলিতেছে। মেঘের কোলে কোলে বলাকাশ্রেণী দলবদ্ধ হইয়া শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া চলিয়াছে। মেঘগর্জ্জন, যুদ্ধকালে মত্ত মাতঙ্গের বৃংহিত মত শুনা যাইতেছে।

বর্ষাবারিসিক্ত শ্যামল বনভূমি। নিম্নে ময়ূরগণ নৃত্যোৎসবে প্রবৃত্ত, আর ঊর্দ্ধে শ্যামসন্ধ্যায় বলাকাশ্রেণী আকাশে ছুটিতেছে। সায়ংকালের এই শোভা কত

মনোহর। বলাকাশ্রেণী পরিব্যাপ্ত মেঘ সকল প্রচুর জলভার বহন করত গর্জ্জন করিতে করিতে উচ্চ পর্ব্বতসমূহের শিখরদেশে কখন বিশ্রাম করিতেছে, আবার অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। এই হর্ষবতী বলাকা পংক্তি গর্ভধারণার্থ মেঘাসক্ত হইয়া আকাশ অভিমুখে গমন করিতেছে। ইহাতে আকাশে বায়ু বিকম্পিত দুলমান মনোহর পদ্মমালার মত যেন ইহারা বিচরণ করিতেছে। নূতন নূতন শ্যামল তৃণশোভিত এই বনভূমি এই বর্ষায় রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপকীট দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া লাক্ষাবিন্দু চিত্রিত শুক শ্যামল কম্বল পরিহিতা নারীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি ॥

এই হরি শয়নের দিনে নিদ্রা ধীরে ধীরে কেশবের দিকে ছুটিয়াছে, বলাকা পঙ্‌ক্তি হর্ষবতী হইয়া গর্ভধারণার্থ মেঘের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সকামা কান্তাগণ প্রিয়ের নিকটে যাইতেছে।

জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্যা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্ব শাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমান কামা
জাতা মহী শস্য বনাভিরামা ॥

দেখ এই বর্ষায় বনের প্রান্তভাগ সকল শিখিগণের সুন্দর নৃত্যভূমি হইল; কদম্ব ফুল ফুটিয়া কদম্ব বৃক্ষের শাখা সকলকে কদম্বময় করিয়া তুলিল; গো ও বৃষ সমান কামাতুর হইল, আর পৃথিবী শ্যামল শস্য ও বনরাজি দ্বারা নয়নাভিরাম হইয়া উঠিল।

বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি,
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যোঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়া বিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ।

নদী সকল ছুটিতেছে, মেঘ সকল বারিবর্ষণ করিতেছে, মদমত্ত মাতঙ্গগণ নিনাদ করিতেছে, বনান্তভাগ শোভাধারণ করিতেছে, বিরহী ব্যক্তি প্রিয়ার ধ্যান করিতেছে, ময়ূরদল নৃত্য করিতেছে, আর বানরেরা সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তিতে আশ্বাসিত হইয়াছে।

প্রহর্ষিতাঃ কেতকিপুষ্পগন্ধ
মাঘ্রায় মত্তা বননির্ঝরেষু।
প্রপাত-শব্দাকুলিতা গজেন্দ্রাঃ
সার্দ্ধং ময়ূরৈঃ সমদা নদন্তি ॥

মত্ত গজেন্দ্রগণ বননির্ঝরে কেতকী পুষ্পগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছে। নির্ঝর বারি পতন শব্দে আকুলিত হইয়া তাহারা ময়ূরের সহিত মদভরে শব্দ করিতেছে।

কদম্ব-শাখায় বিলম্বমান ভ্রমরপুঞ্জ ধারা-পতনে আহত হইয়া পুষ্পরসাস্বাদে বর্দ্ধিত এবং মহোৎসাহে অর্জ্জিত মদ ত্যাগ করিতেছে। জম্বুবৃক্ষের শাখা সকল কৃষ্ণবর্ণ রসাল জম্বুফলে পূর্ণ হইয়া ভ্রমর ভক্ষিত বোধ হইতেছে। তড়িৎ পতাকালঙ্কৃত গম্ভীরশব্দ-উদ্গারী মেঘসকল রণোৎসুক হস্তীর আকার ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ সৌমিত্রে!

মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী
সম্প্রস্থিতো মেঘরবং নিশম্য।
যুদ্ধাভিকামঃ প্রতিনাদশঙ্কী
মত্তো গজেন্দ্রঃ প্রতিসন্নিবৃত্তঃ ॥

এই গিরি-কাননে বন হইতে বনান্তরের পথে চলিতে চলিতে পৃষ্ঠদেশে মেঘধ্বনি শুনিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর শব্দ আশঙ্কা করিয়া মত্ত গজেন্দ্র কেমন ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে।

ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্পদৌঘৈঃ
ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈ
র্বিভান্ত্যনেকাশ্রয়িণো বনান্তাঃ ॥

বনান্তভাগে নানাভাব আশ্রয় করিয়া নানা জীব এই বর্ষায় আনন্দ করিতেছে। ইহা কোথাও ভ্রমর সমূহের ঝঙ্কারে গীতিপূর্ণ, কোথাও ময়ূরের নৃত্যে সুশোভিত, কোথাও প্রমত্ত-বারণ-ভূষিত। মধু সদৃশ বারিপূর্ণ কদম্ব, সাল, অর্জ্জুন এবং স্থলোৎপল প্রভৃতি কুসুম বিরাজিত বনান্তভূমি মত্ত ময়ূর রবে ও নৃত্যে—মদ্যপান ভূমি যেমন মত্তজনের চীৎকার শব্দে ও নৃত্যে পূর্ণ হয়, সেই রূপ বোধ হইতেছে।

মুক্তাসমাভং সলিলং পতদ্বৈ
সুনির্ম্মলং পত্রপুটেষু লগ্নম্।
হৃষ্টা বিবর্ণচ্ছদনা বিহঙ্গাঃ
সুরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ পিবন্তি॥

জলসেকে বিবর্ণ-পক্ষ, তৃষিত বিহঙ্গকুল বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করত পক্ষবিধূনন করিতে করিতে অতি নির্ম্মল, পত্র পুটলগ্ন মেঘপতিত ইন্দ্রদত্ত বারি-বিন্দু আনন্দে পান করিতেছে।

ষট্ পাদতন্ত্রী মধুরাভিধানং
প্লবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্॥

ভ্রমরধ্বনিরূপ বীণাঝঙ্কার, ভেক-উদীরিত কণ্ঠতাল—মেঘশব্দরূপ প্রকটিত মৃদঙ্গ-নাদ—এই সকল লইয়া বন ভূমি যেন সঙ্গীতে প্রবৃত্ত।

ক্বচিৎ প্রনৃত্তৈঃ ক্বচিদুন্নদদ্ভিঃ
ক্বচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষণ্ণকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ময়ূরৈ
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্॥

কোথাও লম্বমান পুচ্ছ ভূষিত ময়ূর গণের নৃত্যে, কোথাও তাহাদের উচ্চরবে, কোথাও বৃক্ষাগ্রভাগে শরীর সংলগ্ন করিয়া অবস্থান করায় বোধ হইতেছে—যেন বনভূমি নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত। আর এই ভেকধ্বনি! চিরনিদ্রা সন্নিরুদ্ধ, বিবিধ রূপ আকার, বর্ণ ও শব্দ বিশিষ্ট ভেকগণ মেঘধ্বনি শ্রবণে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া

প্রবুদ্ধ হইয়া নব বারিধারাভিহত হইয়া শব্দ করিতেছে। নদী সকল ভরিত-যৌবনা যুবতীগণের ন্যায় দৃপ্তভাবে—উদ্ধতভাবে শীর্ণ তটপ্রদেশরূপ আসক্ত জনগণকে নিরাশ করত চক্রবাকরূপ স্তনমণ্ডল উন্নত করিয়া পুষ্পাদি উপহার-পূর্ণ ভোগ স্বীকার করিয়া স্বস্ব স্বামীর নিকটে চলিয়াছে।

নীলেষু নীলা নব বারিপূর্ণা
মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তি সক্তাঃ।
দাবাগ্নি-দগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধাঃ।
শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলাঃ॥ ৪০।

দাবাগ্নিদগ্ধ শৈলের সঙ্গে অন্য দাবাগ্নিদগ্ধ শৈল স্থায়ীভাবে সংলগ্ন হইলে যেমন দেখায় সেইরূপ নব বারিপূর্ণ নীল মেঘে, অন্য নীল মেঘমালা বদ্ধমূল ভাবে আসক্ত হইয়াই যেন মিলিয়া রহিয়াছে।

উন্মত্ত কেকারবকারী ময়ূরগণ যেখানে, ইন্দ্রগোপ কীটাচ্ছন্ন শাদ্বল ভূমি যেখানে, সেই নীপার্জ্জুন বাসিত বনে বন্যহস্তিগণ বিচরণ করিতেছে। ভ্রমর সকল হৃষ্ট হইয়া নবাম্বুধারাহত-কেসর সরোরুহ সকল একবারে পরিত্যাগ করিয়া এখন সকেসর নূতন কদম্ব পুষ্পের মধুপান করিতেছে।

মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রাঃ
বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রাঃ।
রম্যা নগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রাঃ
প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ॥

এই কালে গজেন্দ্র সকল মত্ত, গবেন্দ্রকুল আনন্দিত, মৃগেন্দ্র সকল বিক্রান্ত, নগেন্দ্র সকল রম্য, নরেন্দ্রগণ প্রচ্ছন্ন, আর সুরেন্দ্র মেঘ সকল দ্বারা ক্রীড়া রত।

উত্থিত সমুদ্র-গর্জ্জন সদৃশ গর্জ্জন করিতে করিতে গমনাবলম্বী মেঘ সমূহ প্রচুর বারিবর্ষণ করিতেছে। নদী, তড়াগ, সরোবর, পুষ্করিণী, এবং সমস্ত পৃথিবী প্রবাহ-জল দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ পতন্তি
প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণ বেগাঃ।

প্রনষ্টকুলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং
নদ্যোজলং বিপ্রতিপন্ন মার্গাঃ ॥

বিপুল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহিতেছে, দু'কূল প্লাবিত করিয়া, রাজপথ রুদ্ধ করিয়া, নদীর জল দ্রুতবেগে বহিয়া চলিল।

মনুষ্য আনীত জলদ্বারা যেমন নরপতির অভিষেক হয়, সেইরূপ বায়ু কর্ত্তৃক উপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা সুরেন্দ্র যেন গিরিরাজ সকলকে অভিষেক করিতেছেন। ইহাতে ইঁহাদের নির্ম্মল আকার ও বিবিধ ধাতুযুক্ত রূপের কতই শোভা হইয়াছে।

ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা
ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা
তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ ॥

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। তারকা ও সূর্য্য কিছুই দেখা যায় না। নূতন জলসমূহে পৃথিবী পরিতৃপ্ত। দিক সকল অন্ধকারলিপ্ত হইয়া কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না।

মহান্তি কূটানি মহীধরাণাং
ধারাবিধৌতান্যধিকং বিভান্তি।
মহাপ্রমাণৈর্বিপুলৈঃ প্রপাতৈ-
র্মুক্তাকলাপৈরিব লম্বমানৈঃ ॥

পর্ব্বত সমূহের বারিধারাধৌত অত্যুচ্চশিখর হইতে চ্যুত অতি বৃহৎ বিপুল জলপ্রপাত সমূহ লম্বমান মুক্তামালার ন্যায় ইহাদিগকে কতই শোভাবিশিষ্ট করিয়াছে। মহাশৈলচ্যুত বিপুল জলপ্রপাত, ময়ূর নিনাদিত গুহাতে যেন হার বিকীর্ণ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। পর্ব্বশিখরের উপরিতল ধৌত করিয়া যে মুক্তাকলাপবৎ শোভমান দ্রুতপতিত প্রচণ্ডবেগশালী নির্ঝর সকল বহিয়া আসিতেছে, তাহারা যেন গুহার উৎসঙ্গতলের সহিত উপরিতলের মিলন করাইতেছে। সুরতমর্দ্দনবিচ্ছিন্ন স্বর্গস্ত্রীগণের হার-মুক্তার মত বর্ষাধারা চারিদিকে পতিত হইতেছে। রাজগণের যুদ্ধযাত্রার নিবৃত্তি হইয়াছে; যে সমস্ত সেনা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল

তাহারাও মধ্যপথে অবস্থিত; শত্রুতা অবরুদ্ধ; মার্গসকলও অবরুদ্ধ। ভাদ্রমাসে যে সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট বেদপাঠ করেন, তাঁহাদের অধ্যয়নকাল আসিতেছে। ভরত এখন যজ্ঞস্থান আচ্ছাদন করিয়া প্রজাবর্গের জীবনোপায় সঞ্চয় করত ধন্য হইয়াছেন। সরযূ এখন বারিপূর্ণা হইয়া আমাদের বনবাস আগমনে প্রজাবর্গের কোলাহল ধ্বনির মত স্রোতঃ শব্দ তুলিতেছে। আজ আমরা বিক্লিন্ন নদীকূলের মত অবসন্ন, আমি হৃতদার, আমি রাজ্যভ্রষ্ট, আর সুগ্রীব রাজ্যমধ্যে ভার্য্যার সহিত সুখে কাল কাটাইতেছে। বর্ষাকাল বলিয়া সুগ্রীবকে আমি কিছুই বলি নাই। এখন সুগ্রীব আপনিই প্রত্যুপকার করিতে আসিবে। আমি সেই জন্য শরৎ-কালের অপেক্ষা করিতেছি"।

লক্ষ্মণ রামের বাক্য সম্মানিত করিলেন এবং শরৎকালের প্রতীক্ষায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিতে হইবে, এইরূপ বলিলেন।

দেখ দেখি এই বর্ষাকালে নির্জ্জনে এই চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের নিকটে অবস্থানের অভ্যাস করিতে কতদূর পার।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভাব।

(১) মার্জ্জন।

মন্ত্রস্নানকে মার্জ্জন বলে। মার্জ্জন-মন্ত্রের অর্থ জানিয়া বা শুনিয়া যখন মন্ত্রো-চ্চারণে ঐ ভাবটি জাগান যায় তখন মন আর বিষয়ে স্পন্দিত হইতে পারে না। মন তখন ভগবৎ-ভাবে স্পন্দিত হয়। মন্ত্রময়ী মায়ের ভাবে মনকে স্পন্দিত করাই মনের মন্ত্রস্নান। মার্জ্জনের মন্ত্র ছয়টি। ইহার মধ্যে শেষের মন্ত্রটিতে সমস্ত পাপক্ষয় হয়। এই জন্য ইহাকে অঘমর্ষণ মন্ত্রও বলে। এই মন্ত্রগুলিতে কতকগুলি প্রার্থনা আছে এবং পাপনাশক সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তাও আছে।

"সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ।" ইহার ব্যাখ্যাতে দেখান হইয়াছে ব্রহ্মই সৃষ্টিমত ভাসিয়াছেন। পরমপদই সগুণ ব্রহ্মরূপে এবং সগুণব্রহ্ম সৃষ্টিবৎ ভাসিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ সৃষ্টি ভিন্ন যেমন হয় না সেইরূপ

গায়ত্রী দেবীই ব্রহ্মের নিকটে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দেন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব যে যুক্তিতে নিশ্চয় হয় সেই যুক্তিতেই গায়ত্রীকে পরমপদ বলা হয়। সন্ধ্যা গায়ত্রীরই উপাসনা প্রণালী। গায়ত্রীই পরমাসত্তা। ইনি আপ, জ্যোতি, রস, অমৃত, ব্রহ্ম, ভূর্ভুব স্বঃ ওঁ। যে মাতা জলকে শরীর করিয়া জগৎকে বেষ্টন করিয়া আছেন সেই জলময়ী মাতার নিকটেই মার্জ্জন মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়। জড় বস্তুর কাছে প্রার্থনা হয় না। কারণ জড়বস্তু কখনও প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে না। জগতে কিন্তু যেখানেই জড়বস্তু আছে তাহা চৈতন্য পুরুষের শরীররূপেই ভাসিয়াছে।

পরে বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রে শ্রুতি হইতে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি মন্ত্রে দেখান হইবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দিবি, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র-তারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ, ভূতগণ, প্রাণ, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ, মন, ত্বচা, বিজ্ঞান, শুক্র এই সমস্ত পদার্থেই সেই পরমপদ রূপিনী গায়ত্রীই আছেন কিন্তু ইহারা ইহার শরীর। শরীর সমূহ দেবীকে জানেনা। ইনি শরীরের ভিতরে থাকিয়া শরীর সমূহকে প্রেরণা করেন। ইনিই আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত।

সম্মুখে পঞ্চপাত্রে জল রাখিয়া সাধক ব্রাহ্মণ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন। ঐ জলে মাতৃরূপিণী গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি পবিত্র নদী সকলকে এবং পবিত্র তীর্থ সকলকে আহ্বান করা হইয়াছে। মা ত সর্ব্বত্রই আছেন। ঐ জলেও আছেন। এখানে মায়ের কাছেই প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে—

(১) মা আমাদের মঙ্গল কর।

(২) মা আমাকে পাপ হইতে শুদ্ধ কর।

(৩) মা যতদিন এখানে রাখিবে ততদিন আমাদের অন্নের সংস্থান করিয়া দাও।

(৪) মা অন্তিমকালে আমাদিগকে সেই রমণীয়-দর্শনের সহিত মিলন করাইয়া দাও।

স্থির আসনে বসিয়া প্রথমেই একটু আপনার মনের সন্ধান লও। যদি দেখ ইহার সাড়া শব্দ নাই অথবা ইহা পাগলের মত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছে তখন মনকে একটু কাতর কর। কাতরতা ভিন্ন কোন উপাসনা হয় না। মনকে কাতর করা ত কঠিন কর্ম্ম নহে। আদি প্রতিজ্ঞা কি করিয়া আসিয়াছ, তাহা কি

স্মরণ আছে? তুমি কাহার হইয়া কাহার হইয়াছ তাহা কি স্মরণ কর? জীবন ভরিয়া কত অন্যায় করিয়াছ, বাল্যকাল হইতে কত পাপ হইয়া গিয়াছে, সেইগুলি আলোচনা কর। ভাল হইব বলিয়া কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছ আবার মন্দ কার্য্য করিয়াছ; বাক্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কার্য্যে তাহা কিছুই কর নাই ইহাতে তোমার কাতরতা কি আসিবে না? এখন পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছ সত্য কিন্তু এখনও তাঁহার কোন আজ্ঞা যথা সময়ে যথা নিয়মে করিতে ত পার না? যথা সময়ে শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছ কৈ? যথাকালে নিত্য কর্ম্ম কর কৈ? লোক-ব্যবহারে সর্ব্বদা বিনয়াবনত হও কৈ? আহা! শত শত দোষ তোমার তুমি কাতর না হইবে কেন? সংসারে যত যত অনিষ্ট হইয়াছে—এই যে পুত্র কন্যা, মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী ইত্যাদির অসময়ে বিয়োগ ইহাও যে তোমার পাপের ফলে! কত ব্যাধি তোমার দেহে লুকাইয়া আছে, কখন কে তোমাকে বিষাদসাগরে ডুবাইয়া চলিয়া যাইবে, বল ত তুমি কিসে নিশ্চিন্ত? এই ভাবে মনকে কাতর কর, এবং ভাবনা কর কে তোমাকে স্থির করিতে পারে? আহা! তুমি যত পাপী হও, যত তাপী হও তোমার ও মা আছেন। শত দোষ করিয়া এই মাতার কাছে যখন বল—মা আর আমি অন্যায় করিব না তুমি আমাকে ক্ষমা কর—জননী তোমাকে ক্ষমা করেন। আর সেই মা? অপার করুণাময়ী আমার ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী। তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন। তিনি তোমার প্রতি করুণা করিবেন। তাঁহার কাছে তুমি প্রার্থনা কর। মনকে কাতর করিয়া যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা মনে করিতে থাক। মনে মনে আবৃত্তি কর মা মঙ্গল কর, মা পাপ হইতে শুদ্ধ কর, মা অন্নের সংস্থান করিয়া দাও, মা রমণীয়-দর্শনের কাছে লইয়া চল, এই ভাবিতে ভাবিতে মার্জ্জনের মন্ত্রে ঐগুলি বিশেষ ভাবে দেখিতে থাক।

মার্জ্জন মন্ত্রে বলা হইতেছে,—মা! জলশরীর ধারিণি! পৃথিবীতে যেখানে যত প্রকারের জল আছে—মরুদেশের জল, জলময় দেশের জল, সমুদ্রের জল, কূপের জল—মা জলময়ি! আমাদের কল্যাণ কর। "শন্নঃ নঃ অস্মাকং শং কল্যাণং।" আমাদের কেন? আমি একা তোমার উপাসনা করিতেছি আমাদের কল্যাণ কর কেন বলা হইল? "আমাদের" এই কথাটি যে সন্ধ্যামন্ত্রে আছে তাহাতেও মনকে কাতর করিবার কিছু আছে। মা! আমি একা বসিয়াছি বটে কিন্তু আমি একা নহি। একোনবিংশ জন আমার সঙ্গে আছে। আমি জাগ্রত-অভিমানী

চৈতন্য। আর এই একোনবিংশ জন ? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই উনিশ জন। ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি। যেখানে শক্তি, সেখানে চৈতন্য তাহার সহিত জড়িত। এ জন্য চৈতন্য জড়িত শক্তিই জন বটে।

মা! আমি যখন আমার দিকে চাই তখন দেখি যাহারা আমার সঙ্গে আছে তাহারা সকলেই পাপ করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াছে, কেহ অপেয় পান করিয়াছে, কেহ অগম্যা গমন করিয়াছে, কেহ অদৃশ্য দর্শন করিয়াছে, কেহ অশ্রাব্য শ্রবণ করিয়াছে, কেহ অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়াছে, কেহ অগ্রহণযোগ্যকে গ্রহণ করিয়াছে। চক্ষু পরস্ত্রীকে মাতৃভাবে না দেখিয়া কত পাপ করিয়াছে, কর্ণ পরনিন্দা পরচর্চ্চার কথা শুনিয়া কতই কলঙ্কিত হইয়াছে—এই রূপে সকল ইন্দ্রিয়গুলি অশাস্ত্রীয় পাপপথে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিয়া কলঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে। মা! ইহাদের জ্বালায় বড় জ্বলিয়া, ইহাদের ব্যভিচারে বড় মর্ম্মাহত হইয়া আজ তোমার দ্বারে জুড়াইতে আসিয়াছি। ইহারা অনিচ্ছুক, তথাপি ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইতে, তোমার শীতল চরণচ্ছায়াতে লুব্ধ করিয়া আশ্রয় প্রাপ্তি জন্য ইহাদিগকে লইয়া আসিয়াছি। মা! তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

"আমাদের" এই বহুবচন প্রয়োগ অন্যভাবেও হইতে পারে। ইহা স্থূল চিন্তা। যদিও আমি একা সন্ধ্যা উপাসনায় বসিয়াছি তথাপি আমি পরিচিত অপরিচিত সকল পাপী তাপীর জন্য কাতর হইয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে পারি। হে জল সকল! হে জলময়ি! তুমি আমাদের কল্যাণ কর। মা! আমি আমার স্বরূপ ভুলিয়া মনকেই আত্মা রূপে গ্রহণ করিয়া ফেলি। আর মন পাপ করিলে বলি আমিই পাপ করিতেছি। মা! আর আমি মন সাজিয়া পাপ করিব না। তুমি আমাকে পাপ হইতে শুদ্ধ কর।

কাষ্ঠময় পাদুকা ত্যাগ করিয়া পদ প্রক্ষালনান্তর পদ মল হইতে যেমন লোকে মুক্ত হয়, স্নান করিয়া দেহ মল হইতে যেমন লোকে মুক্ত হয়, ঘৃত যেমন বৈদিক মন্ত্রদ্বারা পবিত্র হয় সেইরূপ হে জল দেবি! তুমি আমাকে পাপ হইতে পবিত্র কর। হে জল সকল! হে জলময়ী জননি! তুমি ত সকল জীবকে সুখদান কর, সকল প্রাণীর সুখসাধন অন্নাদি উৎপাদন কর, তাই মা! বলকর-অন্নাদি জনিত সুখভোগে আমাদিগকে পুষ্ট কর আর সেই রমণীয়-দর্শনকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে উপযোগী কর। হে জলসকল! তোমাদের শিবতম—

কল্যাণকর রসের ভাগ আমাদিগকে দিয়া, স্নেহময়ী জননী স্তন্যরস দ্বারা যেমন সন্তানের বলাধান করেন সেইরূপ তোমার সন্তান স্থানীয় আমরা—তুমি আমাদের বলাধান কর। মা! পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই রস আমাদিগকে ভোগ করাও যে রসের বৃদ্ধি জন্য তুমি বৃষ্টিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল প্রকার শস্যকে পুষ্ট কর।

ইহার পরেই পাপক্ষয় জন্য সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা। ইহার কথা পরে বলা যাইবে। এখন পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনার মন্ত্রগুলির ভাব আরও একটু বিশদরূপে অনুভব সীমায় আনিতে চেষ্টা করা যাউক। জলময়ী গায়িত্রী জননীর কাছে প্রার্থনার সার কথা এই যে, মা! আমার ইন্দ্রিয়গুলি শাস্ত্রনির্দ্ধারিত পথে না চলিয়া, তোমার প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করিয়া কতই অকল্যাণকর কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে, এখনও তাহারা পাপ ছাড়িতে পারিতেছে না—এই পাপেই আমি তাপ পাই, কিছুতেই শান্তি পাই না। মা আর পাপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। মা! শুধু ইচ্ছাই আমাকে পবিত্র করিতে পারিতেছ না। তুমি শক্তি দাও। ইচ্ছা ও শক্তি মিলিত হইলেই আমার কার্য্য হইবে। আমি ত নিত্যকর্ম্মের চেষ্টা করিবই। কিন্তু তুমি কৃপাকটাক্ষে না চাহিলে আমাদিগকে আর কে পবিত্র করিবে? তুমি পাপ হইতে পবিত্র কর, তুমি অন্নের সংস্থান করিয়া দাও এবং রমনীয়-দর্শনের সহিত মিলন করিয়া দাও। সর্ব্বদা এইগুলি কাতর মনে স্মরণে রাখিয়া সন্ধ্যা করিতে হইবে।

আচ্ছা এই যে প্রার্থনা, ইহাতে মনের এমন কি ক্রিয়া হয় যাহাতে মন পবিত্র হয়? ঈশ্বরের গুণ চিন্তা করিলে মন যত শীঘ্র পবিত্র হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। জলশরীর যাঁহার সেই জলময়ী গায়ত্রী জননীর গুণ এখানে কি ভাবে চিন্তা করিতে হয়, আবার শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জলটা জড় মাত্র। কিন্তু জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি তিনি চেতন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা যায়, জল দ্বারা দেহমল প্রক্ষালিত হইলে দেহ শীতল ও পবিত্র হয়। আর জলময়ী মাতার গুণের চিন্তায় মায়ের যে উপাসনা হয় তদ্দারা মনও শীতল এবং পবিত্র হয়।

গুণ চিন্তা, কর্ম্ম চিন্তা, রূপ চিন্তা এবং স্বরূপ চিন্তা এইগুলি সমস্তই ধ্যান। ধৈ ধাতুর অর্থই চিন্তা। ধ্যান বলে চিন্তাকে। এখন দেখ, জলময়ী মাতার গুণের চিন্তাটি কিরূপে করিতে হয়।

এই যে জগতের শোভা, এই শোভা দেয় কে? যাহাতে রস নাই, যাহা

নীরস, যাহা শুষ্ক, তাহাতে শোভা কোথায়? এই যে ফলে ফুলে বৃক্ষলতা শোভা ধারণ করে, এই যে রসময় সুন্দর দেহ ধারণ করিয়া জীব আনন্দে বিচরণ করে, এই রস ইহারা পায় কোথায়? যিনি সরসবতী, যিনি সরস্বতী তিনি রস দিয়া স্থাবর জঙ্গম সকলকে সরস রাখেন বলিয়াই না জগতের এই শোভা? প্রকৃতির যে শোভায় মন আনন্দে মাতিয়া উঠে সেই শোভার জনয়িত্রীই আমার মা। আরও দেখ জল হইতে বাষ্প উঠিয়া মেঘ হয়; মেঘ হইতে বারিবর্ষিত হইলে তবে না ব্রীহি, যব, শ্যামাক ইত্যাতি শস্য জন্মে? এই শস্যইত জীবকে জীবিত রাখে। তবে কেন চিন্তা করিবে না, মা তুমিইত জগতের কল্যাণ করিতেছ। মা! আমরা অনেক অকল্যাণকর কর্ম্ম করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছি। তুমি জগতের কল্যাণদায়িনী! তুমি আমাদের কল্যাণ কর। তুমি যে জগতের কল্যাণ করিতেছ এই চিন্তায় যখন প্রাণ ভরিয়া যায়, যথায় তথায় তোমাকে দেখিয়া যখন তোমাকে কল্যাণদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া অনুভব করিতে পারি তখন কি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া যায় না? তখন কি ব্যভিচার করিয়া মানুষ নিজে শুষ্ক হইতে চায়, না অন্যকে শুষ্ক করিতে পারে? তখন নর নারী, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা সর্ব্বত্র তোমার অনুগ্রহ দেখিয়া তোমার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত হইতে চায়। যে এই ভাবে মায়ের চিন্তা করিতে পারে সে কি আর পাপ করিয়া নিজের ও জগতের অমঙ্গল করিতে পারে? মা কল্যাণ কর, কল্যাণ কর, এই বলিয়া সে যে সকল পাপী তাপীর জন্য প্রার্থনা করিবে, ইহা কি বিচিত্র?

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভাব।

(২) বিষ্ণুস্মরণ।

ব্যাপনশীল—সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—সর্ব্বব্যাপী যিনি তিনিই বিষ্ণু। শ্রুতি এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেন—বিষ্ণোঃ সর্ব্বতোমুখস্য। স্নেহো যথা পললপিণ্ড মোতপ্রোতমনুব্যাপ্তং ব্যতিরিক্তং ব্যাপ্নুত ইতি ব্যাপ্নুবতো বিষ্ণোস্তৎপরমং পদং পরমং ব্যোমেতি পরমং পদং পশ্যন্তি বীক্ষন্তে। সূরয়ো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস ইতি

সদা হৃদয় আদধতে। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—আততং বিস্তৃতং চক্ষুর্দিবি স্থিতং সূর্য্যমিব।

যিনি সর্ব্বতোমুখ—সর্ব্বত্র যাঁহার প্রবেশ দ্বার—সকল দ্বার দিয়া যিনি জগতে প্রবিষ্ট—জগত সৃষ্টি করিয়া যিনি আপন সৃষ্ট জগতে ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"; একমাত্র যিনি বিশ্বের পরিবেষ্টিতা—"বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং," যে ক্রীড়াশীল, দীপ্তিশীল দেবতা অগ্নিতে, জলে, বিশ্বে, ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন যিনি ওষধীতে, বনস্পতিতে, তিনিই বিষ্ণু তাঁহাকে নমস্কার।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

এই বিষ্ণু সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলেন—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মাৎ নানায়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥

একমাত্র যে পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ—অন্য পরিদৃশ্যমান্ যাহা কিছু তাহা রজ্জু অবলম্বনে সর্পের ভাসার মত, না থাকিয়াও, যাঁহার পরমা সত্তা অবলম্বনে আছে এইরূপ বোধ হয় তিনিই বিষ্ণু। স্নেহপদার্থ—তৈল বা জল বা রস যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড বা মাংসপিণ্ডকে পিষ্টকাদিতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া থাকে অথচ তাহা পললপিণ্ড হইতে অতিরিক্ত বস্তু, সেই বিষ্ণু সর্ব্ব বস্তুতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া রহিলেও সর্ব্ব বস্তু হইতে ভিন্ন।

শ্রীবিষ্ণু কি শুধুই সর্ব্ব বস্তুতে পরিব্যাপ্ত? তিনিই কি জগতে জড় আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী? না। তিনিই সকল বস্তুকে আপন আপন কর্ম্মে প্রেরণ করেন, তিনিই সকল বস্তুকে জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো
যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং।
যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

এইরূপ "যোঽপ্সু, যোঽগ্নৌ, যোঽন্তরিক্ষে, যো বায়ৌ, যো দিবি, য আদিত্যে, যো দিক্ষু, যশ্চন্দ্রতারকে, য আকাশে, যস্তমসি, যস্তেজসি, যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু, যঃ প্রাণে, যো বাচি, যশ্চক্ষুষি, যঃ শ্রোত্রে, যো মনসি, যস্ত্বচি, যো বিজ্ঞানে, যো রেতসি"—যে পুরুষ সর্ব্বত্র থাকিয়াও, অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, অমত মন্তা,

অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা—যে পুরুষ ছাড়া অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, অন্য কেহ শ্রোতা নাই, অন্য কেহ মন্তা নাই, অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই সেই পুরুষই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত। এই পুরুষই শ্রীবিষ্ণু। এই সর্ব্বব্যাপী পুরুষই জীবে জীবে, স্থাবর জঙ্গমে আত্মা। এই সর্ব্বব্যাপী পুরুষই ভাবনা রাজ্যে অবতার, এই সর্ব্বব্যাপী পুরুষই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বরূপ, সগুণ ব্রহ্ম; আবার ইনিই মহাপ্রলয়ে নির্গুণ ব্রহ্ম। এই পুরুষেরই প্রশাসনে সূর্য্য এবং চন্দ্র যথাস্থানে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন, ইঁহারই প্রশাসনে দ্যাবা পৃথিবী—দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌর জগৎ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। ইঁহারই প্রশাসনে নিমেষ ও মুহূর্ত্ত, দিবা ও রাত্রি, অর্দ্ধমাস ও মাস, ঋতু ও বৎসর নিজ নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে। এই পুরুষেরই প্রশাসনে শ্বেত পর্ব্বতসমূহ হইতে পূর্ব্ব দেশীয় নদীসকল পূর্ব্বদেশে বহিতেছে, পশ্চিম দেশীয় নদীসকল পশ্চিম দেশেই বহিতেছে। এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! বদান্যগণকে মনুষ্যগণ প্রশংসা করিয়া থাকে এবং দেবগণ যজমানের অনুগত হয়েন, পিতৃগণও দর্ব্বী হোমের অনুগত হয়েন।

যে কেহ অরে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহ লোকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করে, বা বহুবর্ষ কাল তপ করে তাহার কর্ম্মফল ক্ষয়শীল। যে কেহ অরে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সেই যথার্থ কৃপণ, কেননা অল্প সংসার-সুখের জন্য ইহারা অনন্ত সুখ-স্বরূপ ভূমা পুরুষকে পরিত্যাগ করে এবং এই অক্ষর পুরুকে জানিয়া, অরে গার্গি! যে কেহ ইহলোক হইতে প্রস্থান করে তিনিই ব্রাহ্মণ। অরে গার্গি! সেই অক্ষর পুরুষকে দেখা যায় না তিনি কিন্তু দর্শন করেন। তাঁহাকে শুনা যায় না তিনি কিন্তু শ্রবণ করেন। তাঁহাকে মনে ধারণা করা যায় না তিনি কিন্তু মনন করেন। তাঁহাকে জানা যায় না তিনি কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন আর কেহ দর্শনকারী নাই; তিনি ভিন্ন আর কেহ শ্রোতা নাই; তিনি ভিন্ন আর কেহ মননকারী নাই; তিনি ভিন্ন আর কেহ বিজ্ঞাতা—অনুভব কর্ত্তাও নাই। শ্রুতি এই পুরুষ সম্বন্ধেই আবার বলেন এই যে সমস্ত জগৎ ইহা তাঁহা হইতেই নিঃসৃত এবং তাঁহার অস্তিতাতেই অস্তিত্ব সম্পন্ন; তিনিই মহৎ ভয় কারণ; উদ্যত বজ্র স্বরূপ; যাঁহারা এইটি বুঝিয়াছেন তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করেন। ইঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দান করেন; ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য কিরণ দান করেন। ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম পাদস্থ মৃত্যু বা যম ইঁহারই ভয়ে স্বস্ব কার্য্যে ধাবিত হয়েন।

যাঁহারা অধিকারী, এই শ্রুতিমন্ত্রগুলি তাঁহাদের নিত্য পাঠ্য। তাই আমরা শ্রুতি মন্ত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহার জন্য ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করিবেন, যাঁহার নাম ব্রাহ্মণেতর সকলে জপ করিবেন; তাঁহাকে "বিদ্মহে" না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও জপ ইত্যাদির অনুষ্ঠান কি জন্য? তাই অধিকারীর জন্য এই সমস্ত উদ্ধৃত হইল।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠান্ত।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে, শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতি।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি! বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোতমতং মন্ত্র বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রে।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কে এই বিষ্ণু? যিনি সকলকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছেন। এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত?

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি! যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।

অরে গার্গি! যাহা দ্যুলোকেরও উপরে আছে, যাহা পৃথিবীরও নীচে আছে, যাহা এই লোকদ্বয়ের মধ্যভাগেও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই বিদ্যমান বলিয়া লোকে বর্ণনা করে সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওতপ্রোত ভাবে আকাশে ব্যাপ্ত আছে।

কস্মিন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি?

এই আকাশ ওতপ্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত? এই আকাশকেও ওতপ্রোত ভাবে যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনিই অক্ষর পুরুষ। তিনি স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন; অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণও নহেন, জলবৎ দ্রব পদার্থও নহেন। তিনি ছায়া শূন্য, তমঃ শূন্য। তিনি বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন। তিনি অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ। তাঁহার বোধের জন্য চক্ষু, কর্ণ, বাগিন্দ্রিয়, মন কিছুই প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহার জীবনের জন্য সূর্য্যতাপ বা প্রাণ অনাবশ্যক। তাঁহার মুখাদি অবয়বও নাই এবং তিনি সীমাশূন্য, অন্তর-বাহ্যশূন্য। তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না; কাহা কর্ত্তৃক ভুক্তও হয়েন না।

শ্রীবিষ্ণু কে? যিনি সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী, ঈশ্বর। যখন সর্ব্ব জগৎ থাকে তখন তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু যখন সর্ব্ব বলিয়া কিছুই থাকে না তখন তিনি "আপনি আপনি"। এই বিষ্ণুই আপন শক্তি অবলম্বনে যখন অনন্ত কোটি জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা তখন ইনিই ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্। আবার এই পুরুষই জগৎ জীবের দুরবস্থা কালে, ধর্ম্মের গ্লানি সময়ে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে অবতার, আবার এই পুরুষই জীবে জীবে আত্মা। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যায় এই বিষ্ণুকে প্রথমেই স্মরণ করেন এবং বলেন সেই বিষ্ণুর পরম পদ সুরেরা সর্ব্বদা দর্শন করেন:—বিষ্ণু স্মরণে ইহাই বলা হইতেছে। বিষ্ণু কি তাহা শুনিলাম কিন্তু এই বিষ্ণুর আবার পরমপদ কি? আর সুরগণ সর্ব্বদা সেই পরমপদ দর্শন করেন কিরূপে?

পরমং ব্যোমেতি পরমং পদম্। গৌরীর্মিমায় মন্ত্রে এই পরম ব্যোম্‌কে শ্রুতি পরমপদ বলিতেছেন। এই পরমপদই "আপনি আপনি" তুরীয় পদ। যখন ইহার একদেশে সৃষ্টিভাসে তখন ইনি সর্ব্বব্যাপী। শ্রুতি সর্ব্বত্রই নির্গুণ ও স্বগুণকে এক করিয়া বর্ণনা করেন। যখন সৃষ্টি মূলে না থাকিয়াও স্থূলে ইন্দ্রজাল মত ভাসে তখন তিনিই সমস্ত। রাহুর শির বলিলে যেমন রাহুকেই বুঝায় কারণ রাহুর অন্য অঙ্গনাই তিনি শুধু শির সেইরূপ বিষ্ণুর পরমপদ বলিলে শুধু

বিষ্ণুকেই বুঝায়। কারণ তিনি স্বস্বরূপে "আপনিই আপনি"। স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় কোন ভেদ তাঁহাতে নাই। "তিনিই তিনি"। তথাপি তিনি আপনার "আপনি আপনি" ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও সমকালে যখন সর্ব্ব ভাসে তখন সর্ব্বব্যাপী,—সগুণ ব্রহ্ম হয়েন, যখন জগতের বিপর্য্যয় হয় তখন অবতার হয়েন এবং জীবে জীবে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তিনি আপনার মায়া অবলম্বনেই এইরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। এই জন্য বিষ্ণুর পরমপদটি কি তাহা বুঝিতে হইবে।

পরমপদ সম্বন্ধে বুঝিবার কথা এই :—

(১) যখন সৃষ্টি না থাকে তখন পরম পদটি কি ?

(২) যখন সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে তখন ইহা কি ?

(৩) যখন সৃষ্টির বিপর্য্যয় অবস্থা হয় তখন ইনি কি হয়েন ?

(৪) সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গমে ইনি কি ?

(১)

সৃষ্টি উঠুক বা না উঠুক পরমপদ যাহা তাহা সর্ব্বকালেই পরমশান্ত চলনরহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত। এই পরম পদের বর্ণনা করিতে কাহারও শক্তি নাই। "যন্নদেবা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি"। দেবতাগণও এই পরম পদকে জানেন না। মন এই পরম পদকে চিন্তা করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে। কারণ চিন্তা করা অর্থ সীমাবদ্ধ করা। সসীম যাহা তাহারই চিন্তা হয়। সীমাশূন্য যাহা তাহার চিন্তা হয় না। মন পরম পদকে চিন্তা করিতে পারে না কিন্তু জীব পরম পদে স্থিতি লাভ করিতে পারে। দেবতাগণ যাঁহাকে জানিতে পারে না, মন যাঁহাকে চিন্তা করিতে গিয়া অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, বাক্য তাঁহাকে লইয়া স্ফুরিত হইবে কিরূপে ? বাক্য তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। বাক্য সেই সীমাশূন্য বস্তুর কতটুকু বলিবে ? যখন সৃষ্টি থাকে না তখনও পরমপদ যেমন আপন স্বরূপে থাকেন সৃষ্টি থাকিলেও পরমপদ সেইরূপ আপন স্বরূপেই থাকেন। এই পরমপদের কোন প্রকার বিকার কখনও হয় না, চলনও কখন হয় না।

(২)

যখন সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে তখন সেই পরম পদের একদেশে মাত্র একটু ক্ষোভ হওয়ার মত হয়, যেন একটু চলন হয়। পরমপদ তিন পাদে শান্ত কেবল অবিদ্যাপাদে যেন সুস্থির সেই পরমপদ কিছু অস্থিরাকার হয়েন। ফলে তিনি

যাহা তাহাই থাকেন। রজ্জুতে সর্পভাসার মত তাঁহার একদেশে যেন একটি ঝলক উঠে। সীমাশূন্য মত সুনীল আকাশের একদেশে যখন একখণ্ড মেঘ ভাসে তখন সেই মেঘের তলার আকাশ যেন খণ্ডিত হয়, যেন আবৃত হয়। আকাশ আকাশই থাকে কেবল একদেশে মাত্র মেঘ জড়িত হইয়া পূর্ণ মত আকাশ যেন পরিচ্ছিন্ন হয়েন। পরমপদ হইতেছেন অখণ্ড চিন্ময়ি। ইহার একদেশে স্বভাবতঃ যে ঝলক উঠার মত বোধ হয় সেই ঝলকটি হইতেছে মায়া। পরমপদের সম্বন্ধে মায়া অতি ক্ষুদ্র। এই অতি ক্ষুদ্র মায়ার ভিতরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। যেমন সূর্য্যকিরণে অনন্তকোটী এস রেণু ভাসিয়া বেড়ায় সেইরূপ মায়ার ভিতরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে। সেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এই সৌর জগৎ। এই সৌর জগতের অতি ক্ষুদ্র স্থানে এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র অংশ হইতেছে জম্বু দ্বীপ। ইহার অতি ক্ষুদ্র স্থানে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের অতি ক্ষুদ্র স্থানে ৺কাশীধাম। ৺কাশীধামের অতি ক্ষুদ্র স্থানে অশীঘাট। অশীঘাটের মধ্যে এক ক্ষুদ্র স্থানে এই বাড়ী। এই বাড়ীরও সব স্থান যুড়িয়া তুমি বসিয়া নাই। তুমি বাড়ীর এক অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া আছ। এখন বল দেখি যে মায়ার মধ্যে তুমি, মায়ার সঙ্গে তুলনায় তুমি কোথায়? আবার ব্রহ্মসম্বন্ধে যে মায়া অতি ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র সেই ব্রহ্মের তুলনায় তোমার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেহ আছে কি নাই, ইহা কি বলা যায়? তথাপি মানুষ যে আপন দেহ ভুলিতে পারে না তাহা ঐ মায়ারই কার্য্য। এখন দেখ, মায়ার ভিতরে এই সৃষ্টি, আর মায়া ব্রহ্মের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে ঝলকের মত যেন ভাসেন। ব্রহ্ম যখন মায়াকে স্বীকার করেন, যখন মায়াতে অভিমান করেন, তখন তিনি আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়াও যেন স্বরূপ ভুলিয়া সগুণ ব্রহ্ম হয়েন।

মায়াটি হইতেছে যোগনিদ্রা। আর সগুণ ব্রহ্ম হইতেছেন আদি নারায়ণ। নারায়ণ যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া মায়ানিহিত বিচিত্র সৃষ্টিবীজ রূপ কারণ সলিলে যখন শয়ান থাকেন তখন তাঁহার সুষুপ্ত অবস্থা। মহাপ্রলয়ে যখন মায়া আপনার বিচিত্র সৃষ্টি গুটাইয়া সেই পরমশান্ত পরম পুরুষকে স্পর্শ করেন তখন মায়ার আর কোন স্পন্দন থাকেনা বলিয়া সগুণ ব্রহ্মরূপী নারায়ণ যেন প্রসুপ্ত হয়েন। ফলে সদা জাগ্রত পুরুষের আবার নিদ্রা কি? স্পন্দনশূন্য যে মায়া তাহাকে বলে সাম্যাবস্থা। এই মায়াকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। কারণ যদি বলা যায় সাম্যাবস্থাটি আছে তখন বলিতে হয় কোথায় আছে,

যদি বলা হয় পরমপদে আছে তবে সাম্যাবস্থার সহিত পরমপদের কোন পার্থক্য থাকেনা। এখানে শক্তি ও শক্তিমান এক। শক্তিমান যিনি তিনিও যেমন স্থিতি শক্তিও সেইরূপ স্থিতি মাত্র। কিন্তু সাম্যাবস্থাটিকে স্থিতি বলিলেও যখন ইহার মধ্যে সত্ত্ব রজস্তম গুণগুলি স্থির ভাবে থাকে তখন বলিতে হয় সাম্যাবস্থার ভিতরেও বৈষম্যের বীজ আছে। "অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্বুবাহম্" অথবা "অপামিবাধার-মনুত্তরঙ্গম"—অথবা "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"—ইহাদের সহিত সাম্যাবস্থার তুলনা করা হইলেও সমস্ত গতির বীজ যখন ইহার ভিতরে থাকে তখন সমস্ত গতির স্থির ভাব যে সাম্যাবস্থা এবং পরমশান্ত পরম পদের সর্ব্বগতিশূন্য 'স্থিতিভাব—এই দুই কখন এক নহে। এইজন্য বলা হয় ব্রহ্মে মায়া নাই। অথচ মায়া যে নাই তাহাও একবারে বলা যায়না কারণ বৈষম্যাবস্থায় যখন সৃষ্টি জাগে তখন সৃষ্টি নাই এ কথা বলা অনুভব বিরুদ্ধ। এইজন্য মায়াকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। রজ্জুতে যখন সর্প ভাসে তখন এই মাত্র বলা যায় যে রজ্জু রজ্জুই আছে সর্পটা ভাসে অজ্ঞানে। অজ্ঞানে সর্প ভাসিলেও বাস্তবিক সর্পটা কোথাও নাই কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ সর্প মত একটা কিছু দেখা যায়। দেখা গেলেও ইহা রজ্জুর বিবর্ত্ত মাত্র। সেইরূপ সৃষ্টিও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র। ব্রহ্মই মায়া দ্বারা সৃষ্টি মত ভাসেন। "সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ"। সুষুপ্তিই যেমন স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্মও সৃষ্টিবৎ প্রকাশ পান।

যখন সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে তখন ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম সর্ব্বকালে ব্রহ্মই আছেন। আর এই সৃষ্টি? এই জগৎ? ব্রহ্মই জগৎরূপে যেন দেখা যাইতেছে। রজ্জু রজ্জুই আছে। রজ্জুকে সর্পবৎ দেখা যাইতেছে। জগদ্দর্শনটি হইতেছে কার? ব্রহ্মই কি আপনাকে জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইতে দেখেন? শ্রবণ কর।

স্বপ্নবৎ পশ্যতি জগৎ চিন্নভো দেহবিৎ স্বয়ম্।

চিন্নভ—চিদাকাশ যিনি তিনি আপনিই স্বয়ং দেহবিৎ জীব-ভাবাপন্নং সৎ যৎ জগৎ পশ্যতি তৎ স্বপ্নবৎ পশ্যতি। চিন্নভ—চিদাকাশ যখন আপনি আপনি তখন জগৎ নাই। কাজেই জগদ্দর্শনও নাই। চিদাকাশকে চিন্মণিও বলা হয়। মণিতে স্বভাবতঃ ঝলক উঠে। চিন্মণিতে স্বভাবতঃ ঝলক উঠে। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের এক দেশে মায়া ভাসে। এই যে মায়ার সৃষ্টি ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি। মায়া সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা। ইহা অব্যক্তাবস্থা। এই সাম্যাবস্থার ভিতরে বৈষম্যের বীজ আছে। সাম্যাবস্থার যে বৈষম্যাবস্থা আসে তাহা পুরুষের সান্নিধ্যেই হয়।

যিনি পুরে শয়ান তাঁহাকে পুরুষ বলে। পুরুষ শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি পুরীতে বাস করেন। "পুরি বসতি" বস স্থানে উষ হইয়াছে। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মপুরুষকে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বলা যায় না। কারণ যখন যোগমায়া বা যোগ নিদ্রারূপ পুরী নাই তখন সেই পুরে কাহার বাস থাকিবে? তবে বলা যায় ব্রহ্মের পুরুষভাব যেন ঐ ভাবী যোগমায়ারূপ পুরীতে শয়ান অবস্থায় ছিল তাই তিনি পুরুষ। শ্রুতিতে নির্গুণ ব্রহ্মকেও পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হইলেই মায়ার নাম হইল প্রকৃতি। প্রকৃষ্টরূপে যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতিকে যখন ঈক্ষণ করেন তখনই বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি হয়। তবেই হইল, চিদাকাশই প্রকৃতির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মত হইয়া যখন জীবভাবাপন্ন হন তখন সেই জীবভাবাপন্ন চিদাকাশই জগদ্দর্শন করেন। এই জগদ্দর্শনটা কিরূপ দর্শন? স্বপ্নবৎ। জগৎটাকে স্বপ্নের মত দর্শন করেন। রজ্জু আপনাকে সর্পবৎ যেমন দেখেন সেইরূপ সুপ্ত পুরুষ আপনাকে স্বপ্নবৎ ভাসিতে দেখেন। তাই বলা হয় সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নবৎ ভাসে সেইরূপ ব্রহ্মও সৃষ্টিবৎ ভাসেন।

তুমিই চিদাকাশ। তুমিই জীবভাবাপন্ন হইয়াছ। জীবভাবাপন্ন হইয়াছ বলিয়াই জগৎ দেখিতেছ। এই যে তোমার জগৎ দেখা, তাহাও স্বপ্নবৎ দেখা মাত্র।

স্বপ্ন ত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু জগৎ দর্শন ত চিরস্থায়ী? আত্মার দীর্ঘস্বপ্নে জগৎ দর্শনটা স্থায়ী স্বপ্নমত হইয়া গিয়াছে। স্বপ্ন ভাঙ্গাই প্রয়োজন। স্বপ্নকালে এটা স্বপ্ন এটা স্বপ্ন এই সন্দেহ উত্থাপনে যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ প্রথমে জগৎটাকে, দেহটাকে, মনটাকে ঋষিদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া নিরন্তর বলিতে অভ্যাস কর যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্ন। জগৎকে, দেহকে, মনকে যদি সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া থাক তবে কখনও ইহাদিগকে স্বপ্ন বলিয়া বোধ করিতে পারিবেনা। তোমার স্বপ্নও কখন ভাঙ্গিবে না আর সংসার দুঃখও কখন দূর হইবে না। জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে ইহা একটা স্থূল অবলম্বন মাত্র। কিন্তু যে উপায়ে জগৎস্বপ্ন একবারে ভাঙ্গিবে তাহার ক্রম শ্রবণ কর।

যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্।
তৎ সুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে প্রবিনশ্যতি ॥

স্থাবর জঙ্গম এই সমস্ত জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা সুষুপ্তিতে স্বপ্ন যেমন বিনাশ পায় সেইরূপ কল্পান্তে বিনষ্ট হইবে। কল্পান্তকালে জগৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আর কিছুই দেখার নাই। আত্মপুরুষ সুপ্ত। কোন কামনা নাই, কোন বিষয় ভোগের ইচ্ছা নাই। কোন সঙ্কল্পস্বপ্নও নাই। শ্রুতি বলেন—"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্"। আত্ম-পুরুষ স্থূল দেহ হইতে, সূক্ষ্মদেহ (মন) হইতে পৃথক হইয়াছেন; কেবল একটি মাত্র সূক্ষ্ম আবরণে তিনি আবৃত। এইটি অজ্ঞান আবরণ। এই অজ্ঞানটি কি? জ্ঞানের অভাবে অন্য কিছু হইয়া থাকাই অজ্ঞান। আপনাকে আপনি জানিতে পারিতেছন না বলিয়া কি যেন কি হইয়া আছেন। কোন কামনা নাই, কোন স্বপ্ন দেখাও নাই অথচ আপনাকে আপনি জানাও নাই।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় স্বরূপানন্দের অতি ক্ষীণ স্ফুরণে সুপ্তপুরুষ আনন্দভুক্। স্থূল সূক্ষ্ম কোন প্রকার চিত্তস্পন্দন না থাকায় একটা অনায়াস পদে অবস্থিত বলিয়া তিনি আনন্দময়। সুষুপ্তিতে কুয়াসার মত একটা একীভূত কিছু আত্মপুরুষকে ছাইয়া আছে মাত্র। আর ভাবীনামরূপা মায়াতে এই বিশ্বটা ছায়া ছায়া মত অজ্ঞানাবরণে ভাসিতেছে। সুপ্ত আত্মপুরুষের অজ্ঞানাবরণে লগ্ন ছায়া ছায়া মত বিশ্ব ক্রমে স্বপ্ন নগরের মত তাঁহাতে ভাসিবে। ঐ স্বপ্ন নগর আরও স্থূল হইয়া সৃষ্টিরূপে পরে স্থিতি লাভ করিবে।

জীব-চৈতন্যের সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের এই সুষুপ্তিতে এই পার্থক্য যে উভয়েই অজ্ঞানাবরণে আচ্ছন্ন হইলেও সমষ্টি-পুরুষ মায়াধীশ আর ব্যষ্টি-পুরুষ মায়াধীন। সমষ্টি-পুরুষ জ্ঞানময় তপস্যা-প্রাচুর্য্যে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া আপন তুরীয় পদে অবস্থান করেন কিন্তু ব্যষ্টিপুরুষ তাহা পারেন না। এই সমষ্টি পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্"। ইনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী সকলের উৎপত্তি স্থান। ইনি ভূত সমস্তের সৃষ্টি ও নাশ কর্ত্তা।

সুষুপ্তি ও তুরীয় পদের সম্বন্ধ অতি নিকট। শ্রুতি সেই জন্য যেখানে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলেন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামীও বলেন। কল্পান্তে সুপ্ত পুরুষ মুক্তি লাভ করিয়া তুরীয় পরমপদে স্থিতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন, নান্তঃপ্রজ্ঞং। ন বহিঃপ্রজ্ঞং। নোভয়তঃ প্রজ্ঞং। ন প্রজ্ঞানঘনং। ন প্রজ্ঞং। না প্রজ্ঞং। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম গ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্ একাত্ম প্রত্যয়সারং। প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ"।

স্বরূপাবস্থায় ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন, ইনি স্বপ্নাভিমানী নহেন। বহিঃপ্রজ্ঞ হইতেও ভিন্ন, ইনি জাগ্রৎ অভিমানও করেন না। ইনি স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধ্যবস্থা হইতেও ভিন্ন—স্বপ্ন ও জাগ্রতের এককালে অধিষ্ঠাতা এইরূপ হইতেও ভিন্ন। ইনি প্রজ্ঞান ঘনও নহেন—ইনি সুষুপ্তি অভিমানী হইতেও ভিন্ন। ইনি প্রজ্ঞ নহেন—সর্ব্বজ্ঞ হইতেও ভিন্ন। অপ্রজ্ঞও নহেন—অজ্ঞান রূপও নহেন। ব্রহ্মে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এসব ভ্রম মাত্র। যেমন রজ্জুতে স্বপ্ন ভ্রম সেইরূপ। তাঁহার কোন উপাধি নাই। তিনি তুরীয়। তিন অবস্থার অতীত চতুর অর্থাৎ চতুর্থ তিনি। তিনি অদৃষ্ট। তাঁহার কোন বিশেষণ নাই, ইন্দ্রিয় দেখিবে কি ? তিনি অব্যবহার্য্য—সকল ব্যবহারের অযোগ্য। ব্যবহার যাহা তাহা যে মিথ্যা লইয়াই। তিনি অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায়না। তিনি অলক্ষণ—তাঁহাকে কোন অনুমানের দ্বারা লক্ষ্য করা যায়না। তিনি অচিন্ত্য—তাঁহার স্বরূপের চিন্তা হয় না। তিনি অব্যপদেশ্য—তিনি শব্দবাচ্য নহেন—শব্দের দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়না। তিনি একাত্ম প্রত্যয় সার—জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে তিনি একই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, এই নিশ্চয় প্রত্যয় লভ্য। তিনি প্রপঞ্চোপশম—তিনি জগৎ প্রপঞ্চ উপাধি রহিত। তিনি শান্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য। ইনি শিব মঙ্গলময় বিশুদ্ধ। ইনি অদ্বৈত—তিনি ভিন্ন দুই বলিয়া কিছু নাই, ইনি "আপনিই আপনি" অন্য সমস্ত রজ্জুতে সর্প ভাসার মত তাঁহার বিবর্ত্তমাত্র। ইনি চতুর্থ—ইনি পাদত্রয় হইতেও ভিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম।

বলিতেছিলাম যখন সৃষ্টি না থাকে তখন পরম পদটি তুরীয় ব্রহ্ম। আর যখন সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে তখন ইনিই মায়াধীশ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, ঈশ্বর।

এখন মনে কর মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রলয় অন্তে এই মায়াধীশ আত্মপুরুষ, এই সর্ব্বেশ্বর কি ভাবে থাকেন ? শ্রবণ কর।

ততস্তিমিত গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥

আর কিছুই নাই। না তেজ, না সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অন্ধকার। এক চলন-শূন্য সঙ্কল্প-শূন্য সৎ বা অস্তিভাব মাত্র অবশিষ্ট। কোন মূর্ত্তি নাই বলিয়া তিনি স্তিমিত—অক্রিয়। কোন সঙ্কল্প না উঠায় তিনি পরিচ্ছিন্ন হইতেছেন, না তাই গম্ভীর। তিনি তেজ নহেন কারণ কোনরূপ নাই। প্রকাশ মাত্র আছে তাই

তম শূন্য। কোন ধর্ম্ম নাই তাই অনাখ্য। ব্যষ্টিসুপ্ত পুরুষে অজ্ঞান আবরণ মাত্র থাকে বলিয়া যেমন তিনি অনভিব্যক্ত সেইরূপ সমষ্টি সুপ্ত পুরুষ প্রপঞ্চ সংস্কারের আধার বলিয়া তিনিও অনভিব্যক্তি। ব্যবহার সিদ্ধি জন্য এই পুরুষের কতকগুলি নাম জ্ঞানীগণ দিয়া থাকেন।

ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যামিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং তস্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ॥

ঋত, আত্মা, পরং, ব্রহ্ম, সত্য ইত্যাদি কল্পিত সংজ্ঞা জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্যবহারার্থ দিয়া থায়কন।

ঋতং = উৎকৃষ্ট প্রমাণ শ্রুতি গম্যত্বাৎ।

আত্মা = যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততোভাব স্তস্মাদাত্মেতি শব্দতে॥

ইতি ব্যাসোক্তরীত্যা আত্মা।

পরং সত্যতোৎকর্ষাবধিত্বাৎ।

ব্রহ্ম = বৃহত্বাৎ জগদাকারবৃহকত্বাৎ বা।

সত্যং = যথা শাস্ত্রং বিদ্বদ্ভিরনুভূয়নানম্॥

মহাপ্রলয়ে অবশিষ্ট এই পুরুষই "আমিই অন্যমত" এই উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া আদিজীব ভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন।

স তথাভূত এবাত্মা স্বয়মন্য ইবোল্লসন্।
জীবতামুপযাতীব ভাবি নাম্না কদর্থিতাম্।

সৃষ্টির আদিতে সেই আত্মপুরুষের মিথ্যা একটি সমষ্টি জীবভাব যেরূপে হয় তাহাই বলিতেছেন।

তথাভূতশ্চিৎ স্বভাবেন স্থিত এব মোহাৎ অন্যোজড় আকাশাদি ক্রমোদ্ভূতলিঙ্গ সমষ্ট্যাত্মা তদনুপ্রবেশাৎ তদভিমানেন স ইব উল্লসন্ স্তদন্তর্গত প্রাণধারণোপাধিনা দেহনিষ্পত্ত্যুত্তরভাবি বাগভিব্যক্ত্যধীনত্বাৎ ভাবিনা জীবনাম্না কদর্থিতাং কুৎসিতার্থত্বেন সম্পাদিতাং জীবতাং এতীব ভ্রান্ত্যা। বস্তুতস্ত নৈত্যেবেত্যর্থঃ।

জীবভাবটা ভ্রান্তিতেই হয়। শ্রুতিও বলেন "ময়ি জীবত্ব মীশত্বং কল্পিতং বস্তুতোনহি"। আত্মা চিৎ স্বরূপ। চিৎ এর উপরে মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ মায়া যেন উঠেন। আপনা হইতে ইহা উঠার মত বোধ হয় বলিয়া

ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি। পুনঃ পুনঃ ইহা উঠিতে থাকে আবার লয় হয়। এই অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিটিই ক্রমে বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত চিৎ যিনি তিনি চেত্যতা, বহির্ম্মুখতা যেন প্রাপ্ত হয়েন। আকাশবৎ সূক্ষ্ম শুদ্ধ বোধ স্বরূপ যিনি তাঁহাতে স্বভাবতঃ মায়ার উত্থান পতনে যেন কিঞ্চিৎ চেত্যতা উঠে। চেত্যতা বা বহির্ম্মুখতা জাগিলেই "আপনি আপনি" ভাবের, পরম পদের, আপনার অপরিচ্ছিন্ন ভূমাত্মভাবের যেন বিস্মরণ হয়। তখন "স্বয়ং" "অন্যইব"। আপনি আপনিই আছি। তথাপি চেত্যতাতে "আমি আর কিছু যেন" এই উল্লাস হয়। শ্রুতি বলেন, সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। তিনি কামনা করেন বহু হইব। বহু প্রজারূপে ভাসিব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

চেত্যতার অর্থ হইতেছে এই। চেত ঈক্ষণাত্মিকা বৃত্তি। এই বৃত্তির সহিত জড়িত হইয়া সেই চেতনা থাকেন। ঈক্ষণাত্মিকা বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্য অবশ্যই থাকেন। শুদ্ধ বোধ স্বরূপ পরমা সত্তা ঈক্ষণাত্মিক বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যদ্বারা চৈতন্য-প্রধানা হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।

সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা হইলে সমস্ত সৃজ্যবিষয়ে ভাবি নামরূপানুসন্ধান দ্বারা কিছু উহ্যরূপ ও হয় এইরূপ হইয়াই তিনি চেত্যতা প্রাপ্ত যেন হয়েন।

এই যে ভাবি নামরূপানুসন্ধান ইহা তপস্যার ফলে হয়। এই তপস্যা জ্ঞানময়। সর্ব্বশক্তিময় এই পুরুষ আছেন; শক্তির সহিত ইচ্ছা যোগ হইলেই এই সত্যসঙ্কল্প পুরুষে আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে। আর তিনি আপন স্বরূপ ছাড়িয়া "আমি এই" এই অভিমান করিয়া সৃষ্টবিশ্বে প্রবেশ করেন। আমি অন্য, এই উল্লাসের পর "তদন্তর্গত প্রাণধারণোপাধিনা দেহ নিষ্পত্ত্যুত্তর ভাবিবাগভিব্যক্ত্যাধীনত্বাৎ"—সেই উল্লাসের অন্তর্গত প্রাণধারণ উপাধি দ্বারা দেহনিষ্পত্তির পর ভাবি বাক্‌সন্দর্ভের অভিব্যক্তি অধীন হইয়া জীব ভাবপ্রাপ্ত হয়েন।

জ্ঞানশক্তিমাত্র সাধ্য সৃষ্টি এই পর্য্যন্ত। ইহার পরে ক্রিয়াশক্তি সহকৃৎ সৃষ্টি।

ততঃ স জীবশব্দার্থ কলনা কুলতাং গতঃ।

জীবশব্দার্থঃ ক্রিয়া শক্তিপ্রধান প্রাণধৃতিঃ। ক্রিয়াশক্তিপ্রধান প্রাণধারণ যখন্ হয় তখনই জীব ভাব। সেই প্রাণধারণে তাঁহার আকুলতা বা চঞ্চলতা প্রাপ্তি ঘটে।

মনোভবতি ভূতাত্মা মননান্মন্থরী ভবন্।

আত্মা তখন মহামনরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। সঙ্কল্প বিকল্প মননাৎ মন্থরীভবন জাড্যেন মন্দীভবন। মনোভাব হইলে সঙ্কল্প বিকল্প মনন হইতে মন্থরীভাব—জড়ভাবে মিশ্রিত হইয়া তাঁহার মন্দীভাব হয়।

মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।
সুস্থিরাদস্থিরাকার স্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ॥

তেন মনোভাবেন—সেই মনোভাব দ্বারা সেই মহৎ পরমাত্মা হইতে সঙ্কল্পাদি মনোধর্ম্ম তাঁহার হয়। স্থির সমুদ্র তখন অস্থির তরঙ্গাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন।

তৎস্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি নিত্যশঃ।
তেনেত্থমিন্দ্রজালশ্রী র্বিততেয়ং বিতন্যতে॥

তৎস্বয়ং কিনা সমষ্টি মনোভাবাপন্ন হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম অন্যের দ্বারা অবোধিত হইয়াই পূর্ব্ববাসনাবশতঃ বিরাড়্ ভাব অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম সমন্বিত ভুবনাদিভাব নিত্যই সঙ্কল্প করেন। সেই সত্য সঙ্কল্প হইতে এই জগৎলক্ষ্মী ইন্দ্রজালের মত বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

যখন সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে তখন সেই সুস্থির পরম পদই ঈশ্বরভাবে ও জীবভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন ইহাই এখানে বুঝিতে চেষ্টা করা হইল। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্ব অপেক্ষা কঠিন তত্ত্ব আর কিছুই নাই। অথচ ইহা না বুঝিলেও কোন বিষয়ের স্বরূপে পৌঁছান যায় না। সেইজন্য সর্ব্বশাস্ত্রেই কোন না কোনরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করা হইয়াছে। এক দুইবার পড়িয়াই যদি কেহ মনে করেন সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিয়াছি তবে ইহা তাঁহার পক্ষে "বোঝা" মাত্রই হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যায় নিত্যই এই সৃষ্টিতত্ত্বকে সাধনার অঙ্গস্বরূপে আলোচনা করিতে হয়। নিত্যসাধনা কর্ এবং আলোচনা কর—এইরূপ করিলে তবে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। সাধনা-শূন্য পাঠে ইহা ধরা যাইবে না। সৃষ্টিতত্ত্ব বলিতে গিয়া বহু আলোচনা হইয়া গেল কিন্তু অন্য উপায় নাই।

(৩)

সৃষ্টির বিপর্য্যয় যখন হয় তখন এই পরমপদ কি ইহাই এখন দেখিতে হইবে। ইহা অবতার-তত্ত্ব।

সেই মায়াময় ভগবান্ এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সৃজন করিয়া ইহার রক্ষার জন্য প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাদি প্রজাপতি সমূহকে সৃষ্টি করেন। করিয়া

তাঁহাদিগকে বেদোক্ত যজ্ঞদানাদি প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। অতঃপর সনক সনন্দন সনাতনাদিকে উৎপন্ন করিয়া জ্ঞান বৈরাগ্য শমদমাদি লক্ষণযুক্ত নিবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন।

যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু তাহাই ধর্ম্ম। বৈদিক ধর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মটি অজ্ঞানোদ্ভূত জগতের স্থিতির কারণ। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মকে নিবৃত্তিমুখে চালিত করাই সাধনা। নিষ্কামভাবে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম আচরণ করিলেই নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।

শাস্ত্র সর্ব্বত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলেন। দীর্ঘকাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন জীব ইহার বিকার করিয়া ফেলে তখন জীব বহু কামনায় জড়িত হয়। জীব তখন বিবেক বিজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। ইহাতে ধর্ম্ম, অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হয়। অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে আদিকর্ত্তা নারায়ণ জগৎ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন।

এই সময়ে তাঁহার বিরাট দেহ হইতে তিনি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

যিনি অজ, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি অব্যয় আত্মা, সর্ব্বদা স্ব স্ব রূপেই অবস্থিত তিনি যে ভাবে বিশ্বরূপ ধারণ করেন, সেইভাবেই আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াতে অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েন।

অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামিশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামাত্মমায়য়া।

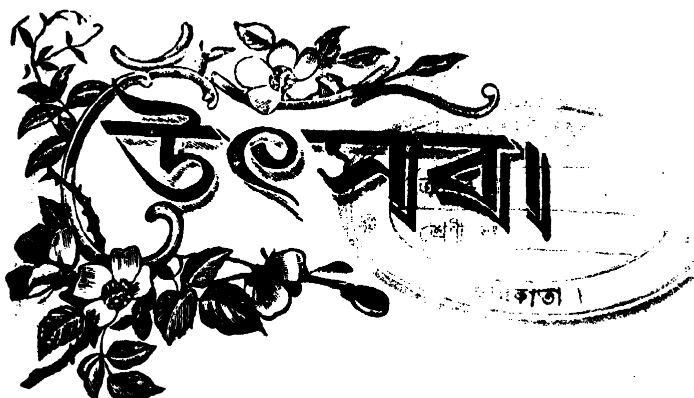
অজ অব্যয় এবং ভূতের ঈশ্বর এই তিন বিশেষণে তিনি যে সমকালে নির্গুণ ও সগুণ ইহাই বলা হইল। ইনি আপন স্বরূপে থাকিয়াও বিশ্ব রক্ষা জন্য অবতার হয়েন, মূর্ত্তিগ্রহণ করেন।

আজকাল লোকে অবতার মানিতে চায় না। তাহাদের যুক্তি এই যে মূর্ত্তি ধরিলে ভগবানকে ক্ষুদ্র করা হয়। মানুষ কি ভগবানকে গড়ে, যে সে ছোট করিবে আর বড় করিবে? "ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া অবতার তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেই কি শাস্ত্র মিথ্যা হইয়া যাইবে? ক্লৃপ ধাতু সামর্থে। শ্রীভগবান অবতার হইবার শক্তি রাখেন।

আগামীবারে সমাপ্য।

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩২২ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ!

শ্রী বিচার চন্দ্রোদয়

পুনর্মুদ্রিত হইয়া আগামী মহাপূজার পূর্ব্বাহ্ণেই প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদকের নিবেদন।

উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক বর্গের শুভ ইচ্ছায় নব বর্ষে নব সঙ্কল্প লইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতরণ করা হইয়াছে। আমরা সকলে কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করিয়া যাইব ফলাফল বিধাতা পুরুষের হাতে। গ্রাহকবর্গের অবগতার্থে নিবেদন করা হইতেছে যে ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক এবং কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ননীলাল রায় চৌধুরী বিষয়কর্ম্ম প্রয়োজনে স্থানান্তর গমন করায় শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ মিত্র ও শ্রীমান্ সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

চিন্ময়ী—মৃণ্ময়ী।

(আগমনী)

মণির ঝলক-প্রায়, ভাসিল লহরী
পরিপূর্ণ নিস্তরঙ্গ শিব-সিন্ধু' পরি ;
লক্ষ লক্ষ জীব শিবে ! করিয়া সৃজন,
খেলিছ মা কত খেলা মিলি দুইজন।
অকালে বোধন তব হইল ত্রেতায়,
ভেঙ্গে গেল যোগনিদ্রা, আপন ইচ্ছায়
অসিতা মূরতি ধরি নাশিলি সন্তানে,
মিশাইতে জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধু সনে।
অকালে বোধন তব হউক আবার,
নেচে নেচে আয় মাগো ! হৃদয়ে আমার,
বিনাশি অজ্ঞানে ব'স হৃদয়-কমলে,
মন বুদ্ধি অহঙ্কার দেই পদমূলে।
মৃণ্ময়ী চিন্ময়-রূপে হেরিতে বাসনা,
সার্থক করিতে মম প্রপঞ্চ-রচনা॥

শ্রীগুরুদাস।

আগমনী।

(১)

আগমনী কি ?

কেন বুঝিতে চাও ?

যদি বুঝিতে পারি তবে সবাই মিলিয়া পূজা করি। আমরা যে সবাই মিলিতে পারি না। কেহ মানে, মানিয়া পূজা করে। কেহ মানে বটে কিন্তু তেমন করিয়া মানে না যে মানায় পূজা না করিয়া থাকা যায় না। আবার কেহ বলে তাঁহার আবার আগমনী অনাগমনী কি ?

সবাই মিলুক, মিলিয়া পূজা করুক এই তোমার ইচ্ছা। সবাই কি মিলিতে পারে ? কোন্ যুগে মিলিয়াছিল ?

'দেবাসুরাঃ হবৈ যত্র সংযতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ' ইত্যাদি। দেবতা ও অসুর উভয়েই একজনের সন্তান। 'উভয়ে দেবাসুরাঃ যত্র সংযতিরে পরস্পরাভিভবায় যুদ্ধং কৃতবন্তঃ।' দেবতা ও অসুর এই উভয় সম্প্রদায়ে যে অভিপ্রায়ে পরস্পর পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। ইত্যাদি

সবাই না মিলে না মিলুক কিন্তু দেবতারা ত মিলিবে ? যাহারা এক দেবতার বংশে জাত তাহারাও যে মিলে না ? ইহাদের মধ্যেও কেহ বলে আগমনী আবার কি, কেহ বলে আগমনী ঠিক। এই বিবাদ কি মিটিবে ?

যাঁহার আগমন তাঁহাকে বুঝেনা বলিয়া লোকে নিজের মনগড়া একটা কিছু করিয়া লইয়া বলে এইটিই তিনি এবং এইটি যিনি না ভজিবেন তাঁহার হইবে না।

এইত বিবাদ। এই বিবাদ মিটিতে এখনও বহু বিলম্ব। দেবভাব জাগিলে তবে ত সবাই মিলিবে। নিজের নিজের কর্ত্তব্য ঠিক মত করিলেই দেবভাব জাগিবে। তখন আগমনীতে বহুমত থাকিবে না।

এখন বল আগমনী কি ?

আকাশ গ্রামে আগমন করিল ইহাতে কি বুঝ ?

আকাশত গ্রামকে ভিতরে বাহিরে ছাইয়া আছে। আকাশের গ্রামে আগমন ইহার ত কোন অর্থ নাই।

সেইরূপ যিনি আকাশের মত সব ব্যাপিয়া আছেন—শুধু তাই কেন যিনি সূক্ষ্ম আকাশকেও ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার আগমনীর কথা

কেহ বলে না ; কিন্তু যিনি বিশ্ব সৃজন করিয়া সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছেন, আবার যিনি ব্যষ্টি সমস্তের ভিতরে বাহিরেও আছেন, যিনি বলেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগতব্যক্তমূর্ত্তিনা" অব্যক্তমূর্ত্তিতে আমার দ্বারাই জগৎ ব্যাপ্ত—সেই অব্যক্তমূর্ত্তি, অন্তর্যামী, সর্ব্বশক্তিমান্ সগুণ ঈশ্বর যিনি, তিনি মায়া-সাহায্যেই অব্যক্তমূর্ত্তি ধারণ করেন। এই বিরাট্ পুরুষই আবার জগতের বিপর্য্যয়-কালে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন জন্মরহিত অব্যয়াত্মা সর্ব্বজীবের ঈশ্বর হইয়াও আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন ; এবং ইনিই আত্মমায়া দ্বারা মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী হইয়া দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতার সাহায্য করেন। অব্যক্তমূর্ত্তি হইতে ব্যক্তমূর্ত্তিতে যে আগমন তাহারই নাম আগমনী।

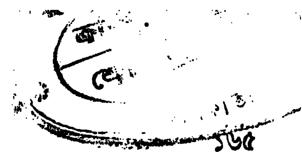
(২)

সে ডাকিলে আর থাকা যায় না। সে ডাকে কখন ? যখন তুমি ডাকিতে ডাকিতে সারা হও তখন। দেবভাব যার জাগে সেই ডাকিতে ডাকিতে সারা হয়। দেবভাব জাগে কখন ? যখন জীব বিশ্বাসী হয় আর প্রবল বিশ্বাসে সেবাটিকেই প্রথম প্রথম জীবনের ব্রত করিয়া ফেলে।

ডাকা আর সেবা এই দুইটি জগতের সার বস্তু। এমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই আর হইতেও পারে না। জগতের যত ভাল লোক এই দুইটি লইয়াই থাকিতে ইচ্ছুক। কেহ ডাকাকে, কেহ বা সেবাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু পৃথক্‌ভাবে এই দুইটি লইলে দুইটিই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ডাক আর সেবা কর, এ সেবা ঠিক, এ ডাকাও ঠিক। এই সেবায় 'যাঁরে ডাকি তাঁরই সেবা করি'। যে নামে ডাকি সেই নাম মূর্ত্তি ধরিয়া মায়ার আবরণে স্বরূপ ঢাকিয়া অন্যরূপ হইয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। মায়িক রূপের কোলে কোলে স্বরূপের প্রকাশ আছে। এইটি বুঝিয়া, এইটি বিশ্বাস করিয়া, সেবা কালে নিজের ক্লেশকে অগ্রাহ্য করিয়া আনন্দে সেবা কর। বুঝ,—বিশ্বাস করিয়া সেবা কর। আপনা হইতে নিজের ক্লেশ অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। ক্লেশ বলিয়া কোন কিছুর ভাবনাও হইবে না। তাই বলিতেছিলাম ডাকার সঙ্গে যে সেবা সেই সেবাই ঠিক। ইহাতে মনে হইবে না কত কষ্ট করিতেছি। ইহাতে লোকের কাছে বলিতে ইচ্ছা হইবে না আমি সমস্ত দিন না খাইয়া জলে ভিজিয়া এই সেবা-কার্য্য করিতেছি। সেবা করিয়া যখন নিজের পরিশ্রমের কথা, নিজের ক্লেশের কথা অন্যকে বল তখন তোমার সেবা ঠিক হয় নাই,—সেবা করিয়া নিজানন্দে তোমার প্রাণ ভরিয়া

যায় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় তোমার সেবাতে, যাঁরে ডাক তার সেবা হয় নাই। তোমার কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোন ক্ষুদ্র অভিলাষ পূরণের জন্য তুমি সেবা-ব্রত লইয়াছ। এটা দোষের। এটা বর্জ্জন কর। ডাকার সঙ্গে সেবা কর। সেই জন্য ডাকার অভ্যাসটি ভাল রূপে করিয়া ফেল। তিন বেলা নিত্যক্রিয়ায় ডাকা অভ্যাস কর আর ব্যবহারিক জগতের কার্য্যে ডাকিতে ডাকিতে সেবার আনন্দ পাইতে থাক। আপন চিত্তের প্রসন্নতা দ্বারাই এ আনন্দ অনুভূত হইবে।

একদিকে যেমন ডাকিতে ডাকিতে সেবা না করিলে তোমার মানুষ হওয়া হয় না, সেইরূপ সেবা শূন্য যে ডাকা তাহাতেও ঠিক ডাকা হয় না। যাঁরে ডাক তিনি যেমন তোমার হৃদয়ে, সেইরূপ সকলের হৃদয়ে আছেন। মানুষকে—শুধু মানুষকে কেন তাঁর সৃষ্ট কোন জীবজন্তুকে, এমন কি বৃক্ষ লতাকেও যখন অবমাননা কর তখন তোমার ডাকা ক্ষুদ্র কোন মনগড়া বস্তুকেই ডাকা হয়। তুমি ডাকিতেছ আর তোমার সম্মুখে তোমরই আপনার জন সকল হাহাকার করিতেছে। তোমার একটু সাহায্য পাইলে ইহাদের পরম উপকার হয়। তুমি মনে ভাবিতেছ ধর্ম্ম করিব, না ইহাদের জন্য খাটিব? তুমি পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গিয়া ধর্ম্ম কথা ছড়াইয়া সাধনা করিতে লাগিলে, ইহাতে তোমার আশ্রম-ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া গেল। তুমি মিথ্যাচারী হইলে। তুমি কপট হইলে। হইলে কিনা নিজেই দেখ। নিজের হৃদয় দেখিলেই বুঝিবে। শান্তি কিছুতেই পাইবে না। তাই বলা হয়, যে অবস্থায় আছ, "খাম খেয়ালে" পড়িয়া ওরূপ ভাবে অবস্থা বদলাইতে চেষ্টা করিয়া প্রতারক হইও না। যে অবস্থায় আছ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া—তাহাই তোমার পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের ফলে ঈশ্বর কর্তৃক তোমার জন্য আনীত এইরূপ মনে ভাবিয়া সেই অবস্থাকে ঈশ্বরের স্নেহের দান মনে করিয়া—উহারই উন্নতি করিতে চেষ্টা কর। গত বিষয়ের চিন্তা করিও না। ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবিও না। বর্ত্তমান সময় যে টুকু পাইয়াছ তাহা শাস্ত্রমত ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর, দুঃখ সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, সময় নষ্ট করিও না তোমার ভাল হইবেই। ভগবান তোমার কর্ত্তব্য পরায়ণতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে তোমার অনভিলষিত বহু কর্ম্ম হইতে ধীরে ধীরে দূরে লইয়া যাইবেন এবং তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবেন। তাঁর আজ্ঞা মত চলিতে যে প্রাণপণ করে তার দিকে কি তিনি কৃপাদৃষ্টি করেন না? তাই বলি স্বধর্ম্মে থাকিয়া সময়ের যথার্থ ব্যবহার শিক্ষা কর। দুঃখ সহ্য কর।



তিন বেলা ডাক। অন্য সময়ে ডাকিতে ডাকিতে গৃহস্থালী কর। গৃহস্থালী করিবার অবসর কালেও ডাক। ডাকিতে ডাকিতে দুঃখীর সেবায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেছি ভাবনা করিয়া ধীরে ধীরে সংসার-পথে চলিতে থাক। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মেও অবহেলা হইবে না, ধর্ম্ম কর্ম্মও নষ্ট হইবে না। ধীরে ধীরে তোমার ভক্তি বাড়িয়া যাইবে। তখন তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে। রাগদ্বেষ থাকিবে না। শত্রু মিত্রে সমান ভাব দাঁড়াইবে। তখন তুমি নিষ্কাম কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিবে। কর্ম্মজা-সিদ্ধির পরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি জ্ঞানী হইবে। অনাসক্ত ভাবে সব করিয়াও কর্ম্মে বদ্ধ হইবে না। তাই বলিতেছিলাম সেবা কর্ম্মেও ডাকা হয়। তাই বলি ডাকিতে ডাকিতে সারা হও। হইলেই তাঁর ডাক শুনিতে পাইবে।

শ্রীমতী ডাকিতেন। ডাকিতে ডাকিতে সারা হইতেন। আর শুনিতেন সে ডাকিতেছে। তাই সাধক বলেন "রাধিকার হৃদয় মাঝে বাঁশীবাজে জয়রাধে শ্রীরাধে বলি।" তুমিও যখন শুনিবে তোমার নির্ম্মল "হৃদয় মাঝে বাঁশীবাজে" তখন তুমি কি হইয়া যাইবে তাহা আর বলিয়া কি হইবে? শুন গান কি বলে।

শুন ঐ গোচারণে গহন বনে বাজিল মোহন মুরলী।
শুনে সেই মোহন বেণু, চলে ধেনু, মীন চলে মুখ তুলি;
রাখাল মণ্ডলী মাঝে—রাখাল মণ্ডলী মাঝে,
মোহন সাজে নাচে কানু বনমালী॥
যশোদা ভাবে মনে বেণু শুনে বাঁশী ডাকে মা মা বলি;
রাধিকার হৃদয় মাঝে—রাধিকার হৃদয় মাঝে
বাঁশী বাজে জয় রাধে শ্রীরাধে বলি।
জটিলার মনও যেমন বাঁশীও তেমন রসে করে রস কেলি;
ডেকে কয় কুটিলারে—ডেকে কয় কুটিলারে
বাঁশীর স্বরে কালা দিল কুলে কালি॥
কাঁঙ্গাল কয় বাঁশীর স্বরে ধেনু ফিরে মন কেন তুই না ফিরিলি
ফিকির কয় বাঁশীর স্বরে—ফিকির কয় বাঁশীর স্বরে
উদাস করে বাঁশী কেন নিদয় হলি—
নিকটে না ডেকে নিয়ে, বাঁশী কেন নিদয় হলি॥

চণ্ডীর পাহাড়ে প্রভাত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত যেমন, এখন আর তেমনটি নাই। বর্ষা-স্নাত হইয়া পর্ব্বত ও বন নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে। তুমিও এখানে আসিয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে পার। সুখ পাইবে। সূর্য্যদেব গৌরি-শঙ্করে কিরণ বর্ষণ করিলেন। হিমমণ্ডিত গৌরিশঙ্কর প্রাতঃসূর্য্য কিরণে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। চণ্ডীর পাহাড় হইতে এক এক কালে ইহা দেখা যায়। একটু বেলা হইলে যখন বরফ গলিতে থাকে তখন গৌরিশঙ্করে শত শত চূড়া বাহির হয়। এ সব চূড়া কিসের? গৌরিশঙ্করে কি কোন রাজভবন আছে? আছে কি নাই কে বলিবে? আমরা শুনি ওখানে হিমালয় রাজপুরী।

এই সেই রাজপুরীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। চারিদিকে পর্ব্বতমালা। এখানে বৃক্ষ লতা কি অপূর্ব্ব। এখানে ফলফুল শুষ্ক হয় না। পাখীর শব্দ এখানে কত মিষ্ট। এইখানে কি জানি কি জড়ান আছে। চল স্থানটিতে যাই চল। উপরে নীল আকাশ বড় প্রশান্ত। আর আকাশের তলে এই উচ্চ স্থান। নীচে গঙ্গা পন্নগ বধূর ন্যায় কত রঙ্গে ভঙ্গে হিমালয়ের শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া ছুটিয়াছে। এবং গোমুখী দিয়া বাহির হইয়া আরও নীচে চলিয়াছে।

হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখরের যে স্থান হইতে ভূভৃত-কন্দর বিদারিণী গঙ্গা প্রচণ্ড-বেগে স্খলিত হইতেছেন, যাঁহার পুলিনাঙ্গনে মত্ত ময়ূর ময়ূরী আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা দেখিতে, আর গঙ্গার কল্লোল কোলাহল শ্রবণ করিতে রাজপুরীর প্রমদারা কতদিন এখানে আসিতেন। আজ এখানে কেহই নাই। নিকটে সেই স্ফটিকশিলা। শিলাতলে এক রমণী। রমণী কি মূর্চ্ছিতা? কেশপাশ আলুথালু। সুন্দর অবদাত তনু, রুচির মুখমণ্ডল, অঙ্গের আভরণ দেখিয়া মনে হয় ইনি এই রাজকুলের প্রধানা অন্তঃপুরচারিণী, ইনি একাকিনী এখানে কেন? সঙ্গে ত কেহ নাই? এই একান্ত মণ্ডপ শিলাতলে ইনি মূর্চ্ছিতা কিরূপে? এ কথা পরে বলা হইতেছে।

(৪)

কৈলাস পর্ব্বতের শিখরদেশে যে রবি-শত-বিমলমন্দির, সেই মন্দিরের আরও ঊর্দ্ধে সর্ব্বোচ্চ শিখর। সে স্থানের চারিধারে বিল্ববৃক্ষ-রাজি। তাহার মধ্যে যে নিকুঞ্জ—আজ এক মহাপুরুষ সেখানে দণ্ডায়মান। মৌলিতলে চন্দ্রকলা

কি অপূর্ব্ব জ্যোতি ছড়াইতেছে। "মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং" এই পুরুষ যেন চিন্তামগ্ন। ইনি কি চিন্তা করিতেছেন?

কৈলাসে শরৎ কাল দেখা দিয়াছে। বিমল ব্যোমে আর বিদ্যুৎ বলাহক নাই। এখন রাত্রিকালে রম্য জ্যোৎস্না অম্বরতল, পর্ব্বতগাত্র ও অবনীতল অনুলেপন করিয়া রাখে। বনভূমি হইতে সারসকুল শব্দ করিতে করিতে আকাশ-গাত্রকে যেন জীবন্ত পুষ্পমালায় সজ্জিত করে। বর্ষাকালের যে সকল মেঘ দীর্ঘ গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বারিধারা বর্ষণ করিয়াছিল, আর পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিয়াছিল তাহারা এখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ মেঘমালা দশদিক শ্যামীকৃত করিয়া মদশূন্য মাতঙ্গের ন্যায় শান্তবেগ হইয়া অবস্থান করিতেছে। বায়ু, মেঘ, হস্তী, ময়ূর ও প্রস্রবণ সকলেই প্রশান্ত। মেঘ-নির্ম্মুক্ত-আকাশমণ্ডল এখন কত সুন্দর। আর সান্ধ্য-গগনে শতরঙ্গে মেঘের খেলা কত মনোহর। অনুরাগিণী নায়িকা নায়কের কোমল করস্পর্শে প্রীতিবশত নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করিয়া যেমন শিথিল ভাব ধারণ করে সেইরূপ এখনকার লোহিতবর্ণা সন্ধ্যা সুন্দর-চন্দ্র-কর-স্পর্শে প্রেমোৎফুল্লা হইয়া নয়নতারা রূপ তারকা সকল ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং বস্ত্র রূপ অম্বরতল যেন পরিত্যাগ করিতেছে। নদী তড়াগের জল নির্ম্মল হইয়াছে। পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের শোভা বিস্তার করিতেছে। চারিদিকে যেন কাহার অঙ্গকান্তি মাখিয়া শেফালিকা গন্ধ বিস্তার করিতে করিতে কাহার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছে।

মহাপুরুষ অন্তরীক্ষ মণ্ডল দেখিতে দেখিতে ইহা যেন কাহারও নাভিদেশ মনে ভাবিয়া ঊর্দ্ধে যেন তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে একাগ্র হইতেছেন। এমন সময়ে রূপ-প্রভায় দশদিক বিভাসিত করিয়া কে আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রজতগিরি এই মদজলকল্লোল-লোচনা কনক প্রতিমার দিকে চাহিতে চাহিতে কি যেন কি ভিতরে মিলাইয়া লইলেন। নীলাম্ভোজ-দলাভিরাম-নয়না, নীলাম্বরালঙ্কৃতা, গৌরাঙ্গী, শরদিন্দুসুন্দরমুখী, অরুণাধরজিতবিম্বা পার্ব্বতী তখন জ্ঞানময় মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার এই সৌভাগ্য? কে আজ স্মৃতিপটে ভাসিয়াছে?

কে ভাসিতে পারে তুমিই বল?

আর কে? এই যে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সত্যই!

কি দেখিতেছিলে?

দেখিতেছিলাম—যাহা দেখিলাম সেই এই।

শুনিতে কি পাই না?

শুন। এমন সুন্দর আর কে আছে—যাহাকে দেখিতেছি সে তুমিই!

দ্যৌর্মূর্দ্ধি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তৌষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্যমাকাশমুদরং, নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজপত্যং, কৈলাসমলয়াবূরূ, বিশ্বেদেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্ম্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকালস্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমেষমহোরাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ।

এই যে—এই যাহাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারি না এই যে মাতৃময়ী, রঙ্গময়ী, প্রেমময়ী—ইহাকেই দেখিতেছিলাম। যাঁহার সুন্দর তেজমণ্ডিত মস্তক স্বর্গলোক, ললাট রুদ্র, ভ্রূদ্বয় মেঘমণ্ডল, চক্ষুদ্বয় চন্দ্র সূর্য্য, কর্ণদ্বয় শুক্রওবৃহস্পতি, নাসিকারন্ধ্র বায়ু, দন্ত ও ওষ্ঠ উভয় সন্ধ্যা, মুখরূপ হোমকুণ্ড অগ্নি, জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা দেশ সাধ্যগণ, স্তনদ্বয় বসুগণ, বাহুদ্বয় মরুদ্গণ, হৃদয় পার্জ্জন্য, উদর আকাশ, নাভি অন্তরীক্ষ, কটিদেশ ইন্দ্র ও অগ্নি, জঘন দেশ প্রজাপতি, কৈলাস ও মলয় পর্ব্বত উরু, বিশ্বদেবগণ জানু, জহ্নু ও কুশিক জঙ্ঘা, পিতৃগণ খুর, বনস্পতিগণ চরণ, মুহূর্ত্ত, গ্রহ, ধূমকেতু, মাস, ঋতু, সন্ধ্যাকাল প্রভৃতি অঙ্গুলি, রোম ও নখ; সংবৎসর যাঁহার আচ্ছাদন; দিন রাত্রি সূর্য্য চন্দ্র যাঁহার নিমেষ সেই আজ এই হইয়া আমার সম্মুখে।

কি তুমি! কে তোমার কথা বলিতে পারে? ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্। এমন আর কোথায় আছে? সত্যই "যথাগ্নির্দেবানাং, ব্রাহ্মণোমনুষ্যাণাং, মেরুঃ শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, বসন্ত ঋতূনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাং এবমসৌ মুখ্যা।

অগ্নি যেমন দেবতাগণের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান, সুমেরু যেমন পর্ব্বতগণের মধ্যে প্রধান, গঙ্গা যেমন নদীগণের মধ্যে প্রধান, বসন্ত যেমন ঋতুগণের মধ্যে প্রধান, ব্রহ্মা যেমন প্রজাপতিগণের মধ্যে প্রধান সেইরূপ এই সকলের মধ্যে প্রধান।

তুমি আজ হিমালয়-রাজ্যে যাইবে—আজ কৈলাসপুরী তমসাচ্ছন্ন হইবে—আর আমি? বল দেখি আমি কি করিব?

আমার ধ্যানে এই চারিদিন যাইবে। চতুর্থ দিন অপরাহ্নে আমাকে আনিতে হইবে।

তাহা আর বলিতে হইবে না। তুমি মেনকা রাণীকে স্মরণ করিয়াছ—দেখিতেছ মেনকা কেমন অবস্থায় আছেন? আর বিলম্ব করিও না।

(৫)

মায়ের কথা স্মরণ করিয়া মা ব্যাকুল হইলেন। মা তখন মাকে দেখিতে—মায়ের পূজা লইতে হিমালয়ে আসিতেছেন। মা আজ পিত্রালয় স্মরণ করিয়াছেন। হিমালয়-রাজ্যের সকলের প্রাণ যেন উদ্বেলিত। কি জানি কার মঙ্গলচ্ছায়া যেন হিমালয়ে পড়িল। কি জানি কেমন করিয়া যেন সকলেই একটা অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির ভাবে উদ্ভাসিত হইল; কি জানি কেমন করিয়া যেন পাখীর স্বর বড় মিষ্ট হইল; কি জানি কেমন করিয়া যেন সংসারী সংসার ভুলিল; কি জানি কেমন করিয়া যেন মুনি ঋষি আত্মভাবে বিভোর হইলেন, কি জানি কেমন করিয়া যেন সাধকের প্রাণ মন মাতিয়া উঠিল। ঐ শুন কে গায়—

ওকার মুরতি রে মন জান না কি উহারে,
ওই ত করেছে এই বিশ্ব রচনা, নৈলে হেন দৃশ্য আঁকিতে বল কে পারে।

দশভূজা দেখে মায়ের ভেবেছ রূপের শেষ,
অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনন্ত বেশ,
অনন্ত প্রেমলোলুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
ক্বচিদাকাশ ক্বচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে॥

ধরেরে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শোনে কথারে;

সহস্র শিরা না হলে, কেবা ওরে অবোধ প্রাণ;
এতই গরবে করে সহস্র ধারায় স্নান,
সহস্র ভাবে বিভোরা সহজ জ্ঞানের অগোচরা,
ওই ত অহরহঃ বাস করে তোমার সহস্রারে॥

অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
কভু কালী রূপে তারা করে ধ'রে করবাল,
কখন বা সীতা হয় মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে।
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গা রূপে এসেছে,
কাল দেখ্‌বে রাধা রূপে শ্যামের বামে বসেছে,
তাই বলি এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,
ধর্‌লে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওঁকারে॥

গানটিতে সাধক ধ্যানের অবস্থাগুলি অল্প কথায় বেশ বলিয়াছেন। রূপটিই অবলম্বন। "গোবিন্দের কাছে দুর্গা রূপে এসেছ"—তার পরেই অন্যরূপও তোমারই রূপ। সীতা, কালী, রাধা তুমিই। শুধু সকল অবতারগুলিই যে তুমি এ বলিলেও ত সব বলা হইল না। তুমি সহস্রারে থাকিয়াও বিশ্বরূপে আছ। বিশ্বরূপে থাকিয়াও "অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল।" জগতের সব কর্ম্ম তুমিই কর। তুমি "চকোরে উড়াও শূন্য পথে দেখায়ে পূর্ণিমার বিধু, আবার ভূতলে ভুলাও ভ্রমরদলে বনফুলে যোগায়ে মধু"—আবার কখন "সূতিকা মন্দিরে শ্যামা আনন্দের প্রদীপ জ্বালো, আবার দেখাস মা পাষাণীর কন্যা শ্মশান-বহ্নির ভীষণ আলো।"—৺ গোবিন্দ চৌধুরী মহাজন। বড় সুন্দর ভাবে মায়ের খেলা বলিয়াছেন। আমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আবার তাঁর গান তুলিলাম।

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতুলি সনে।
সেই জানে তোর খেলার মর্ম্ম যে থাকে সদা তোর ধ্যানে॥
রেখছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে,
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হ'য়ে,
মিছে পৃথক্ ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞান-হীনে॥
ওমা সর্ব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল,
আবার ভার্য্যা রূপে ব্রহ্মময়ি! তুমি প্রণয়ের খেলা খেল,
তুমি শিশু মূরতি হ'য়ে আলো কর সূতিকা গৃহ,
আবার খেলিয়ে নানা খেলা অন্তে শ্মশানে লুকাও সেই দেহ
মিছে মায়া-ভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে॥

ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী,
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী,
কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্পশয্যায় শয়ন করি,
কেউ বা গাছের তলায় তৃণ শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী,
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে॥

ওমা কেমন মহামায়া তোমার পায় না বিধি বিষ্ণু ভেবে
শ্মশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোমার মায়া-প্রভাবে।
আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতয়াত কর বারম্বার,
আবার নিজে বুঝনা নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ার বিকার,
সে মহামায়া দ্বিজ গোবিন্দে বুঝিবে কেমনে॥

রূপ, গুণ, কর্ম্ম বা লীলা এই সকলে তোমার ধ্যান হয়। আবার স্বরূপের স্থিতি ধ্যানে বুঝা যায় "তাই বলি এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া, ধর্‌লে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওঁকারে॥" এইটি শেষ ধ্যান। তাই বলি কর্ম্ম কর—নিত্য কর্ম্ম তিন বেলায় তাঁর প্রসন্নতার জন্য কর। আবার ব্যবহারিক সেবায় ডাকাটা পাকা কর, ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তি পাকা হইবে। এইরূপে কর্ম্মজা সিদ্ধি আসিবে। তার পরে নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিতে জ্ঞান এবং জ্ঞানেই স্থিতি। ইহাতেই সর্ব্ব দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে।

(৬)

স্থূলে আসিবার বহুপূর্ব্বে সূক্ষ্মে আসা হয়। প্রবল আসক্তির সহিত যে যাহাকে চিন্তা করে সে তাহার কাছে সূক্ষ্ম দেহে আসে। যে চিন্তা করে সে ত ভাবনা-চক্ষে দেখিতে পায় যে তাহার প্রিয় ব্যক্তি কি করিতেছে, কি ভাবে আছে। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তি যদি আসক্ত ব্যক্তির চিন্তা না করে তথনও তাহার মনোরাজ্যে আসক্ত ব্যক্তি, সূক্ষ্মদেহে—ভাবনার দেহে, থাকে। কিন্তু নানা কার্য্যে নানা ভাবনায় ঐ ব্যক্তি ব্যাপৃত বলিয়া উহার মন দণ্ডে দণ্ডে বহু সঙ্কল্প-স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। বহুস্পন্দনে মত্ত থাকে বলিয়া মন সেই আসক্ত ব্যক্তির ভাবনা ধরিতে পারেনা। কিন্তু যখন নিদ্রাকালে স্থূল জগতের চিন্তা থাকেনা তখন স্বপ্নে আসক্ত ব্যক্তির উগ্রচিন্তা তাহার মনের মধ্যে প্রস্ফুট হইয়া স্বপ্নাকারে দেখা দেয়। তাই স্বপ্নে আমরা আসক্ত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখি।

আবার প্রিয় ব্যক্তি যদি ঈশ্বর চিন্তা লইয়া থাকেন তবে জাগ্রত অবস্থাতেও ঈশ্বরচিন্তার বিরামকালে তিনি আসক্ত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখেন, আসক্ত ব্যক্তির কথা শুনেন। তিনি বলিয়াও থাকেন অমুক আমাকে এই সময়ে উগ্রচিন্তা করিতেছে।

তারপর আসক্ত ব্যক্তির যিনি প্রিয় তিনিও যদি আসক্ত ব্যক্তির উপরে আসক্ত থাকেন অর্থাৎ যদি উভয়ে উভয়ের উপর সমান ভাবে আসক্ত থাকেন আর উভয়ের আসক্তিতে কোন কপটতা না থাকে তবে স্থূল দেহ বহু দূর দূরান্তরে থাকিলেও ইঁহারা ভাবনা-ময় দেহে সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা কহেন। এই মিলন অকপট ভাবে হইলে স্থূল দেহেও ইহার কার্য্য হয়। কখন অশ্রু, কখন পুলক, কখন হাসি, কখন মান অভিমান, কত রকম হইতে থাকে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্তি অতি দুর্লভ বস্তু। কিন্তু সাধারণ ভাবের আসক্তি যখন সময়ে সময়ে উগ্রচিন্তায় প্রবলতা লাভ করে তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের জন্য একটা ব্যাকুলতা তুলে। তাহার পর অন্যচিন্তা উঠিলেই ব্যাকুলতা কমিয়া যায়। তবেই দেখা যায় অন্য অভিলাষ ছাড়িতে পারিলেই প্রিয় ব্যক্তির সহিত সূক্ষ্ম ভাবে মিলন হয়। প্রথমে আসক্তি থাকিলেও "একতরফা" এই আসক্তিতে যদি কপটতা না থাকে, যদি এই আসক্তি সেই একটি লইয়াই স্ফুরিত হয়, যদি তাহার প্রিয় ব্যক্তিতেই ইহা নিরন্তর মগ্ন থাকে তবে তাহার প্রিয় আসক্ত ব্যক্তির নিকটে ঈশ্বর-মূর্ত্তি ধারণ করে। সর্ব্ব অভিলাষ ত্যাগ করিয়া যাহার ভজনা করিবে তাহাই শ্রীভগবান হইয়া যাইবে। কারণ তিনি ত সর্ব্বত্রই আছেন। আমরা একাগ্র হইতে পারি না বলিয়া, আমরা অন্য অভিলাষ ছাড়িতে পারি না বলিয়া তাঁহাকে পাই না। মানুষে মানুষে অনুরাগ জন্মিলে সে অনুরাগ যে স্থায়ী হয় না, তাঁহার কারণ অনেক থাকে। অনুরাগ প্রথমে প্রবল ভাবেই আসে। প্রথম অনুরাগে সবই সুন্দর। তাহাতে কোন দোষ থাকে না। ক্রমে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা আসিয়া সংশয় তুলে। মানুষ কি কখন ভগবান্ হয়? ইনিও ত অন্য সাধারণের মত সুখে দুঃখে, রাগ-দ্বেষে ব্যাকুল হন। না—না—ইনি শ্রীভগবান হইবেন কি রূপে? ইহা অসম্ভব। ইঁহারও আধি-ব্যাধি দেখা যায়, ইঁহারও সংসার-আসক্তি দেখা যায়, ইঁহারও মান-অপমান বোধ দেখা যায়; ইঁহারও আহার নিদ্রা ভয় ইত্যাদি দেখা যায়—এই সব যখন মনে উঠিতে থাকে তখন মনে হয় মানুষের ঈশ্বর হওয়া অসম্ভব। ইনি ঈশ্বর

নহেন ইনি মানুষ, তখন এইরূপ বিপরীত ভাবনা হইয়া যায়। এই যখন হয় তখন অনুরাগ আর রাখা যায় না। তাই বলিতে ছিলাম যে মুহূর্ত্তে অনুরাগের বস্তুতে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনায় দোষ দর্শন হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই অনুরাগ দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু আবার যখন তাহার গুণ দেখিয়া অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা ক্ষণকালের জন্যও অন্তর্দ্ধিত হইল তখন আবার অনুরাগ জাগিল। পূর্ব্বকৃত অবিশ্বাসের জন্য মন তখন বড়ই অনুতাপ করিল। আবার উগ্রভাবে ভজন চলিল। আবার যখন দোষ-দৃষ্টি জাগিল আবার তখন অবিশ্বাস আসিল। এই ভাগে অনুরাগের খেলা সাধারণ জীবেও হয়।

(৭)

উমার মহেশ্বর আছেন। মহেশ্বরের কাছে থাকিলে উমার কিছুই মনে থাকে না। গিরিরাণীর কিন্তু উমা ভিন্ন কেহ নাই। গিরিরাণী সর্ব্বদাই গিরিজার চিন্তা লইয়া থাকেন। এই শরৎ কালে উমার সহিত মিলন হইয়াছিল বলিয়া—এই কালের সকল বস্তুই উমার কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে। উমার রূপ, উমার গুণ, উমার কার্য্য, উমার স্বরূপ—এক কথায় উমার ধ্যান, উমার সম্বন্ধে উগ্রচিন্তা রাণীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই সময়ে আর কিছুই ত ভাল লাগে না। রাজপ্রাসাদ ভাল লাগে না, লোক জন ভাল লাগে না। শুধুই যে ভাল লাগে না তাহা নহে। "অব্ সব বিষসম লাগই" এখন সব বিষের মত লাগিতেছে। তাই রাণী হিমালয়-রাজ্যের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভরা একান্ত স্থানে আসিয়াছেন। আসিয়া যাহা দেখেন তাহাতেই উমার স্মৃতি প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। মনে মনে উমার কথা ভাবিতে ভাবিতে অভিভূত হইয়া রাণী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মেনকারাণী সুমেরুর কন্যা।

মহাদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উমা মাতার কাছে আসিতেছেন। দেহ আসিবার বহু পূর্ব্বে ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ আসিয়াছে। রাণী স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। রাণী উঠিয়া বসিলেন আর দেখিলেন সম্মুখে রাজা হিমালয়। রাণীর প্রাণ ব্যাকুল। রাণী চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে উমার স্ফুরণ দেখিতেছেন। পুষ্পগন্ধে উমার দেহের গন্ধ পাইতেছেন; শেফালিকা ফুলে উমার রূপ দেখিতেছেন; প্রস্ফুটিত কমলে কমলবাসিনীর জলভরা চক্ষু দেখিতেছেন; আকাশে নানাবর্ণের মেঘের খেলায় উমার চঞ্চল

বসন দেখিতেছেন। রাণী থাকিতে পারেন না—কাঁদিতেছেন। আর গিরিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন। বলিতেছেন—

গিরি ! গৌরী আমার এল কৈ ?
ঐ যে সবাই এসে, দাঁড়ায়েছে হেসে
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই।

সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি
কৈ গিরি আমার কৈ শশি-মুখী ;
শেফালিকা এল উমার বর্ণমাখি
বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী।

নির্ঝরিণীর জল, হল নিরমল
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল
শতদল বাসিনী কোথায় আমার বল
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে কেবল তারা নাই।

শরতের বায়ু যখন লাগে গায়
উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখা দায়
যাও যাও গিরি আনগে উমায়
উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই।

গিরিরাজ ব্যাকুল হইয়াছেন ; সান্ত্বনা দিতেছেন, বলিতেছেন রাণি ! এত উতলা হইও না। একবার মহাদেবের কথা মনে ভাব। সমুদ্র মন্থনে সংসার-ধ্বংসকারী অনল রাশির কথা মনে কর। নীলকণ্ঠ কণ্ঠে বিষধারণ করিয়া আছেন। বিষের জ্বালা বড় জ্বালা, শৈলাধিরাজ তনয়া ! আহা কত শীতল। মায়ের আমার শীতলতা স্পর্শে দেবাদি-দেব বিষের জ্বালা ভুলিয়া যান। তাই এক দণ্ড ছাড়িতে পারেন না, সদাই বুকে বুকে রাখেন। তুমি উতলা হইলে চলিবে কেন ? মেনকা কাঁদিতেছেন, বলিতেছেন গিরি ! সুবর্ণ প্রতিমা আমার গৌরী—আর তোমার ভাঙ্গড় ভিখারী জামতা। আমি ত কতবার কাঁদিয়া বলিয়াছিলাম—এই যোগীকে—এই ভাঙ্গড় ভিখারীকে আমার রাজ-দুলারী দিব না। কতইত বলিয়াছিলাম—

যোগিয়াকে সঙ্গ্ না করুঁগি ব্য ম্যায় গৌরী মেরী রাজ-দুলারী।
উয়ৎ যোগিয়া কি ম্যায় জাত না জানু কৌন পিতা কৌন মাহতারী॥
য়হ যোগিয়া হ্যায় ষাট্ বরষ্ কো গৌরী মেরী বালী হ্যায়,
পৈর পদ্ম মাথে চন্দ্রমা কর্ণে কুণ্ডল ভারী॥

পায়ে পদ্ম মাথায় চন্দ্রমা, কর্ণে কুণ্ডল, আহা কি রূপ দেখিলাম! দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম। গৌরীকে দিলাম। এখন আর প্রাণ ধরিতে পারি না।

রাজা আর শুনিতে পারেন না। রাজা উঠিয়া গিয়াছেন। রাণী আবার মূর্চ্ছা গিয়াছেন।

এমন সময়ে চারিদিকে বড় কোলাহল উঠিল। উমার সখারা গিরি-রাণীকে সংবাদ দিতে দৌড়িয়া আসিয়াছে। রাণি! আর কেন শয়ন করিয়া আছ—মা উঠ।

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
যুগল শিশু লয়ে কোলে মা কৈ মা কৈ ব'লে
ঐ এল তোর শশধর-বদনী॥
ত্রিভুবন ধন্যে ত্রিভুবন মান্যে
তোর মেয়ের তুলনা নাই রাণী
এমন রূপ দেখি নাই কার হরে মনের অন্ধকার
নাশ করে তোর হর-মন-মোহিনী।
ধরলি যে রত্ন উদরে তোর মত সংসারে
রত্ন-গর্ভা এমন নাই গো রাণী
আমরা ভাব্তাম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে
উমা নাকি ভবের ভয় হারিণী॥

"উমা নাকি ভবের ভয় হারিণী" বলিতে বলিতে পাঁচ সাত সখী রাণীর নিকটে আসিল। রাণী স্বপ্নে আবার উমাকে পাইয়াছিলেন পাইয়া স্বপ্নেই কতকি বলিতেছিলেন। বলিতেছিলেন—

ওমা মনে পড়ে এত দিনে।
এলি মা ভবনে
ওমা পিতা মাতা আকুল তব দরশন বিনে।

কুশল বল মা শুনি জুড়াক তাপিত প্রাণী,
কোলে আয় মা ভবরাণী,
মা ব'লে বদনে।

অকস্মাৎ সখীদিগের কোলাহল রাণীর কর্ণে গেল। রাণীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। এমন সময়ে জয় জয় শব্দে চারিদিক আপূরিত হইল। গুহ গজাননকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উমা দ্রুতপদে মায়ের দিকে আসিতেছেন। মনে জানেন মায়ের অভিমান হইয়াছে। তখন বিশ্ববিমোহিনী মায়ের অভিমানের উপরে নিজের অভিমান জাগাইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। আর চারিদিকে সকলে উমার জয়ধ্বনি করিতেছে।

উমা এল এল জয়ধ্বনী গিরিরাণী শুনিয়ে।
অমনি এলোকেশে ধায় পাগলিনীর প্রায়
উমার জয় বলিয়ে।
উমা দুবাহু পসারি মায়ের গলে ধরি
অভিমানে ভাসে নয়ন-জলে।

কৈ মেয়ে বলে তত্ত্ব ক'রে ছিলে
নিতান্ত মা আমার পাস্থরে ছিলে॥

ওমা কৈলাসেতে সবে আমায় কয়
আই আই তোর কি মা নাই
শুনে সরমে মরে যাই
বলি আমার পিতে এসে ছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে॥

ও মা শ্বশুর শাশুড়ী নাহিক যার
বল কেবা আদর করে তার,
আমি থাকি ধরাসনে মনের অভিমানে
আমার বলে আমায় ধ'রে কে তোলে।

কি অপূর্ব্ব হইল। মা মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছেন। মেনকার চক্ষে অবিরল জলধারা। মেনকা উমার চক্ষের জল মুছাইতেছেন। এমন সময়ে গুহ

গজানন আসিল। মেনকা গুহ গজাননকে কোলে লইয়া উপবেশন করিলেন। উমা মায়ের নিকটে বসিয়াছেন। আর চারিদিকে উমার সখীগণ জয়ধ্বনি করিতেছে—গিরিরাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই দৃশ্য জয়যুক্ত হউক।

গুহ গজানন রাজার নিকটে দৌড়িয়া গিয়াছেন। রাণী উমাকে কোলে লইয়া বসিয়াছেন আর কতই দুঃখের কথা বলিতেছেন। উমা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছেন—বুঝিবা শিব নিন্দা আবার হয়। রাণী বলিতেছেন,—

কেমন ক'রে হরের ঘরে ছিলি উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কতই বলে শুনে লাজে মরে যাই।

শুনতে পাই মা পরে পরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
তুই নাকি মা হরের সঙ্গে
সোণার অঙ্গে মাখিস্ ছাই।

উমা বিপত্তি গণিতেছেন। আর তুমি জননি! তোমার উমা যদি স্বামীগত-প্রাণা হয় তবে তুমি কেন মেয়ের কাছে মেয়ের স্বামীর নিন্দা কর? উমা বিপত্তি গণিয়া স্বামীর আদরের কথা তুলিলেন। ভোলা যে তাঁর জন্যই পাগল তাহাই বলিতে লাগিলেন। সে যে আসিবার সময় নয়নজলে ভাসিয়া গিয়াছিল তাহাই বলিতে লাগিলেন। একটু চাপ দিয়া বলিতে লাগিলেন,—

তুমিত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই,
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানেনা মা আমা বই।

দিতে হয় মা মুখে তুলে, না হয় খেতে যায় মা ভুলে
ভোলার কথা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি নই।

ভুলিয়ে যখন এলাম চ'লে, ভেসে গেল নয়ন জলে
একলা পাছে যায় মা চ'লে আপন হারা এমন কৈ।

উমার গদ্ গদ্ ভাবে রাণী বুঝিতেছেন উমা বড় সুখে আছে। তবু বলিতেছেন মা তোর এত সুখ তবে বল দেখি তোর সোণার অঙ্গ এমন কেন হইল? তোর অঙ্গের আভরণ কোথায় গেল?

উমা তখন নিজের অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া হাসিলেন।

হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা! আমিই কেবল অলঙ্কারের অহঙ্কার করিতে পারি। যে স্বামীর আদর পায়, স্বামীর আদরই যার আভরণ, তার আবার অন্য-আভরণের কি প্রয়োজন মা? মা আমার কত সুখ, কত সুখের আভরণ আমি পরি মা তাহা কি না বলিলে তুমি বুঝিবে? শুন মা আমার কত আভরণ।

নাই আভরণ এমন কথা মুখে এননা মা আর।
আমি কেবল কর্‌তে পারি মা অলঙ্কারের অহঙ্কার॥

এ জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার-সাজান থাল,
প্রাতর্মধ্য-সায়ংকালে পরায়ে দেয় স্বয়ং কাল;
আবার নিশা কালে ব'দলে পরায়
তাতে আলো আঁধার দুই দেখা যায়,
বল মা তবে কার মা ভবে আছে এমন অলঙ্কার॥

কে বলে মা তোমার উমার অলঙ্কারের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির তড়িতের সুতায় গাঁথা তারার ফুল,
প'রে থাকি তাই মা বলি ইন্দ্র ধনুর একাবলী
তা বৈ বৈজয়ন্তী কি মা পর্‌বে বৈজয়ন্তীর হার॥

জীবের জীবন নাসার নোলক তা ত জানে সর্ব্বজন,
পদ্ম-পত্র-জলের মতন দোলে যে তা সর্ব্বক্ষণ।
জ্ঞান সমুদ্রের মহা রতন, উপনিষৎ (আমার) কর্ণভূষণ
মুকুট আমার সদানন্দ নাশেন ভবের অন্ধকার।

বরাভয় মোর হাতের বলয়, তা ত সবার জানা কথা,
(আমি) করুণার কঙ্কণ পরি মুক্তি-ফলে মালা গাঁথা;
মায়া যন্ত্রে কায়া ঢাকি, সদা সঙ্গোপনে থাকি
নিতম্বে সতত পরি সপ্ত সিন্ধুর চন্দ্রহার॥

অষ্টসিদ্ধির নুপুর পরি তাইতে বেশী অনুরাগ,
পুণ্যগন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ,
ব্রহ্মা আমার অলক্তের জল, কেশব আমার চক্ষের কাজল;
কালানল তাম্বুল আমি চর্ব্বণ করি বারম্বার॥

গোবিন্দ দেখেছে মাগো সুধাইলে ব'লবে সেই,
বাছা বাছা কাঁচা মেঘের আমলা বেটে মাথায় দেই ;
পোহাইলে বিভাবরী শিশু-সূর্য্যের সিন্দুর পরি ;
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥

মা ও মেয়ের কত কথাই হইল। এ কথার অন্ত নাই। তাই বলিতেছিলাম কত বৎসরইত পূজা আসিল, পূজা গেল। কিন্তু মাকে ঠিক করিয়া একটু কি বুঝা হইল? বিদ্মহে কি হইল? যদি "বিদ্মহে"তেই গোল থাকিয়া যায় তবে কি "ধীমহি" হয়? আর "ধীমহি" যদি না হয় তবে কি তিনিই সব করিতেছেন, তিনিই সবার প্রেরণা করিতেছেন, তিনিই আত্মারূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন, আবার বিশ্বরূপে সারা জগৎ ছাইয়া ভিতরে বাহিরে তিনিই আছেন, আর বিশ্ব লয় করিয়া তিনিই "আপনি আপনি" থাকেন ইহা কি ধরা যায়? শ্রুতি যে বলেন—

যঃ পৃথিব্যা তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো
যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং
যং পৃথিবামন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

এই শ্রুতি বাক্যে যাঁহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তিনিই যে এই পৃথিবীর দুঃখের সময়ে, পৃথিবীর বিপর্য্যয়-কালে, ধর্ম্মের গ্লানী ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান-সময়ে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন ইহা বুঝিতে কি তখন কষ্ট হয়? তাই বলিতেছিলাম যখন সৃষ্টি থাকে না তখন যিনি "আপনি আপনি",—যখন সৃষ্টি ভাসে তখন তিনিই সর্ব্ববস্তুর অন্তরে বাহিরে অন্তর্যামিনীরূপে এবং ব্যষ্টিজগতে প্রতি জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজমানা—তিনিই আবার দেবাসুরের বিবাদ মিটাইবার জন্য কখন দুর্গা কখন কালী কখন রাম কখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণা—এই রূপে "বিদ্মহে" করিলে আর ত আমাদের কোন গোল থাকে না। তখন ত আমাদের দেশ জুড়িয়া এক মায়েরই পূজা হয়। তাই পূজার দিনে আমাদের সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া এস সকলে একবার এই মায়ের পূজা করি।

ঐ শুন বিল্ববরণের বাজানা বাজিয়া উঠিল। ঐ দেখ মা বিল্বমূলে দাঁড়াইয়া আছেন। এস এস মাকে বরণ করিয়া লই এস। আর 'জটাজূটসমাযুক্তাং' এর সঙ্গে মাকে আত্মারূপে, বিশ্বরূপিণী রূপে এবং "আপনি আপনি" রূপে বিদ্মহে

করিয়া ঠিক ঠিক ধীমহি করি এস। তবেই "প্রচোদয়াৎ" বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইয়া যাইব।

আত্ম নিবেদন।

নিত্য কর্ম্মটি যথাসময়ে করিবার জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে ভুলিওনা। ভোলা মামা তুমি। চিন্তারাম চাপরাশী ছাড়া তুমি চলিতে পার না। "তক্তি আঁটা" চাপরাশী সঙ্গে না থাকিলে তোমার সম্ভ্রম—সম্যক্ ভ্রমটি রক্ষা হয় না। তা যা কর, কর; কিন্তু যথা সময়ে কর্ম্ম করিতে ভুলিও না। প্রাতঃকালে যে শয্যাকৃত্য কর তাহাতেই সর্ব্বাগ্রে মনের সন্ধান লও। মন তমোভাবে থাকিলে মৃত্যুচিন্তা কর আর রজোভাবে থাকিলে আত্মনিবেদনে নিষ্কাম কর্ম্ম কর। যদি এইক্ষণেই মৃত্যু হয় তবে কি হইবে—ইহা ভাবিলেই কাতরতা আসিবে। আহা! কত কষ্টের টাকা কড়ি, ঘড়ি ছড়ি, শয্যা পালং, জমিদারী তেজারতি, গাড়ী বাড়ী আর "তেলে ঘিয়ে পাকান" হাঁড়ি কলসী; অনেক যত্নের কুলো ডালা, খৈ-চালা আর কত সুন্দর বাঁধান আলমারি-সাজান "আনকোরা" বইএর কাঁড়ি যাহা কাহাকেও দেখ্‌তে দিতেও ব্যথা অনুভব করিতে—বল না এ সব ফেলে কোথায় চল্‌লে? এখন ত কোথাও একা যেতে পার না, অন্ধকারে বড় ভয় হয়—আর তখন? কে তোমার সঙ্গে যাইবে? সেই "অজানা অশোনা" দেশে একা একা কিরূপে যাইবে? পথের সম্বল ত কিছুই কর নাই! এখন ত চাপরাশী সঙ্গে যায়—তখন বল কোন্ চাপরাশী সঙ্গে যাইবে? তার উপরে যাইবার সময়ে সময়ে—তখন হইতেই ত যাতনা আরম্ভ হইবে। শয্যা ত কণ্টক ছড়ান। এ পাশ ও পাশ ত নিরন্তর করিবে। এখানকার কিছুই ত লইয়া যাইতে পারিবে না। নাম যশ "খেতাব চাপরাশ" কিছুই ত সঙ্গে যাইবে না। যখন আসিয়াছিলে তখন দিগম্বর শিশু হইয়া আসিয়াছিলে আর যখন যাইবে তখনও দিগম্বর শিশু হইয়া যাইবে। শুধু তাই কি? ৺ গোবিন্দ চৌধুরী গানে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—

ভূতের বোঝা আজ্‌কে ভূতে মিশাইবার শুভদিন,
ঘটাকাশ আজ্‌কে আমার মহাকাশে হবে লীন।
জল যাবে সেই জলধরে, তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে,
রন্ধ্রগত বায়ু আমার মিশ্‌বে মহা সমীরণে।

তুমি চাও আর না চাও—তোমার এই সখের দেহ হইতে সব জিনিষগুলি বাহির করিয়া তাহাদের আধার-স্থানে মিশাইয়া দিবে। বল তোমার কি থাকিবে? কাহাকে সঙ্গের সাথী করিয়া তুমি সেই "অজানা" দেশে যাইবে? তাই বলি, যখন মনকে তমোভাবে আছন্ন দেখিবে তখন একবার মৃত্যুচিন্তা কর। শাস্ত্র ইহাই বলেন। তখন কাতর হইবে। কাতর হইলেই প্রাণ সেই চরণে মস্তক লুণ্ঠন করিতে চাহিবে। বেশী কথা মনে না রাখিতে পার ৺ গোবিন্দ চৌধুরীর একটা গান শিখিয়া লও—মৃত্যু-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাতরভাবে ঈশ্বর চিন্তার সুবিধা হইয়া যাইবে।

আমি আজ কেন এমন হ'লেম তারা।
আঁধার দেখি মা থাকিতে নয়নতারা॥

অবশ ইন্দ্রিয় একি ধারা, আমি বুঝিতে না পারি মাগো
রাত্রি কি দিবস এখন, উলঙ্গ কি আছি বসন পরা॥

কণ্টক সম শয্যা বিঁধিছে গায়
কণ্ঠ করিল রোধ কি যেন পাষাণ-প্রায়,
কি যেন বলিতে চাই, আবার ভুলিয়া যাই
আমি পলে পলে হ'তেছি জ্ঞান হারা॥

অনন্ত বৃশ্চিক যেন করিছে ঘনদংশন, অন্তর্দ্দাহে দেহ জ্বরা,
ফেলিলে নিশ্বাস আর তুলিতে না পারি কেন

হর-নারি! এতই কি আজ হলেম মা নাড়ীক্ষীণ,
উহু উহু মুহুর্মুহু, পিপাসা প্রলাপ বহু
অমৃতে অরুচি বল কি করা॥

আজি কেন হেরি মাগো! জলন্ত অনলরাশি
চৌদিকেতে নরক-খাদে ঘেরা।

গোবিন্দ কয় মন! তোমার নিকটে এসেছে শমন,
এ সংসারে পাপী জীবের পুরস্কার জেনোরে এমন,
যদি এ দায় এড়াতে চাও, দুর্গা দুর্গা বলে এখন
নয়ন মুদে শয়ন কর ধরা॥

তাই বলিতেছি যদি সাধক হইয়া শেষের দিনের জন্য সাবধান হইতে চাও তবে প্রত্যহ একবার করিয়া মৃত্যু-চিন্তা করিয়া রাখিও। প্রত্যহ অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে নিত্য কর্ম্মের যে উৎসাহ তাহার মূল ভিত্তিটি স্থির রহিল।

যথাকালে নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া একবার স্থির হইয়া অবস্থান কর; করিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতে অভ্যাস কর। হে ভগবান্! হে আমার দেবতা! আমি আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহাই তোমাকে নিবেদন করিয়া দিতে চাই। এই চক্ষু তোমার হউক, এই কর্ণ তোমার হউক, এই বাক্য তোমার হউক, এই মন তোমার হউক। আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে এই দেহ, এই মন অর্পণ করিলাম। ইহাতে আমার আর কোন সত্ত্ব থাকিল না। শুধু নিবেদন করিলেই হইল না, ব্যবহারিক জগতে ইহা নিত্য স্মরণ করা চাই। চক্ষু ত সেই চ'ক্ষে মিলিয়াছে, কর্ণ সেই কর্ণে গিয়াছে, হস্ত পদ, দেহ মন সমস্তই তাঁহার অঙ্গে মিশিয়াছে—তবে আমার রাগ দ্বেষ কিরূপে থাকিবে? আমি যে তাহাতে মিশিয়া তাই হইয়া গিয়াছি—তাহাতে যে রাগ দ্বেষ নাই, সে যে বড় নির্ম্মল, বড় পবিত্র, বড় দয়াময়। এও এক রকম বটে।

বলিতেছিলাম—নৌকারোহণে ভরা গঙ্গায় চলিয়াছ। তরঙ্গ—তরঙ্গ—তরঙ্গ—সারা গঙ্গা তরঙ্গে তরঙ্গে নৌকাকে বিচলিত করিতেছে। ইহার বিরাম কবে হইবে? দেহ-তরিকে মনস্তরঙ্গ সর্ব্বদা নাচাইয়া কোথায় লইয়া চলিয়াছে। চতুরাশি লক্ষবার দেহতরি বদলান হইল, তবুও ত কিছুই শান্ত হইল না। কতকি ত করা হইতেছে—মনের এই উঠা পড়া নিবারণের জন্য জপ, তপ, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান, বিচার কতই ত করা হইতেছে। সবদিন ত একভাবে তবু যায় না। বল কি উপায়ে মনকে থামাইবে?

মনটিই মায়া। মায়া যে অতিক্রম করিতে চায় তাহাকে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" করিতে হইবে। আমার শরণাপন্ন হইতে হইবে। মায়াও যেমন তোমার সঙ্গে আছেন আমিও সেইরূপ তোমার সঙ্গে আছি। আমাকে আশ্রয় কর, মায়া

কিছুই করিতে পারিবে না। যে যতটুকু আমাকে আশ্রয় করিতে পারিবে সে ততটুকু শান্ত হইবে। পূর্ণমাত্রায় আমার শরণে যে আসিল সে আমার মতন মায়া-তরঙ্গে নাচিয়াও নাচিবে না। মায়া তাহার আয়ত্বাধীন হইবে।

পূর্ণমাত্রায় মনকে থামাইতে হইলে যাহার নিকট হইতে যাহা লইয়াছ তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দাও। অনেকের কাছে অনেক জিনিষ ধার করিয়া এই দেহতরি—এই মনস্তরি তৈয়ারি করা হইয়াছে। সব ফিরাইয়া দাও। পঁচিশ তত্ত্ব এই সব গড়িয়াছে। এইগুলি সব পঞ্চভূতের নিকট হইতে ধার করা জিনিষ। ভূতগুলিকে তাহাদের দ্রব্য ফিরাইয়া দাও। ক্ষিতির জিনিষ ক্ষিতিকে, জলের জিনিষ জলকে, তেজের জিনিষ তেজকে, বায়ুর জিনিষ বায়ুকে, ব্যোমের জিনিষ ব্যোমকে ফিরাইয়া দাও,—এখন দেখ দেখি কি থাকে? সত্ত্ব রজস্তমের দ্রব্য প্রকৃতিকে ফেরৎ দাও। এখন থাকিল কি দেখ। ঘটের সব উপাদানগুলি ইহার কারণে ফেলিয়া দাও। থাকে শুধু আকাশ। এই আকাশ সেই আকাশ। তেমনি সব সবাইকে ফেরৎ দাও। থাকে চৈতন্য। এই চৈতন্য আর খণ্ড নহেন। এই সেই অখণ্ড চৈতন্য। ফিরাইয়া দিতে অভ্যাস কর। নিত্য অভ্যাস কর। দেখিবে তুমিই সেই পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ "আপনি আপনি।" জগতটা পঞ্চভূতের। ভূতের কার্য্য একটা মিছা মিছি ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজালে তাঁহাকে রজ্জুতে সর্প ভাসার মত বিবর্ত্তিত দেখায়। সব তুমি, কোথাও কিছুই নাই। ভূতের মায়া কাটিয়া গেলে "তুমি তুমি।" এই এক রকম। আবার মন ও মনের কার্য্য ভুলিবার জন্য রস মার্গেও যাইতে পার। সর্ব্বদা রসের বস্তুর চিন্তা লইয়া থাক। একটা ভাবের ঘোরে থাকিবে। ভূতের নৃত্য কিছুই দেখিবে না। শেষে উপরে যাহা বলা হইল, সেই আত্মনিবেদনই আসিবে। ইহাও এক রকম।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভাব।

(২) বিষ্ণুস্মরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তিনিই ভক্তচিত্তানুসারে আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও মূর্ত্তি ধারণ করেন। বহু স্থানে আমরা যুক্তি দিয়াছি। এখানে এই মাত্র বলি শ্রীভগবানকে বিশ্বরূপ বলিলেও তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়। ব্রহ্ম স্ব স্বরূপে "আপনি আপনি"। তিনি চতুষ্পাদে পূর্ণ। পূর্ণব্রহ্মের একদেশে মাত্র মায়ার চলন হয়। মায়ার ভিতরেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দেহ সেই সগুণ ব্রহ্ম পূর্ণব্রহ্মের নিকটে স্ব স্বরূপে থাকিয়াও অতি ক্ষুদ্র। ফলে অবতার সম্বন্ধে যদি তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলা হয় তবে সগুণ ব্রহ্মও ক্ষুদ্র। মূঢ় বুদ্ধিতে ভগবানের অবতার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আহার শুদ্ধি ও আচার শুদ্ধি ও অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কার হইয়াছে তাঁহারা দেখেন যে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াও তিনি যেমন খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন হন না সেইরূপ রাম, কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি মূর্ত্তি ধরিয়াও তিনি কখন পরিচ্ছিন্ন হন না। এখানে একটি মাত্র যুক্তি দেওয়া যাইতেছে।

ঘটের মধ্যে যে আকাশটা থাকে তাহাকে খণ্ড আকাশ বলিয়া বোধ হয়। ঘটের মধ্যে যে আকাশ তাহা খণ্ড মত বোধ হইলেও তাহা এই মহাকাশই। যাঁহারা দেখিতে জানেন, যাঁহারা ঘটাকাশে তন্ময় হইতে পারেন তাঁহারা ঘটটা ভুলিয়া গিয়া ইহাকেই মহাকাশ দেখেন। যাহা খণ্ড বোধ হইতেছিল বাস্তবিক তাহা খণ্ড হইতেই পারে না তাহা সর্ব্বদাই অখণ্ড। যে তোমার তত্ত্ব কিছু আলোচনা করিয়াছে সে বাহিরের অখণ্ড আকাশ দেখিয়া দেখিয়া যদি ভিতরের খণ্ডমত আকাশকে ভাবনা করে তবে দেখিবে ঘট আবরণ একটা যেন ভাসিয়াছিল দুই আকাশকে এক দেখিয়া এ আবরণটা যেন মিলাইয়া গেল। সেইরূপ তোমার সুন্দর অবতারের মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া যখন সে তোমার স্বরূপ চিন্তা করে তখন সে দেখে যে এক অখণ্ড তুমি তুমিই আছ আর তোমার স্বরূপের চিন্তায় এই নামরূপের আবরণ তোমার স্বরূপে যেন লুকাইয়া যায়।

তবেই হইল বিশ্বরূপ হইলেও যেমন পূর্ণ স্বরূপের নাশ হয় না সেইরূপ অবতার হইলেও তোমার বিশ্বরূপের বা পূর্ণ স্বরূপের বিচ্যুতি কখনও হয় না।

(৪)

পরমপদ জীবে জীবে আত্মা রূপে অবস্থিত। নীল আকাশে একখণ্ড মেঘ ভাসিল। এই মায়া-মেঘের তলায় যে সুনীল আকাশ তাহা প্রকৃতপক্ষে খণ্ডিত না হইয়াও যেন মেঘ দ্বারা খণ্ডিত বোধ হয়। ইনিই সগুণ ব্রহ্ম, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর। সেই একখণ্ড মেঘ আবার যখন বহুখণ্ডে বিভক্ত হইল তখন তাহাদের তলায় তলায় যে সুনীল অকাশ তাহা প্রকৃতপক্ষে খণ্ডিত না হইয়াও যেন বহু মেঘখণ্ড দ্বারা বহু খণ্ডে খণ্ডিত মত বোধ হইল। এই খণ্ড আকাশগুলির সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মার তুলনা। ফলে জীবাত্মা, ঈশ্বরাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। মায়া ও অবিদ্যা উপাধিতে ইঁহারই নাম ঈশ্বর ও জীব। জীব উপাধি দ্বারা ইঁহাকে অল্পজ্ঞ, অল্পদ্রষ্টা মত বোধ হয়। তবেই হইল পরম পদটিই নির্গুণ ব্রহ্ম আর নির্গুণ ব্রহ্মই সমকালে সগুণ ব্রহ্ম, অবতার এবং আত্মা।

"সমকালে" এইটিতে বিশেষ রূপে দৃষ্টি করা আবশ্যক। এক প্রকৃতি যেমন সমকালে ৺ কাশীধামে ও কলিকাতায়; যেমন সমকালে ৺ কাশীধামের প্রবল গ্রীষ্ম ও কলিকাতার সুখপ্রদ শীতলতা, সেইরূপ প্রাণি-শরীরস্থ আত্মাই সমকালে ভাবনারাজ্যে অবতার, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিয়া সর্ব্বব্যাপী সগুণব্রহ্ম এবং সর্ব্বশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরিপূর্ণ পরমশান্ত চলন-রহিত অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপী নির্গুণব্রহ্ম।

তৎ বিষ্ণুর কথা আলোচনা করা হইল এবং তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদের কথাও বলা হইল। শ্রুতি বলিতেছেন এই পরমপদই জীবের গন্তব্য স্থান। এখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই চিরকালের জন্য জুড়াইতে পারিবে না।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি॥

সকল বেদ যে পদকে মনন করেন, সমস্ত তপস্যাও যে পরমপদের কথা বলিতেছেন ও যে পদ প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে সেই পরমপদকে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি।

উপনিষদ্-বল্লাস্তর্ব্যাপ্তিতন্তনী শ্রীগীতাও বলিতেছেন—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূল
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ১৫।২
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তিভূয়ঃ ॥ ১৫।৩

সুদৃঢ়-মূল এই সংসার অশ্বত্থকে অসঙ্গ শস্ত্রে দৃঢ়রূপে ছেদন করিয়া সেই পরমপদকে অন্বেষণ করিবে। সেই পরমপদ পাইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

শ্রীগীতা আরও বলেন—

ন তদ্ভাসতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।১৬

যে পদকে সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি প্রকাশ করিতে পারেন না, যেখানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি নাই, ইহাই আমার পরমধাম।

এই পরমপদই ওঁকার। স্ব স্বরূপে যিনি অবস্থিত তাঁহাকে জানা যায় না কিন্তু কৌশলে তাঁহাতে স্থিতি লাভ হয়। ওঁকার স্বরূপে যাহা তাহাই তুরীয় ব্রহ্ম। ইহাই চতুর্থ পদ। এখানে কোন প্রকার সৃষ্টি-তরঙ্গ নাই। মাণ্ডুক্য শ্রুতি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলেন "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ"। জানাই এখানে স্থিতি।

ওঁকার তটস্থে যাহা তাঁহাকেই সাধনা দ্বারা ধরা যায়। স্বরূপ হইতে তটস্থে যখন তিনি বিবর্ত্তিত হয়েন তখনই তিনি ধরা দিয়া থাকেন। ইনি তখন সগুণ ব্রহ্ম। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ হইতে পারে না। মায়া না থাকিলে ব্রহ্মের সগুণাবস্থা হয় না। সর্ব্ব না থাকিলে সর্ব্বব্যাপীকে জনিবার উপায় নাই।

এখন "সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ" বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। এই অংশের ব্যাখ্যায় শ্রুতি বলেন—

"সদা প্রশ্যন্তি বীক্ষন্তে সূরয়ো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস ইতি সদা হৃদয় আদধতে"। দেবাস—দেবতা সমূহ। বেদে দেবের বহুবচন এইরূপে হয়। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সর্ব্বদা এই পরমপদকে দর্শন করেন। সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন।

হৃদয়ে ধারণ করাই এখানে দর্শন করা। পরমপদের কথা শ্রবণ মনন করিতে করিতে যখন ইহার নিদিধ্যাসন বা ধ্যান হয় তখন নিজের হৃদয়স্থ খণ্ড চৈতন্যই যে সেই পরমচৈতন্য ইহা অনুভবে আইসে। এই যে অখণ্ডমত আকাশ, ইহাকে দেখিতে দেখিতে যেমন ঘটাকাশকেই ঐ পূর্ণ আকাশ ভাবে দেখা হয় ইহাও সেইরূপে হয়। সুরেরা সর্ব্বদা দেখেন কিন্তু অসুরেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিবার জন্য, সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য জীবকে তবে সুরত্ব লাভ করিতে হইবে, অসুর হইয়া থাকিলে হইবে না।

জীব সুর হইতে পারেন আবার অসুরও হইতে পারেন। যাহারা রজ ও তম দ্বারা পরিচালিত তাহারাই অসুর। কিন্তু সত্ত্বগুণ দ্বারা যাঁহারা রজস্তমকে বশীভূত করিতে পারেন, পারিয়া এই স্ববশীভূত রজস্তম দ্বারা একদিকে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কর্ম্ম করেন এবং অন্যদিকে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে পরমপদে যখন ইচ্ছা স্থিতিলাভ করিতেও পারেন অর্থাৎ সমকালে জগচ্চক্র পরিচালন ও আত্মশক্তির সাহায্যে পরমপদে স্থিতির অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই সুর। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে একাগ্রতা হয়। একাগ্রতা হইলে কর্ম্মত্যাগ হয়। তখন চিত্তনিরোধ হয়। চিত্তনিরোধ করিতে পারিলেই আর চিত্তে কোন প্রকার বৃত্তি উঠে না। ইহা আয়ত্বাধীন হইলে স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি লইয়া খেলা করাও যায়। যাঁহারা ইহা পারেন তাঁহারা সুর। যাঁহারা সুর তাঁহারা পরম দেবতা। তাঁহারা সর্ব্বদা "বৃক্ষইব স্তব্ধঃ"। বৃক্ষ যেমন স্বভাবতঃ আপন শান্তভাবেই অবস্থিত অথচ বায়ু বহিলে চঞ্চল হয় আবার বায়ু না থাকিলে যে স্থির সেই স্থির—পরমশান্ত, ইঁহারাও সেইরূপ কর্ম্ম আসিলে কর্ম্ম করেন আর কর্ম্ম না থাকিলে পরমানন্দে অবস্থান করেন। কর্ম্ম করিয়াও ইঁহারা কর্ম্ম ফলে যে সুখ ও দুঃখ তাহাতে আসক্ত হন না। কর্ম্ম করিয়াও ইঁহারা কর্ম্মে বদ্ধ হন না বলিয়া ইঁহারা কোন কর্ম্মই করেন না। ইঁহারা কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন আবার অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখেন।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ৪।১৮

ইঁহারা স্থিত-প্রজ্ঞ। ইঁহারা জীবন্মুক্ত। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, আহার নিদ্রা, ক্ষুধা পিপাসা, জরা-মরণ, শোক মোহ কিছুতেই ইঁহারা স্ব স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। পরমপদে স্থিতিই জীবন্মুক্তি।

"দিবীব চক্ষুরাততম্‌" ইহাতে কি বলিতেছেন? আতত—সমন্তাৎ প্রসারিত চক্ষু আকাশস্থিত সূর্য্যকে যেমন দেখে সেইরূপ দেবতাগণ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা দর্শন করেন। "দিবীব চক্ষুরাতম্‌" ইহা মহানির্ব্বাণে পঞ্চমোল্লাসের ২২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা মত করা হইল। স্মরণ রাখা উচিত চক্ষুও সূর্য্য। জীবচৈতন্য পরম-চৈতন্যের সহিত এক হইলেও যেমন উপাধিতে ভিন্ন, সেইরূপ মানবের চক্ষু ঈশ্বরের চক্ষু স্বরূপ সূর্য্য হইলেও বদ্ধ মনুষ্য ইহা অনুভব করিতে পারেনা।

শ্রুতি বলেন—"ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ" তৎ চক্ষু জগতাং নেত্রভূতং আদিত্যরূপং পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি উচ্চরৎ উচ্চরতি উদেতি। সেই জগতের চক্ষু স্বরূপ আদিত্য-মণ্ডল পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছেন। উহা কিরূপ? দেবহিতং দেবানাং হিতং প্রিয়ং—উহা দেবগণের প্রিয়কারী। শ্রুতি আরও বলেন—"চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষুঃ সূর্য্যো অজায়ত"। বিরাট পুরুষের চক্ষু হইতেই সূর্য্য জন্মিলেন। সূর্য্যের প্রধান স্থান এই দৃশ্যমান সূর্য্যলোক বা সূর্য্যগোলক হইলেও তাঁহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের চক্ষুতে অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইয়া আসিয়াছেন। তাই শাস্ত্র বলেন "চক্ষুঃ সূর্য্যস্তব প্রভো"! হে প্রভু! তোমার চক্ষুই এই সূর্য্য দেব। সমন্তাৎ প্রসারিত চক্ষু আকাশস্থিত আপন পূর্ণ স্বরূপ সূর্য্যকে যেমন অবাধে দর্শন করে সেইরূপ এই জ্ঞানসূর্য্য-স্বরূপ পরমপদকেও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অবাধে দর্শন করেন। আকাশ দেখিতে দেখিতে মনশ্চক্ষু যখন আকাশের মত হইয়া যায় তখন সূর্য্যকে হৃদয়ে পাওয়া যায়।

বিষ্ণু-স্মরণ আমাদের শক্তিমত আলোচিত হইল। যাঁহাদের শক্তি অধিক তাঁহারা ইহার মধ্যে আরও কত কি পাইতে পারেন।

বিষ্ণু স্মরণ মন্ত্রটির অর্থ একরূপ বুঝিলাম। কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবার সময় যখন বিষ্ণু-স্মরণ করা যাইবে তখন এত কথা স্মরণে আনা অসম্ভব। বিষ্ণু-স্মরণ মন্ত্রে কোন বিষয় প্রাণে জাগিবে?

সাধকের মত প্রশ্নই করা হইয়াছে।

আকাশে যেমন সূর্য্য মণ্ডল ভাসেন সেইরূপ হৃদয়াকাশে সূর্য্যমণ্ডল স্বরূপ জ্ঞানসূর্য্য ভাসিবে। ইহাকেই পরম পদ বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে। এই সূর্য্য জ্ঞানসূর্য্য-স্বরূপ পরম চৈতন্যের স্মারক। হৃদয় হইতে সূর্য্য কখন মুছিয়া যাইবেনা। কখন ইহাকে বিস্মৃত হওয়া হইবে না। পরে প্রাণায়ামে ও শেষে

গায়ত্রী মন্ত্রে এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যেই সশক্তিক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তার চিন্তা করিতে হইবে সন্ধ্যা-মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে বাদ দিয়া কিছুই হইবে না।

বড় ভাল হইল।

মন মরে না বলিয়াই না জীবের দুঃখ! আর তুমি? তুমি মন হইয়াই দুঃখী। মন মরে, কতবার মরে, কতবার মরিল, আরও কতবার মরিবে, সঙ্গে সঙ্গেও তুমিও মরিতেছ। এ মরণের অন্ত নাই। এ মরণ কিন্তু সে মরণ নহে। এ মরণে দুঃখ পাইবার জন্য আবার জীবন আছে কিন্তু মনের মরণ রূপ যে মরণ সে মরণে নিত্য জীবন হইয়া গেল। দুঃখ আর থাকিল না।

তুমি মন সাজিয়া বড় ভুল কর। ভুলেই দুঃখ। মন সাজিয়াছ বলিয়া সর্ব্বদা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতেছ। তুমি কেন মনের দয়িত হও না; মনের ঈপ্সিত-তম হও না; মনের রমনীয় দর্শন হওনা; মনের প্রিয় হওনা; মনের সকল সাধের সমষ্টি হও না। মন সাজাটা ভুলে হয় কিন্তু মনের প্রিয় হওয়াই সত্য। তুমি সত্য সত্যই মনের দয়িত; মনের "পরাণ পুতুলি"; মনের "কলিজার হার"; মনের "হাতকি দরপণ"; মনের সর্ব্বস্ব। মন হইয়া আর কথা কহিও না। মনের সর্ব্বস্ব হইয়া কথা কও। মনের আপনার হইতেও আপনার হইয়া মনকে উপদেশ দান কর। মনকে কর্ম্ম করাও।

মনের আপনার হইতেও আপনার কে জানত? সেই যে—মনের অসম্বদ্ধ প্রলাপ থামিলে যাহাকে দেখা যায়। সেই যে—লয় বিক্ষেপ থামিলে যে থাকে; সেই যে—যার জন্য মনকে জপ, তপ, ধারণা, ধ্যান কত কি করাইতে চাও, যার জন্য স্বাধ্যায় কর, যার জন্য শত ক্লেশ কর, যার জন্য ব্রহ্মচর্য্য কর, যার জন্য সৎসঙ্গ কর।

মন না সাজিয়া মনের উপদেষ্টারূপে থাক। সব গোল মিটিবে। এতদিন মন জপ করিতেছিল; এখন মনের উপদেষ্টা জপ করিয়া জপ দেখাইতে দিতে লাগিলেন। হরি হইয়া "হরি হরি" করা এই।

এতদিন মন "হরি হরি" করিতেছিল—আর কত বিষয়-চিন্তার সহিত জপ, ধ্যান জড়াইয়া ফেলিতেছিল। কাজেই দুঃখ আর ঘুচিতে ছিল না। এখন মনের মনোভিরাম, মনের বচোভিরাম, মনের শ্রবণাভিরাম যিনি তিনি "রাম রাম" করিতে লাগিলেন। বড় ভাল হইল—সব গোল মিটিয়া গেল। মন আর গোল তুলিতে পারিল না। শ্রীগুরু করাইতে লাগিলেন। শ্রীগুরু স্বয়ং আচরণ করিয়া শিষ্যকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীগুরু শিষ্যের হইয়া সব করিতে লাগিলেন। শিষ্য শ্রীগুরুকে দেখিতে লাগিল। শিষ্য শান্ত হইয়া গেল। শিষ্য দেখিতে লাগিল শ্রীগুরু আপনাকে আপনি ডাকিতেছেন—আস্বাদন করিতেছেন। আহা! বড় সুন্দর হইল।

মনকে তুমি বড় ভালবাস। ভালবাস বলিয়াই মনের হইয়া সব করিয়া দিতে লাগিলে। ভালবাসার ধর্ম্মই ত এই। ভালবাসায় তার হইয়া সব করিতে ইচ্ছা করে।

এ কথাটি বুঝিতে কষ্ট নাই। কিন্তু অভ্যাস করাটি তোমার হাত। অভ্যাস কর ভাল হইবে, না কর রসাতলে যাইবে। মনের সর্ব্বস্ব হইয়া জপ করিতে বলিতেছি। নতুবা এত দিন ধরিয়া ত কত কি করিতেছ—কিন্তু যখনকার তখন। একজন লোক—তার নাম আনন্দ—কাপড়ের ব্যবসা করে। গৌরাঙ্গ বলিতে কাঁদে। কিন্তু কাপড় বেচার সময় দেড়া দামও লয়। বক্তৃতা করিবার সময় কত কাঁদিলে এবং কাঁদাইলে কিন্তু পাটোয়ারি বুদ্ধিত ছাড়িলে না। সেই যাহা পূর্ব্বে ছিল "আপনার বেলা আঁটি সাঁটি পরের বেলা দাঁত খামুটি"—পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই রহিয়া গেল। এতে ত কিছুই হইবে না।

কেন এমন হয় জান? মনটা হইতেছে নানারকমের ছবি আঁকা একখানা চিত্রপট। পটটি আদত জিনিষ। কিন্তু এত ছবি পটের উপর আঁকা হইয়াছে যে পট আর দেখা যায় না—সব ছবি গুলিই সর্ব্বদা ভাসিতেছে। তাই বলিতেছি—পট হইয়া যদি থাকিতে পার তবে মনের তলায় যাইলে। যাইলেই তারে পাইলে। তাই বলি মনের রাম মনের হইয়া রাম রাম জপ করিতেছেন। এই বেশ উপায়। তাই বড় ভাল হইল।

বর দে মা।

বর দে মা,—তুমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছ,—কতবার আশীর্ব্বাদ করিয়াছ, এত অনুগ্রহ তোমার, তবুও আমার হয় না কেন? কতবার আমার আশা জাগাইয়াছ, আবার নিরাশ হইতেছি। আজ কিন্তু আবার বিশেষ আশা জাগাইয়াছ, এবার জয় মা তারা জগদম্বা। "ত্বৎসমা তারিণী নাস্তি মৎসমো' নাস্তি পাপকৃৎ।" "তারয় মাং জগদম্বে নিরালম্বোহস্মি সাম্প্রতম্"। হউক না অব্যর্থ তোমার ন্যায়ের শাসন দণ্ড,—হওনা তুমি রাজরাজেশ্বরী,—অব্যর্থ ন্যায়-দণ্ড-ধারিণী, কিন্তু তোমার অপার করুণা! তুমি কি শাস্ত্রবাক্য গুরুবাক্য সাধুজন পরম্পরায় উচ্চারিত তোমারই আদেশবাক্য, তোমারই 'আইন' রদ্ করিয়া দিবে? কৈ 'আইন' রদের 'পরোয়ানা' তো এরাজ্যে আসে নাই? তুমি যে জগজ্জননী—তুমি যে আমার জননী—তুমি যে আমার আমিত্বের মা'ঠাকুরাণী—তুমি কি আমাকে কোলে না নি'য়ে পারিবে? এতদিন তো পার নাই—যদি পারিতে তবে আমি যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ি তখন আমার চ'খের জল সযতনে মুছাইয়া আমাকে হাসাও কেন? আবার আমি যখন রুক্ষ, কর্কশ ও অবিশ্বাসী হইয়া পড়ি, তখনইবা কত অনুকূল স্রোতে আমাকে 'ঘাড়' ধরিয়া টানিয়া লইয়া সরস, সোৎসাহ ও উদ্যম-পরায়ণ কর কেন? মরা গঙ্গায় কেন মাঝে মাঝে বাণ ডাকে? 'সাহারার' মরুভূমিতে কেন মন্দাকিনীর তর তর প্রবাহ প্রবাহিত হয়? শ্মশানে কেন প্রসূন্ ফোটে? আয়ুঃ-সূর্য্য ত মধ্যন্দিন সময় অতিক্রম করিল, এখন ঘাঁড়ে ধরিয়া একটানা স্রোতে তোমার দিকে, তোমার অনন্ত পরমায়ুর দিকে চালাইয়া নেও মা,—"এখন কোলে নে মা তোর অবোধ সন্তানে"। আর যেন ডুবা উঠা করিতে না হয়, এখন একটানা গতি—কেবল উঠা। কেবল সংযম-সমৃদ্ধি-রমণীয় তোর কল্যাণ-পথে নিয়া নে' মা। হউক সঙ্কীর্ণপন্থা, হউক কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম বর্ত্ম, হউক এই সংযমের পথে—কল্যাণের পথে, শত দুঃখ শত কষ্ট—অমিত অযুত লাঞ্ছনা—হউক কর-চরণ ক্ষতবিক্ষত—হউক না রুধিরধারা পরিপ্লুত সর্ব্বঅঙ্গ। তোর দয়ামান দীর্ঘ নয়নের দিকে (মহেরণায়চক্ষসে) তাকাইয়া যেন সকল সহ্য করিতে পারি। সর্ব্বংসহা জননী তোর সন্তান যেন সর্ব্বংসহ হয়—যেন সানন্দচিত্তে উৎফুল্ললোচনে সংযম-মার্গে সর্ব্বংসহ হইতে পারে। বর দে মা! আজ এই বর দে। আজ এই বর দে।

শ্রীশ

আগমনী গীতি।

(১)

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

কবে আনিবে (গিরি) আমার উমা চন্দ্রাননী
আঁধার হৃদয়াকাশে হাসিবে সেই সৌদামিনী।
তুচ্ছ করি রাজ্যধন, কাঁদে রাণী নিশি দিন
মুখে নাই অন্য বচন কেবল দুর্গা দুর্গা বাণী।
কভু বলে সকাতরে, সম্বোধিয়া ধরাধরে
পাশরিয়া অভয়ারে কেমনে আছ না জানি।
বড় আশা ছিল মনে শরতের আগমনে
গৌরী আসিবেন ভবনে মুখে দিব ক্ষীর ননী।
অনিত্য বিষয়ে ভুলে, উমাধনে না ভাবিলে
কাচের মূল্যে বেচিলে অমূল্যধন চিন্তামনি।
এ বিশ্ব যাঁহারে ধ'রে, কন্যারূপে তব ঘরে
ভুল না নাথ তাঁহারে সে যে ব্রহ্মসনাতনী।

(২)

রাগিণী ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আমার তাইতে সাধ উমারে দেখিতে।
ভবের যাতনা আর না পারি সহিতে॥
এলেম্ গেলেম্ কতবার তবু না যায় মোহঘোর
কবে মা করিবি পার বাসনা গো সুধাইতে॥
অনন্তরূপ ধরিয়ে কেন মা ভবে লুকায়ে।
এ খেলা ভাঙ্গিবার ভয়ে পার না কি দেখা দিতে
অপার জলধি তুমি, তাহে জল বিম্ব আমি
সিন্ধু হতে বিম্ব কি মা, পারে গো ভিন্ন হইতে॥

শ্রীদী

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

পশ্চিম গগণ সিন্দুররাগে রঞ্জিত করিয়া ভগবান্ মরীচিমালী চক্রবালান্তরালে প্রবেশ করিতেছিলেন। সন্ধ্যার অদৃশ্য-প্রায় ধূসর ছায়াস্পর্শে গৃহ, প্রাঙ্গন, তরু, লতা কেমন একটু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গৃহদ্বারে, পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, খঞ্জনীতে মৃদুমন্দ আঘাত করিয়া, মন্দ মন্দ, মিষ্ট মিষ্ট বোল্ তুলিয়া কে গাহিল—

"গুরু, তুমি ত পার হয়ে গেলে
একলা যেতে ভয় করে,—
ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হ'ব কেমন করে,
গুরু, পার হ'ব কেমন করে!"

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" সঙ্গীত "মন প্রাণ আকুল করিল!" হৃদয়ের গভীরতম নিভৃত প্রদেশে কি এক ব্যাপার যে চলিতে লাগিল এতদিন পরে আজ তাহা ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সেই ভাবের যতটুকু আবার মনে আসিতেছে তাহাও ঠিক বলিতে পারিতেছি না, কারণ সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারি এমন স্পষ্ট অথচ-অস্পষ্ট, স্ফুট অথচ-অব্যক্ত, মধুর অথচ-বেদনাময়, সরল অথচ-রহস্যময় ভাষা আমি বিদিত নহি। সেই দিবা ও নিশার সন্ধিক্ষণে, সেই প্রকৃতি দেবীর ঈশ্বর-আরতিকালে, সেই স্থির, শান্ত, গম্ভীর, পবিত্র মুহূর্ত্তে, সেই মধুর খঞ্জনীর সুমধুর বোল শুনিয়া, সেই ভাবাবেশে মৃদু-মন্দোচ্চারিত, সার গর্ভ ও ভাবময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, তরঙ্গায়িত হৃদয়ে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। মলিন ছিন্ন-বস্ত্রখণ্ড-পরিহিত জনৈক বৈরাগী স্কন্ধের ঝুলি দ্বারদেশে রাখিয়া অনাহার ক্ষীণ-কণ্ঠে গাহিতেছিলেন। আমি আসিবামাত্রই ঝুলি অংসে তুলিয়া "ভিক্ষে দিতে হয় দিবি, না হয় না দিবি" এই বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া গায়ককে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। লোক ফিরিয়া আসিল। তিনি ফিরিলেন না।

সকলে বলিল "ও পাগল, ঐ রকম।"

উন্মাদই হউন আর প্রকৃতিস্থই হউন, গানটিও বেশ, গাহিতেছিলেনও বেশ। গানটি ভাল লাগিবার অনেক কারণ ছিল। একে সময় সুন্দর—দিবা ও নিশার মিলন কাল, প্রকৃতি দেবীর বদনখানি গাম্ভীর্য্যবিমণ্ডিত। চঞ্চলচূড়ামণি মনও এমন গম্ভীর মুহূর্ত্তে ক্ষণতরেও স্থির হয়, আসক্তির প্রিয়নিকেতন প্রাণেও এই শুভক্ষণে কেমন উদাসভাব ভাসিয়া উঠে। তাহার পর স্থান সুন্দর,—সম্মুখে স্বীয় সহস্র-রক্তরশ্মি-বিজড়িত অদৃশ্য-প্রায় দিনদেব আর লোহিত-রাগ-রঞ্জিত পশ্চিমাকাশ। দিবসের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিনমণি দিবাকর অন্তর্হিত হইতেছেন, পশ্চিম-গগনে এখনও তাঁহার কিরণচ্ছটা শোভা পাইতেছে, অন্ধকার ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিক্ গ্রাস করিতেছে,—এমন আধ্যাত্মিকভাব ব্যঞ্জক দৃশ্যদর্শনে কাহার মন না অন্তর্ম্মুখী হয়? এমন চিত্র দর্শন করিতে করিতে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত না স্বীয় আশার আলোক ও নিরাশার অন্ধকারে ভাসিতে ও ডুবিতে থাকে? তাহার পর খঞ্জনুত্থিত মধুর ধ্বনি,—খঞ্জনী কি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কোমল করে গ্রহণ করিয়া বাজাইতেন? নহিলে এত মিষ্ট! আবার স্থির শান্ত মৃদু মধুরকণ্ঠ,—প্রেমের গান গীত হওয়ার যোগ্য কণ্ঠ! তাহাতে সঙ্গীতগ্রথিত ভাব মধুর হইতে মধুর! গানটী ভাল লাগিবার প্রধান কারণ সঙ্গীতটী যেন শ্রোতারই স্বীয় হৃদয়-বেদনার কথা। গায়ক যেন আমারই কাতর হৃদয়ের অন্তঃস্থল দর্শন করিয়া, আমারই মর্ম্মবেদনার গীতি আপন বিষাদকণ্ঠে গাহিতেছেন। কবি তাঁহার ভাষায় গাহিয়াছেন—বিষাদ-গীতিই মধুরগীতি। আর যদি এই বিষাদ-গীতি শ্রোতারই জীবনের কোন বিষাদ-কাহিনীকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে,—শ্রোতারই হৃদয়বীণার কোন ছিন্নতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে—তাহা হইলে সঙ্গীত মধুরতমই বোধ হয়। সর্ব্বোপরি ভগবৎ কৃপা,—তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কি এমন মধুর লাগে? জীবনে কতদিন ঠিক এমনই সময়ে, ঠিক এমনই স্থানে, ঠিক এইরূপ গান ত শুনিয়া থাকি, কিন্তু কয়দিন এমনভাবে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে,—কয়দিন এত সামান্য কারণে প্রাণে অব্যক্তমধুর বেদনা জাগিয়া উঠে, কয়দিন এত সামান্য আঘাতে রুদ্ধ হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, কয়দিন এমন সামান্য কারণে হৃদয়সিন্ধু আলোড়িত হইয়া মহা তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং তরঙ্গশীর্ষে ভাসিতে ভাসিতে কয়দিনই বা এতাদৃশ আনন্দধামে নীত হই? গায়ক চলিয়া গিয়াছেন, গান অনেক দিন হয় থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তান প্রাণে মুদ্রিত রহিয়াছে! জননি, তোমার চরণ সরোজে শতকোটি প্রণাম,—তুমি কত সুন্দর, তোমার কত দয়া!

আজ এতদিন পরে এমনভাবে সেই পুরাতন সঙ্গীত হৃদয় আলোড়িত করিতেছে-কেন? কি কারণে হৃদয়সাগরে তরঙ্গের পশ্চাৎ তরঙ্গ ছুটিতেছে—

"ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হ'ব কেমন করে?

কেন এমন করিয়া হৃদয় আলোড়িত করিতেছে? কেন এমন করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিতেছে? আলোড়িত হইবে না? তরঙ্গ ছুটিবে না? বৎসরের পর বৎসর—কত বৎসর মহাকালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশাইল, জীবনের কতকাল কাটিয়া গেল, কত চেষ্টাই করিলাম, প্রাণের উপর দিয়া কত যুদ্ধই হইয়া গেল তবুও ধর্ম্মজীবনে স্থির হইতে পারিলাম না। আজ উত্থান, কাল পতন,—এই সুখ, এই দুঃখ। শান্তিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে রহিল না। ধর্ম্মজীবন যে "চুলের সেতু," "ক্ষুরের ধার" তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাই পাষাণ-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আজি উষ্ণ প্রস্রবন ছুটিতেছে—

"ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
গুরু, পার হ'ব কেমন করে!"

একাকী এই "ক্ষুর ধার" পথে চলিতে যাইয়া, অসহায় অবস্থায় এই "চুলের সেতু" অতিক্রম করিতে প্রয়াস করিয়া কত প্রকারেই না বিড়ম্বিত হইতে হয়! ভুক্তভোগী ব্যতীত সে গূঢ় কথা কে বুঝিবে? একাকী গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হওয়া সাধারণের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। পথমাঝে সতত শ্রীগুরুর সাহায্য না পাইলে আমাদের ন্যায় পথিক দিক্‌ভ্রান্ত ত হয়েনই, অধিক সময় ঈপ্সিত প্রদেশ অতিদূরে রহিয়া যায়। ব্যর্থচেষ্টা, নয়নজল এবং সময় সময় অধঃপতনই সারফল হইতে দেখা যায়। সাধনার অন্তরায় যে অসংখ্য, কত দেবতা ঈর্ষাবশে প্রতিকূল হয়েন, মন ভুলাইবার জন্য সুন্দরী শিরোমণি কত অপ্সরা আসিয়া সম্মুখে নৃত্য করে, ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য কত ভীষণ দর্শন রাক্ষস নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখায়।

উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে শ্রীশ্রীগুরুর নিত্য সাহায্য যে একান্ত আবশ্যক তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অতি সামান্য, নগন্য বিষয়ে সফলতা লাভ করিবার জন্য কত শিক্ষকের শরণ লইতে হয়, আর এই যোগিজনদুর্লভ, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতে হইলে শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না? কামনা,—অসাধ্য

সাধন করিব, অধরকে ধরিব। লালসা,—"অবাঙ্‌মনসোঽগোচর" কে বাক্য ও মনের গোচর করিব,—যাঁহার স্বরূপ বাক্যাতীত তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিব, যিনি মনশ্চক্ষুরও অতীত তাঁহার "দেবেন্দ্র-মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণ চরণাম্বুজ" চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন করিব, হৃদয়ে ধারণ করিয়া—অধম মানবজন্ম সফল করিব। বাসনা—রঙ্গময়ী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কুহকিনী মহামায়ার বিশ্ব-বিজয়ী ইন্দ্রজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া তদন্তরালস্থ শত চন্দ্রবিনন্দিত, অশেষ সৌম্যাতি-সৌম্য শ্রীমুখ সন্দর্শন করিব। পিপাসা—কানন শোভা, বল্লরী ভূষণ, সুরভি প্রসূন চয়ন করিয়া চন্দন-চর্চ্চিত করতঃ সেই জগদারাধ্য রাজীব চরণে সজল নয়নে প্রেমাঞ্জলি দিব, আর আমাকে তোমার কর, "মোকো চাকর রাখো জি" এই বর মাগিয়া লইব। এই ভূমণ্ডলে আশ্রিত মানবমাঝে একই সময়ে কয়জন ভাগ্যবান্ এই স্বর্গ সুখের অধিকারী? জগতের আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কয়জন সাধক এই সাধ্য লাভ করিয়াছেন? প্রকৃত সন্তান, সফলকাম সাধক গাহিয়াছেন, "লক্ষে ঘুঁড়ি কাটে দু একখানি, তুমি হেসে দাও মা হাত চাপড়ি"। পর্ব্বতশিখরে আজন্ম ব্রহ্মচারী মৃদু হাস্যাধরে বলিয়াছিলেন "কোটিতে ও একটি মিলে না"। লক্ষজনের মধ্যে একজনও যে অমূল্য রত্নের সন্ধান পায় না আমরা সেই দুর্লভ রত্ন কণ্ঠে পরিতে চাই। কোটি জনের মধ্যে একজনও যে অমৃতের আস্বাদ পায় না আমরা সেই অমৃতসরে চিরনিমগ্ন রহিতে চাই। বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাই,—পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিতে চাই। মূক হইয়া গীত গাহিতে চাহি। কীট হইয়া দেবতার চরণে পৌঁছিতে চাহি।

এতদৃশ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে নিশ্চয়ই শিক্ষা চাই। সামান্য অর্থকরী বিদ্যা লাভ করিতে হইলে শিক্ষকের প্রয়োজন হয় আর পরাবিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন হইবে না? অর্থকরী বিদ্যা লাভ করা যে অতি সহজ তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর শত সহস্র বালক, যুবক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। যাহা এত সহজ তাহা লাভ করিবার জন্য জীবনের কত বৎসর ব্যয়িত হইতেছে? যাহা এতাদৃশ সুসাধ্য তাহা করিবার জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কতজন গুরুমহাশয়ের শরণ লইতে হইতেছে? বাঙ্গালী জীবনের অর্দ্ধাংশকাল এই অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে ব্যয়িত হয় বলিলে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। আর

শিক্ষক? তা সেই পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে অর্দ্ধশত হইবে। যে বিদ্যালাভে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক ও যুবক কৃতকার্য্য হয় সেই বিদ্যা অর্জ্জন করিতে জীবনের অর্দ্ধেক সময় পঞ্চাশৎ গুরুর চরণতলে বসিতে হয় তাহা হইলে যাহা কোটিতে একজন পায় না এমন দুর্ল্লভ বস্তু লাভ করিতে কত যুগযুগান্তর কত শত সহস্র গুরুর চরণাশ্রয়ে কাটাইতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বন্ধু, তুমি যে ভয়াকুল চিতে গাহিতেছ—

"গুরু, তুমি ত পার হয়ে গেলে,
একলা যেতে ভয় করে!"

ইহাতে তোমার অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ হইতেছে না,—তুমি যে ভীরু কাপুরুষ ইহাতে এমন ভাব প্রকাশিত হইতেছে না। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে তুমি কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ,—জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত পক্ষে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছ। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে তুমি প্রকৃত পথের পথিক, পথের পরিচয় তোমার কিছু হইয়াছে, বন্ধুর পথে তুমি চলিতেছ, রসের স্বাদ পাইয়াছ। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে,—তুমি সাধু! বন্ধু, তুমি সাধু। চল, দৃঢ়পদে ধীরমন্দে অগ্রসর হও। অদূরেই তোমার চিরশান্তি নিকেতন, অখণ্ড আনন্দ আর অফুরন্ত উৎসব!

রসজ্ঞ শিষ্যোক্ত এই গুরুর-প্রয়োজনীয়তা যথার্থ সাধকের সহজেই বোধগম্য হয়। যাবৎ ধর্ম্মজীবনের অস্তিত্ব মুখের কথায় আর পরোপদেশ দানে, যাবৎ সাধু হওয়ার ইচ্ছা ক্ষীণেচ্ছা মাত্র, যাবৎ কায়মনোবাক্য তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহারই হওয়ার চেষ্টা করা না যায় তাবৎ সাধনায় শ্রীশ্রীগুরুর কোন আবশ্যক নাই এমন (খেয়াল) আমাদের থাকিতে পারে। কিন্তু যখন (খেয়ালের) সীমার মধ্যেই বাস না করিয়া বাস্তব জগতে প্রবেশ লাভের প্রবলেচ্ছা জন্মে এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রকৃত চেষ্টা আরম্ভ হয় তখন (খেয়াল) ছুটিয়া যায়, তখন সত্য সহজেই বোধগম্য হয়। যাবৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা না যায় তাবৎ সেই বিষয় সম্বন্ধে বহু ভ্রান্তি ধারণা আমাদের মনে উঠিতে পারে কিন্তু যখন প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য যথার্থ কর্ম্ম আরম্ভ করা যায় তখন কঠোর নির্ম্মম অভিজ্ঞতার তীব্র অঙ্কুশাঘাতে সকল অসত্য ধারণা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সত্য ফুটিয়া উঠে, খেয়াল টুটিয়া যায়। অনভিজ্ঞ

ব্যক্তি যে কার্য্য অতি সহজ সাধ্য মনে করে ভুক্তভোগী জানেন তাহা কত কঠিন। ধর্ম্মজীবনের প্রাণ চিত্তশুদ্ধি—আধ্যাত্মিক শুচি ও পবিত্রতা। এই শুচি সতত রক্ষা করিতে না পারিলে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না। এই আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যদি না জন্মিয়া থাকে তবে সন্ধ্যাহ্নিক, পূজা, জপ, তীর্থ কখনই যথাযথ করিতে পারা যাইবে না। এই শুচি লাভ যদি হইয়া থাকে তবে যে ধর্ম্মালম্বীই হই না কেন কোন ভয় নাই, আর যদি এই শুচি না পাইয়া থাকি তবে যে ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিনা কেন কোন ভরসা নাই। শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, আহারে বিহারে—দৈনন্দিন প্রত্যেক কর্ম্মে এই শুচি বজায় রাখিতে হইবে। যদি সামান্য সামান্য কথায় সামান্য সামান্য কার্য্যে এই পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তবে ধর্ম্মজীবনে উন্নতি হইবে না। এই শুচি রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। একটি সামান্য চিন্তায়, মুহূর্ত্তের অঙ্গভঙ্গিতে, একটী মুখের কথায়, ক্ষণিকের অসতর্কতায়, "পান হইতে চুণ খসিইলেই" এই শুচি নষ্ট হয়। এই শুচি রক্ষা করা যে কতদূর কঠিন তাহা কর্ম্মী প্রতিদিনই বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকেন। এই পবিত্রতা প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য যে সাধক সজাগ হইতে চেষ্টা করিতেছেন তিনি অনতিবিলম্বেই বেশ বুঝিতে পারেন যে একজন অভিজ্ঞ, রসজ্ঞ মহাপুরুষের নিত্য সাহায্য ব্যতীত আমাদের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। যখন দেখি যে—মধুর উষার মৃদু মন্দ সমীরণ সংস্পর্শে সুশীতল দেহে একান্তে উন্মুক্তস্থানে উপবেশন করিয়া তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে রমণীর দেহকে কৃমিকীটালয় মাংসপিণ্ডমাত্র বলিয়া বোধ হয়, এতাদৃশ ঘৃণা জন্মে যে কামের নামে সত্যসত্যই বমন আইসে এবং চিরদিনের মত কামের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইলাম মনে করিয়া আনন্দ হয়, অথচ নির্জ্জন স্থান পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে প্রবেশ করিলে, উজ্জল-বৈদ্যুতিকালোক বিভাসিত, সুমন্দ মলয় সেবিত, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত, চিত্রিত বিচিত্রিত চারুকক্ষে ক্ষণ-প্রভাচঞ্চলকটাক্ষময়ী, সুগন্ধ সুরভিত মনোহর পরিচ্ছদ শোভিতা, সুচারুহাসিনী, বিলাসবিভ্রমময়ী, চার্ব্বাঙ্গী সুন্দরীশিরোমণির সমক্ষে রমণীকে আর পুরুষের ন্যায় কৃমিকীটালয়, ঘৃণিত মাংসপিণ্ডমাত্র বলিয়া বোধ একেবারেই হয় না—বরঞ্চ "লাবণ্যলতিকা সম রমণী এভবে" এই গান আপনা হইতে অধরে কম্পিত হইতে থাকে,—সকল বিচার ছুটিয়া যায় বাসনার অনলে দগ্ধ হই—তখন নিদারুণ অনুতাপের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি একজন শক্তিমান্ রহস্যবিদ্ গুরুর কত প্রয়োজন! তিনি থাকিলে কি আজ এত বিড়ম্বনা

ঘটিত! আমার অবস্থানুরূপ সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতেন,—আমাকে আর এইরূপে অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইতে হইত না। যখন দেখি যে—যে সময় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই কিছুই বলেন না, আমার সকল (খেয়ালই) পূর্ণ হয়, আহার বিহার বসন ভূষণ কোন বিষয়েই আমার কোন অভাব থাকে না, দাসদাসী আত্মীয় স্বজন আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাকে ভাবিতে ও গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় না, আমার দোষকেও লোকে গুণ বলে সে সময় আমার (মেজাজটী) বেশ থাকে, ক্রোধপরায়ণতা যেন আমার নিকট অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়, সংসার তাপ দগ্ধ বিবিধানমুকুল ঘটনাবিড়ম্বিত হতভাগ্য কেহ যদি বিশেষ কারণ সত্বেও ক্রুদ্ধ হয়েন তাহা হইলে তিনি আমার নিকট তখন অতি হীন বলিয়া প্রতীত হয়েন। তাঁহার দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া আমার করুণার উদ্রেব হয়, অথচ যে সময় আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কেহ কিছু বলেন, আমার দুই একটী খেয়ালও অপূর্ণ রহিয়া যায়, আমার আহার বিহার বসনভূষণের সামান্য ক্রটি হয়, আমার সকল আদেশ সকলেই অবনত মস্তকে পালন করেন না, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাকে একটু বেগ পাইতে হয়, আমার বহুদোষের একটীও কেহ ক্রটি বলিতে সাহস করেন তৎক্ষণাৎ আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সুখের সময় যে ক্রোধ অতি ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল সেই ক্রোধ তখন আমার জ্ঞান হরণ করে, ক্রোধবশে যাহাকে যাহা না বলিবার তাহাকে তাহা বলি, যাহা না করিবার তাহা করিয়া বসি, শতদিনের কু কঠোর চেষ্টায় অর্জ্জিত সৌন্দর্য্য যখন এইরূপ মুহূর্ত্তের ধৈর্য্যচ্যুতিতে উড়িয়া যায়, শূন্য কক্ষ পড়িয়া রহে, স্বর্গীয় শান্তির স্থানে নারকীয় গ্লানি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে তখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি, শিক্ষকের কত আবশ্যক। আজ যদি শ্রীশ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে থাকিতাম, আজ যদি তাঁহার কৃপাপূর্ণ সতর্কদৃষ্টির মধ্যে বাস করিতাম তবে এই মহাদুর্ঘটনা কি ঘটিত! জীবন কি মুহূর্ত্তের অসহিষ্ণুতায় এমনই ভাবে শুষ্ক হইয়া যাইত! যখন দেখি যে—যে সময় অভ্রভেদী শৈলশিখরে সুখাসনে উপবিষ্ট হই, মোহময় মানবসমাজ বহুদূরে নিম্নভূমিতে পড়িয়া রহে, যে সময় সীমাহীন, সুনীল, নভোমণ্ডল উর্দ্ধে তাহার প্রকাণ্ড দেহ বিস্তৃত করিয়া তাহার অসীম নীলিমা মাঝে আমার সসীম দেহখানিকে বিলীন করিয়া দেয়, যে সময় চতুর্দ্দিকস্থ, দিগন্তবিস্তৃত, জনমানবশূণ্য পর্ব্বতমালা নীরবে এক মহাস্তব নিয়ত পাঠ করিয়া আমাকে গম্ভীর করিয়া তুলে, যে সময়

বিহগ-কুজন-শব্দান্বিত নয়নভিরাম সবুজ বনভূমি তাহার উজ্জ্বল মধুর সৌন্দর্য্য প্রতি লোমকূপ পথে আমার হৃদয়াভ্যন্তরে ছড়াইতে থাকে, যে সময় আমার প্রাণ পাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত বিমানে উধাও উড়িয়া যায়, তখন রূপরসগন্ধ-স্পর্শ শব্দের দৃঢ় বন্ধন টুটিয়া যায়, পৃথিবীর সকল বস্তুই অসার বলিয়া বোধ হয়, মনমাঝে এক অনির্ব্বচনীয়, প্রশান্ত, মুক্ত ভাব জাগিয়া উঠে, পাশ মুক্তির আনন্দে হৃদয় ভাসিয়া যায়, তখন এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র অধিকারী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্রীকেই—

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী" ॥

বলিয়া অন্তরের অন্তরে অনুভব করি এবং তাঁহার কৃপালাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া যুক্তকরে প্রার্থনা করি—

"দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য" ॥

অথচ যখন প্রকৃতির রম্যনিকেতন, শান্তিদেবীর লীলাভূমি শিখরি-শেখর সুনীল গগনতল, সবুজবনভূমি পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে পুনঃ প্রবেশ করি, যখন অসীম পর্ব্বত শ্রেণীর পরিবর্ত্তে সসীম প্রাসাদ শ্রেণী নয়ন পথে পতিত হয়, যখন বিহগগীতির পরিবর্ত্তে স্তাবকের মিথ্যা যশোগান, নিন্দুকের অসত্য ঘৃণোক্তি কর্ণ-কুহরে বাজিতে থাকে, যখন প্রাণ পাখী অসীম আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার সঙ্কীর্ণাদপি সঙ্কীর্ণ কোটরে পুনঃ প্রবেশ করে—হায়! কি বিড়ম্বনা!—যখন বিবিধ ভোগ্যবস্তু সম্মুখে বিস্তৃত দেখি, যখন সকল ব্যক্তিই সেই সকল ভোগ্যবস্তু অবলম্বন করিয়া কেমন সুখে কাল হরণ করিতেছে তাহা ক্রমাগত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দেখিতে থাকি তখন আবার এই পৃথিবী অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয়, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ আবার তখন তাহাদের ইন্দ্রজাল আমার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করে, ভোগের জন্য কুহক-মুগ্ধ আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

জন্য শান্তির অন্য উপায় নাই। অজ্ঞানই সমস্ত দুঃখের মূল। আত্মজ্ঞানই অজ্ঞান-নাশের একমাত্র উপায়।

তখন তিনি—ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—অজ্ঞান নিবারণ জন্য আমাকে সৃজন করিলেন। আমিও পিতার মত অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া পিতাকে অভিবাদন করিলাম। পিতা তখন আমাকে সত্যাখ্য-আসন পদ্মের উত্তর পাপাড়ীতে বসাইলেন। শুভ্র মেঘে যেমন চন্দ্র উপবেশন করেন, আমিও সেইরূপ উপবেশন করিলাম। রাজহংস যেমন সারসের কথা বলে, মৃগচর্ম্ম পরিধায়ী আমার সহিত পিতার তখন সেইরূপ কথা হইতে লাগিল। পিতা আপন কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন বশিষ্ঠ! তুমি ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া যাও। পিতার অভিশাপে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া দিন দিন দুঃখী ও কৃশ হইতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই ভাবিতাম এই সংসার-যাতনা কোথা হইতে আমাকে আক্রমণ করিল! পিতা আমাকে দুঃখী দেখিয়া বলিলেন, পুত্র! তুমি আমাকে দুঃখশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা কর। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম পিতঃ! জীবের দুঃখ কিরূপে আসিল—কিরূপেই বা তাহার শান্তি হইবে—আপনি শীঘ্র বলুন।

পিতা বলিলেন আত্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তোমাকে শাপ-প্রদান দ্বারা অজ্ঞান-গ্রস্ত করিয়া জিজ্ঞাসু করিয়াছি। জিজ্ঞাসু না হইলে জ্ঞানসার উপদেশ শুনিবার অধিকারী কেহই হয় না। সেই জন্য এইরূপ করিয়াছিলাম। পিতা আমাকে আত্মজ্ঞান দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যাহারা সংসার-বিরক্ত বিচারপরায়ণ তুমি তাঁহাদিগকে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর। আমি সর্ব্বদা জ্ঞান দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। সংসারে যতকাল উপদেশযোগ্য লোক থাকিবে ততকাল এখানে আমাকে থাকিতে হইবে।

এই ভাবে আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। সনৎকুমার এবং নারদাদিও এইরূপে পৃথিবীতে প্রেরিত হইলেন। মহর্ষিগণ জীবের মোহনাশ-জন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ, পুণ্য ও জ্ঞান উপদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রচারক্রমও এখানে বলিতেছি। মহর্ষিগণ প্রচার জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেশ বিভাগ করিয়া সেই সেই দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা নির্দ্দেশ করিলেন। লোককে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান অনুষ্ঠান করাইবার জন্য রাজার

আবশ্যক। জীবের ধর্ম্মার্থ কামের অনুষ্ঠান করাইবার জন্য যেমন রাজার সৃষ্টি হইল সেইরূপ স্মৃতিশাস্ত্র এবং যজ্ঞশাস্ত্রাদিও [শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের শাস্ত্র] প্রচারিত হইল।

এইরূপে ধর্ম্মসংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের শাস্ত্র জগতে সৃষ্ট ও প্রচারিত হইল। শুধু প্রচারে ফল কি? প্রচারের বস্তুটি অনুষ্ঠান করিবার লোক থাকা আবশ্যক। আবার যাহারা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্যভিচার করিবে তাহাদের শাসন জন্য রাজা থাকাও আবশ্যক। কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক আবার কতকগুলি বিষয়ে নিয়মের অধীন হইয়া চলাও আবশ্যক। লোকে যে বলিয়া থাকে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নহে এ কথা সত্য নহে। কিরূপে প্রচার করিতে হয় তাহা ঋষিগণ জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই জ্ঞান প্রচারের জন্য তাঁহারা রাজা, সমাজ, শাস্ত্র এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু কালচক্রের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। কালে আবার বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইতে লাগিল। লোক সকল ভোগাভিলাষ ও ভোগপ্রাপ্তির জন্য ধনাদির উপার্জ্জনে অত্যাসক্তি দেখাইতে লাগিল। ধনের জন্য রাজগণের মধ্যে শত্রুতা চলিতে লাগিল। অত্যাচারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। বহু লোক দণ্ডার্হ হইয়া উঠিল। বিনাযুদ্ধে রাজগণ পৃথিবী শাসন করিতে পারিলেন না। প্রজাগণ দৈন্যদশাগ্রস্ত ও অধিকতর দুঃখী হইল।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, আমি ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সংসার-দুঃখ দূর করিবার জন্য এবং জ্ঞান ও নিয়ম প্রচারার্থ বহু জ্ঞান-শাস্ত্র প্রকটন করিলাম। এই কারণে অধ্যাত্মবিদ্যা রাজাদিগের নিকট বর্ণিত হইয়াছিল। তাই ইহার এক নাম হইল রাজবিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা রাজগণ দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইতেন। সে সমস্ত রাজা এখন নাই। হে রাম! এক্ষণে রঘুকুলে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যেমন জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র আমিও সেইরূপ জ্ঞান প্রচার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত।

দেখ রাম! যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানহীন ও বিফলভাষী তাহাকে যে ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসা করে সে নিতান্ত মূঢ়। আবার তত্ত্বজ্ঞানী গুরু যাহা বলেন তাহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে না সেও নিতান্ত অধম।

যে ব্যক্তি গুরুর অজ্ঞতা ও তজ্জ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন করে সে ব্যক্তি উত্তম ও বুদ্ধিমান্। আর যে মূর্খ বক্তার স্বভাবাদি পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ

গ্রহণের ইচ্ছা করে সে যারপর নাই অধম। যে গুরু সহসা অপাত্রে বক্তব্য বলেন সে গুরু সাধুসমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন। রাম! তুমিও যেমন শিষ্য, আমিও সেইরূপ গুরু। তুমি মহান্ হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, সংসারের গতি বুঝিয়াছ, জীবের গতি বুঝিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দান করিলে সর্ব্ব-কার্য্য সিদ্ধ হয়।

এই রামকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য মণ্ডপোপাখ্যান। দৃশ্য-দর্শন মার্জ্জন ভিন্ন কখন পরমপদে স্থিতি লাভ হয় না। দৃশ্য-দর্শন যে মিথ্যা ইহা বুঝাইতেই এই উপাখ্যানের সৃষ্টি। এই উপাখ্যান-কথিত বিষয়গুলি ধারণা করিতে পারিলেই পরমপদে স্থিতি লাভ হইবে।

আমরা এই উপাখ্যান উপন্যাস আকারে কেন বিবৃত করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন ধৈর্য্য ধরিয়া এই কথাগুলি ধারণা করিতে পারিলে বড় ভাল হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এখন যাহার যেরূপ রুচি। আমরা কিন্তু নিজের জন্য ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

দশম অধ্যায়।

আকাশ ভ্রমণে আয়োজন।

যেমন অবরণীয় ভর্গ বরণীয় ভর্গকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সেইরূপ কোন বিদ্যাই সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যাকে ছাড়িয়া থাকে না। কোন বিদ্যাই জীবনের প্রকৃত উপকার করিতে পারে না যদি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠবিদ্যাকে ধরা না যায়।

আমরা লীলা উপন্যাসকে একটু নিকটের বস্তু বলিয়া যদি বুঝিতে চেষ্টা করি তবে ইহাকে বড়ই আপনার বস্তু বলিয়া জানিতে পারি।

আমাদের মধ্যে কি সর্ব্বদা কেহ লীলা করে না? করে। যিনি সর্ব্বদা বিষয়-সংসারে লীলা করেন তিনিই আবার যখন বিপদগ্রস্ত হইয়া ত্রিরাত্রি ব্রতাদি ব্যাপারে বিষয়-মলা ক্ষালন করিতে পারেন তখন তাঁহার জীবন সঙ্গিনীর সহিত দেখা হয়। ইনিই লীলার ইষ্টদেবতা। ইনিই জ্ঞপ্তিদেবী। ইনিই জগতকে সরস করেন বলিয়া সরস্বতী নামে পরিচিতা।

লীলাকে সর্ব্বদা ইঁহার আশ্রয়ে, ইঁহার উপদেশে চালাইবার জন্যই এই উপন্যাস। এইটি জীবনের কার্য্য। যে লীলা কাতরপ্রাণে সরস্বতীর উপাসনা করেন, প্রথমে সর্ব্বদা, অন্ততঃ বিশ্বাসেও সরস্বতীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে অভ্যাস করেন, আবার নিত্যকর্ম্মে তাঁহার নিকটে স্থির হইয়া বসিতে অভ্যাস করেন, প্রতি বিপদে কাতরপ্রাণে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করেন আর ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বদা তাঁহার নামকেই জপমালা করিয়া ফেলিতে পারেন তিনিই বুঝেন এমন জীবনসঙ্গিনী, এমন কি এমন মরণসঙ্গিনীও আর কেহ নাই।

শ্রীদেবী বড়ই আপনার জন; আপনার হইতেও আপনার। ইনি সকলের হৃদয়ে বাস করেন। ধর্ম্মাচরণে শত ত্রিরাত্রি ব্রতাদি পালনে যে কেহ নির্ম্মল হয় সেই ইঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হয়।

দুরন্ত বালককে সৎপথে আনিতে হইলে যেমন সর্ব্বদা তাহার কার্য্যকলাপে দৃষ্টি রাখিতে হয় সেইরূপ সংসারমগ্না লীলাকে সৎপথে আনিতে হইলে সর্ব্বদাই তাহাকে শ্রীদেবীর উপদেশ মত চলিতে হয়। সর্ব্ব হৃদয়বাসিনী শ্রীদেবী সকলের

জন্য সদা জাগ্রত থাকেন। তুমি জাগ্রত থাকিয়া প্রতি ভাবনায় প্রতিবাক্যে প্রতি কার্য্যে তাঁহার শরণে আইস, তোমার সংসার-লীলার উপরেও আরও যে সূক্ষ্মলীলা আছে শ্রীদেবী তোমাকে সমস্ত লীলা-স্থানে লইয়া যাইবেন।

আমরা আর অধিক কিছুই বলিলাম না। এখন লীলা আকাশ-ভ্রমণের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতেছেন সেই কথা আরম্ভ করিব।

চতুর্থদিনের কথা শেষ হইল। প্রভাতে পুনরায় বক্তা শ্রোতাকে বলিতে লাগিলেন।

লীলা ও সরস্বতী যখন ঐ রজনীতে কথোপকথন করিতেছিলেন তখন পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত। গৃহের দ্বার গবাক্ষাদি সমস্তই দৃঢ়বদ্ধ। অন্তঃপুর-মণ্ডপ পুষ্পগন্ধে আমোদিত এবং রাজার শব-দেহ অম্লান পুষ্পমাল্যে ও বসনে আচ্ছাদিত। লীলা ও সরস্বতী তখন শব-পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ নিশ্চল হইল। পরিপূর্ণ অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল মুখ প্রভায় সেই স্থান আলোকিত। তাঁহারা যেন রত্নস্তম্ভে ক্ষোদিত দুইটি চিত্রমূর্ত্তি। ভিতরে কোন চিন্তা নাই তাই সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হইয়া সঙ্কোচ-প্রাপ্ত। যেন দিবা-প্রস্ফুটিত দুইটি পদ্মিনী দিবসান্তে পরিমল উপসংহার করিতেছে; যেন শরৎকালে পর্ব্বতোপরি বায়ুশূন্য সময়ে দুই খণ্ড শুভ্র মেঘ নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া শয়ন করিয়া আছে। লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আর তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান নাই; মনে হইতেছে যেন দুইটি কল্পলতা নববসন্ত সমাগমে পূর্ব্ববসন্ত সঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন পত্রাপগম অবস্থায় অবস্থিত। কি সুন্দর সেই সমাধির দৃষ্টান্ত। সকলামল পূর্ণেন্দুবদন-জ্যোতি সেই দুই বরাঙ্গনা যেন চিত্রলিখিত প্রতিমা, যেন দিবসান্ত অব্জিনী, যেন নির্ব্বাত শরতে গিরিশৃঙ্গে অবতীর্ণ শুভ্র শান্ত স্পন্দবিবর্জ্জিত দুই অভ্রমালিকা। নির্ব্বিকল্প সমাধি কখন হয়?

অহং জগদিতি ভ্রান্তি দৃশ্যস্যাদাবনুদ্ভবঃ।
যদা তাভ্যামবগত স্বত্যন্তাভাবনাত্মকঃ॥ ৮॥

যখন অহং এবং এই জগৎ—এই ভ্রান্তি-দৃশ্যের আর আদৌ উদ্ভব হয় না, আর দৃশ্যভ্রমের আত্যন্তিক উপশমে যখন স্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় তখনই

নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রতিষ্ঠা। ঐ সময়ে অন্তর হইতে দৃশ্য পিশাচ একবারে অন্তর্হত হয়।

লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবস্থায় দৃশ্যের অত্যন্তাভাব দর্শন করিলেন কিন্তু ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন "আমরা তিনকালেই দৃশ্যের অসত্তা, দৃশ্য-দর্শনের মিথ্যাত্ব অনুভব করি। লোকের দৃষ্টিতে মৃগতৃষ্ণাম্বুবৎ এই জগতের প্রকাশটা আমাদের দৃষ্টিতে শশশৃঙ্গের মত সর্ব্বদাই অপ্রকাশ! কারণ "আদাবেব হি যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা॥" মূলে যাহা নাই, তাহা প্রতীত হউক বা না হউক তাহা বর্ত্তমানেও যে নাই তাহা অবধারণ করা যায়।

স্বভাবকেবলং শান্তং স্ত্রীদ্বয়ং তদ্বভূবহ।
চন্দ্রার্কাদি পদার্থৌঘৈর্দ্দূরমুক্তমিবাম্বরম্॥ ১১॥

দৃশ্যদর্শন অস্তমিত হইলে সেই স্ত্রীদ্বয় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিশূন্য মুক্ত আকাশের ন্যায় "আপনি আপনি" ভাবে কেবল অবস্থা,—শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন; প্রলয়কালে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আছে শুধু শূন্য আকাশ; এই দৃশ্য যেরূপ ইহাও সেইরূপ। সরস্বতী জ্ঞানময় দেহে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন আর লীলা ভৌতিক দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া ধ্যান-জ্ঞানের অনুরূপ দিব্যদেহে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

গেহান্তরেব* প্রাদেশমাত্র মারুহ্য সম্বিদা।
বভূবতুশ্চিদাকাশরূপিণৌ ব্যোমগাকৃতী॥ ১৩॥

তাঁহারা পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন আকাশ গমন করিবেন, গিরি গ্রাম দর্শন করিবেন, সেইজন্য পূর্ব্ব সঙ্কল্প-সংস্কার-জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে প্রবুদ্ধ হইবেই। তাঁহারা সেই অন্তঃপুর মণ্ডপের প্রাদেশ পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্ব্বগামী জ্ঞানে ব্যোমগমনের অনুরূপ চিদাকাশমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের দেহঘটে যে আকাশ ছিল তাহাতে অভিমান না করাতে, তাহা খণ্ডভাব ত্যাগ করিয়া অখণ্ডভাবেই স্থিতিলাভ করিল। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন

* গেহান্তরিতি বা পাঠঃ

তাঁহারা দূর আকাশে গমন করিতে লাগিলেন ও পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। যেখানে "দেহান্তপাঠ", সেখানে হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত যে প্রাদেশ পরিমিত স্থান, তাঁহারা নাড়ীমার্গে সেই প্রদেশে আরোহন করিয়া যেন আকাশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য-সম্বলিত মনোবৃত্তি দ্বারা তাঁহারা কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ললিত লোচনা ললনাদ্বয় এখন চিদাকাশ দেহশালিনী। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের রূপ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত গিরিগ্রামাদির অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া তাঁহারা স্নেহরসে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

আকাশ ভ্রমণ।

তীর্থ দর্শন করিয়া মনে মনে তীর্থ ভ্রমণ করা যায়। আকাশ ভ্রমণের বিবরণ শুনিয়া মনে মনে আকাশ ভ্রমণের সুখ অনুভব করায় দোষ কি? সুখভোগটা স্থূলে হয় আর সূক্ষ্মে কি হয় না? স্থূলে সুখভোগের আয়োজন অনেক, কিন্তু সূক্ষ্মে কোন আয়োজন নাই। তথাপি লোক সূক্ষ্মে করেনা কেন? স্থূল-সঙ্গ করিতে করিতে মানুষ বড় মূঢ়-বুদ্ধি হইয়া কর্ম্মেই আটকাইয়া পড়ে তাই ভাবনায় সুখ আনিতে পারে না।

মানুষের পক্ষে আকাশ গমন অসম্ভব, প্রায় লোকে এইরূপ বলে। সত্যই যাহার, "আমি এই স্থূলদেহে আবদ্ধ" এইরূপ মতিভ্রম আছে সে যে আকাশে যাইতে পারেনা ইহা অনুভব-সিদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্থূল নরদেহ-বুদ্ধি নাই, আপনার আতিবাহিক দেহত্ব যাহার নিশ্চয় হইয়াছে সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকালীন দৃঢ় সংস্কারবলে সূক্ষ্মে গমনাগমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুবার অনুভব করিয়াছে যে আমি অনবরুদ্ধ-স্বভাব, সেজন্য আমি অতিসূক্ষ্ম আকাশে, অতি সূক্ষ্মতম ছিদ্রের ভিতর দিয়া গৃহমধ্যে গমন করিতে পারি; তাহার জীব চৈতন্যে তাদৃশ স্বভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে। যোগিদিগকে কেহ জোর করিয়া কোথাও আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বস্থানে যাইতে পারেন, সকল বস্তুই দেখিতে পারেন।

লীলা ও সরস্বতী ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছেন। পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়াছেন। অদ্ভুত নভোমণ্ডল দেখিতে দেখিতে তাঁহারা দূর হইতে দূরে গমন করিতে লাগিলেন। আকাশ একার্ণবের মত—মহাপ্রলয়ান্তে সাগরের মত, যত দেখা যায় ততই দেখা যাইতেছে। ইহা নিতান্ত গম্ভীর, আকাশের অন্তর প্রদেশ নির্ম্মল, অতি স্নিগ্ধ, মন্দমারুত-সংশ্লেষে ইহা অত্যন্ত সুখপ্রদ। এই শূন্য সাগর অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর, সজ্জনের চিত্ত অপেক্ষাও প্রসন্ন—এই শূন্য সমুদ্রে অবগাহন কতই সুখাবহ, কতই আনন্দজনক। ইহারা আকাশ ভ্রমণকালে কখন মেরু-শৃঙ্গস্থিত- দেব অট্টালিকার অভ্যন্তরবর্ত্তী নির্ম্মল জলদমণ্ডলে কখন বা

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল। [৭ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সাবিত্রী

ও উপাসনা তত্ত্ব।

তৃতীয় সংস্করণ।

অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব।

পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য ও ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার প্রণীত।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। উৎসব আফিসে এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য॥

আমাদের আদরের সাবিত্রী হিন্দুকুললক্ষ্মীগণকে পতিনারায়ণ ব্রত শিক্ষা দিবার জন্য পুনরায় নব কলেবরে আসিয়াছেন। ভারতরমণীর সতীত্ব জগতের আদর্শ। এ আদর্শ অন্য কোথাও এরূপ জীবন্ত ভাবে মানবের নয়ন গোচর হয় নাই। যতদিন ভারতে রামায়ণ ও মহাভারতরূপী অক্ষয় বটতরুদ্বয়ের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন ভারতবাসী ঐ মহা তরুদ্বয়ের শ্যামল ছায়াতলে বসিয়া ইষ্ট কর্ম্ম সাধন করতঃ ধন্য হইতে পারিবেন। এই সাবিত্রী সেই মহাতরুর একটি রসাল ফল। এই অমৃতময় ফলের রসাস্বাদনে কত নরনারী চিরতৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন; আর আজও এই মহাদুর্দ্দিনে হিন্দুললনাগণ এই মহীয়সীর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করতঃ স্বামীর সহিত অনন্তকাল মহামিলনের আশায় প্রতিবৎসর ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া থাকেন। সাবিত্রীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। "সাবিত্রীসমানা ভব" বলিয়া কুলাঙ্গনাগণকে আশীর্ব্বাদ করা হয়। মনে হয় ইহার অধিক তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার আর কিছুই নাই। সতীত্বের আদর্শ দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবা মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত কৃতার্থ হইয়া যাইবেন।

সাধারণ ভাবে সতীধর্ম্ম ও সাধনা নামক যে প্রবন্ধ উৎসবে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে ছিল তাহা এই গ্রন্থের শেভাগে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার সন্ধ্যামন্ত্রে সাধনার গুপ্ত রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প রহিল।

প্রকাশক,

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সাবিত্রী

ও উপাসনা তত্ত্ব।

তৃতীয় সংস্করণ।

অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব।

পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য ও ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার প্রণীত।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। উৎসব আফিসে এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য॥

আমাদের আদরের সাবিত্রী হিন্দুকুললক্ষ্মীগণকে পতিপরায়ণ ব্রত শিক্ষা দিবার জন্য পুনরায় নব কলেবরে আসিয়াছেন। ভারতরমণীর সতীত্ব জগতের আদর্শ। এ আদর্শ অন্য কোথাও এরূপ জীবন্ত ভাবে মানবের নয়ন গোচর হয় নাই। যতদিন ভারতে রামায়ণ ও মহাভারতরূপী অক্ষয় বটতরুদ্বয়ের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন ভারতবাসী ঐ মহা তরুদ্বয়ের শ্যামল ছায়াতলে বসিয়া ইষ্ট কর্ম্ম সাধন করতঃ ধন্য হইতে পারিবেন। এই সাবিত্রী সেই মহাতরুর একটি রসাল ফল। এই অমৃতময় ফলের রসাস্বাদনে কত নরনারী চিরতৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন; আর আজও এই মহাদুর্দ্দিনে হিন্দুললনাগণ এই মহীয়সীর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করতঃ স্বামীর সহিত অনন্তকাল মহামিলনের আশায় প্রতিবৎসর ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া থাকেন। সাবিত্রীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। "সাবিত্রীসমানা ভব" বলিয়া কুলাঙ্গনাগণকে আশীর্ব্বাদ করা হয়। মনে হয় ইহার অধিক তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার আর কিছুই নাই। সতীত্বের আদর্শ দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবা মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত কৃতার্থ হইয়া যাইবেন।

সাধারণ ভাবে সতীধর্ম্ম ও সাধনা নামক যে প্রবন্ধ উৎসবে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে ছিল তাহা এই গ্রন্থের শেভাগে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার সন্ধ্যামন্ত্রে সাধনার গুপ্ত রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প রহিল। প্রকাশক,

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উপাসনা স্বভাবিক।

স্বামী। পূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছ উপাসনার প্রচলিত অর্থ হইতেছে শ্রীভগবানের নিকট উপবেশন। দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে স্থিতি। একটিতে হয় মিলন, অন্যটিতে হয় মিশ্রণ। প্রথমটীর মুখ্য কার্য্য হইতেছে ধ্যান আর আনুসঙ্গিক কার্য্য হইতেছে প্রার্থনা, কথা কওয়া, পূজা, প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও জপ ইত্যাদি। গীতা এই জন্য বলেন "মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে"। দ্বিতীয় প্রকারটির মুখ্য ব্যাপার হইতেছে সমাধি বা স্থিতি।

স্ত্রী। কত মানুষত উপাসনা করে না। তবে উপাসনা যে মানুষের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম তাহা বল কিরূপে?

স্বামী। সূর্য্যের ধর্ম্ম আলোক দেওয়া আর তাপ দেওয়া। সূর্য্য উদয় হইলেই আলোক ও তাপ থাকিবেই। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য্যকে যদি মেঘ ঢাকিয়া রাখে তবে আলোক ও তাপ পাই না। পাই না বলিয়া কেহ কি বলে সূর্য্যের স্বভাব নষ্ট হইয়া গেল? মানুষ উপাসনা করে না বলিয়া কি বলিতে হইবে উপাসনা স্বাভাবিক নয়?

স্ত্রী। বুঝিতে পারিতেছি না। মেঘ যেমন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ কিসে মানুষকে ঢাকিয়া রাখে যাহাতে মানুষ উপাসনা করে না?

স্বামী। মানুষের প্রকৃতিতে তিনটি বস্তু আছে যখন যেটি জাগে তখন সেইটি তার স্বভাব মত কার্য্য করে। রজঃ ও তম গুণ জাগিলে বিষয়ের উপাসনা হয় আর সত্ত্বগুণ জাগিলে পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। অভাব জাগিলেই সেই অভাব দূর করিবার জন্য যাহা দ্বারা অভাব দূর হয় তাহার উপাসনা করিতে হইবেই।

স্ত্রী। সহজ করিয়া বল।

স্বামী। আচ্ছা দেখ সংসারে কে কাহার উপাসনা করে? দরিদ্র ধনীর উপাসনা করে, দুর্ব্বল সবলের উপাসনা করে, মুর্খ বিদ্বানের উপাসনা করে, পীড়িত বৈদ্যের উপাসনা করে, ক্ষুধিত অন্নদাতার উপাসনা করে, বদ্ধ মুক্তিদাতার উপাসনা করে। এক কথায় দুঃখী, যিনি দুঃখ দূর করিতে পারেন তাঁহার উপাসনা করে। ইহা স্বাভাবিক।

যাহাদের স্বভাব অত্যন্ত তামসিক তাহারা নিজের আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন লইয়াই ব্যস্ত। আহার নিদ্রাদি ইহাদিগকে সুখ দান করে। যদ্দ্বারা এইগুলি

লাভ হয় ইহারা তাহার উপাসনা করে। যে ইহাদিগকে এইগুলির সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া দেয় ইহারা তাহার উপাসনা করিবেই। আর এইগুলির বিঘ্ন যে জন্মায়, তাহাকে ইহারা ঘৃণা করে। ইহাদের স্বভাবে প্রতিহিংসা অতিশয় প্রবল। ইহারা ক্ষমা করিতে প্রায় জানে না। সর্ব্বদা ইহারা অন্ধকারে থাকে। ইহাদের জ্ঞানসূর্য্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন থাকে। মৃত্যুর পরে ইহারা ক্রিমি কীটাদির যোনি প্রাপ্ত হয়।

যাহারা রাজসিক তাহারাও সর্ব্বদা অভাবগ্রস্ত বলিয়া দুঃখ পায়। ইহাদের আশা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। ইহাদের জ্ঞানসূর্য্যও মেঘে ঢাকা থাকে। যাহারা রজস্তমাচ্ছন্ন তাহারা বিষয়ের উপাসনা করিয়াই বহুকষ্ট পায়। তথাপি ইহাদের উদ্ধারের পথ আছে। প্রকৃতির কষাঘাতে যখন ইহাদের রজস্তম এক একবার অভিভূত হয় তখন ইহাদের সত্ত্বগুণ জাগে। কারণ সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ চিরদিন এক সঙ্গেই থাকে। রজস্তম প্রবল হয় বলিয়া সত্ত্বগুণ জাগে না। ইহারা সৎসঙ্গাদি উপায়ে যখন রজস্তমকে পরাস্ত করে তখন সত্ত্বগুণ ইহাদের মধ্যে জাগিবেই। জাগিলেই ইহারা পরমেশ্বরের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না।

রজস্তমকে পরাস্ত করিয়া সত্ত্বগুণ জাগাইবার জন্যই সাধনা করিতে হয়। রজ গুণের কার্য্যের নাম বিক্ষেপ এবং তম গুণের প্রধান কার্য্য হইতেছে লয়। গুণ অর্থ রজ্জু। সত্ত্বরজস্তমগুণে জীব বদ্ধ। সত্ত্বগুণের দ্বারা যখন বন্ধন হয় সে বন্ধন হইতে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। পরমেশ্বর সহায় হইয়া মুক্তি দিয়া থাকেন। কিন্তু রজস্তমের বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন। এ বন্ধন কাটাইবার জন্য সাধন-ক্লেশ সহ্য করিতে হইবেই। মানুষ সংসারে ভব-রোগাক্রান্ত। সেই জন্য জীব দুঃখী। বন্ধন দশায় থাকে বলিয়াই দুঃখ। যে গুণে বাঁধা পড়িয়াছে সে স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না বলিয়াই দুঃখী।

মানুষ শরীরিক ব্যাধিতে ক্লেশ পায়; মনের আধি যে কাম ক্রোধ তাহাতে দুঃখ পায়। এতদ্ভিন্ন অজ্ঞানজনিত বহু দুঃখ ত আছেই। স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর এই তিন শরীরে মানুষ বদ্ধ। যিনি বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন, সে শক্তি যাঁহার আছে মানুষ তাঁহার উপাসনা না করিয়া থাকিতেই পারেনা। বিষয়ের উপাসনা করিতে করিতে মানুষ যখন নানাবিধ দুঃখ পায় তখন মানুষ পরমেশ্বরের দিকে ফিরিবেই। তাই বলিতেছিলাম উপাসনা স্বাভাবিক।

স্ত্রী। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু প্রার্থনা, পূজা, আরতি, ইত্যাদিও কি উপাসনা?

স্বামী। প্রার্থনা, পূজা, আরতি, ধ্যান এগুলি উপাসনার অঙ্গ বটে। প্রকৃত উপাসনাটি যাহা তাহাতে ভালবাসা থাকিবে। প্রার্থনা হইতেছে উপাসনার সর্ব্ব নিম্নস্তর। এখানে বিশ্বাস হইতেছে ভিত্তি-ভূমি। আমার একজন আছেন, তিনি আমার দুঃখ দূর করিতে পারেন, ইহার নাম বিশ্বাস। যাঁহারা বিশ্বাসী প্রার্থনাই তাঁহাদের সম্বল। প্রার্থনা দ্বারা উপাসনায় পৌছান যায় কিন্তু প্রার্থনাটিকেই উপাসনা বলে না। উপাসনাতে তাঁহার সমীপে বসিতে হয়। ভয়ে, আশায় ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে উপাসনা তাহা নিম্নশ্রেণীর। কিন্তু অনুরাগে যে উপাসনা তাহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ভয়ে ও আশায় যে উপাসনা তাহা বলপূর্ব্বক করাইতে হয়। ইহা সকাম। কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে উপাসনা তাহার ভিত্তিটি অনুরাগের নিম্ন অবস্থা। কিন্তু ভালবাসায় যে উপাসনা তাহাতে 'জোর' নাই।

বলিতেছিলাম উপাসনা স্বাভাবিক। রজস্তম গুণে থাকাই দুঃখ। দুঃখ দুর করিবার জন্য, রজস্তমের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্যও উপাসনা করিতে হয় সত্ত্বগুণ জাগিলেই কিন্তু যথার্থ উপাসনা হয়।

মনের মানুষ।

মনের মানুষ একটা চাই। সকলেরই চাই। কথা কহিবার কেহ না থাকিলে কাহারও চলে না। যখন বাহিরের লোক যুটে না তখন মনে মনে কথা কহিতে হয়

স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি একাকী রতি অনুভব করেন নাই। যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তা একাকী-অবস্থায় রতিলাভ করেন নাই, সেই জন্যই কোন সৃষ্ট বস্তুও একাকী রতি লাভ করিতে পারে না। তাই দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। একই দুই হইয়া সুখী হইলেন। প্রথমে এক—"আপনি আপনি।" ক্রমে দুই। ক্রমে বহু। এইরূপ সব।

কথা কওয়াটা চাই। কখন আমি কথা কই। কখন সে কথা কয়, তাহা শুনি। শুনায় সুখ—শুনাইতে সুখ। এই যাহার হইল তাহার সব হইল। সে নিশ্চিন্ত হইল। আর বাহিরের কোন কিছুর আবশ্যক থাকিল না। এই মনের মানুষ পাইবার জন্য অনেক করিতে হয়। প্রথমে বাহিরে যুটে, শেষে ভিতরে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া গেল। "ধিয়া দৃষ্টে তত্ত্বে রমণমটনং জগতমিদম্"। ইদং জগতমটনং রমণং ক্রীড়নমেব ন পীড়নমিত্যর্থঃ।

মনের মানুষ মিলিলেই—ভিতরে মিলিলেই—চিত্ত প্রসন্ন হইয়া গেল। মনের মানুষ যে তার চৈতন্য-মাত্রত্ব স্বভাব। চিত্তের চিত্তত্ব এই। এই যখন হইল তখন আর এখানে ওখানে সেখানে, এর ওর তার কাছে, যাওয়া নাই। "দূরবন্ধুর্গতোহং" বলিয়া কোন দুঃখ নাই। তখন মনের মানুষকে মনে পাইলে যে জগৎ-ভ্রমণ হয় সেটা কি আর ভ্রমণ? সেটা রমণ সেটা পীড়ন নয়।

প্রাতে পদ্ম, অবলালয়, চন্দ্রকলা, রক্তবিন্দু, মণিমণ্ডপ, হংস, ত্রিকোণ কত কি করা হইল। খুব সাধনা চলিল। সব ভাল হইল। মনের মানুষ কথা কহিল। বলিল সব কর। আদত জিনিবটি ভুলিয়া নয়।

একটু চাহিয়া ও দেখিল। জিজ্ঞাসা করা হইল—কি বলিতেছ?

কি আর বলিব! দ্বিতীয়মৈচ্ছংটি দেখ। এইটি ভুলিও না। এই যে যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা কিন্তু উলঙ্গ পুরুষের তিন ফের্‌তা কাপড় পরা। লোক দেখিলেই লজ্জা—কাপড় পরা। যখন কেহ নাই তখন কাপড় পরা নাই। উলঙ্গ। "আপনি আপনি।"

কাপড়ও নাই। কাপড় পরাও নাই। উলঙ্গই উলঙ্গ। সব ফাঁকি সব ভেল্‌কি। "একাকী ন রমতে" তাই ইন্দ্রজাল। করা ধরা সব ফাঁকি। দুঃখ শোক, কি করিব, কি না করিব, এর সঙ্গ চাই, ওর সঙ্গ চাই না—এ সব ভেল্‌কি। সব মতলব করা, না করা সব ফাঁকি। অসঙ্গের সঙ্গ জন্য যা কিছু সবই ইন্দ্রজাল। সবই মিথ্যা। এইটি বেশ করিয়া মনে রাখিয়া যা পার কর কিন্তু 'খেই' হারাইও না। তার উপরে ইন্দ্রজাল ভাসিয়াছে। সেই সে। দ্বিতীয় একেবারেই ফাঁকি। তবুও করিতে হয় তাই করা। মূলটি না জানিয়া যা কর তাতেই কিন্তু সাধন বাঁধন। সাধের কাজল। নিরঞ্জনের অঞ্জন। দাদামহাশয় ঠিক বলিয়াছেন—'ব্যঞ্জনে অঞ্জন লেগে যায় স্বর শুকিয়ে ফাঁকি। আমি কি ব'লে তায় ডাকি।' তবুও একটা ডাকা ডাকি চাই। হারার চাইতে গোলমাল,

ক'রে দেওয়া ভাল। নতুবা "সরিতে হয় একবারে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সরিয়া পোষ্টকার্ডে জানান—আরও সবুর ?"

মূল কথা—সাপটি নাই, আদৌ নাই। দড়ী গাছটিই দড়ীগাছটি। তবু ও ভূত ছাড়াইবার জন্য এত আড়ম্বর। অদ্ভুত রঙ্গ।

আবিরাবিমএধি।

আত্ম-তত্ত্ব বুঝিয়া, বিপুল বিশ্বের নিখিল রহস্য করধৃত কুবলয় ফলবৎ স্বায়ত্তীকৃত করিয়া, সাধনার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তবে সাধনা করিব তাও কি আর হয়? বামনের চাঁদে হাত? পঙ্কিলের পরম পবিত্র পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দের স্পর্শানুভূতি? মসকের হস্তীলীলার বিড়ম্বনা? গোবর গণেশের গিরিধারী-গোবিন্দের ন্যায় গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রয়াস?

হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমাতে আবির্ভূত হও। ঠাকুর! তুমি প্রসন্ন হও; তুমি বেদে, পুরাণে, দর্শনে ও সংহিতায় আত্ম প্রকাশ করিয়াছ। শ্রীগুরু রূপে তুমি শাস্ত্রমুখে আত্ম প্রকাশ করিয়া, শ্রীগুরুর মুখারবিন্দ-মকরন্দরূপ প্রবচনসমূহ পান করাইয়া আমাকে সরস করিয়া, মধুর করিয়া—মাতোয়ারা করিয়া, শ্রীগুরুরূপী তুমি, আমাতে প্রকাশিত হও। আমাকে তোমার ভাবে ভাবিত করিয়া, তোমার কল্যাণ-কর-পথে লইয়া যাও। তোমার বরণীয় ভর্গ আমার কাছে প্রকাশিত কর। আমি যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করি,—তুমি আমাকে কল্যাণবর্ত্মে প্রণোদিত করিতেছ,—আমি তোমার সান্দ্রানন্দ সুধাসমুদ্রে অবগাহন করিতেছি। প্রতিবারের সাধনায় আমার যেন এই অবস্থা হয়। "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই তোমার আদেশ, অমান্য করিবার আমি কে? শব্দ আমি উচ্চারণ করিতে পারি না—অর্থ আমি বুঝি না। তোমার আজ্ঞা "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" আমি এই 'পরোয়ানার' বলে আলস্য ও জড়তা কাটাইবার প্রয়াস পাইয়া, তোমার বাক্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অহরহঃ সন্ধ্যো-পাসনা করিতেছি, তুমি অহরহঃ প্রতিবারে "প্রচোদয়াৎ" করিয়া দাও, ঠিক্ ঠিক্

ভাবে করিয়া দাও। তোমার বাক্য বেদ, তোমার বাক্য পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র তর্ক যুক্তিতে কে তোমকে বুঝিবে বা বুঝাইবে? তুমি শ্রীগুরু রূপে বেদ পুরাণাদি নিখিল শাস্ত্র উদ্ভাসিত করিয়াছ, আবার এখন শ্রীগুরুরূপে সেই সকল শাস্ত্র আমাতে আবির্ভূত হউক—দেদীপ্যমান হউক। শাস্ত্র জীবন্ত গুরুমূর্ত্তি ধারণ করুক। তুমি গুরু থাকিতে আমি অন্ধকারে!—তুমি ভেলা থাকিতে আমি অজ্ঞান পারাবারে!—"অহো মন্দভাগ্যোঽস্মি নিতরাম্"—অহো! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে? তুমি জ্যোতিরূপে—তুমি ভেলারূপে আমাতে আবির্ভূত হও! মোহান্ধকারে আমি পথ পাইতেছি না প্রভূ! এই অজ্ঞান পারাবার উত্তালতরঙ্গ তুলিয়া দুঃখ-দৈন্যের শতশত নিত্য নূতন ঘাতপ্রতিঘাতে আমাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিতেছে। এই অকিঞ্চন দীনাতিদীনকে তুমি শাসন কর,—"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" আর বিলম্ব করিও না ঠাকুর। "আবিরাবির্ম্ম এধি।" হে স্ব-প্রকাশ! তুমি আমাতে আবির্ভূত হও।

ভারতের অসুখ।

দক্ষিণাপথে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরম্ আর উত্তরাখণ্ডে হরিদ্বার, হৃষিকেশ পর্য্যন্ত ত দেখা হইল—সর্ব্বত্রই মনে হইতেছে ভারতের অসুখ। কি গৃহী, কি ভেকধারী সকলেরই এক প্রকারের অসুখ, কাহারও যেন মনের সুখ নাই, তাই সবারই অসুখ। শারীরিক সুখ বাড়াইবার জন্য নানা প্রকারের চেষ্টা ও কার্য্য বাড়িয়াছে—মনকে ক্ষণিক সুখে সুখী করিবার জন্য বহু চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু যে সুখে মানুষ শান্ত হয় সে সুখ কোথাও দেখা যাইতেছে না। তাই বলিতেছি—ভারতের সর্ব্বত্রই অসুখ।

পৃথিবীর অন্য সকল নরনারীর এই অসুখ করিয়াছে কিনা তাহা আমরা বলিলাম না। না বলাই উচিত। কারণ যেমন ভাবে আমরা আমাদের ভারতকে জানি তেমন ভাবে পৃথিবীকে জানি না। একটী প্রাণীর যে অসুখ, সমস্ত জাতির সেই অসুখ। তবে যদি কেহ অসুখ স্বীকার না করেন তবে বলিব—হয় তাঁহার মন বলিয়া যাহা ছিল তাহা অতিশয় বিকৃত হইয়া গিয়াছে অথবা তিনি

এমন বিকারগ্রস্ত হইয়াছেন যাহাতে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে কেমন আছেন—তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন বেশ আছি। আহারের সময় আহার এবং বিহারের সময় বিহার করি—আর বেশ থাকি। কিন্তু এখনও যিনি প্রকৃতিস্থ আছেন তিনি বলিবেন কতই ত করি, কিছুতেই সুখ পাই না—কিছুতেই শান্তি পাই না। সমস্ত জীবন ধরিয়া দেখিতেছি, দু'দিন এক ভাবে কাটাইতে পারি না। কি সাধন-ভজনে—কি পর-হিতকর কর্ম্মে—কি সংসার-যাত্রায়—সুখটা বড়ই অল্প হইয়াছে। এই আইসে এই চলিয়া যায়—সাধ্য-সাধনা করিলেও থাকে না। নিজেরও থাকে না, অন্য যাহাদিগকে সুখী দেখিতে চাই তাহাদেরও থাকে না। এই অসুখ কেন হইতেছে তাহার মূলটী ধরিবার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের উৎপত্তি।

ভারত যাহা ছিল এখন আর সে ভারত নাই। কেন নাই? ভারতের সে বিশ্বাস গিয়াছে। যে বিশ্বাস ভারতকে শান্তি দিয়াছিল—সুখ দিয়াছিল—সে বিশ্বাস আজ বহুলোক-সঙ্গে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাই ভারত অসুখী। যে বিশ্বাসের কর্ম্ম করিয়া ভারত সমস্ত জগৎটা ব্রহ্মমন্দির দেখিত—যে বিশ্বাসে কর্ম্ম করিয়া ভারত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি ভূতগণকে পূজা না করিয়াও ইহাদিগকে ব্রহ্মের প্রকাশ-স্থান ভাবিতে পারিত—এই সমস্ত প্রকাশ স্থানে—এই সমস্ত মন্দিরে একমাত্র শ্রীভগবানকেই ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে দর্শন করিয়া আনন্দে ভরিয়া যাইত, আর মন্দির দেখিয়াও সর্ব্বত্র নমস্কার করিত—আজ সে বিশ্বাস নাই, সে বিশ্বাসে কর্ম্মও নাই। যে বিশ্বাসে এবং যে বিশ্বাস-জনিত কর্ম্মে ভারত দেখিত পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া—সর্ব্বত্র পূর্ণ থাকিয়াও—"আপনি আপনি" থাকিয়াও সর্ব্বত্র স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়াও এবং স্ব স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হইয়াও কেবল মাত্র একাংশে এই জগতে প্রবেশ করেন; প্রবেশ করিয়া সর্ব্ব পদার্থের—সর্ব্ব দেহের—সকল প্রাণীর প্রাণরূপে তিনি বহিতেছেন; যে বিশ্বাসে ও যে বিশ্বাসজনিত কর্ম্মে ভারত দেখিত সেই সর্ব্ব লোকনিয়ন্তাই—সেই জগৎ প্রসবিত্রীই শ্বাস প্রশ্বাস রূপে জগজ্জীবধারিণী; যে বিশ্বাসে ও যে বিশ্বাসজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভারত দেখিত সেই জগতের প্রাণ-স্বরূপের জ্বলন্ত তেজই সূর্য্য, তারকা, অগ্নি বিদ্যুৎ সকলকে দীপ্তি দিতেছে, যে বিশ্বাস ও বিশ্বাসজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভারত দেখিত প্রাণিগণের শরীরে শক্তি ও উৎসাহ, নর নারীর মুখশ্রী ও আত্মার দেবভাব সেই অনন্ত চিন্মণির ঝলকমাত্র, যে

বিশ্বাসে বর্ম্ম করিয়া ভারত দেখিত এই সর্ব্বত্র সুশোভিত জগৎ মন্দিরে তিনি প্রবেশ করিয়াই ইহাকে শোভাময় করিয়াছেন। আর তখনকার আর্য্যগণ জগতের যে ভাগে তাহার মহিমাচ্ছটা দেখিতেন সেইটি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা তাঁহার পূজা করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া তাঁহারা সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু বরুণাদি দীপ্তিমান প্রভাবের পূজা করিতেন; তাঁহারই জপ যজ্ঞাদি সমারোহে করিয়া এই ভারতকে যজ্ঞধূমগন্ধে পরিপূরিত করিয়া রাখিতেন আবার যজ্ঞাদির শেষে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসে নিজ অন্তরাকাশে তাঁহার প্রকাশকেই অনন্ত প্রকাশ রূপে দেখিয়া সর্ব্বপ্রকার অসুখ দুর করিতেন। যে বিশ্বাসে ও বিশ্বাসজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভারত এই ভাবে পূর্ণ থাকিত—আজ বহুলোক-সঙ্গে বহু ব্যভিচারে, বহু আচার-ভ্রষ্ট-আহারে, জম্বুক-ধর্ম্মীর বচনচ্ছটায় ভারত সে বিশ্বাসে সংশয় তুলিয়াছে, সে বিশ্বাজ ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়িয়াছে,—তাই ভারতের এই অসুখ।

শুধু দুঃখ দেখিয়াই ত কোন লাভ নাই। এই অসুখের কোন প্রতিকার আছে কি? আছে। অসুখটি আগে বেশ করিয়া জান। জনে জনে জান। সমষ্টিতেও জান। জানিয়া অসুখ দূর করিবার কার্য্য কর। মনের অসুখ যদি দূর করিতে চাও তবে মনকে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত কর—মনকে বাক্যে প্রতিষ্ঠিত কর। এই বাক্য হইতেছে—গুরুবাক্য ও বেদান্তবাক্য। গুরু ও বেদান্তবাক্যে যে বিশ্বাস তাহারই নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হারাইয়া ভারত অধঃপাতে ছুটিতেছে। শ্রদ্ধা আনিতে পারিলে ভারত আবার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিয়া জগৎকে ব্রহ্ম-মন্দিররূপে দেখিতে পারিবে। এই জন্য শ্রুতি—মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছেন "বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মানোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ আবিরাবির্ম্মএধি।" হে আবিরাবি! হে স্বপ্রকাশ! হে জ্যোতির্ম্ময়! অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ী বেদমাতা জগজ্জননি! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও।

"মুড়া মুড়ো" বাদ দিয়া শুধু "আবিরাবির্ম্মএধি" বলিলে কি হইবে। পূর্ব্বের কর্ম্মটী—পূর্ব্বের অনুষ্ঠানটি—সেই বাক্যকে মনে এবং মনকে গুরু ও বেদান্ত বাক্যে যে শ্রদ্ধা তাহাতে আবার দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তবে ভারত আবার ভারত হইবে।

যাহারা সাধনা করেন আর বলেন একদিন বেশ হয় তার পর দিন কিছুই রস পাওয়া যায় না সাধকের এই যে অসুখ এই অসুখের কারণটি হইতেছে মনকে গুরু ও বেদান্ত বাক্যে প্রতিষ্ঠার কার্য্যটি না করা।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অঘমর্ষণ-মন্ত্র-ভাবনা ও প্রাণায়াম।

---:*:---

স্বামী। মার্জ্জন মন্ত্রের শেষ মন্ত্রের অর্থ-চিন্তা হইতেছে অঘমর্ষণ-মন্ত্র-ভাবনা। এই চিন্তা এত সুন্দর যে যিনি ইহা প্রত্যহ চিন্তা করিতে সমর্থ তিনি যতক্ষণ ঐ চিন্তা লইয়া থাকিতে পারেন ততক্ষণ দেবতা ভাবেই স্থিতিলাভ করেন। ভগবদ্দর্শন ইঁহার পক্ষে অসম্ভব হইতেই পারে না। জগজ্জননী গায়ত্রী যে এই মন্ত্রেও পাপক্ষয় করিয়া, পবিত্র করিয়া, জাগ্রত অভিমানী জীবকে তাঁহার স্বরূপ যে পরমশান্ত রমণীয় দর্শন তুরীয় ব্রহ্ম—সর্ব্বজীব হৃদয়বিহারিণী গায়ত্রীদেবী যে জীবকে সেই অবস্থায় প্রেরণা করেন, করিয়া দেখিলেই, যিনি অকপট ভক্ত, তিনি তাহা অনুভব সীমায় আনিতে পারেন। এই মন্ত্রের শক্তি এরূপ যে ইহাকে উপাসনা করিয়া হৃদয়ে একবার আনিতে পারিলে ইনি বহুকাল হৃদয়ে থাকেন। কোন বিষয়ের চিন্তা আসিতে দেন না। যে গায়ত্রী আত্মারূপে, অন্তর্যামীরূপে, অমৃত রূপে তাঁহার এই জগৎরূপী শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন, থাকিয়া সকলকে প্রেরণা করিতেছেন অথচ যিনি তাঁহার সর্ব্বপ্রকার জড় দেহ হইতে পৃথক; যাঁহাকে কোন জড় বস্তু জানে না; তিনি এই জড় দেহ কোথায় পাইলেন—জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল—এই সৃষ্টিতত্ত্ব মার্জ্জনের শেষ মন্ত্রে বুঝান হইয়াছে। 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' মন্ত্রের অর্থ ধারণা করিতে পারিলে মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইবে। তখন এই সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা বিচার আসিবে জাগ্রতাভিমানী চৈতন্যই স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য হইয়া সূক্ষ্ম জগতে বিহার করেন। তিনিই আবার সুষুপ্তাভিমানী চৈতন্য হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর ছাড়িয়া, খণ্ডভাব ত্যাগ করিয়া অখণ্ডভাবে প্রবেশ করেন। অখণ্ডভাবের সহিত মিলিত হইয়া পরে তাঁহার সহিত মিশ্রিত হন, হইয়া পরমপদে বা আপন তুরীয় স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব না বুঝিলে কিছুতেই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হওয়া যায় না। তাই সর্ব্বশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা কোন না কোন প্রকারে বলা হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিলেই জানা যায় চেতন

পুরুষ সর্ব্বদা অসঙ্গ কিরূপে? চেতন যিনি তিনি অসঙ্গ ইহা জানিলে এবং জানিয়া অসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে পাপ আর কাহার হইবে? উপাসনা দ্বারা অসঙ্গ ভাবটিতে স্থিতিলাভ করিলে এইক্ষণেই বুঝা যায় পাপ কে করিয়াছিল, পাপ বা কাহার হইয়াছিল? এই মন্ত্রকে এই জন্ম অঘমর্ষণ মন্ত্র বলে।

স্ত্রী। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে জীব অভিনয় করিতে নামিয়াছে। অভিনয় করিতে করিতে আমি কে, আমার স্বরূপ কি, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কেনই এত যাতায়াত করি, কোন্ কার্য্য এখানে করি, কেন শান্তি পাই না, কি চাই কি ভুলিয়া দুঃখ পাইতেছি, অভিনয় করিতে করিতে পুরুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতিই এই সৃষ্টি তুলিয়াছে। প্রকৃতি আপনি নিঃসার। ইনি পুরুষকে লইয়াই তাঁহাকেই জগৎরূপে দেখাইতেছেন। কাজেই সৃষ্টিটি না বুঝা পর্য্যন্ত প্রকৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। পুরুষ প্রকৃতিতেই বদ্ধ; চৈতন্য, দৃশ্য দর্শনেই মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত। আপনার স্বরূপ বিস্মৃতিই দুঃখ। প্রকৃতি এই অনিষ্ট করেন বলিয়া প্রকৃতিকে জানিয়া প্রকৃতির হাত হইতে এড়ান পুরুষের কর্ত্তব্য। এইত বলিতেছ?

স্বামী। তুমি যেন আরও কিছু বলিতে চাও? তা বলনা কেন? তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ। তবে একটু যেন কিন্তু—

স্ত্রী। মনের কথা টানিয়া বলা এ তোমার এক বিদ্যা। এ বিদ্যা বা কোথায় শিখিয়াছ? আমি বলিতেছিলাম প্রকৃতি কি এতই খারাপ যে ইহার কার্য্য যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তাহা জানিয়া প্রকৃতির সঙ্গ একবারে ত্যাগ করিয়া তবে পুরুষ সুস্থ হইতে পারেন? সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে চাই। কেন চাই? কারণ, জানিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া তবে স্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ করিব? হায়! প্রকৃতি! তুমি কি পুরুষকে দুঃখ দিতেই জন্মগ্রহণ কর?

স্বামী। তুমিই বা প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া আপনা ভুলিয়া এ দুঃখ কর কেন? প্রকৃতি পুরুষের মতন পুরুষকে, কিছুই করিতে পারেন না। 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং' মনে কর। তবে যে পুরুষকে প্রকৃতি মুগ্ধ করেন তিনি একটি কল্পিত পুরুষমাত্র। স্মরণ রাখ শ্রুতি বলিতেছেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি।" যাক্ এসব কথা! বন্ধন, মুক্তি এ সমস্তই কল্পনামাত্র।

বন্ধন সর্ব্বদাই স্বাপ্ন বন্ধন। স্বপ্ন দেখা ছাড়িলেই যিনি আছেন তিনিই আছেন। যতদিন স্বাপ্ন বন্ধন ততদিন দুঃখ।

যতদিন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আছে ততদিন দৃশ্য দর্শন আছে। যতদিন দৃশ্য দর্শন আছে ততদিন পুরুষের একটা বন্ধন আছে। বন্ধন থাকিলেই দুঃখও আছে। আভাস চৈতন্য বা চৈতন্যের একটা প্রতিবিম্ব জড়ের উপর পড়ে। জড়ের সহিত মিশিয়া এই আভাস চৈতন্য জড়কে চঞ্চল করে। আর জড়ের কর্ম্মে চৈতন্যই কর্ম্ম করিতেছেন এই একটা আরোপ হয়। এই আরোপে চৈতন্য যেন নিজের স্বভাবটি ভুলিয়া জড়কেই ভাবেন এই আমি। প্রথমে এই দেহকে বা বাগান, বাড়ী, কাপড়, চোপড় সকলকে আমার, আমার বলা হয়। 'আমার' কথার অর্থ হইতেছে আমিটিকে বা চৈতন্যকে কোন বস্তুতে মাখান। আমি মাখান যাহা তাহাই আমার। কাজেই "আমারের" ক্ষতি হইলেই 'আমির' দুঃখ। যে আমিটিকে আমির স্বরূপ যে পূর্ণ চৈতন্য অথবা পরমপদ, অথবা জগজ্জননী গায়ত্রীর চরণ কমলে তাহা মাখাইয়া ফেলিতে পারে তাহার দুঃখ থাকে না। জড় হইতে যে চৈতন্যকে পৃথক করিতে পারে তাহার দুঃখ নাই।

দুঃখী পুরুষকে সুস্থ করার জন্যই সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা। তুমি নিজেই প্রকৃতি সত্য। কিন্তু সেটা এই স্ত্রী দেহে অভিমান করিয়াছ বলিয়া। কিন্তু যে পুরুষ আপনাকে বদ্ধ ভাবেন তিনি আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে যে পারেন তাহাও প্রকৃতিরই সাহায্যে। "যে মাতা বাঁধেন মোহে মোহমুক্ত করিতেও তিনি" একথা স্মরণ রাখ। রজস্তম ভাবেই বন্ধন। সত্ত্বগুণে যে বন্ধন তাহা কিন্তু মুক্তির জন্য। এই শুদ্ধ সত্ত্বগুণ দিয়াই উপাস্য দেবতা মূর্ত্তিধারণ করেন। বরণীয় ভর্গ ইনিই। গায়ত্রী ইনিই। ইনি ভিন্ন মুক্তি কেহই দিতে পারে না।

স্ত্রী। আমি ভুলিয়া গিয়াই দুঃখ করিয়া ফেলি। মার আমার ঘোরা ও অঘোরা দুই মূর্ত্তি। অঘোরা মূর্ত্তিতে মা আমাদিগকে আমাদের স্বরূপে লইয়া যান। আহা! মা তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার করি। নমস্কার ভিন্ন আর আমার কি আছে মা? তুমি কৃপা কর। তুমি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সেই রমণীয়-দর্শনের পাদমূলে লইয়া চল।

স্বামী। এখন আর চক্ষের জল ফেলিও না। তত্ত্ব কথা বুঝ। বুঝিতে প্রাণপণ কর। যেখানে বুঝিতে প্রাণপণ করিয়াও পারিবেনা সেখানে কাতরভাবে শরণাপন্ন হও—ইহাই দৈব ও পুরুষকারের আশ্রয়ে তাঁহাকে পাইবার

পথে আসা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা কেন করিতে হয় তাহাত বুঝিয়াছ ?

স্ত্রী। হাঁ। এইত তুমি বলিলে সৃষ্টিকে পরিহার করিবার জন্যই সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা। যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন দৃশ্যদর্শন আছেই। যতদিন জগৎ আছে ততদিন স্বচ্ছ আত্মদর্পণে দৃশ্যের ছায়া পড়িয়া সেই স্বচ্ছমুকুরকে কলঙ্কিত করিবেই। ততদিন বহু অভিনয়ের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ উঠিবেই। এতদিন আপন স্বরূপে যাওয়া যাইবে না। কাজেই শোক ছুটিবে না। আত্মতত্ত্বের দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই হইবেনা।

স্বামী। তাই। শ্রুতি তাই বলেন "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। অঘমর্ষণ মন্ত্রের ভাবটি শুনিবার পূর্ব্বে আলোচনা করিতে হইবে সৃষ্টি কি ? সৃষ্টি কার হয় ? উৎপত্তি স্থিতি লয় কোন্ বস্তুর হয় ?

স্ত্রী। বল বল। ইহাই ত শুনিবার কথা।

স্বামী। অজ্ঞান হইতে সৃষ্টি অথবা অজ্ঞানেরই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়। ভ্রমেরই সৃষ্টি, ভ্রমেরই স্থিতি ও ভ্রমেরই লয়। ভ্রম-জ্ঞান দূর হইলেই যিনি আছেন তিনিই আছেন। ইহাই স্বরূপে স্থিতি।

স্ত্রী। সৃষ্টি ভ্রম-জ্ঞান-জনিত ইহাত পূর্ব্বেও বলিয়াছ ?

স্বামী। বলিয়াছি। ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত। রজ্জু রজ্জুই আছে। ভ্রম-জ্ঞানেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়। ফলে সর্প কোথাও নাই। অথচ যখন ভ্রম জ্ঞান আইসে তখন সত্য সত্যই যেন সর্প থাকে। এখন দেখ সৃষ্টি কি ও ইহা কোথায় ? "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎতথা" যাহা আদিতে নাই, যাহা শেষেও নাই তাহা বর্ত্তমানেও নাই। দেহটা ও সৃষ্ট বস্তু বটে। ইহা আদিতে ছিলনা, শেষেও থাকে না. কাজেই এটা বর্ত্তমানেও নাই। তথাপি যে আছে বলিয়া মনে হয় এটা ভ্রম। এটা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কৌশল। যাহা নাই তাহাকে আছে বলিয়া দেখানই এই অঘটন-ঘটনা পটীয়সীর কার্য্য। সৃষ্টি অবিদ্যারই কার্য্য। অজ্ঞানেরই খেলা। মায়ারই ইন্দ্রজাল।

অনেকে মনে করেন সৃষ্টিত একবারে লোপ পায়না ; ঘটটা ভাঙ্গিয়া গেলেও ঘটের একটা সংস্কার—ঘটের বীজটা ত মনে থাকে। হাঁ মনে থাকে সত্য। কিন্তু মনটাত মায়াই। মনে থাকে বটে কিন্তু আত্মাতে থাকেনা। মনে সংস্কাররূপে থাকে বলিলে বলা হয় মায়াতে থাকে, অজ্ঞানে থাকে, ভ্রমে থাকে।

ভ্রমটা কি? আর ইহাতে যাহা থাকে তাহা তবে কি? যাঁহারা বলেন স্বষ্টির বীজ ব্রহ্মে থাকে তাঁহারা অজ্ঞ। এ কথা ভগবান্ বশিষ্টদেব বলিতেছেন। যুক্তি দিতেছেন—নির্ম্মল ব্রহ্মে সমল স্বষ্টি বীজ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মে ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন কিছুই, ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। স্বষ্টিটা স্পন্দন। ইহা গতিবিশিষ্ট। জগৎটা পরিবর্ত্তন বিশিষ্ট। গম ধাতু ক্বিপ্ করিয়া জগৎ! পরিবর্ত্তন হয় জগতের। কিন্তু ব্রহ্ম যিনি তিনি অপরিবর্ত্তনীয় স্থিতি। স্থিতিতে গতি কিছুতেই থাকিতে পারে না।

তথাপি যদি বল ব্রহ্মে জগৎ বীজ থাকে—তোমার অনুরোধে না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু বল দেখি বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহারও কিছু সহকারী কারণ ত থাকে? বীজকে মাটীর মধ্যে রাখা চাই, জল দেওয়া চাই, ইহার জন্য একজন মালীও চাই। ব্রহ্মে যে স্বষ্টিবীজ থাকে তাহাতে সহকারী কারণ কোথায়? ভগবান্ বশিষ্ট দেব বলেন সহকারী কারণ নাই বলিয়া স্বষ্টি বীজ হইতে কখনও জগৎ-বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারেনা।

ব্রহ্মে কোন বীজ নাই। আছে মায়াতে, আছে অজ্ঞানে। মণির ঝলকের মত মায়াটা নাই হইয়াও যেন আছে মত বোধ হয়। এইটাই ভ্রমজ্ঞান। এইটাই স্বপ্ন। কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ সব সত্য বলিয়া মনে হয়। এই স্বষ্টি-স্বপ্ন ভাঙ্গাইবার জন্যই স্বষ্টিতত্ত্বের আলোচনা।

স্ত্রী। স্বষ্টির মধ্যে এত নিয়ম, এত শৃঙ্খলা, ইহা মিথ্যা?

স্বামী। মায়া পাগলিনী। পাগলামীতে কিন্তু নিয়ম আছে। প্রকৃতিতেই নিয়ম আছে। চৈতন্যে নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। তাঁহাতে তিনিই আছেন।

প্রকৃতির নিয়মপূর্ব্বক পাগলামীতে জীব বদ্ধ; তাহাকে পাগলামীটা বুঝিতে হইবে। ভ্রমটাকে ভ্রম বলিয়া জানিলেই ভ্রমের অন্ত হইবে। যে সত্যবস্তু লইয়া মায়া এই ভ্রম তুলিতেছে সেই সত্যবস্তু ধরিবার জন্য স্বষ্টির আলোচনা। এই আলোচনা করিয়া তবে সেই ভ্রমের ভিতরে যে সত্য, সেই সত্যের সাধনা অভ্যাস করিতে হয়; তবে ভ্রম দূর হইবে। তাই অঘমর্ষণের পরে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে ভ্রম-জগতের বস্তু মধ্যেই যে সত্য আছেন তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাতে একাগ্রতা লাভ করিতে হয়। এ কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে। এখন এস, "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

জগতের স্বষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। ইনি প্রথমে আতিবাহিক দেহ মাত্র ধরিয়া হিরণ্যগর্ভ

পরে ইনিই বিশ্বদেহ ধারণ করিয়া বিরাট্‌পুরুষ। লোক সৃষ্টির জন্য আদি নারায়ণ ঈশ্বর যখন মহদাদি জাত ষোড়শকলায় পূর্ণ পৌরুষ রূপ গ্রহণ করেন তখন যোগ-নিদ্রা বিস্তার করিয়া গর্ভোদকে শয়ান সেই আদি বিষ্ণুর, সেই ঈশ্বরের, নাভিহ্রদাম্বুজ হইতে এই বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি হিরণ্যগর্ভ উদ্ভূত হয়েন। জগৎ সৃষ্টির জন্যই ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা ভাগবতে পাওয়া যায়! অধ্যাত্ম রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডের ১৪ সর্গের ২৩ হইতে কতিপয় শ্লোকে বলা হইয়াছে—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদি মধ্যান্ত-বর্জ্জিতঃ।
ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্ট্বা তত্র সুপ্তোঽসি ভূৎকৃৎ ॥ ২১ ॥

সগুণব্রহ্ম, আদি নারায়ণ, মহাবিষ্ণু, ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। তোমার আদিও নাই মধ্যও নাই অন্তও নাই। তুমি অগ্রে সলিল কারণ-বারির সৃষ্টি করিয়া—ভূতকৃৎ তুমি—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তুমি সেই কারণ জলে সুপ্ত ছিলে।

নারায়ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ নরানামন্তরাত্মকঃ।
তন্নাভি কমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।

তুমি নারায়ণ। আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্যতা পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি বুৎপত্তিং

নারায়ণ পদস্য দর্শয়তি। নারং জীবসমূহস্তৎ স্থানকত্বাৎ নারায়ণ ইতি ব্যুৎপত্ত্য-ন্তরমাহ—তুমি বিশ্বের আত্মা। তুমি নরসমূহের অন্তরাত্মা। তোমার নাভিকমল হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। পরে বলিতেছেন :—

দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরক্ষিষোঃ।
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্ ॥ ৩০ ॥

এই সগুণব্রহ্ম, আদি নারায়ণ, আদি বিষ্ণু—ইনি দেহশূন্য হইয়াও যখন সৃষ্টি ইচ্ছা করেন তখন ইহার দুই দেহ হয়। একটি বিরাট স্থূল শরীর। অন্যটি সূক্ষ্ম সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ।

বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন ॥ ৩১ ॥

বিরাট পুরুষ হইতে সহস্র সহস্র অবতার সমুদ্ভূত হয়েন। আবার অবতারের কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহারা সেই বিরাট-পুরুষে প্রবেশ করেন।

সৃষ্টি করিব এই সঙ্কল্প লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি প্রথমে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। পরে তাঁহার উপর তপঃ এই দৈববাণী হয়। তখন তিনি তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যা হইতেছে যাহা সৃষ্টি করিবেন সেই বিষয়ের পর্য্যালোচনা। 'তপশ্চাত্র স্রষ্টব্য পর্য্যালোচন লক্ষণম্।' শ্রুতিতেও পাওয়া যায় 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।' তাঁহার তপস্যা-জ্ঞান প্রচুর। জ্ঞানময় তপস্যা ইহার অর্থ কি? মুণ্ডকশ্রুতি বলেন 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ন্তপঃ-তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই জগৎ জ্ঞানের বিকার মাত্র, ইহা সামান্য ভাবে যিনি জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ আর এই সমস্তকে বিশেষ রূপে বা মিথ্যা রূপে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্ববিদ্। অক্ষয় পুরুষই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্। তাঁহা হইতেই হিরণ্যগর্ভাখ্য কার্য্য লক্ষণ ব্রহ্ম জন্ম গ্রহণ করেন। 'জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞ্য লক্ষণং তপঃ', ইত্যাদি। জ্ঞান ও জ্ঞান-বিকার উভয়ই জানা চাই। তপস্যা দ্বারা এক দিকে জ্ঞান অন্য দিকে তাহার বিকার উভয়েই লক্ষ্য পড়িল। এই তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা এক দিকে ঋত এবং সত্য যে পরমব্রহ্ম তাঁহাকে নিজের অন্তরাকাশে প্রকাশিত হইতে দেখিলেন এবং অন্য কিছুও দেখিলেন।

'ঋতং মানসং যথার্থ সঙ্কল্পনম্। সত্যং বাচিকং যথার্থ ভাষণম্।' "ঋতং সত্যং পরব্রহ্ম" ইত্যাদি রুদ্রোপস্থান মন্ত্রে এক অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

ঋতং এবং সত্যং এবং অন্য কিছুও অতি প্রদীপ্ত তপস্যা হইতে সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পরে রাত্রি উৎপন্ন হইল। তাহার পরে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল।

ঋতং চ সত্যং চ অভীদ্ধাৎ অভিতপ্তাৎ ব্রহ্মণাপুরা সৃষ্ট্যর্থং কৃতাৎ তপসঃ অধি উপরি অজায়ত। শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৮ম অনুবাকের ১৯০ম সূক্তের ভাষ্যে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঋত ও সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মকে ব্রহ্মা হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে দেখিলেন। ঋতং চ সত্যং চ এই শেষের "চ"টিতে যে অপর কিছু পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারের ধৃত শ্রুতিবাক্য প্রয়োগ এখানে করা যাইতে পারে। "তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজ-তেতি শ্রুতেঃ।" তপস্যা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সৃজন করিলেন।

অতি প্রদীপ্ত তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা প্রথমে ঋত ও সত্য পরব্রহ্মকে নিজের অন্তরা-

কাশে জন্মিতে বা প্রকাশ হইতে দেখিলেন। তপস্যার ফলে ব্রহ্মের প্রকাশই অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিব এই সঙ্কল্প লইয়া তপস্যা করিতে ছিলেন বলিয়া পরম জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম দর্শনের কোলে কোলে সৃষ্টির মূল বস্তুটি সৃষ্টির আদিটিকেও জন্মিতে দেখিলেন। এই ব্যাপারটি অনুভব সীমায় আনিতে হইলে বলা যায় কোন একটি তীব্র ইচ্ছা করিয়া যখন মনের একাগ্রতাদির জন্য সাধনা করা যায় তখন সেই সাধনা বা তপস্যার ফলে প্রথমে মনের নিবৃত্তি হইয়া যায়। মনোনাশ হইলেই ব্রহ্মদর্শন হয়। কিন্তু অন্য বিষয়ের তীব্র সঙ্কল্প লইয়া সাধনা করা হইতেছিল বলিয়া ব্যুত্থানও হয়। সেই ব্যুত্থান দশায় যাহা ইচ্ছা করিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল তাহার মূলটি পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা পরম জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্মকে অন্তরাকাশে জন্মিতে দেখিলেন পরেই দেখিলেন 'রাত্রি অজায়ত।' সৃষ্টির আদি অবস্থাটিকে রাত্রি বলাতে কোন দোষ হয় না। রাত্রিকে লোকে অন্ধকার বলে। সমস্ত সৃষ্টবস্তু গলিয়া একীভূত হইয়া যেন অন্ধকাররূপে পরিণত হয়। সৃষ্টি সম্বন্ধে রাত্রি বা অন্ধকারটি যাহা তাহা অজ্ঞান। অজ্ঞানটি বিশ্ব প্রসব করে বলিয়া ইহাকেই সৃষ্টির বীজ বা আদি বলা হইল।

'ঋতং সত্যং' যিনি তিনি অজায়ত হইবেন কিরূপে এই ভয়ে বোধ হয় শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত বেদজ্ঞ শ্রীমৎ হলাযুধ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় নানাপ্রকার কাতরোক্তি করিয়া—'মম হৃদ্‌কম্পো জায়তে' ইত্যাদি বলিয়া বলিতেছেন 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ আসীৎ—পরব্রহ্মমাত্র আসীৎ। এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা।' মহাপ্রলয় সময়ে কেবলং ব্রহ্মমাত্রমাসীদিত্যর্থঃ। শ্রীমৎ হলাযুধ বলিয়াছেন এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা তিনি কোথাও পান নাই। কিন্তু শ্রীমৎ সায়ণ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সায়ণ অগ্রে না হলাযুধ অগ্রে ইহার নিষ্পত্তিতে এ বিবাদ মিটিবে। পূজ্যপাদ হলাযুধ লিখিতেছেন কাজেই কাহারও ব্যাখ্যা না পাইয়া তিনি "আসীৎ" এই কথাটি জুটাইয়া অর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু বেদের মন্ত্রগুলির একটি ছন্দ আছে। বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে নূতন কথা বসাইয়া অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে ছন্দটি ভাঙ্গিয়া যায় কাজেই অর্থটিও অন্যরূপ হইয়া পড়ে। শ্রীমৎ সায়ণের ভাবটি কিন্তু শ্রীমৎ হলাযুধের ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাক্। সৃষ্টির মূল-রাত্রি বা বীজভূত অন্ধকার বা অজ্ঞান সৃষ্টির পরে

সৃষ্টিকার্য্যের কারণ যাহা তাহা জন্মিল। ইহাই সৃষ্টিসম্বন্ধে কারণার্ণব। ইহাকে মন্ত্রে বলা হইতেছে 'অর্ণবঃ সমুদ্রঃ জলপূর্ণ সমুদ্রঃ অজায়ত।'

স্ত্রী। রাত্রির পরে সমুদ্র জন্মিল না বলিয়া জলপূর্ণ সমুদ্র জন্মিল ইহা যে বলা হইতেছে তাহা কেন?

স্বামী। সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থাটিকে রাত্রি, অন্ধকার, অজ্ঞান এই সব বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র কারণ সমূহ রহিয়াছে। সৃষ্টির আদি যে রাত্রি তাহা বহু কারণ পূর্ণ। সেই সমস্ত কারণের মধ্যে বহু কার্য্য আছে। তাই বলা হইতেছে রাত্রির পরে জলপূর্ণ সমুদ্র স্বরূপ সৃষ্টির ভাবী বহু কার্য্যের বহু কারণ উৎপন্ন হইল। ইহাকেই কারণ সলিল বলা হইল।

"সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।"

সৃষ্টির কারণ-রাশির পরে সম্বৎসর উৎপন্ন হইলেন। এই সম্বৎসরটি আমাদের প্রচলিত বৎসর বা কাল নহে; সম্বৎসরকে শ্রুতি প্রজাপতি বিরাট পুরুষ বলিতেছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইহা পাওয়া যায়।

অক্ষর বা আদিনারায়ণ হইতে যে ব্রহ্মা জন্মিলেন তিনি হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার যে দেহ তাহা আতিবাহিক দেহ বা ভাবনাময়—সঙ্কল্পময় দেহ। হিরণ্যগর্ভের পরে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা জন্মিলেন তাঁহার দেহটি বিরাট স্থূলদেহ। পরম পদই যেমন জগজ্জননী গায়ত্রীরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন আবার গায়ত্রীই হিরণ্যগর্ভরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন সেইরূপ একটী মাত্র দেহধারী—আতিবাহিক দেহধারী হিরণ্য-গর্ভ পুরুষই বিরাট দেহধারী প্রজাপতি ব্রহ্মারূপে বিবর্ত্তিত হইলেন।

এই বিরাট পুরুষই সহস্রবাহু, সহস্র পদ, সহস্র চক্ষু। সমস্ত অবতার ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়েন আবার কার্য্যাবসানে ইহাতেই লয় হয়েন। এই বিরাট্ পুরুষই বিশ্বরূপ পুরুষ।

এই বিরাট পুরুষই 'অহোরাত্রানি বিদধৎ' দিনরাত্রির বিধান কর্ত্তা, ইনি 'মিষতঃ বিশ্বস্য বশী'—মহা প্রলয়ে বিলুপ্ত জগতের পুনর্নির্ম্মাণে সমর্থ, বিধাতাই সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে এবং সুখময় দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ এই ত্রিভুবনকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় কল্পনা করেন।

এই মন্ত্রের অর্থে প্রধান বিষয়টিত লক্ষ্য করিয়াছ?

স্ত্রী। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ এইটিই একমাত্র সত্য। তবে সত্যটি অসত্যের মূলে

দাঁড়াইয়া আছেন বলিয়া অসত্য জগৎ ও সত্যমত প্রতীয়মান হইতেছে। অসত্য জগতকে অসত্য জানিয়া সত্যের অনুসন্ধান করা চাই তবেই গায়ত্রী আত্মা অন্তর্যামী অমৃতকে পাওয়া যাইবে।

স্বামী। হাঁ তাই। এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রার্থনা ও চিন্তা এই দুইটি মানসিক ব্যাপার চলিতেছিল। একটি ভক্তিমার্গের ব্যাপার অন্যটি জ্ঞানমার্গের ব্যাপার এখন কর্ম্মের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে। এই কর্ম্মটি যোগমার্গের সাধনা।

(৩) প্রাণায়াম।

সন্ধ্যাতে প্রথমেই পরমপদের কথা বলা হইল। গায়ত্রী উপাসনা ভিন্ন পরমপদে যাওয়া যাইবে না তাহাও বলা হইল। জগজ্জননী শক্তি-স্বরূপিণী শক্তিমান হইতে অভিন্ন গায়ত্রীই কেমন করিয়া নারায়ণ, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জগৎ দেহ ধারণ করিয়াছেন তাহাও বলা হইল।

এখন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মূলে 'প্রণবরূপিণী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।' ব্রহ্মা ঋত ও সত্যরূপী প্রণব মাত্র দেখিলেন। ব্রহ্মাই ওঁকারের দ্রষ্টা। তাই ব্রহ্মা ওঁকার মন্ত্রের ঋষি। ইনি প্রণবকে দেখিলেন গায়ত্রী ছন্দে। দেখিলেন দিব্য স্পন্দনে আচ্ছাদিত এই ব্রহ্ম। ঝলক-জড়িত মণি, গায়ত্রী-জড়িত ওঁকার যিনি তিনিই রূপধারী দেবতা। ওঁকারের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী এবং দেবতা অগ্নি। অগ্নিই সকল রূপের আদি। ইহার সঙ্গে অন্য অন্য ঋষি, গায়ত্রী মন্ত্রের অন্যান্য অঙ্গগুলি ও অন্যান্য দেবতা—সকলেই প্রকট হইলেন। সাধক ভাবনা চক্ষে দেখিতেছে মাই জগৎরূপে সাজিয়াছেন। সত্যস্বরূপিণী অসত্যের বস্ত্র পরিয়া বড় সুন্দরী হইয়া আসিয়াছেন।

গায়ত্রীই ব্রহ্ম শক্তি। গায়ত্রীই আত্মশক্তি। ইনি শুদ্ধ সত্ত্বগুনান্বিতা হইলেও রজস্তমও ইঁহার বশীভূত। সত্ত্বগুণ প্রবল করিয়া ইনি যখন পরম পুরুষের সঙ্গে প্রকট হয়েন তখন ইনি বিষ্ণু; রজগুণে ব্রহ্মা এবং তমগুণে রুদ্র।

বিশ্বরূপিণী—অথচ বিশ্বাতিরিক্তা গায়ত্রী এখন নিজ অঙ্গের নাভিদেশে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু ও কপালে রুদ্র লইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণ সাধককে এখন শরীর ও মনের মল-ক্ষালন জন্য শ্বাস সহ এই মায়ের অঙ্গীভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশকে ধ্যান করিতে হইবে। ব্রহ্মা রক্ত বর্ণ, বিষ্ণু নীলোৎপলদলপ্রভ, রুদ্র শ্বেতবর্ণ—এই তিনবর্ণ ও ইহাদের ত্রিবিধ আকার ধ্যান করিতে করিতে পূরক কুম্ভক রেচক রূপ প্রাণায়াম করিতে হইবে। রক্তবর্ণ ব্রহ্মার চিন্তায়—শুধু রক্তবর্ণ

চিন্তাতেও শরীরের জড়তা নিবারণ হয়, শরীরস্থ অগ্নির বলবৃদ্ধি হয়, শরীর সতেজ হয় এবং কর্ম্ম করিবার শক্তি গুলির স্ফুরণ হয়। নীলবর্ণ শ্রীবিষ্ণুর চিন্তায় সত্বগুণ গুলি জাগ্রত হইয়া বরাভয় শক্তি স্ফুরিত করে এবং দেহ ও মনকে স্নিগ্ধ করে। আবার শ্বেতবর্ণ শিবের ধ্যানে সমস্তই শান্ত হয় এবং জ্ঞান শক্তিগুলি উজ্জল হয়। প্রাণায়ামে এই তিন ধ্যানের সহিত পূরক কুম্ভক রেচক অভ্যাস করা চাই। আজ কাল কেহ একবার কেহ 'জোর' তিনবার মাত্র প্রাণায়াম করেন। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ১৬টি প্রাণায়াম করা আবশ্যক। তবেই শরীর ও মন নির্ম্মল হয়। ইহা গুরুর নিকটে অভ্যাস করা আবশ্যক। নতুবা বিপদ ঘটিতে পারে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক আচার ও আহার সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার করিয়া অনেক জাতি ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব পাইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমেই কুম্ভক বর্জ্জিত অন্তঃ প্রাণায়াম গুরুর নিকটে যদি শিক্ষা করেন তবে এই সন্ধ্যার প্রাণায়াম তাঁহাদের কষ্টকর বোধ হয় না।

প্রাণায়ামে ভরিতাবয়বা গায়ত্রীর চিন্তাও পূরক কুম্ভক রেচকে করিতে হয়। যাঁহাকে লইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়াছে, যে পরমপদের একাংশে মায়ার তরঙ্গ উঠিয়া সেই পরমপদ সেই দেশে বিবর্ত্তিত হইয়া ভিতরে সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশরূপে যাঁহার নাভি, হৃদয় ও ললাটে আপন আপন কর্ম্ম করিতেছেন, এবং বাহিরে যিনি এই সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত স্থাবর জঙ্গম আকার ধরিয়া বিরাট বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়াছেন, যিনি স্ব স্বরূপে অবিজ্ঞাত স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আবার যিনি তটস্থে আতিবাহিক হিরণ্য-গর্ভ এবং আধিভৌতিক বিরাট বিশ্বরূপ তিনিই এই গায়ত্রী।

এই মা আমার ওঁ, ইনিই ভূরাদি সপ্তলোকব্যাপিনী, ইনিই সেই সর্ব্বভাব প্রসবিতার, সেই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল মায়া ঝলকজড়িত চিন্মণির, সেই পরম দেবতার বরণীয় ভর্গ, ইনিই আমাদের ধ্যেয়, ইহাকে ধ্যান করিলে আমরা বুঝিতে পারি ইনি কিরূপে আমাদের বুদ্ধি সকলকে ব্রহ্মপথে প্রেরণা করেন ; এই মাই আপ, জ্যোতি, রস, অমৃত বা মুখ্যপ্রাণ, ইনিই ব্রহ্ম ; ইনিই ভূঃ ইনিই সৎ— [ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে] ইনিই ভুবঃ—ইনিই চিৎস্বরূপা জ্ঞানস্বরূপা [সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে] ইনিই স্বঃ—ইনিই আনন্দ— [সু ব্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বরিতি সুষ্ঠু সর্ব্বৈর্ব্রিয়মান সুখস্বরূপ মুচ্যতে], এই আমার মাই ওঁকার।

ওঁকার, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রী শির এই লইয়াই মা আমার ভরিতাবয়বা। এই ভরিত যৌবনা জননীর নাভি, হৃদয় ও ললাটে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ—অন্যান্য অঙ্গে অন্যান্য দেবতা—ইহাঁরা মায়ের আতিবাহিক দেহে। আর মায়ের স্থূল দেহের সপ্তাঙ্গের মস্তক হইতেছে সুন্দর তেজ মণ্ডিত স্বর্গলোক, চক্ষু হইতেছে শ্বেল নীল রক্তাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট সূর্য্য, প্রাণ হইতেছে নানা গতিতে বিচরণশীল বায়ু, দেহ মধ্যভাগ হইতেছে চতুর্দ্দিক প্রসারিত এই আকাশ' তন্নিম্নস্থান হইতেছে সমুদ্রাদি জলরাশি, পাদদেশ হইতেছে ভূতভরা এই পৃথিবী আর মুখ হইতেছে অগ্নিহোত্রের উপযোগী আহবনীয় নামক অগ্নি।

শ্রুতি ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন "তস্য-বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথীব্যেব পাদৌ, অগ্নিহোত্রকল্পনা শেষত্বেনাগ্নি মুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ।"

মাকে এইরূপে জানিয়া এইরূপে ভাবনা করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে হয়।

স্ত্রী। ইহা কিরূপে হইবে?

স্বামী। নরনারীর এই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই দেহ অবলম্বনেই বিরাটের চিন্তা করিতে হয়। এই পরিদৃশ্যমান্ অন্তরীক্ষ মণ্ডল দেখিয়া দেখিয়া ভাবনা কর ইহাই মায়ের মাভিদেশ। তখন নিজের ক্ষুদ্র শরীর যেন বৃহৎ হইয়া ভাবিত হইতে থাকিবে। তারপরে এই ক্ষুদ্র দেহের মস্তককে স্বর্গলোক, চক্ষুকে চন্দ্রসূর্য্য, নিশ্বাস প্রশ্বাসকে সর্ব্বত্র বিচরণশীল বায়ু, উদরকে জল, পাদদেশকে পৃথিবী এবং মুখকে অগ্নি—এইগুলি ভাবনা করিয়া দেখ দেখি এই পরিদৃশ্যমান জগদাকারে কে দাঁড়াইয়া আছেন? এই ক্ষুদ্র মানব দেহ ধারণ করিয়াই বা কে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন?

শ্রুতি যেমন মাকে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত, ব্রহ্ম ইত্যাদি বলেন অন্যান্য শাস্ত্রও শ্রুতির প্রতিধ্বনি তুলিয়া স্তব করেন।

'আত্মা এবাসি মাতঃ পরমসি ভবতী ত্বৎ পরং নৈব কিঞ্চিৎ।' ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন—

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমহি হুতবহ স্ত্বং জগদ্বায়ুরূপা।
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎ পূর্ব্বিকাহঙ্কৃতিশ্চ॥

বল মায়ের অভাব কোথায়? শুধু একটু দৃষ্টি ত্যাগ কর দেখিবে যে মা

আমার সমষ্টিভাবে সর্ব্বসাক্ষী, ঈশ্বর, হিরণ্য গর্ভ ও বিরাট সেই মাই আবার ব্যষ্টিভাবে তুরীয়, প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব। ইনিই তুরীয় আত্মা, ইনিই সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রদাভিমানী আত্মা।

ইনিই জাগ্রৎ অভিমানকালে এবং স্বপ্নাভিমানকালে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার এই একোনবিংশতি মুখ দিয়া—একোনবিংশতি উপলব্ধি দ্বার দিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় সকল ভোগ· করেন আবার সুষুপ্তিতে অভিমান করিয়া "ন কঞ্চনঃ কামং কাময়তে" কোন প্রকার কামনা না করিয়া সুপ্ত থাকেন আবার তুরীয় অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের ভেদত্ব ঘুচাইয়া 'আপনি আপনি' ভাবে অবস্থান করেন এই মাকে ধ্যান করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে হয়। এই গুলি জানিয়া নাভি, হৃদয় ও ললাটে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশকে ধ্যান করিতে করিতে যে পূরক কুম্ভক ও রেচক তাহারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের মত উৎকৃষ্ট তপস্যা আর নাই। প্রাণায়াম করিলে ফুসফুস ঘুচিয়া যায় অতএব ইহা সংক্ষেপ কর—ইহা বলিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে কিরূপে? আর সন্ধ্যার প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম বাদ দিলে সন্ধ্যাই বা হয় কিরূপে? তবে প্রাণায়ামাদি কার্য্য বই পড়িয়া হয়না—করিতে গেলেই বিপত্তি ঘটিবে। সেই জন্য করিতকর্ম্মা গুরুর প্রয়োজন এখানে থাকিবেই। কোন কর্ম্মই যখন বিনা গুরুতে হয়না তখন এই সমস্ত কর্ম্ম কি গুরু স্বীকার না করিলে হইবে? গুরুকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই গুরুও শাস্ত্রমত কর্ম্ম-অনুষ্ঠায়ী হওয়া উচিত। ঈশ্বর আমার গুরু, জীবন্মুক্ত মহাত্মা আমার গুরু—এইরূপে আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া ঈশ্বরকে বা মহাত্মাকে পথেঘাটে ছড়ান জিনিষ মনে করা উচিত নহে। তুমি প্রথমভাগও পড় নাই, তুমি চিত্তশুদ্ধির জন্য কোন অনুষ্ঠান কর নাই, রাগদ্বেষে তুমি ভরা তোমার জন্য কোন্ ঈশ্বর, কোন মহাত্মা প্রাণায়াম শিক্ষা দিতে আসিবেন? ঘোর বিষয়ী তুমি, ঘোর পামর তুমি; তুমি কখন বৈরাগ্য অভ্যাস কর নাই, একদণ্ড বৈরাগ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারনা, তুমি কিরূপে জীবন্মুক্ত পুরুষকে গুরুরূপে পাইবে? 'কপটী চেলা কপটী গুরু অভিমানীকেই লাভ করে।' এই জন্য সাবধান হইয়া শাস্ত্র মত অনুষ্ঠানগুলিকে মায়ের আজ্ঞা বলিয়া, মা প্রসন্ন হও বলিয়া প্রাণপণে অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিতে হয়। এসব শিক্ষার লোক এখনও অনেক আছেন। সকল ভাবনা, সকল বাক্য, সকল কার্য্য তাঁহার স্মরণে, তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া অভ্যাস করিলে

তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব সীমায় আসিবে। তাঁহার কৃপা হইলেই প্রবুদ্ধ করিতে পারেন এমন গুরু লাভ হইবে। সাধুরা বলেন "যব্ গোবিন্দ কৃপা করি তব্ গুরু মিলি যায়"।

দুর্গতিং

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ ~~বিনাশং~~ তাত গচ্ছতি।

গীতা—৬।৪০

যাহারা কল্যাণ কর্ম্ম করে অর্থাৎ যাহারা জীবের নিশ্রেয়স্ ও জগতের অভ্যুদয় কল্পে স্বকর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে যথা নিয়মে সম্পাদন করে তাহারা কখনও বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। ইহাই প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের সন্ত্বনা বাক্য। হায়! এই সান্ত্বনা-বাক্যে আস্থা নাই বলিয়া জীব কত দুঃখই ভোগ করে।

মন! তোমার এবং আমার মধ্যে প্রীতি স্থাপন হইয়াছে। এখন আমার নিকট আর কিছুই গোপন রাখিও না। যে কোন সন্দেহ থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বল আমরা উভয়ে বিচার যুক্তি বলে উহা ভঞ্জন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। অসমর্থ হইলে শাস্ত্র বাক্যের শরণ লইব। তথাপি ছিন্ন সংশয় হইতে না পারিলে শ্রীগুরুর অভয় পদে আশ্রয় লইব। তাঁহার সস্নেহ উপদেশে সংশয় দূর হইয়া যাইবে। যদি না হয় তবে নিশ্চয় জানিও প্রারব্ধ ভোগ-শেষের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

সংশয় পাপেরই অন্যমূর্ত্তি; কেন না চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কালে পূর্ব্ব কৃত পাপ হেতু নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হয়। প্রারব্ধ ভোগকালে সংশয় আসিবেই সে জন্য দুঃখ করিয়া ফল নাই। কিন্তু সে সংশয় সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে। নতুবা চিত্তশুদ্ধি হইবে না। বিস্ফোটক ত্বকস্থ হইলে ঔষধ প্রয়োগে বিদূরিত হইতে পারে কিন্তু মজ্জাগত হইলে প্রাণনাশক হইয়া উঠে।

মন! তুমি বলিতেছ—এই সংসারে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায় যে যথা-সম্ভব সুখ ভোগাদি ঈশ্বর-বিমুখী জীবের করতল-গত। ব্যভিচারী জীব যথেচ্ছা আচরণ করে কিন্তু তাহাদের কোনরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয় না, বরং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর যাহারা সদাচার পালন করতঃ ধর্ম্মপথে থাকিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে তাহাদের পদে পদে বিপত্তি ভোগ করিতে হয়।

সঙ্গ দোষে কিম্বা পূর্ব্ব সংস্কার বশে কোনরূপ সামান্য পাপ কার্য্য করা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ভীষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

তোমার এই বিক্ষেপ প্রশ্নটী প্রথম দৃষ্টিতে জীবকে বড়ই হতাশ করিয়া দেয় বটে কিন্তু শ্রীগুরুর কৃপায় এই প্রশ্নের সমাধান হইলেই জীব তমঃ ভাব পরিত্যাগ করতঃ রজগুণের আশ্রয়ে কর্ম্ম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তৎপর বিহিত কর্ম্ম-গুলি নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে রজস্তমের নিষ্ক্রিয়তা হেতু বিষয়ের আরাধনা ক্ষান্ত হইয়া যায়। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে স্বভাবতঃ ভগবদারাধনা হইতে থাকে।

এই সংশয় ভগবদারাধনার এক বিষম অন্তরায়। দুর্ব্বল অধিকারী জীব সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন এইরূপ সংশয় তাহাকে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে আনিয়া দেয়। যখন সে দেখিতে পায় অন্ধ বিধবা রমণীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন শিশুপুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হইল, তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে মঙ্গলময় বিধাতার একি মঙ্গলময় বিধান। চিত্ত তখন সংশয় দোলায় দুলিতে থাকে। যদি কিছু সাধনা করা থাকে তবে জীব এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নতুবা অবিশ্বাসের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায় কে জানে।

মন! এই প্রশ্নটি আমরা জীবনের কার্য্যাবলীর সঙ্গে মিশাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। তত্ত্বের পথে গেলে প্রশ্নের সমাধান হইবে কিন্তু অনুভূতি আসিবে না কেন না তেমন সাধনা করা হয় নাই। অর্থাৎ বাল্যকাল হইতেই জানা আছে—"সদা সত্য কথা কহিবে, কুকথা কদাপি বাচ্য নহে", কিন্তু কার্য্য কালে কত মিথ্যা কথা, কত কুকথা বলা হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে চারি পোয়া (চা'র পো) পাপ না হইলে গৃহদাহ হয় না। কথাটী সত্য। জীব যখন পাপের স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দেয় তখন সতর্ক হইবার জন্য তাহাকে অনেকবার সুবিধা দেওয়া হয় কিন্তু সে উহা অগ্রাহ্য করিয়া আপাতরম্য সুখের প্রলোভনে উধাও হইয়া ছুটীয়া যায়। তার পর পাপ যখন ষোল আনায় পূর্ণ হয় তখন পাপের ভরা একেবারে ডুবিয়া যায়। সে ভরা রক্ষা করিবার আর কাহারও সাধ্য থাকে না। প্রতি সংসারে দৃষ্টিপাত করিলে এই দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। অপর পক্ষে চিত্তচাঞ্চল্য হেতু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতির ফলে হটাৎ কোন পাপকার্য্য করিয়া ফেলিলে তাহকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হয় এবং ইহাতে তিনি শ্রীজগদম্বার ইঙ্গিত বুঝিতে

পারেন। দণ্ডকে তিনি মায়ের স্নেহের দান মনে করিয়া সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন এবং বুঝিতে পারেন যে তাহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল—এইবার তিনি নিষ্পাপ হইলেন তখন তিনি মানস-নয়নে স্পষ্টতঃ দেখিতে পান—বাম হস্তদ্বয়ে রুধিরাক্ত অসি ও সন্তানের ছিন্নমুণ্ড এবং দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বর ও অভয় লইয়া করুণাময়ী মা দয়মানদীর্ঘনয়নে সন্তানের প্রতি চাহিয়া আছেন। "চিত্ত নাম নদী উভয়তঃ বাহিনী—বহতি পাপায়—বহতি কল্যাণায় চ"। চিত্ত নামক নদী পাপ এবং কল্যাণ উভয় পথেই প্রবাহিত হয়। তখন তাঁহার চিত্তনদী কল্যাণের পথে প্রবাহিত হইয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হয়।

মন! এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর হইল। এখন তুমি তোমার বিহিত কর্ম্ম-গুলি করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। কর্ম্ম করিতে করিতে তোমার সমস্ত সংশয়গুলি দূর হইয়া যাইবে। শাস্ত্র বলেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" তুমি কর্ম্ম করিবে না কিন্তু সকল তত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছা কর। এটা তোমার বাতুলতা। ইহাতে তত্ত্বের কদর্থ—"ত্বয়া হৃষিকেশ" তোমার ভাগ্যে জুটিবে। চুণ এবং হলুদ একসঙ্গে মিশ্রিত করিলে লাল রঙ হয়। হয় কি না হয় সে প্রশ্ন করিয়া কোন ফল নাই। আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর ফল হাতে হাতেই পাইবে।

মন! তুমি যাহা সাজিয়া আছ ইহা তুমি নও। একবার তুমি প্রবুদ্ধ হও। যে অসম্বন্ধ প্রলাপগুলি বড় প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়াছ এগুলি কিন্তু তোমাকে সর্ব্বদাই উন্মত্তবৎ করিয়া রাখিয়াছে। এগুলি তোমাকে মরণের পথেই লইয়া যাইবে। এগুলি তুমি ছাড়। ছাড়িলেই তুমি আর একটি আপনার জন পাইবে। তাহার নাম বুদ্ধি। তাহার সহিত তোমার অকপট বান্ধবতা হইলেই শ্রীগুরুর কৃপায় তাহাতে তুমি এক অপূর্ব্ব জিনিষ দেখিতে পাইবে। তাহার নাম নাই। তাহার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে কেবল শুধুই অনুভূতি। সে কেবল শুধুই স্থিতি। তখন তুমি জনন-মরণ রোগ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিবে। তাই বলিতেছিলাম—মন! সত্যই সত্যই তুমি খুব বড়লোকের সন্তান। না জানি কোন কর্ম্মের ফেরে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ইহকাল পরকাল হারাইতে বসিয়াছ। তোমার ভয়ই বা কি সংশয়ই বা কি। পূর্ব্ব জন্মের একটু সুকৃতি ছিল, তাই সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে আশ্রয় পাইয়াছ। তাঁহার সস্নেহ উপদেশ মত স্বকর্ম্মগুলি যথা নিয়মে কর এবং কর্ম্মজ আনন্দে সকল সময় বিভোর হইয়া থাক। অসম্বন্ধ প্রলাপগুলি স্থান না পাইয়া ক্রমে ক্রমে দূরে চলিয়া যাইবে। তখন বুঝিতে

পারিবে সংসারের হাহাকার, দুঃখ ও দৈন্য হেলায় উপেক্ষা করিয়া তুমি আনন্দময় রাজ্যে যাইবার পথে অগ্রসর হইতেছ। এগুলি তখন থাকিয়াও তোমার পক্ষে কিছুই থাকিবে না। তাই তোমাকে বলিতেছিলাম—কল্যাণ পথের যাত্রী কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না—এই শাস্ত্রবাক্যে—গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস রাখিয়া আপন গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাক।

শ্রীগুরুদাস

বিজয়া-গীতি।

সিন্ধু—ভৈরবী।

আর কতবার ওমা দুর্গে (আমার) হবে গো ভবে আসিতে।
ত্রিগুণ-বন্ধন বেদন আর যে নারি সহিতে॥

মোহ অন্ধকার ঘোরে, নাহি দেখি আপনারে,
অনিত্য সুখের তরে, মত্ত হই বিষয় বিষেতে।

তিন দিনে তিন গুণ, জ্ঞান অসি করি ধারণ,
পদে দিব বলিদান, বাসনা মা ছিল চিতে।

ষড় রিপু ছলা ক'রে, সে আশা ফেলিল দূরে,
ভুলিলাম মা তোমারে, পড়িয়া মোহ কূপেতে।

চল্লি তুই কৈলাসপুরে, একটী কথা বলি তোরে,
অন্তে মা যেন না ঘেরে দুরন্ত তোর পঞ্চভূতে॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

চল্লি যদি ওমা উমা একটী কথা বলি তোরে।
শিবকে বল্ মা নে যাক্ ধ'রে আমার বাসনা কাল-বিষধরে॥
থাকে সে মোহ বিবরে, নিশি দিন দংশন করে
লুকিয়ে আছে দেখে হরে, সে কেবল ডরে শঙ্করে॥
অহি দেখা যাত্রা কালে, অমঙ্গল জানি মঙ্গলে,
(ওমা) শিব কি ডরে অমঙ্গলে, অহি যে জন পরে শিরে॥
বিষের জ্বালাতে জ্বলি, তাইতে মা তোমারে বলি,
বিষের অষুদ দেগো বলি, সে তো কেবল তোদের ঘরে॥

শ্রীদী—

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম

সকল জাতীর সকল প্রকার নরনারীর সম্বন্ধে বলা যায় মনকে বিষয়ের দিক হইতে ঘুরাইয়া ক্রম অনুসারে আত্মপুরুষে সংলগ্ন করাই জীবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের লক্ষ্য। "চিত্ত নাম নদী উভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ।" মন নদী বা চিত্তনামক নদী কল্যাণপথ ও পাপ পথ এই উভয় পথে প্রবাহিত হয়। মন উর্দ্ধমুখে চলিয়া চলিয়া যখন পরম শান্ত আত্মদেবকে স্পর্শ করে তখন ইহার স্পন্দন আর থাকেনা। ইহার নাম মনোনাশ। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি।

সঙ্কল্পশূন্য, কামনাশূন্য হইয়া অবস্থান করাই মুক্তি। কিন্তু সঙ্কল্প ও কামনা একবারে ছাড়া যায়না। সেইজন্য প্রথম প্রথম শুভ সঙ্কল্প করিতে হয়, শুভ কামনা করিতে হয়। ব্যবহারিক জগতে শ্রীভগবানকে স্মরণে রাখিয়া তাঁহার নাম করিতে জীব সেবা,—দেশ সেবা এবং একান্তে নিত্য ক্রিয়ায় মানসপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীভগবানের সঙ্গে থাকা ইহা কামনা হইলেও শুভ কামনা। এই সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম। কারণ শ্রুতি বলেন "অকামো বিষ্ণুকামো বা"।

নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা সমকালে জগচ্চক্র পরিচালন এবং সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবেই। নিষ্কাম কর্ম্ম ও যোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা রূপ ভক্তিযোগ আসিবেই। ভক্তির পরে জ্ঞান এবং জ্ঞানেই মুক্তি ইহাই সাধনার ক্রম।

আমরা প্রথমে সংক্ষেপে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সাধনাটি দেখাইতেছি।

সাধনায় বসিয়া সর্ব্বাগ্রে মনের সন্ধান লও। লইয়া মনকে একদিকে দেখাও পরম শান্ত পরমপদের সুখের ছবি,—শুনাও "ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ" অন্যদিকে ইহাকে শুনাও জগতের দুঃখের হাহাকার ধ্বনি—দেখাও ব্যথিত জীব পুঞ্জের মর্ম্মভেদী হাহাকার জড়িত মর্ম্মবিদারক করুণ দৃশ্য। শেষ দৃশ্যে, জীবের দুঃখ ভাবনায়—দেশ বিদেশের ব্যথা ভাবনায় মন ব্যথিত হইবে। ব্যথিত হইয়াও ইহা হতাশ হইবেনা। যে সুখের ছবি দেখে, শত দুঃখে পড়িলেও সে কখন হতাশ হইতে পারেনা। যে ভালবাসে সে আপন প্রিয়কে ত্যাগ করিয়া কিছুতেই মরিতে পারেনা। সে আশায় আশায় বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে মরিয়াও মরে না। সে কিছুতেই সাধনা ছাড়িতে পারেনা। তাহার প্রিয় তাহাকে মরিতে দেয়না। নানাভাবে তাহার কর্ম্মোদ্যম বাড়াইয়া দেয়। কর্ম্মোদ্যম করিতে করিতে সে বল পায়। বল পাইয়া তাহার মন কর্ম্মোদ্যমে ভরিয়া যায়। সে আপনি চলে সুখের পথে, আবার যে তাঁহার সঙ্গে যাইতে চায় তাহাকেও সুখের পথে টানিয়া লয়। সকলকে সঙ্গে লইতেও সে ভার বোধ করেনা। ইহাই সাধনার সার কথা।

তাই বলি মনকে একদিকে তোমার বাঞ্ছিতের রূপ দেখাইয়া লুব্ধ কর অন্যদিকে জগতের হাহাকার শুনাইয়া তৎপ্রতিকার জন্য ভগবচ্চরণাশ্রিত এই মনকে শুভ কর্ম্মে ভরিত কর, বড় শুভ হইবে। রূপটি হইতেছে অবলম্বনের বস্তু। সকল প্রকার উপাসনায় এই জন্য রূপ থাকা আবশ্যক। আর রূপের সঙ্গে গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ জড়িত। রূপের অন্তস্তলে স্বরূপ থাকিবেই। আবার রূপের কোলে কোলে আছে গুণ আর আশে পাশে আছে কর্ম্ম। মনকে রূপ দেখাও। যাহা ভালবাস তারই রূপ দেখাও। দেশ ভালবাস দেশের রূপই দেখাও। তবেই মন ধ্যান করিতে পারিবে। রূপ, স্বরূপ, গুণ ও কর্ম্ম এই গুলিতে হৃদয় ভরিয়া ফেল,—হইবে ধ্যান; সবগুলি অভ্যাস কর, হইবে পূর্ণ ধ্যান। এই ধ্যানে খেলিতে খেলিতে খেলিবে না; হাসিতে হাসিতে হাসি ভুলিয়া কোলে

উঠিয়া করিবে স্থিতিলাভ। তখন সব আয়ত্ব করিয়া যাহা করিবার তাহা করিয়াও কিছুই করিবে না।

গুণ ও কর্ম্মের ভিতরে থাকিয়াও তুমি ধ্যানের পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি স্বরূপটি না জানিতে চেষ্টা কর। তাই স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রধান উপাসনা যে গায়ত্রী তাহাতে "বিদ্মহে" "ধীমহি" ও "প্রচোদয়াৎ" ইহা ইর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। যাহাকে না জানা যায় তাহার ধ্যান হয় না। আর ধ্যানটি ঠিক না হইলে বুঝা যায় না তিনিই সকল ব্যাপারের প্রেরক কিরূপে?। যখন স্বরূপ রূপ, গুণ ও কর্ম্ম চিন্তায় পূর্ণ ধ্যান আসিবে তখন "তোমার কর্ম্ম তুমি কর" হইয়া যাইবে; আর বলিতেও পারা যাইবে "লোকে বলে করি আমি।"

স্বরূপের ভাবনা না করিতে পারিলেই দলাদলি। স্বরূপ জানা হয় না বলিয়াই সাম্প্রদায়িকতা। যে যাহার উপাসনা করুক না কেন স্বরূপে দৃষ্টি পড়িলেই বুঝা যায় যে এক ঈশ্বরই মানুষের উপাস্য। নাম, রূপ ভিন্ন হইলেও তিনি একই স্বরূপ ভাবনায় সেই একহে স্থিতিলাভ হয়। তখন সকল অবস্থায় থাকিয়াও স্বরূপের বিচ্যুতি কখন হয় না। ইহাই জীবন্মুক্তি।

পূর্ণ ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গ চারিটি

(১) জগৎ যখন নাই তখন তিনি আপনি আপনি নির্গুণ বা গুণাতীত।

(২) জগৎ যখন হয় তখন তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বিশ্বরূপ, অন্তর্য্যামী, ভগবান, পরমেশ্বর।

(৩) সমষ্টি ভাবে যিনি সর্ব্বেশ্বর তিনিই প্রতি সৃষ্টবস্তুর ভিতরে থাকিয়া আত্মা।

(৪) যখন জগতের বিপর্য্যয় ঘটে, যখন ধর্ম্মের গ্লানী ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন সেই আত্মদেব স্ব স্বরূপে থাকিয়াও—বিশ্বরূপে ও আত্মারূপে ভাসিয়াও অবতার রূপে আসিয়া উদিত হয়েন। তাই বলা হয় জগৎ যাঁহার উপাসনা করে তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার।

ইহার একটিও যদি অবজ্ঞা কর তবে তুমি নিশ্চয় সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়াছ। বিদ্বেষ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সরল হও। সরল হইয়া ভাবনা কর তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার কিরূপে? ইহা কর দেখিবে তোমার সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভাব দূর হইয়া যাইবে; তুমি শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ দেখিবে না; তুমি যথার্থ শাস্ত্রশ্রদ্ধা করিতে পারিবে আর সমগ্র মানবজাতি তোমার ভালবাসার

বস্ত হইয়া যাইবে ; তুমি নামের সঙ্গে সেবা এবং সেবার সঙ্গে নাম করিতে করিতে প্রকৃতভাবে জীবে দয়া করিতে পারিবে ; এবং যতদিন কর্ম্ম করা যায় ততদিন কর্ম্ম করিয়া অন্তে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া সেই পরমব্যোমে, সেই পরমপদে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। সার্ব্ব জনীন ধর্ম্মের যিনি সাধক তাঁহাকে সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত কর্ম্মগুলি করিতে হইবে।

(১) অসত্যে বৈরাগ্য অভ্যাস জন্য জগতের হাহাকার ভাবনা ; নিজের মৃত্যু-চিন্তা।

(২) সত্যে অনুরাগ জন্য আত্মার রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ চিন্তা।

(৩) স্বরূপের চিন্তায় আত্মাই যে নির্গুণ, সগুণ ও অবতার ইহার পূর্ণ ধারণা।

(৪) প্রতিদিনের সাধনায় (১) আমি তোমার (২) তুমি আমার (৩) তুমিই আমি—ইহা বেশ করিয়া বুঝিয়া যিনি যে ভূমিকায় আছেন ব্যবহারিক কর্ম্মজগতে তাহার অভ্যাস।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন সাধনার চতুর্থ অঙ্গের কথা এক্ষণে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমেই স্মরণ রাখা আবশ্যক যাঁহাদের চিত্ত-দুর্ব্বল তাঁহাদের চিত্তকে সবল করিতে হইবে।

বাহুবলের ভিত্তি হইতেছে মনের বল। যিনি সাত্ত্বিক তাঁহারই মনের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সত্ত্বগুণটি হইতেছে তাহা যাহা রজোগুণ ও তমোগুণকে পরাস্ত করিয়া উদয় হয়। সকলেই বুঝিতে পারেন যিনি রজস্তমকে বা লয়বিক্ষেপকে নিরস্ত করিতে পারেন তাঁহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। সমস্ত জাতি যখন রজস্তমকে অধঃকৃত করিবার জন্য তপস্যা করেন, প্রতি ব্যক্তি যখন সাধনা দ্বারা নিজের ভিতরের লয় বিক্ষেপ কাটাইতে সক্ষম হয়েন তখন সেই জাতি সকলের পূজনীয় হয়েন।

তবেই হইল চিত্তকে সবল করিবার জন্য জাতির ও ব্যক্তির তপস্যা চাই। সত্ত্বগুণ জাগাইবার জন্য শুদ্ধ আচার চাই ও শুদ্ধ আহার চাই। মাংসাদি আহারে শরীর যতটুকু বল লাভ করে আতপ তণ্ডুল, দুগ্ধ, ঘৃতাদি সাত্ত্বিক আহারে চিত্ত তদপেক্ষা কোটিগুণে বলশালী হয়। সাত্ত্বিক আহারে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লাভ হইতেছে চিত্তের বিচার-ক্ষমতা।

জগতের সর্ব্ব অনিষ্টের মূল হইতেছে বিচার হীনতা। যে যেখানে যাহা কিছু

অন্যায় করে, যে যেখানে যাহা কিছু পাপ করিয়াছে তাহা অবিচারেই হইয়াছে। ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিলে কোন পাপই হইতে পারে না। শ্রীভগবান নর নারীকে যতগুলি শক্তি দিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি হইতেছে এই বিচারশক্তি। যাহাতে এই বিচারশক্তি বৰ্দ্ধিত হয় সেই সাধনা কর ব্যক্তিগত উন্নতি ও জাতিগত উন্নতি উভয়ই লাভ করিতে পারিবে। ভিতরের অভ্যাস ব্যবহারিক কর্ম্মে নিত্য-প্রয়োগ করাই সাধনা। আমরা এখানে ঈশ্বরলাভের সাধনাই বলিতেছি।

যিনি আমার মধ্যে আছেন তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্ণতা অনুভব করিতে হইবে ইহাই হইতেছে সার কর্ম্ম।

আমার মধ্যে যিনি আছেন তিনিই আত্মপুরুষ, তিনিই আত্মা। আত্মাই চেতন। চৈতন্য যখন শরীর গ্রহণ না করেন তখন তাঁহাকে ধরা যায় না। তখন তিনি নিগুর্ণ। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে কেহই জানিতে পারে না; পাইতেও পারে না। দেহ না থাকিলে চৈতন্যকে উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সত্য কথা এই যে চৈতন্যদেহ আশ্রয়ে খণ্ডমত বোধ হইলেও তিনি কখন খণ্ডিত হন না। আকাশ ঘটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘটাকাশ নাম ধরিলেও আকাশ কখন খণ্ডিত হয় না। কাজেই দেহের মধ্যে যে চৈতন্যকে তুমি জীবচৈতন্য বলিতেছ তাহা স্বরূপে সেই পূর্ণ চৈতন্যই। কাজেই যে আত্মা জীবদেহে আসিয়া বদ্ধজীব মত দেখা যাইতেছে সেই আত্মাই স্বরূপে নিগুর্ণ, তটস্থে বিশ্বরূপ এবং জগৎ বিপর্য্যয়ে অবতার। তবেই হইল তোমার উপাস্য যিনি তিনি চেতন, তিনি জড় নহেন; তিনি আত্মা, তিনি অনাত্মা নহেন। যাহা কিছু উপাসনা তাহা আত্মারই উপাসনা। শ্রুতিও বলেন—

"স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং
ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি।" বৃহ, ১অধ্যায় ৪ব্রাহ্মণ ৮শ্লো।

যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্যকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলিবেন তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই সত্যটুকু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই চৈতন্যটি কোন্ পদার্থ, দেহের মধ্যে ইনি কখন কিরূপ থাকেন তৎপরে তাহারও বিচার চাই। মায়ার যেমন তিন অবস্থা আমাদের মনেরও সেইরূপ তিন অবস্থা। মায়ার অব্যক্ত অবস্থাটি কারণ শরীর, সঙ্কল্প অবস্থাটি সূক্ষ্ম শরীর এবং পরিদৃশ্যমান এই জগৎটি স্থূল শরীর। এই তিন শরীরে যে চৈতন্য খেলা করেন তিনি সগুণব্রহ্ম,

হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। জীবাত্মাও এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে খেলা করেন। আবার সাধনা দ্বারা ইনিই তুরীয় অবস্থা লাভ করিয়া আপনি আপনি ভাবে স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন।

আমরা বলিতেছি আমাদের উপাস্য যিনি তিনি চেতন। তিনি জড় নহেন। শিব, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা—এই মূর্ত্তিগুলি চৈতন্যেরই মূর্ত্তি। আবার চৈতন্যের যখন খণ্ড হয় না তখন আমার উপাস্যের মূর্ত্তি যাহা তাহা আত্মার অখণ্ড হইয়াও খণ্ডমত প্রতীয়মান আত্মারই মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণকে যদি আমার আত্মার মূর্ত্তি না বলিতে পারি তবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা যায় না। তবে এইখানে এই বলা যায় যে আমি কি এক মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই যেন আমাকে—আমার ভিতরে অনুভূত চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইতে পৃথক মনে করিয়াই কষ্ট পাই। ব্যষ্টি আপনাকে সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবিয়াই পুনঃপুনঃ জনন মরণ রূপ দুঃখ পাইতেছে। এই দুঃখ নিবৃত্তি জন্যই খণ্ডমত চৈতন্যকে অখণ্ড কৃষ্ণচৈতন্য বা রামচৈতন্য বা কালীচৈতন্যকে উপাসনা করিতে হইবে। ইহারই ক্রম হইতেছে আমি তোমার, তুমি আমার এবং তুমিই আমি!

প্রতিদিনের সাধনায় ভূতশুদ্ধি করিয়া, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পচিশ তত্ত্ব পঞ্চভূতকে ভাবনাতেও ফিরাইয়া দিতে অভ্যাস করিলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনি জীব উপাধিধারী আত্মা হইয়াও পূর্ণ আত্মা। সকল ভূতের সকল বস্তু ভূতদিগকে দিয়া দিতে পারিলেই আত্ম-দর্শন হয়। যদিও আত্ম-দর্শন হয় তথাপি বহুকাল "উপনয়ন" (চশমা) ব্যবহারে নাসিকাতে যেমন একটা দাগ পড়ে—চসমা ব্যবহার না করিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত একটা দাগ থাকে সেইরূপ সাধের "কাজল" স্বরূপ এই দেহধারণ করা হইয়াছিল বলিয়া আত্মাতে একটা সংস্কারের দাগ থাকে। তুমিই আমি এই অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে তবে এই দাগ মুছিয়া যায়। ইহা লাভ করিবার জন্য প্রত্যহ আত্ম-নিবেদন করা চাই। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই আমি তোমার। কাজেই আমার ইচ্ছায় আর কিছুই যেন করিতে পারা যায় না। যাহা কিছু ইচ্ছা জাগে তাহা ধরিয়া বলিতে হয়—এই ইচ্ছামত কার্য্য কি করিব? এইরূপে প্রতি ভাবনা, প্রতি বাক্য এবং প্রতি কার্য্য যখন তাঁহাকে জানাইয়া করিতে অভ্যাস পাকা হইয়া যায় তখন "আমি তোমার" সাধনা পূর্ণ হয়। "আমি তোমার" এই সাধনা ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগ করিতে করিতে যখন প্রতি বিপদে, প্রতি দুঃখে তোমার আগমন বুঝিতে পারা যায়, যখন বিপদে পড়িয়া

ডাকিলেই তুমি আসিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দাও, ডাকিলেই যখন তুমি না আসিয়া থাকিতে পার না তখন তুমি আমার হও। "আমি তোমার" এই সাধনা না করিয়া "তুমি আমার" সাধনা করিতে গেলে ব্যভিচার হইবেই। "আমি তোমার" এই সাধনা করিতে করিতে যখন আমার অনাদি-কাল-সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কার তোমার চরণে অর্পিত হইতে থাকে; "আমি তোমার" সাধনা করিতে করিতে যখন আমার দোষগুলি দূর হয় আর তোমার গুণরাশি আমারে মধ্যে উদিত হইতে থাকে তখন তুমি আমাকে পাপশূন্য করিয়া তোমার করিয়া লও। তাই আমার বিপদে তুমি স্থির থাকিতে পার না। তোমার ভৃত্যকে, তোমার দাসানুদাসকে, তোমায় ভক্তকে, তুমি সর্ব্বদা রক্ষা কর। তোমার আদরে, তোমার স্নেহে সে তোমার হইয়া তখন তোমার উপর মান অভিমান সবই করিতে পারে। এই ভাবে ভাব পুষ্টি লাভ করিয়া যখন তুমি আমার সাধনা পূর্ণ কর তখন ঘটাকাশই মহাকাশে এক হইয়া যায় এবং তুমিই আমি হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজ যদি নিপুন মাঝি থাকিত তাহা হইলে তীরে আসিয়া তরী কি এমন করিয়া ডুবিত! জীবন সমুদ্রের কোন্ অংশে কোন্ শৈল নিমজ্জিত আছে, কোন্ মেঘ আকাশ ছাইলে এই সাগরে তরঙ্গ উঠে,—কোথায় বিশ্রামের আশ্রয় মিলে—এই সমুদয় সম্যক্‌রূপে যে মহাজন পরিজ্ঞাত, আজ তিনি সঙ্গে থাকিলে কি এমন হয়! যখন দেখি—যে দিন ব্রহ্মা, মুরারি, ত্রিপুরান্তকারী, ভানু, শশী, ভূমিসুত, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি ও রাহুকেতু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সুপ্রভাত করেন, সেদিন কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা ও মাতঙ্গী আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন, যেদিন প্রভাতে শ্রীশ্রীদুর্গা শরণে আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত

হয় সেইদিন আমার আমিত্ববোধ বিলুপ্ত হয়—আমি থাকি না, আমার জনক জননী, সোদর সোদরা, স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহই থাকেন না, আমার দেশ গৃহদ্বার কিছুই থাকেনা, আমি ও আমি ছাড়া বিশ্ব—এই দু'য়ের পার্থক্য বোধ থাকে না, সেইদিন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অখণ্ড, জ্যোতির্ম্ময়, অসীম সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া যায়, আমি ও আমার এই বিশ্ব সেই সাগরের অবিচ্ছিন্ন ও অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া যায়, সেইদিন এই সচ্চিদানন্দ সাগরের অংশ হইয়া সত্যসত্যই অনুভব করি, আমি ব্রহ্মেরই অংশ, আমার শোক নাই, তাপ নাই, জ্বালা নাই, যাতনা নাই আমি "শোকভাক্" নই, আমার কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই—আমার বন্ধন নাই, আমি "নিত্য মুক্ত", আমার চাঞ্চল্য নাই, ভাবান্তর নাই, আমি পথভ্রান্ত হইনা—আমি সদা "স্বভাবস্থ", আমার জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আমার আদি নাই, অন্ত নাই, আমার নির্জীবতা নাই, অপ্রফুল্লতা নাই, বিষাদ নাই. অবসাদ নাই—আমি "সচ্চিদানন্দ", সেই দিন তখন আমার এত বিচার আইসে না, এত বিশ্লেষণ করিবার শক্তি থাকে না, মনের কথা এমন করিয়া লিখিবার ইচ্ছা থাকেনা, সেইদিন তখন কেবল এক জগদ্ব্যাপী জ্যোতি সমুদ্র জ্বলিতে থাকে, আর এক অখণ্ড আনন্দের মধুর অনুভূতি মাত্র থাকে, অথচ যে দিন মঙ্গলময়েরা আমার প্রতি ফিরিয়া চাহেন না, আমার সুপ্রভাত করেন না, যে দিন মঙ্গলময়ী জননীরা আমার প্রতি বিরূপ হয়েন, যে দিন প্রভাতে জগজ্জননী আমার অন্ধকার দূর করেন না সেই দুর্দ্দিনে আমার আমিত্ব পুনর্জীবিত হইয়া উঠে, আমার পিতামাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব শত্রু সকলেই একে একে প্রকাশিত হয়েন, আমার জন্মভূমি গৃহদ্বার সকলই ভাসিয়া উঠে, আমি ও এই জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়—আমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কই আর থাকে না, আমার স্বার্থ ও জগতের স্বার্থ সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বোধ হয়,—আমার চাঞ্চল্য ঘটে, ভাবান্তর উপস্থিত হয়, এই দ্বন্দ্বে মাতিয়া আমি শোক তাপ জ্বালা যাতনার অধীন হই, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের তাড়নে আমি তখন অসীম যাতনা পাইতে থাকি—যখন এইরূপে দেখি যে প্রভাতে যে বস্তু অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি সন্ধ্যায় পুনরায় সেই বস্তুকেই সারাৎসার বলিয়া হৃদয়ে ধরিতেছি, যখন এইরূপে দেখি যে বিচারকালে যাহা ত্যাজ্য বলিয়া স্থির করিলাম, প্রলোভন উপস্থিত হইলে তাহাকেই সার

বলিয়া গ্রহণ করিলাম তখন এই মোহাবর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য একজন মোহাতীত যোগ্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা সুন্দরভাবে অনুভব করি। যখন দেখি—যে সময় স্থির মনে আমার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সহিত আমার তুলনা করি, এই কলিকাতা নগরীর জনসমূহের সহিত আমার তুলনা করি, এই বাঙ্গালা দেশের লোকসমূহের সহিত আমার তুলনা করি, এই ভারতবর্ষের জনসঙ্ঘের সহিত আমার তুলনা করি, যে সময় এই সলিলরাশি পরিবেষ্টিত আমাদের পৃথিবীর মহত্ত ও বৈচিত্র্যের বিষয় চিন্তা করি, যে সময় বৈচিত্র্যময়, গ্রহ উপগ্রহ-পরিবেষ্টিত সৌর জগতের কথা ভাবি সেই সময় আমি যে অতি সামান্য, দীনাতিদীন, হীনাতিহীন ক্ষুদ্র ধূলিকণারও অধম তাহা বেশ উপলব্ধি হয়, আমার অহঙ্কার, মদ আমার অসারত্ব দর্শন করিয়া লজ্জায় দ্রুতপদে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে, অথচ যখন এই বিশ্বের মহত্ত ও বৈচিত্র্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না, যখন জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যায় আমার অপেক্ষা হীন কোন ব্যক্তির সমক্ষে উপস্থিত হই—তখনই "এরণ্ড" আমি "দ্রুম" হইয়া বসি—বসিবার ভঙ্গি দাঁড়াইবার 'কায়দা', কথার ঢং ইত্যাদিতে মদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করি—তখন এই ভ্রান্তি-সম্ভূত মদ দমনের জন্য উপায় অনুসন্ধান করি এবং মদবর্জ্জিত জনৈক প্রভুর শরণ লওয়ার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় তখন শ্রীগুরুর উপদেশের আবশ্যকতা সুন্দররূপে অনুভব করি। যখন দেখি—যে সময় আমার সমকক্ষ কেহ নয়নগোচর হয় না, যে সময় যে দিকেই চক্ষু ফিরাই না কেন দেখি বিদ্যাবুদ্ধি ধন সম্পদ্ মান মর্য্যাদায় সকলেই আমার অপেক্ষা হীন তখন সকলের প্রতি সহানুভূতি হয়, তখন প্রত্যেকের দুঃখের জন্য দুঃখ পাই, তখন সকলের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়—তাহাদের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি, অথচ যখন দেখি আমারই পরিচিত কেহ কাল যে আমার সমান ছিল—বেশ বড় হইতেছে, বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া "মানুষ" বলিয়া পরিগণিত হইতেছে তখন প্রাণের মাঝে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হয় যেন সে অত বড় না হইলেই ভাল হইত, যেন যে কোন ভাবেই হউক সে বেশ একটু পড়িয়া গেলে প্রাণটা বেশ আরাম পায়, তখন হয়ত তাহার কুৎসা করি—প্রথম পরিচয়ে যাহার বিশ্বব্যাপী জ্ঞান দেখিয়া অন্যের নিকট পরিচয় করিয়া দিয়াছি আজ আবার তাহাকেই তাঁহাদের নিকট পাগল বলিয়া ছোট করিবার প্রয়াস পাইতেছি—তখন মাদৃশ হীনজনকে উন্নতির পথে প্রেরণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুর নিত্য সাহায্য যে কত আবশ্যক তাহা আর তর্ক করিয়া জানিয়া

লাইতে হয় না—বিস্ময় অভিজ্ঞতাই পরম শিক্ষকের কার্য্য করে। যথন এইরূপে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে থাকে, যথন এইরূপে উত্থান পতন অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে, যথন এইরূপে মহা সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকি তথন বুঝি একজন অবিভাবকের কত প্রয়োজন, তথন কথনও জ্বালায় উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করি—

"আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে চণ্ডালে,
এ দীক্ষা শিক্ষার্থে যারে গুরুপদে ধরি
এ তত্ত্ব স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ;"

তথন কথনও গভীর মর্ম্মবেদনায় নীরবে নির্জ্জনে রোদন করি—

"যতবার আলো জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।"

মন, যদি এই ভয়ঙ্কর মর্ম্মপীড়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে চাও, যদি এই যন্ত্রণাময় উন্মাদবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, যদি এই লয় বিক্ষেপের অবস্থা অতিক্রম করিতে চাও, যদি চিরদিন সর্ব্বক্ষণ শান্তি সরোবরে ভাসমান হইয়া মনের আনন্দে প্রেমাশ্রুলোচনে গাহিতে চাও—

"নিবিড় আঁধারে, মা, চমকে তোর অরূপ-রাশি,
তাই যোগী ধ্যান করে, হ'য়ে গিরিগুহাবাসী।

অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে
চির শান্তি পরিমলে অবিরত যায় ভাসি।

মহাকালরূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একাবসি,
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি,"

তাহা হইলে দীনহীন হইয়া যাও, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া ফেল, যাহা যাহা কিছু শিথিয়াছ সকল ভুলিয়া যাও, নিজকে মূর্খাদপি মূর্খ বলিয়া প্রাণে

প্রাণে অনুভব কর, দীনহীন বেশে, গললগ্নীকৃত-বাসে শ্রীশ্রীগুরুর রাজীব চরণে শরণ লও। মহা যাদুকরী, মোহময়ী, জগজ্জননী মহামায়ার সহিত শ্রীগুরুর পরিচয় আছে—তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হওয়ার পথ শ্রীশ্রীগুরু পরিচিত, শ্রীশ্রীগুরু কৃপা পূর্ব্বক তোমার হস্ত ধারণ করিলে আর তোমাকে উত্থান পতনের জ্বালা ভুগিতে হইবে না। শ্রীশ্রীগুরু তোমাকে মন্ত্র দিয়া "প্রণামী" গ্রহণ করিয়াই অন্য শিষ্যের আলয়ে গমন করিবেন না—তোমার অজ্ঞানান্ধকার পূর্ব্ববৎ রহিয়া যাইবে না—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে রহিবে না"। তাঁহার চরণ স্পর্শে তোমার নবশক্তি যাগিবে। যে প্রলোভন পূর্ব্বে শত চেষ্টা করিরাও দূর করিতে পারিতে না—এক্ষণে কেবলমাত্র শ্রীশ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করিবা মাত্র সেই প্রলোভন দূরে পলায়ন করিবে। শ্রীশ্রীগুরু সর্ব্বক্ষণ তোঁমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবেন,—তিনি স্থানকাল ব্যবধানের অতীত—সকল দুঃখ দুর্ব্বিপাকে তিনি তোমার স্বতঃপ্রণোদিত সহচর। তুমি যাহা বুঝিতে পারিতেছ না তিনি তাহা হাস্যমুখে বুঝাইয়া দিবেন। যে কর্ম্ম সঙ্কেতে তুমি সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ধরিতে পারিতেছ না সেই কর্ম্ম সঙ্কেত শ্রীশ্রীগুরু তোমাকে শিখাইয়া দিবেন। তুমি যাহা আপনি করিতে পারিতেছ না তিনি তোমার হইয়া তাহা করিয়া দিবেন। তোমার সকল চেষ্টা এক্ষণে সফল হইবে। বিফল মনোরথ হওয়ার কষ্ট আর তোমাকে পাইতে হইবে না। তোমার দিন দিন উন্নতি হইবে। জগজ্জননীর পুত্র জগজ্জননীর সহিত তোমার সম্পর্ক সংস্থাপিত করিয়া দিবেন তুমি পরম শান্তি পাইবে।

মন, এস এস,—যাঁহার সদানন্দ মূর্ত্তি স্মরণে, যার জ্ঞান-ভক্তি-সমুজ্জ্বল-বিশাল-প্রাণে যুগপৎ হর্ষ, শান্তি, ভক্তি, ভরসা জাগিয়া উঠে, যিনি আমার উত্থান-পতন দূর করিবেন, যিনি আর সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিবেন, যিনি আমাকে মায়ের চরণে লইয়া যাইবেন, যাঁহার কৃপায় আমার মানব জন্ম সফল হইবে তাঁহার রাজীব চরণে ভক্তিভরে যুক্তকরে, গললগ্নীকৃত-বাসে, সাশ্রু নয়নে প্রণাম করি।

* * * * *

বন্ধু, তুমি দ্বারে দ্বারে যে গান গাহিতেছ তাহা গাহিয়া যাও। তোমার কথায় আমাদের ভ্রান্তি অপণোদিত হইবে—আমরা শ্রীশ্রীগুরুর চরণে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিব। গুরো! প্রভো! স্বামিন্! তোমাকে এ অধম আর কি বলিবে আমার শত অপরাধ হইতেছে ও হইবে—আমি অতি হীন; তুমি আমাকে

তোমার চরণাশ্রয় হইতে দূরে ফেলিয়া দিও না। ইষ্টস্বরূপ! তুমি চলিয়া গেলে আমি যাইতে পারিব না, তুমি দয়া না করিলে—

"গুরু, ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হ'ব কেমন করে!"

উন্নতি।

অগ্রসর হইতেছি ইহা যতক্ষণ না বুঝিতেছ ততক্ষণ কর্ম্মে উৎসাহ জাগিবে না। যেমন তেমন করিয়া হউক "আগে বাড়", আপনিই বুঝিবে উন্নতি হইতেছে কিনা।

যাহাদের এখনও ছাত্রাবস্থা তাহাদের পক্ষে "আগে বাড়া" নিতান্ত প্রয়োজন। যে ছাত্র ভাবে যে একবারে সবটি বুঝিয়া তবে অন্যটিতে অগ্রসর হইব তাহার উৎসাহ বড় একটা থাকে না। কাজেই তার উন্নতি হয় না। কিন্তু যাহারা প্রত্যহ একটা কর্ম্মের বিভাগ করিয়া লয় এবং যে সময়ে যাহা করিবে ও যে কার্য্যে যতক্ষণ সময় দিবে প্রত্যহ কর্ম্মারম্ভ কালে তাহা ঠিক করিয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে এবং যেমন তেমন করিয়া হউক যথাসময়ে সেই কর্ম্ম সম্পাদন করে তাহারা উন্নতি করিতে পারে। প্রথমে যেমন তেমন কর্ম্ম হয় বটে কিন্তু এক কর্ম্ম বহু বার ধরিয়া করিবার সময় হয় বলিয়া কিছু দিন পরে কর্ম্মটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। উৎসাহ ও উন্নতিও কখন তাহাদিগকে ত্যাগ করে না।

ব্যবহারিক জগতে যে নিয়ম ধর্ম্ম জগতেও তাই। নিত্য কর্ম্মগুলি সব বুঝিয়া বেশ করিয়া করিব আর যতক্ষণ বেশ করিয়া না বুঝিতেছি ততক্ষণ আরম্ভই করিতেছি না, এইরূপ বুদ্ধি যিনি করিয়াছেন তাঁহাকে বড় একটা অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। মনে করা হউক, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিক। এই সন্ধ্যা-আহ্নিক আগে বুঝি তবে করিব—এই সিদ্ধান্ত যিনি করিয়াছেন তিনি জীবনে বড়ই ভুল করিয়াছেন। তাঁহার কিছুই হয় নাই এবং পরেও হইবে না। সন্ধ্যা বুঝিবার

জন্যই সন্ধ্যা প্রথম হইতে বিশ্বাস রাখিয়া করা চাই। নিত্যকর্ম্ম বুঝ আর না বুঝ করাই চাই। জগদীশ্বরের ইহা আজ্ঞা। এ আজ্ঞা তুমি যদি পালন না কর তবে তুমি প্রথমে অবিশ্বাসী ঈশ্বরদ্রোহী হইলে। তোমার উপরে ভগবান কৃপা করিলেও তুমি সে কৃপা কখন বিশ্বাসীর মত অনুভব করিয়া মানুষ হইতে পারিবে না। কিন্তু বিশ্বাসী হইয়া "তিনি আছেন, তাঁহার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য" ভাবিয়া যখন যেমন তেমন করিয়াও কার্য্য আরম্ভ করা যায়, তিন বেলা এই নিয়ম পালন করা যায় আর কর্ম্মারম্ভে কাতর ভাবে প্রার্থনা করা যায় আমি মূর্খ আমি ফলাকাঙ্খা করিয়া কার্য্য করিতে চাই বলিয়া তোমার কাছে যাইতে পারি না—আর আমি কি ফল পাইব না পাইব ইহা আর দেখিব না। তোমার আজ্ঞা বলিয়াই কর্ম্ম করিব—এই ভাবে যিনি কর্ম্ম করেন—অপার-করুণাময়ী মা তাঁহাকে আপনিই সমস্ত বুঝাইতে থাকেন—সে নিত্য নূতন ভাবে মন্ত্রময়ী মাকে অনুভব করিতে থাকে, ক্রমে যখন সবটি বুঝিতে পারে তখন তাহার সর্ব্বকর্ম্ম শেষ হইয়া যায়। এইরূপ করিলে তবে শ্রুতির "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা—আর তোমাকে জানা ভিন্ন সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণের অন্য পথ নাই—শ্রুতির এই মহাবাক্যের মত কার্য্য করা হয়। জানার জন্যই কর্ম্ম। আগেই যদি তুমি সব জানিয়া ফেলিলে, তবে কর্ম্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না করিলে ভক্তি হয় না, ভক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হয় না, এসব কথার কোন অর্থ নাই। তাই বলি প্রথমে শাস্ত্র শ্রদ্ধাকর, করিয়া নিত্য কর্ম্ম "তোমার আজ্ঞা বলিয়া করি" এই ভাবে কার্য্য এই ক্ষণ হইতে আরম্ভ কর তবে একদিন যথার্থ চরিত্রবান হইতে পারিবে, যথার্থ ধার্ম্মিক হইতে পারিবে, যথার্থ সুখ যাহা তাহা আস্বাদন করিতে পারিবে।

আবার যাহারা নিত্য সন্ধ্যা করেন তাঁহাদেরও একটা দোষ এই হয় যে প্রথমেই তাঁহারা সন্ধ্যার সময়ে সন্ধ্যার অর্থ চিন্তা করেন। এই চিন্তায় রস আছে। কিন্তু তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য একটু চিন্তার সুখ পান বলিয়া সময়ে কর্ম্ম না করিয়া চিন্তা করিতে বসিয়া যান বলিয়া যথাসময়ে তাঁহাদের কর্ম্ম হয় না। চিত্তশুদ্ধি নাই কাজেই তাঁহাদের সন্ধ্যাভাবনা—ওটা যখন করে তখন। ইহা করা উচিত নহে। মা তুমি প্রসন্ন হও—মা আমি মূর্খ আমি কিছুই যেন ঠিক করিতে পারি না—তুমি কৃপা করিয়া আমার অজ্ঞান সরাইয়া দিও এই বলিয়া প্রণাম করিতে

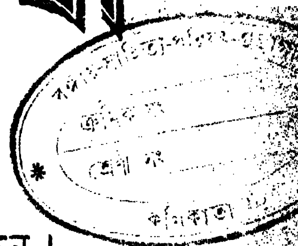
করিতে মাতার আজ্ঞা পালন করা চাই। তার পর কর্ম্মটি করিয়া যতক্ষণ পার চিন্তা কর, ইহাই ঠিক নিয়ম।

কর্ম্মের পরে যে স্থিরত্ব আইসে—যাঁহারা নিত্য কর্ম্ম শাস্ত্রমতে করেন তাঁহারা তাহা ধরিতে পারেন। এই স্থিরত্ব যাহার যত বাড়িল তাহার ধর্ম্মজগতে তত উন্নতি হইতে লাগিল। কর্ম্মের পরে চিন্তা, চিন্তার পরে আবার কর্ম্ম এইরূপ করিতে করিতে একটা স্থিরত্ব আসিবেই। মনে করা হউক যিনি ত্রিকোণ মণ্ডল বুঝিয়াছেন, সেখানে যিনি আছেন তাঁহার কথা শাস্ত্র দৃষ্টে দেখিয়াছেন—রেখায় রেখায় জপ ভ্রমণে—রেখার শেষ যে বিন্দু সেই বিন্দু যিনি ধরিয়াছেন তিনি নিত্য ক্রিয়াতে ঠিক ঠিক এই কর্ম্ম করিলে স্থিরত্বটি নিশ্চয়ই ধরিতে পারিবেন। এই স্থিরত্বটি হইতেছে স্থিতি। পথমে স্থিতিলাভ হইলেও একটা অপূর্ব্ব শান্তি মাত্র প্রথমে বুঝা যায়। ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে একটা আনন্দ তাহাতে আইসে। নিত্য ক্রিয়ার পরে সমচিত্ত মানুষের সৎসঙ্গে যে সুখ হয় সেই সুখ আপনা হইতে আসিতে থাকে। সাধনা তখন আর ছাড়া যায় না। নিত্য সেই স্থিতির সুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্মাচরণে এইটুকু পর্য্যন্ত যিনি উঠিতেছেন তাঁহার কিছু হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম যিনি কর্ম্মের পরাবস্থার স্থিতিটি বাড়াইয়া চলিতেছেন তাঁহারই যথার্থ উন্নতি হইতেছে।

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল।　　[৮ম সংখ্যা।





মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের চাঁদা এবং উৎসব সম্পাদক মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ অন্যূন ৬০০৲ ছয় শত টাকা উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকের নিকট প্রাপ্য আছে। তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় টাকা সত্বরে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। তাঁহাদিগের এই সহানুভূতি না পাইলে শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যে আমরা সক্ষম হইব না।

বিনীত—

"উৎসব" সেবক মণ্ডলী।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

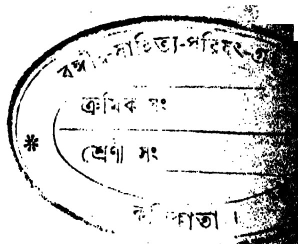
৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲, টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

আমি তোমা ভুলি কত দূরদেশে
কত জীব-নদী বাহিয়া
আসিয়াছি তব প্রকৃতির সাথে
একবার শুধু চাহিয়া।
তুমি কিন্তু মোরে, হে দয়াল প্রভু
ক্ষণেকের তরে ছাড়িয়া
যাও নাই কভু এ দীর্ঘ প্রবাসে,
আমি ভুলিয়াছি বলিয়া।
যদি কৃপা করি দিয়েছ বুঝায়ে—
জাগে যবে চিত্তে বাসনা
লীলা হেতু তবে প্রকৃতির সনে
অনিত্য এ বিশ্ব রচনা;
এই মোর আশ ওহে স্বপ্রকাশ,
থেকো সদা মোর হৃদয়ে,
ঘুচাইয়া মোর মায়া-মোহ-ঘোর
কাম-দাব জ্বালা জুড়ায়ে।
তোমা ভুলি আমি, হে হৃদয় স্বামী,
নাহি যেন মজি বিষয়ে।
হে অমৃতময় সদা যেন রয়
মতি তব পদ অব্যয়ে।

স্মরণায় ও করণীয়।

১। বহু শাস্ত্র কথার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিও না।

২। অন্তরে জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্রমূর্ত্তি ইষ্টদেবতা দর্শনের জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন কর।

৩। সর্ব্বদা মন্ত্রাভ্যাস করিবার বিঘ্ন দূর করিতে প্রাণপণ কর।

৪। চিত্তের ক্ষিপ্ত ভাব, মূঢ় ভাব ও বিক্ষেপ ভাব দূর করিয়া প্রত্যহ একাগ্র ভাব আনয়নের নিমিত্ত যত্ন কর।

৫। যখন চিত্ত অবশ হইয়া অসম্বন্ধ প্রলাপ করে তখন ইহার ক্ষিপ্ত ভাব। যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় তখন মূঢ় ভাব। যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক সংসার চিন্তা করে ও পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষণিক বৈরাগ্য আশ্রয় করে তখন ইহার বিক্ষিপ্ত অবস্থা। তুমি যে নিত্য কর্ম্ম করিতে পার না সে কেবল এই তিন অবস্থা ত্যাগ করনা বলিয়া। তোমার কোন্ শক্তি নাই? যাহার ভিতরে চৈতন্য বিরাজ করেন তাহার আবার কোন শক্তির অভাব হয়? তুমি অভ্যাস মন্দ করিয়া ফেলিয়াছ তাই মনে করিতেছ এই বয়সে আর বুঝি হইল না। এই প্রাণহারিণী বুদ্ধির কথা শুনিও না। শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন শ্রবণ কর। করিয়া পুনঃ পুনঃ যত্ন কর। নিশ্চয়ই পারিবে। তোমার সব শক্তি আছে।

১। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিও না।

তামাক নস্য এ সমস্তই মত্ততা জন্মায়। ইহাদের দ্বারা অনিষ্ট হয়। বাহিরের কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করাই পাপজনক।

২। ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত অবস্থা জয় করাই চিত্তজয়। চিত্তজয়ের জন্য—

(১) একটিমাত্র তত্ত্বের ও তাহার চিহ্নস্বরূপ জপের অভ্যাস কর।

(২) যতক্ষণ পর্য্যন্ত সদ্‌যুক্তি দিয়া চিত্তকে বুঝাইতে অভ্যাস না কর ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ একান্তে বসিলেও কিছু হইবে না। প্রত্যহ চিত্তকে সদ্‌যুক্তি শুনাও।

(৩) চিত্ত অন্যায় করিলে ইহাকে ধমকাও এবং ইহার অপমান কর এবং ইহাকে শারীরিক দণ্ড দাও।

(৪) ইহাকে অধ্যাত্ম-শাস্ত্র ও ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করাও। যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভাগবত এইগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাকে অধ্যাত্ম-চিন্তা করিতে নিযুক্ত রাখ।

(৫) ইহাকে সৎসঙ্গ করাও। বহুপ্রকারের ভিতরের ও বাহিরের সৎসঙ্গ আছে।

(৬) ইহাকে একান্তে লইয়া গিয়া বল আমি কোন চিন্তা করিব না। কারণ সবই ক্ষণস্থায়ী, সবই অনাস্থার বিষয়। কোন বাসনা আমার নাই। শরীর রক্ষার বাসনাও বৃথা। এইভাবে বাসনাশূন্য করাইয়া—আর যদি ইহা না পার, তবে শুভবাসনা করাইয়া পরে প্রাণচেষ্টার নিরোধ কর। ইহাতে এ কার্য্য বিশেষরূপে হইবে।

(৭) ইহার পরে মানস পূজা করিয়া অন্য সমস্ত বাহিরের ও ভিতরের কার্য্য কর।

(৮) এইভাবে প্রত্যহ তিন বেলার নিত্যকর্ম্ম কর। বাসনাক্ষয়, মনোনাশ বা চিত্তজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাভ্যাস করিতে করিতে নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবে। শেষে সে যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানে যাইবে।

কিছু ত্যাগ ও কিছু গ্রহণের কথা এখানে বলা হইল। এ ভিন্ন কিছুই হইবে না। ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা যেরূপেই পার ত্যাগ কর। বিষয় বাসনা ত্যাগ কর, মানসী বাসনা ত্যাগ কর, মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা বাসনা গ্রহণ কর। আবার ইহাও ত্যাগ করিয়া চিৎ বা চৈতন্যমাত্র বাসনা লইয়া অন্তঃশান্ত ও সমস্নেহ হও। পরে ইহাও ত্যাগ করিয়া নামমন্ত্রে ইষ্টদেবে সমাধি গ্রহণ কর।

মর জগতে অমরত্ব।

এই মরজগতে জীব আপনাকে আপনি যদি বুঝিতে পারে, বুঝিয়া আপনার অমর স্বরূপে যদি স্থিতি লাভ করিতে পারে তবেই তাহাকে আর কখন কারাগৃহের কয়েদী হইতে হয় না।

এই জগৎটা মরজগৎ। এটা স্থূল, এটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যাহা স্থূল, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাই নষ্ট হইবে। এই বিপুল জগৎটাও একদিন বিনষ্ট হইবে।

ইহার প্রতিবস্তুই ক্ষণস্থায়ী, প্রতিবস্তুই বিনাশশীল। যাহা নিত্য থাকে না তাহাতে আস্থা কিরূপে থাকিবে? এমন বুদ্ধিমান কেহ কি আছেন যিনি দু'দিনেই যাহা ফুরাইয়া যায় এইরূপ ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন যদি তিনি জানেন চিরদিন লইয়া থাকিবার বস্তুও আছে? যথার্থ বুদ্ধিমান তিনিই যিনি চিরস্থায়ী বস্তুর অনুসন্ধান করেন, করিয়া তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়েন, ব্যাকুল হইয়া সমস্ত চেষ্টা সেই দিকেই প্রেরণ করেন। ব্যবহারিক যাহা তাহা একবারে ত্যাগ হয় না বলিয়া তাহা তিনি অনাস্থার সহিত করিয়া সর্ব্বদা সেই পারমার্থিক বস্তু প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর প্রাণপণ করেন।

এই মরজগতে চিরদিন থাকে এমন কি আছে? ক্ষণস্থায়ী, বহুকালস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী এই তিন প্রকারের বস্তু সকলের উপলব্ধি আমরা করিতে পারি। স্থূল যাহা তাহা ক্ষণস্থায়ী, সূক্ষ্ম যাহা তাহা তদপেক্ষা বহুকাল স্থায়ী, কারণ যাহা তাহা বহু বহু কালস্থায়ী। কিন্তু যাহা তুরীয় তাহাই চিরস্থায়ী তাহাই নিত্য।

প্রতিবস্তুর মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয় এই চারি প্রকার অবস্থা আছে।

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। রক্তমাংস অস্থিমজ্জা বিশিষ্ট এই দেহটা স্থূল দেহ। এটা অতি সহজেই নষ্ট হয়। কিন্তু এই স্থূলের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি সূক্ষ্মদেহও আছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ মন ও বুদ্ধি এইগুলি লইয়া সূক্ষ্মদেহ। স্থূলদেহ অতি অল্পকাল থাকে কিন্তু সূক্ষ্মদেহ বহুকাল স্থায়ী। পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ পোড়াইয়া ফেলা হয় কিন্তু সূক্ষ্মদেহ দগ্ধ হয় না। স্থূলদেহ নষ্ট হইয়া গেলে ইহা প্রথমে 'বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' হইয়া কষ্টভোগ করে। পরে ইহাই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া নরক ভোগ করে। ইহাই পুনরায় জন্মে পুনরায় মরে, আবার জন্মে। ইহার মৃত্যুর জন্য অর্থাৎ ক্লেশের শেষ জন্য যখন মনকে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইবার সাধনা করা যায় তখনই মনের নাশ হয়, হইলে তবে পরমানন্দ প্রাপ্তির পথে যাওয়া যায়।

সূক্ষ্মদেহ নাশ হইলেও কারণ দেহ থাকে। ইহাই অবিদ্যা। ইহাই সমস্ত দেহ ধারণের কারণ। এই অবিদ্যা নষ্ট হইলে তবে পরমানন্দরূপ আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূলদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মদেহ বহুদিন স্থায়ী, তদপেক্ষা বহুকাল স্থায়ী এই কারণ দেহ বা অবিদ্যা। দেহ ধারণই জীবের দুঃখ। সর্ব্বতোভাবে দেহের অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলে জীব আপন অমর স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই জীবের স্বরূপাবস্থান।

সকল জীবই কি আপনার অমর স্বভাব লাভ করিতে পারে?

এক মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবের পক্ষে অমরত্ব লাভ অসম্ভব। আবার মনুষ্যের মধ্যে কতকগুলি সাধক-মনুষ্য সাধনার সাহায্যে অমরত্ব বুঝিতে পারে। যাহারা অমরত্ব বুঝিতেও পারে তাহাদের মধ্যে চেষ্টাবান সাধকমাত্র সাধনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারে।

মানুষ সুখ চায়। শুধু মানুষ নহে জীব মাত্রই আনন্দের ভিখারী। স্থূলে সুখ অল্প কিন্তু সূক্ষ্মে সুখ বহুক্ষণ স্থায়ী। রসগোল্লা স্থূল বস্তু। স্থূল জিহ্বাতে লাগাইলে ইহাতে সুখ হয়। সে সুখ কিন্তু অতি অল্পকাল স্থায়ী। জিহ্বা হইতে গলায় নামিলেই এ সুখ থাকে না। স্থূল সুখের জন্য যাহারা ব্যাকুল তাহারা মূঢ়। কিন্তু স্বপ্নে যদি কেহ স্বপ্নের রসগোল্লা কখন খাইয়া থাকেন তিনি জানিতে পারেন সে সুখে স্থূল ভোগের দুঃখ থাকে না। কিন্তু জাগ্রত-অবস্থাতে থাকিয়াও যাহারা কল্পনার সুখ ভোগ করেন তাঁহারা বহুক্ষণ স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা স্থূল ভোগ ছাড়িয়া চিত্ত লইয়া চিত্তের সূক্ষ্ম সুখ ভোগ করিতে পারেন, তাঁহারা পশুধর্ম্মী স্থূল-ভোগাকাঙ্ক্ষী মনুষ্য অপেক্ষা সুখী। চিত্ত লইয়া যাঁহারা সুখ ভোগ করেন তাঁহারা ভক্ত-সাধক।

ইহার উপরেও অন্য প্রকার আনন্দ আছে। এই আনন্দ ভোগ হয় না। এই আনন্দে স্থিতি লাভ করা যায়। জীবন্মুক্ত হইলে এই আনন্দ লাভ হয়। এই আনন্দে স্থিতি লাভ করিয়া চিত্ত দ্বারা যে সুখ তাহা ভক্তিমার্গের চরম সুখ। আর সুখ স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। যে সুখের সম্পর্ক জড়ের সহিত যত অল্প তাহাই তত অধিক্ষণ স্থায়ী এবং তাহাই তত রমণীয়। ফলে যাহা গ্লানীশূন্য সুখ তাহা ভক্তিমার্গেই পাওয়া যায়। আবার গ্লানিশূন্য সুখ-স্বরূপে অবস্থান করাই মুক্তি। এইটিই জীবের স্বরূপ। এই স্বরূপে অবস্থান করিয়াও জীবন্মুক্ত পুরুষ গ্লানিশূন্য চিত্তসুখ আস্বাদন করিতে পারেন। ইহা অনিচ্ছার ইচ্ছা।

সাধনা ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবের পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ অমরত্ব লাভ হইতে পারে না। শাস্ত্র ইহার যে ক্রম দিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। স্থূল দেহ ভুলিয়া সূক্ষ্ম দেহে থাকাটাই প্রথম কথা। বহু উপায়ে এই স্থূল দেহ ভুলিতে পারা যায়। এক একটি জীবের দেহকে ব্যষ্টি দেহ বলা যায়। আবার সমস্ত দেহের সমষ্টি যাহা তাহা যাঁহার দেহ তাঁহাকে বিরাটদেহধারী পুরুষ বলা হয়। বিরাটদেহধারী পুরুষ যিনি তিনি কখন বিরাটদেহে অভিমান করেন,

কথনবা ঐ পুরুষ সমস্ত ব্যষ্টি দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সূক্ষ্ম দেহ সমষ্টি সেই সূক্ষ্ম সমষ্টি দেহেও অভিমান করেন। যখন তিনি সূক্ষ্ম সমষ্টি দেহে অভিমান করেন তখন তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ। আবার এই পুরুষ যখন কারণ দেহ বা অবিদ্যাতে অভিমান করেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। এই পুরুষ আবার যখন সর্ব্বপ্রকার দেহ অভিমান ত্যাগ করিয়া আপনার "আপনি আপনি"রূপ স্বরূপে অবস্থান করেন তখন তিনি তুরীয়।

আমি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ নহি, আমি প্রকৃতি হইতেও ভিন্ন—যিনি বিচার সাধনা দ্বারা এইটি উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি প্রকৃতি হইতেও আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন, যাঁহার বিচার ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। ইহার জন্য সদ্যোমুক্তি। আর যিনি পারেন না তাঁহার জন্য শাস্ত্র ক্রমমুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক্রমমুক্তিই যাঁহার লক্ষ্য তিনি হিরণ্যগর্ভের উপাসক। হিরণ্যগর্ভের উপাসকই ভক্ত। এইরূপ উপাসকের অবলম্বন যিনি তিনিই অবতার। অবতারকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে পৌঁছানই ইহাদের সাধনা। গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা, ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের মিশ্র উপাসনা ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গায়ত্রীদেবী ক্রম মুক্তি প্রার্থী সাধককে ভূরাদি সপ্ত লোক-পারে লইয়া গিয়া যখন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষে স্থিতিলাভ করাইয়া দেন—খণ্ড চৈতন্য যখন আপনাকে অখণ্ড চৈতন্যরূপে অবস্থান করাইয়া সমস্ত দৃশ্যমার্জ্জন রূপ পরমপদ লাভ করেন তখনই তিনি মুক্ত হয়েন। জীবের শিবস্বরূপে অবস্থানই জ্ঞান মার্গ। যিনি ইহা না পারেন তিনি ইষ্টদেবতার আশ্রয়ে যখন হিরণ্যগর্ভে সমস্ত ভাবনা, সমস্ত বাক্য ও সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দিতে পারেন তখনই ঐরূপ সাধককে ভক্ত নাম দেওয়া হয়। শ্রীভগবানই ভক্তকে জরা-মরণ-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্র পার করিয়া দিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। সেখানে ব্রহ্মার সহিত তিনি মুক্তিলাভ করেন। এইটি ক্রমমুক্তির পথ। এই পথে শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্মার্পণই প্রধান কার্য্য। ইহা লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলেন :—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

ইহাই ভক্তের সাধনা। এই কার্য্যে প্রাণপণ করিতে পারিলে যখন চিত্তশুদ্ধি

লাভ হয় তখন আপনা হইতে বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিচার দ্বারাই এই জীবনে জ্ঞানলাভ হয়—সদ্যোমুক্তি হয়। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রম মুক্তির কার্য্য করা আবশ্যক।

অভ্যাস করিলে কবে যে পাইবে ?

ঘড়ার মধ্যে যে আকাশ তাহা মহাকাশই। প্রাণীর মধ্যে যে চৈতন্য তাহা সেই পরিপূর্ণ চৈতন্য। সর্ব্বদা সকল প্রাণীতে—সকল দ্রব্যজাতে সেই পূর্ণ চৈতন্যকে স্মরণ করা ; কাহারও সহিত কথা বলিবার সময় সেই পূর্ণ চৈতন্যই যেন কি বলিতেছেন—কি যেন বলিতেছেন তাহাতে যাহা বুঝিতেছি তাহা অপেক্ষা আরও যেন কত কি তিনি বলিতেছেন, প্রতিশব্দ শুনিয়া তাহাতে যেন কত কি তিনি বলিতেছেন ইহা ভাবনা করা, করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বদা অনুভব করা ; আবার কথা কহিবার সময় লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছি না,—তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছি এই ভাব সর্ব্বদা মনে রাখা ; ইহাই হইল উৎকৃষ্ট সজীব সাধনা।

তত্ত্বটি ধর, ধরিয়া প্রতিক্ষণে তাহার সাধনা কর, তবেত হইবে ? শুধু একবার বুঝিলে আর ব্যবহার কালে, যাহা বুঝিয়াছ তাহার বিপরীত ভাবটি লইয়া সর্ব্বদা আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতেছ ইহাতে কি হইবে ?

'সব তুমি' ইহাই সগুণ সাধকের তত্ত্ব কথা। নির্গুণ সাধকের তত্ত্ব কথা 'সব নাই তুমিই তুমি'। আগে সগুণ তত্ত্ব সাধনা কর, তার পরে নির্গুণ তত্ত্বের কথা কহিও। আগে 'সব তুমি' দেখ, দেখিয়া সাধনা কর, তারপরে 'আমিই আমি' ইহাতে স্থিতিলাভ কর।

'সব তুমি' এই সাধনায় সিদ্ধি হইবে কখন ? যখন সবের মধ্যে যে চেতন সেই চেতনে সর্ব্বদা দৃষ্টি পড়িবে আর সেই চৈতন্যই মহাচৈতন্য ইহা সর্ব্বদা স্মরণে জাগিবে, সেই মহাচৈতন্যই যেন প্রাণী দেহের ভিতর দিয়া, প্রাণীগণের ভাবনা বাক্য কার্য্য দিয়া কি করিতেছেন, প্রাণীগণের ভাবনা বাক্য ও কার্য্যে তুমি যাহা

বুঝিতেছ তদপেক্ষা কত কি তোমার অজ্ঞাত বিষয় যেন প্রকাশ হইতেছে, তুমি জাননা—শুধু অবাক্ হইয়া যেন শুনিতেছ, যেন কিছুই বোঝ না অথচ এই জানিতেছ যে সেই যেন কথা কহিতেছে বলত এই সাধনার অভ্যাস কবে করিলে? জিনিষটি বুঝিতে পার কিন্তু বিনা অভ্যাসে এই বোঝাটি ভুল হইয়া যাইবে। আত্মবিস্মৃতিই সর্ব্বদুঃখের মূল।

ঐ দেখ স্ত্রীবেশধারী ঐ পুরুষটি কেমন সুন্দর কথা বলিতেছেন। ঐ যে লোকটি বলিতেছে "আমিই সে" এ কথাতে তুমি চটিতেছ কেন? তুমি যদি 'সবই সে' ইহার অভ্যাস করিতে তবে লোকের সোঽহং কথা কওয়াতেও কত সুখী হইতে? সবই সে। সেই বলিতেছে "সোঽহং"। এইভাবে দেখিলে অন্ততঃ তুমিত বাঁচিলে? তোমার সাধনা যে 'সব সে' ইহার অভ্যাস, ইহা হইতে ত ভ্রষ্ট হইলে না? যে সোঽহং বলিতেছে তার কি হইল বা না হইল তার জমা খরচের জন্য তোমার প্রয়োজনটা কি? সে প্রয়োজন সেই বুঝিবে। সব তুমি এই সাধনার অভ্যাসে বড় রস আছে। রস পাই না বলিয়া দুঃখ কর! রস পাইবার জন্য এই সাধনার অভ্যাস করনা। ইহাতে কত রস পাইবে এবং পাইয়া কি হইয়া যাও একবার দেখ না।

শাস্ত্র কি এই সাধনা করিতে বলিতেছেন যে করিব এই যদি তোমার প্রশ্ন হয় তবে বলিব স্বয়ং বেদই ইহা অভ্যাস করিতে বলিতেছেন।

দেখ ইহা কোথায় বলিতেছেন।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"

বেদের এই বাক্যের অর্থ বেশ করিয়া চিন্তা করা যাউক আইস।

এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। কারণ এই সমস্ত তাঁহাতেই জন্মিতেছে, তাঁহাতেই লয় হইতেছে, তাঁহাতেই স্থিতিলাভ করিতেছে। শান্ত হইয়া ইঁহার উপাসনা কর।

শ্রুতি এখানে কোন্ উপাসনার কথা বলিলেন? শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য চিন্তা কর, উপাসনাটি ধরিতে পারিবে।

এখন শ্রুতির তাৎপর্য্য দেখ।

এই সমস্ত যাহা দেখিতেছ তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। আচ্ছা এই যে ছোট আম্র ফলটি দেখিতেছ ইহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, ইহা বল কিরূপে? ব্রহ্ম বলে কাহাকে? যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাঁহাকে। এই আম্র ফলটিত এতটুকু, ইহা বৃহৎ বা ব্রহ্ম কিরূপে?

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যাহা অতি বৃহৎ। শুধু কি তিনি অতি বৃহৎ? বৃহৎ, ক্ষুদ্র ইত্যাদিতে ত একটা আকার বুঝায়? ব্রহ্ম কিন্তু চেতন। চেতন যাহা তাহা অনুভবে পাওয়া যায়। চৈতন্যের আকার কোথায়, যদি তিনি আত্মমায়া অবলম্বনে আকার ধারণ না করেন? ব্রহ্ম যিনি তিনি তটস্থে জন্মাদ্যস্যযতঃ, যাঁহা হইতে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে। এই তটস্থ লক্ষণে তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে বিশ্ব-কর্ত্তা রূপে ধরা দিতেছেন, চিন্তার বিষয়ীভূত হইতেছেন। কিন্তু এই কি তাঁহার সব? শ্রুতি বলিতেছেন,—না। ইহা তটস্থ লক্ষণ মাত্র। কিন্তু স্বরূপ লক্ষণে এই চৈতন্য পুরুষটি সৎ চিৎ আনন্দ। তিনি স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এখন বল দেখি ক্ষুদ্র আম্র ফলটি অতি বৃহৎই বা কিরূপে আর সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপই বা কিরূপে? তবে এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইহার অর্থ তবে কি? শ্রুতি এখানে কি বলিতেছেন?

ঘড়ার ভিতরে আকাশ,—এইটি এখন লক্ষ্য কর। আম্র ফলটির তুমি যাহা দেখিতেছ তাহাত নাম ও রূপ। এই নাম ও রূপের আবরণে আবৃত আর কিছু কি আছে? খুঁজিলে দেখিবে যে অস্তিভাতি এবং প্রিয় যিনি তিনি নাম ও রূপ লইয়া আম্রফলরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। বিবর্ত্ত কি তাহাত জান? এক গাছা রজ্জু পড়িয়া আছে। তাহাকে যদি তোমার মনে হয় এটা সর্প, তবে রজ্জুকেই সর্পভাবে দেখা হয়। এটা হয় ভ্রম জ্ঞানে। এই ভ্রম জ্ঞানে ব্রহ্মকেই আম্রফলরূপে দেখা হইতেছিল। ভ্রম ভাঙ্গিলেই দেখিবে সর্প নাই—রজ্জুই আছে। নামরূপ নাই—অস্তিভাতি প্রিয়ই আছে।

কিন্তু আম্র ফলই ব্রহ্ম কিরূপে, এখান হইতে ব্রহ্মানুসন্ধান করা প্রবর্ত্ত সাধকের উচিত নহে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সমস্ত ব্রহ্ম ইহার চিন্তা করিতে হয় চেতন প্রাণী হইতে অথবা মানুষ হইতে। আপনার ভিতর যে চৈতন্যানুভূতি তাহা হইতে মানুষের সমস্ত জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া পূর্ণজ্ঞানের অনুসন্ধান করিতে হয়। তবেই ঘড়ার ভিতরকার আকাশটি ধরার মত চেতন পুরুষটিকে ধরা যায়। আর সেই চৈতন্য পুরুষটিই যে পূর্ণ পুরুষোত্তম তাহার চিন্তা সহজও হয়। আমি চেতন ইহা ত সকলেই অনুভব করেন। এখন চেতন যাহা তাহা কি, তাহার স্বরূপ কি, এই সমস্ত ভাবনা করা, পরমপুরুষে পৌছিতে পারিবে। বুঝিবে চেতন যাহা তাহা কখন অচেতন হয় না, সেই জন্য চেতনের মৃত্যু নাই। এইরূপে দেখিবে চেতনের জন্ম নাই

জরা নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ভয় নাই, মৈথুন নাই,—চেতন যাহা তাহার খণ্ড হয় না। চেতন অখণ্ড সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ।

তবেই ত হইল সৎচিৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া ভাসিয়াছেন। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নমত ভাসে, ব্রহ্মও সেইরূপ সৃষ্টিরূপে যেন ভাসেন। এখন ভাবনা কর সুষুপ্তিতে চেতন পুরুষ কোথায় থাকেন, কিরূপ থাকেন? শ্রুতি বলেন 'যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্'। এ কথা ত সকলে অনুভব করিতে পারেন যে সুষুপ্তস্থানে বা ঐ কালে সুপ্ত আত্ম পুরুষ কোন কামনা করেন না—কোন ভোগ্য বিষয়-কামনা তখন তাঁহার থাকে না। আর তিনি কোন স্বপ্নও দেখেন না। সেই সুষুপ্তাবস্থা যাঁহার স্থান তিনি সুষুপ্তস্থান। জাগ্রত ও স্বপ্নকালের ন্যায় সুষুপ্তিতে কোন ভোগ বাসনা থাকে না, কোন দৃশ্যদর্শনাদিও থাকে না।

সুষুপ্তিকালে থাকে কি তাহাই দেখ। যাহাকে অবলম্বন করিয়া জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা ঘটে, চেতন পুরুষ সুষুপ্তিতে সেই বস্তুটি হইতে সরিয়া থাকেন। সুষুপ্তিতে বিষয় ভোগের দ্বারগুলি রুদ্ধ হয়। পুরুষের অন্য আবরণ থাকে না। স্থূল দৃশ্য আবরণ বা স্থূল শরীর নাই, সূক্ষ্ম শরীর বা মনও নাই, আছে কেবল অজ্ঞান। কুয়াসা যেমন পর্ব্বতকে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ অজ্ঞানটা পুরুষকে যেন ঢাকিয়া থাকে। আর সেই চেতনের সত্তাটিমাত্র অবলম্বন করিয়াই এই অজ্ঞানটি যেন তাঁহাকে আবরণ করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভাব যাহা তাহাই না অজ্ঞান? দৃশ্য নাই দ্রষ্টাই আছেন এই না জ্ঞান? ইহার অভাব হয় কিরূপে? ইহার অভাব হয় মায়ার আবরণ শক্তিতে। দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার একটা যে ভেদ থাকে মায়ার আবরণ শক্তি সেই ভেদটাকে তিরোহিত করে বলিয়া দৃশ্যজগতটাই ব্রহ্মরূপে তিনি ভাসান। অজ্ঞানটি মায়ারই সৃষ্টি। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবটি মায়ার আবরণ শক্তিরই কার্য্য। এই অজ্ঞানে থাকে ছায়া ছায়া মত বিশ্ব। তাহাই ক্রমে স্বপ্ননগরের মত ভাসে।

সুপ্তপুরুষ অথবা প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন চেতনপুরুষ যদি পূর্ব্ব হইতে সাধনা করেন তবে সাধনা প্রাখর্য্যে তিনি ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া সত্বরে তুরীয় ব্রহ্ম রূপে অবস্থান করিতে পারেন। এই সাধনা কিন্তু যজ্ঞ দান তপস্যা ইত্যাদি নহে। ইহা জ্ঞানময় সাধনা। ইহাই সৃষ্টি তত্ত্বানুসন্ধান রূপ ঈক্ষণ বা তপস্যা। এই তপস্যা দ্বারাই

তুরীয়ে স্থিতি লাভ হয় আবার এই সুপ্তপুরুষই নিম্নের তপস্যা দ্বারা সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা দ্বারা জগৎ সৃষ্টিও করিতে পারেন।

বলা হইল অজ্ঞানেই সৃষ্টি ভাসে। অজ্ঞান আবার মায়া রচিত। যদি বলা যায় মায়া কোথা হইতে আসিল ? উত্তরে বলা হয়, মণিতে যে ঝলক উঠে তাহা কোথা হইতে আইসে ? স্বভাবতঃ মণিতে ঝলক উঠার মত যেন মায়া তাঁহাতে ভাসে। সেই মায়ার প্রভাবে অজ্ঞান রচিত হয় !

মায়া যখন তাহা হইতে সৃষ্ট হয় সে সৃষ্টিটা অবুদ্ধি পূর্ব্বক। এই অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি হইতেই পরে বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি হয়। যেমন ভোজনেচ্ছা নাই তথাপি খাইতে খাইতে ভোজনেচ্ছা জন্মে সেইরূপ স্বভাবতঃ মায়ার যে চলন হয় তাহা প্রথমে অনিচ্ছা পূর্ব্বক হইলেও উহাই পরে অনিচ্ছার ইচ্ছা রূপে বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টির কারণ হয়। 'মম যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম'—এখান হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। হিরণ্যগর্ভাদিরও বীজ এই গর্ভ।

তবেই দেখ, যে মায়াটা যেন উঠে সেই মায়া-রচিত যে অজ্ঞান তাহা কেবল জ্ঞানের অভাব—তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। এই জ্ঞানাভাব হইতে সৃষ্টি। এই সৃষ্টিটি—এই জগৎটি ব্রহ্মরূপে দাঁড়াইয়া আছে। বাস্তবপক্ষে জগৎ নাই। ব্রহ্মই আছেন। জগৎটা ভ্রমজ্ঞানে দেখা যাইতেছে। নাম রূপটা ভ্রমজ্ঞানে ভাসিয়াছে। অস্তি ভাতি প্রিয়ই আছেন। তুমি এখন দেখিতেছ মানুষ পশু পক্ষী জল স্থল আকাশ বায়ু অগ্নি, এই যে তোমার দেখা এটা অজ্ঞান আশ্রয়ে। এই অজ্ঞানটি সাধনা দ্বারা যখন সরাইতে পারিলে তখন দেখিলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিয়া সাধনা কর 'সবই তুমি'। সকলের মধ্যে সেই চেতনপুরুষ দেখিতে অভ্যাস কর। জড়ের মধ্যে চেতনপুরুষ আছেন ইহা প্রথমে বিশ্বাসে রাখ। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে চেতনপুরুষের অনুভব করিতে পার যিনি তোমার সহিত কথাও কহেন কত কার্য্যও করেন ; তাঁহার কার্য্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া তুমি তাঁহাকে তাঁহার স্বরূপ যাহা বুঝিয়াছ সেই লক্ষ্যে কথা কও, সর্ব্বত্র তাঁহাকে লইয়া থাক। শান্ত হইয়া এই উপাসনা কর। কেমন ?

ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং প্রভো !

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, তোমাকে তেমন ভাবে পাইলাম কই ? তুমি প্রাণে সঙ্কল্প জাগাইলে,—নিয়ম করিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহা পারিলাম কই ? হায় আজ কতবার তোমার ভক্তের কথা স্মরণে দুঃখ করিয়া বলি "বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা ন তৎকৃতং ময়া, সোঽহং কর্ম্ম দুরাচারো ত্রাহি মাং মধুসূদন।" বাক্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কর্ম্মে তাহা করি নাই, আমি বড়ই কর্ম্ম-দুরাচার, মধুসূদন আমাকে পরিত্রাণ কর। কিন্তু আমি কেন তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে পারি না, আমার কি তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই ? ঠাকুর ! আমার অন্তর তো তুমি জান ? আমার দুর্ব্বলতাও তো তুমি জান। আমি কি চাই, কি না চাই, তাহাও তুমি জান। তুমি আসিলে না বলিয়া দুঃখ করি কিন্তু যাহা করিলে আসিবে বলিয়া গিয়াছ তাহা কেন করি না ? যে মুহূর্ত্তে তোমাকে স্মরণ করা হয় তাহাই শুভমুহূর্ত্ত। তাই আজ এই শুভমুহূর্ত্তে তোমাকে স্মরণ করিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমাকে ডাকিতে বসিলেও আমার এমন হয় কেন ? তোমাকে ডাকাই ত আমার সাধনা, তাহা আমি পারি না কেন ? তোমার সমস্ত উপদেশ বুঝি আমি বুঝিতে পারি না তাই এমন হয়। আজ একবার ভাল করিয়া তোমার উপদেশ আলোচনা করিব, এবং "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" তোমার এই আদেশবাণী হৃদয়ে এবং তোমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া আমি কর্ম্মকরিতে প্রবৃত্ত হইব।

সাধনা করিলেই তুমি আসিবে; ইহাই ত তোমার ব্রত ইহাই তোমার উপদেশ। সাধনা করে মন। মন স্ত্রীলোকের মত উত্তম, মধ্যম ও অধম। আর তুমি স্বামী—তুমি পরমাত্মা। যে মন সর্ব্বদা কাতর, সেই মন উত্তম, কাতর মন সতী স্ত্রীর মত। আমার সতী হইতে বড় সাধ। তোমাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে আমার বড় সাধ কিন্তু সর্ব্বদা তো আমি কাতরতা লইয়া থাকিতে পারি না। কাতরতা কি তাহা তো আমি একদিন বুঝিয়াছিলাম, যে দিন তুমি আমাকে কাঁদাইয়া ছিলে, যে দিন বলিলে আমি কপটতা করি, সে দিন আমি কাতরতা কি তাহা

বুঝিয়াছিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে বড় অভিমানে আমি বলিয়াছিলাম যদি কপট হইলাম তবে আর এ বৃথা জীবন ধারণে ফল কি ? মরিব সত্য—কিন্তু মনে মনে কতবার বলিলাম, "ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং প্রভো !" সেই মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণ কাতর হইয়া বলিয়াছিল "তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে চাও করিও কিন্তু প্রাণেশ্বর ! তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়, আমার আর অন্য আশ্রয় কেহই হইতে পারে না।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তখনই সঙ্কল্প করিলাম "জপই জপই শ্যাম নাম, ছার তনু করব বিনাশ।" আমি কিছুই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, কিন্তু দয়াময় ! তুমি আমার প্রাণের ভাব বুঝিলে, আমার কাতরতা দেখিয়া হাসিলে, আমাকে আবার আদর করিলে। হরি ! হরি ! সেই সময় আমি বুঝিয়া ছিলাম কাতরতা কি ? সেই কাতরপ্রাণে ডাকিলেই ডাকা হয়। ডাকার মত ডাকা হইলেই তুমি এস। হায় ! আজ তুমি আমাকে সাধনা করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছ, যদি আমার ঐ কাতরতা সর্ব্বদা থাকিত তবে কি তুমি আমাকে দূরে রাখিতে ? আর তুমি কি এত গোপনে থাকিতে ?

আর এক দিন—আর এক দিন বড় কাতর হইয়াছিলাম আমি ব্যাসগঙ্গায় স্নান করিবার জন্য জলে নামিয়াছি, তোমাকে পাইলাম, তুমি বলিলে গৃহে যাও—আমি এইখানেই অদৃশ্য হইব। হরি ! হরি ! এই কথায় ত্রিভুবন শূন্য বোধ হইল আমি অভিমানে জলে ডুবিয়া মরিব মনে করিলাম তুমি আমাকে আবার সান্ত্বনা করিলে। কাতরতা সে দিন তো বুঝিয়াছিলাম আজ এমন হইয়াছি এ দোষ তোমার নহে, এ দোষ আমার। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে চাই কিন্তু কাতর প্রাণে সাধনা করিতে পারি না তাই তুমি আসিয়াও এসো না। যখন নির্জ্জন স্থানে একাকী যাই তখন প্রাণে প্রাণে বুঝি যেন তুমি আমার সঙ্গেই আছ কোথাও যখন একাকী গমন করি তখন স্পষ্ট অনুভব হয় তোমার সঙ্গেই যাইতেছি। তুমি যেন সঙ্গে থাকিয়া তোমার কাছেই লইয়া যাইতেছ। কাতরপ্রাণ না হইলে তোমাকেও ডাকা হয় না আর তুমিও এসো না। হায় ! সর্ব্বক্ষণ আমার কাতরতা কেন থাকে না ?

আর এক অবস্থাতেও তো কাতরতা অনুভব করিয়াছিলাম, তুমি দেখা দিয়াছিলে—যখন সাধনা করিতে বলিয়া গেলে—কাতরপ্রাণে আমাকে ডাক—পাইবে। আমি প্রথম প্রথম কত কাতর হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতাম কিন্তু বুঝি সে কাতরতা প্রবল হইত না তাই তুমি স্পষ্টভাবে দেখা দিতে না কিন্তু স্বপ্নে তোমাকে

প্রায়ই পাইতাম। ক্রমে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমি তোমার আজ্ঞা-মত সাধনা করিতে লাগিলাম। সাধনা করিলেই কি জানি কোন শক্তি আসিত। সেই শক্তি লইয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হইত। ক্রমে ক্রমে একটি অস্পষ্ট আভাষ পাইতাম। তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া লোকের জন্য কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। ক্রমে প্রকৃত কাতরতা যেন থাকিল না। আমি যেন যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতাম আর মনে ভাবিতাম তোমার সঙ্গেই তো কথা কই, তোমার জন্যই তো কর্ম্ম করি, এই মোহে আমি অন্যরূপ হইয়া গেলাম, নানাবিধ কার্য্য করিতাম, কত কবিতা লিখিতাম,—বৃক্ষে, পত্রে, আকাশে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, সমুদ্রে, নদীতে, পর্ব্বতে, মানব হৃদয়ে সর্ব্বত্রই যেন তুমি আছ এইরূপ কতই কল্পনা করিতাম।

নদী বহুদূর হইতে সমুদ্রে মিশিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। প্রাণে আকুল পিপাসা কিন্তু সন্মুখে স্তূপাকার বালুকারাশী। মিলনে বাধা পড়িল। নদী সাগরের স্বর শুনিতেছে। মধুর গর্জ্জনে প্রাণের ব্যাকুলতা আরও বাড়াইয়া দিতেছে কিন্তু সম্মুখের বালুকার স্তর অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই। পুরুষোত্তমে চক্র তীর্থে এই নদী দেখিয়া কত কাঁদিলাম—ভাবিলাম নদি !—আমিও যে তোমার মত ভাগ্যহীন হইয়াছি। তাঁহার মধুময় স্বর আমি শুনিতে পাই—সে আমার বড় নিকটে তা ও বুঝিতে পারি কিন্তু বালুকারাশী—এই নামরূপের বন্ধন—অতিক্রম করিতে আমারও সামর্থ্য নাই। নদীকে দেখিয়া আমার মনে হইল আমি বুকে করিয়া ইহাকে যদি সমুদ্রের বক্ষে দিয়া আসিতে পারিতাম তবে তো নদীর এই দুঃখ থাকিত না। চক্র-তীর্থের নদী কত শুকাইয়া গিয়াছে। সাগরের এত নিকটে তবুও তাহাকে পাইতেছ না। শরীর তো শীর্ণ হইয়া গেল। সে জলধারার স্রোত নাই। বড়ই নির্ম্মল কিন্তু বড় শীর্ণ। কত দুঃখ করিলাম যদি আজ আমাকে কেহ কৃপা করিয়া হাতে ধরিয়া লইয়া যায় এবং লইয়া গিয়া তোমার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। এইরূপ কতই ভাবিলাম কতই কাঁদিলাম। আমি যেমন নদীকে সমুদ্রের বক্ষে দিতে পারিলাম না, আমাকেও কেহ সেইরূপ মিলাইয়া দিল না। কে দিবে ? তোমার কথা মত সাধনা না করিলে শুধু কল্পনায় চাঁদ দেখিয়া তোমার মুখ দেখিতেছি ভাবিলে, বায়ু স্পর্শ করিয়া কল্পনায় তোমার স্পর্শ অনুভব করিতেছি ভাবিলে, ক্ষণকালের জন্য চিত্ত বিনোদন হয় বটে, প্রাণে একটু কাতরতা জাগে বটে, কিন্তু যে কাতরতায় তোমার দর্শন পাওয়া যায় সে কাতরতা আসে না, তোমার দর্শনও পাওয়া যায় না। হায় ! আভাষ লইয়া আমি আর কতদিন

তৃপ্ত থাকিব? এসব কথা আর তোমাকে বলিয়া কি হইবে? আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছ সেই অবস্থায় থাকিয়াই কাতর প্রাণে তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।

আমার যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপ অবস্থাতেই আমাকে রাখিয়াছ, সুতরাং দুঃখ করিয়া ফল নাই। কাতরতা সর্ব্বদা রাখিবার উপায়ও আছে। লোক সঙ্গে আমাকে থাকিতে হইবে, লোকে আমাকে তিরস্কার করিবে তাহাতে আমি বিচলিত হইতে পারিব না। লোকে নিন্দা করিবে তাহাও হাস্যমুখে সহ্য করিয়া এবং কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া তোমার সাধনা করিতে হইবে। কাতরতার অন্য অন্য বিষয়ও আছে—মৃত্যু চিন্তায় কাতরতা আইসে, কিন্তু মৃত্যু চিন্তায় আমি সেরূপ কাতর ত হই না। না হই—যে কোন রূপে কাতর হইলেই ত হয়। সাধনা নিয়ম মত করিতে না পরিলেই আমার কাতরতা আইসে। তোমার জন্য আমি নিয়মিতরূপে কর্ম্ম করিতে পারি না ইহাই ত আমার পক্ষে কাতরতা— সাধনা করিতে প্রাণপণ করি, তোমাকে ডাকিতে বহু চেষ্টা করি, ডাকিয়া ডাকিয়া যখন পাই না তখন কাতর হইয়া আবার ডাকি ইহাই আমার সাধনার ক্রম। আলস্য অনিচ্ছা ত্যাগ করিয়া তোমাকে ডাকিবার জন্য প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করিব। অধিক আর কি বলিব, সবই ত তুমি জান। হে দীনবন্ধু! আমাকে দীনের দীন করিয়া তুমি আমার বন্ধু হও।

শ্রীআমি

দুঃখের কথা বা বিষাদ-যোগ।

[স্বামীই উপাস্য আর স্ত্রী উপাসক, এই ভাবে উপাসনা-তত্ত্ব পাঠ করিলে স্বামী স্ত্রীর মুখে এই তত্ত্ব-কথা শ্রবণ দোষের বলিয়া বোধ হইবে না।]

স্বামী। কি?

স্ত্রী। আবার ত আসিলাম।

স্বামী। তা ত বেশ।

স্ত্রী। বেশ বুঝিগো। তবে আগে বুঝিতাম একরূপ আর এখন বুঝি আর একরূপ।

স্বামী। তখনত চব্বিশ ঘণ্টাই আসিতে। তাতে মনে কিছুই উঠিত না। তখন মনে হইত আমার স্বামী—স্বামীর সহিত যেমন ব্যবহার করিলে আমার সুখ হয়, তেমনি আমি করিব ইহাতে আবার স্বামী ভাবিবে কি? স্বামীর কাজের আবার বিঘ্ন কি? আর—

স্ত্রী। আর এখন তেমন করিয়া আসিলে মনে কিছু উঠে।

স্বামী। মনে উঠে আমি উপযুক্ত হইয়া নিকটে আসি। কেমন?

স্ত্রী। তাই। কিছু করিতে চাই। ভাল হইতে চাই। প্রত্যহ ভাল করিয়া কার্য্য করিয়া প্রত্যহ ভাল থাকিতে চাই।

চেষ্টাও করি তাওত দেখিতেছ তবুওত দুঃখ যায় না। এক ভাবে ত কার্য্য করিতে পারি না। কখন কার্য্য করিতে উদ্যম করি, আর কখন আলস্য, অনিচ্ছা আইসে। কখন কার্য্য করিতে করিতে প্রাণ ভরিয়া যায় আর কখন বেগার দেই, কিছুই পারি না। আবার এই অবস্থায় অন্য যাহা করিতে যাই কিছুতেই চিত্ত যেন সুখ পায় না।

স্বামী। শুধু যে তোমার এই দুঃখ তাহা নয়। যাহারা ধর্ম্ম পথে উঠিতে যাই-তেছে তাহাদের অধিকাংশেরই এই দুঃখ। বরং যাহারা সংসার করে তাহাদের একটা উদ্যম আছে, একটা নিয়ম আছে, একটা বেগ আছে। কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম পথে আসিতে চায় তাহারা না পারে সংসার করিতে, না পারে ধর্ম্ম করিতে। সংসারের লোকে ইহাদের উপর অসন্তুষ্ট ত হইবেই। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা এই সংসারী লোকের বিরক্তি হইতে অব্যাহতি লাভ জন্য দুই দিক বেশ আঁটিয়া সাঁটিয়া করিতে যান। গিয়া সংসার আঁটা সাঁটাটি বেশ চলে, ধর্ম্মের আঁটা সাঁটা ক্রমে আল্‌গা হইয়া যায়। এই অবস্থায় যাহা হয় তাহাত জানই।

স্ত্রী। আমি আমার দুঃখ দুর করিবই।

স্বামী। নিশ্চয়ই। কেন পারিবে না? শাস্ত্র উপায় বলিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা দেখাইয়া দিতেছি; তুমি না পারিবে কেন? আমিও ত চাই তুমি প্রবল উৎসাহে দুঃখ দুর করিতে প্রবৃত্ত হও।

স্ত্রী। আমার দুঃখ যাহা আছে তাহা শুন—শুনিয়া যাহাতে চিরদিনের জন্য দুঃখের হাত এড়াইতে পারি তাহার উপায় করিয়া দাও।

স্বামী। দুঃখের কথা বলিতে চাও বলিও। কিন্তু জগতের দুঃখ ত সকলেরই দেখিতেছ। আর দুঃখ যে কত প্রকার আছে তাহার সংখ্যা করিবে কে? যত যত প্রকারের অজ্ঞান, যত যত প্রকারের অবিচার, তত তত প্রকারের দুঃখ। সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে যাহা জানা আবশ্যক সেই কথা গুলি অগ্রে শ্রবণ কর। পরে সেই গুলি বেশ করিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝিয়া লইয়া কার্য্য কর নিশ্চয়ই একটা আনন্দের অবস্থা লাভ করিতে পারিবে। যত টুকু কর্ম্ম করিবে তাহাতেই আনন্দ পাইবে। কর্ম্ম করিতে করিতে আজ ভাল, কাল মন্দ ইহা আর হইবে না। এই হইলেই তুমি নিশ্চিন্ত হইবে। নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা লাভ হইবে।

স্ত্রী। বল আমাকে কি জানিতে হইবে?

স্বামী। তিনটি বিষয় জানিবার আছে।

প্রথম—লক্ষ্যটি স্থির করিয়া সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে লক্ষ্যটি ধরিতে অভ্যাস কর।

দ্বিতীয়—যে উপায় দ্বারা লক্ষ্যস্থানে পৌছিবে সে উপায় গুলি বাহির কর।

তৃতীয়—উপায় মত কার্য্য করিতে যে বল প্রয়োগ আবশ্যক সেই বল সংগ্রহ কর।

লক্ষ্য হইতেছে, যে অবস্থায় কোন দুঃখ নাই সেই অবস্থাটি আয়ত্ব করা। কোন প্রকার গ্লানীশূন্য আনন্দ যখন পাওয়া যায় তখন কোন দুঃখ থাকে না। এই অবস্থাটি আয়ত্ব করিতে পারিলেই লক্ষ্য স্থানে পৌছান গেল। লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় হইতেছে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনবর্গের মধ্য দিয়া যাওয়া। এই তিনটি লাভ হইলেই মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। মোক্ষ যাহা তাহাই হইতেছে সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি। মোক্ষের পথ হইতেছে ধর্ম্মার্থ কাম প্রাপ্তি। কিরূপে ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে, ধর্ম্মাচরণে কিরূপে অর্থ লাভ হইবে, অর্থলাভে কামের প্রাপ্তি কিরূপে হইবে এবং তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিতেছি। যিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ পথে প্রেরণ করেন তাঁহাকে ধ্যান করা চাই। ধ্যান করিলে তিনি আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গ পথে প্রেরণ করেন। ধর্ম্ম কি জানিলাম; জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা আমাদিগকে উদ্যমের সহিত সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে আমরা লক্ষ্যস্থানে পৌছিব। দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ইহাই আবশ্যক।

স্ত্রী। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ত অল্পাধিক পরিমাণে আমাকে বলিয়াছ। তথাপি

কোন দিন অনুষ্ঠান ভাল লাগে, কোন দিন লাগে না। জানিয়াছি ত অনেক কথা কিন্তু ঠিক ঠিক করিতে ত পারিতেছি না ; দুঃখ ও দূর হইতেছে না। তুমি আমার আছ তথাপি আমার দুঃখ দূর হইতেছে না! তাই আমি সকল কথা খুলিয়া বলিব। তোমার কাছে সঙ্কোচ কেন করিব?

স্বামী। না—কোন সঙ্কোচ করিও না। কেন হইবে না? নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ আমি দূর করিব।

স্ত্রী। আমি বলিতেছি—শোন।

স্ত্রী তখন বলিতে লাগিল। আমাদেরও কথা আরম্ভ হইল।

স্ত্রী যদি যথার্থ সতী হয়—স্বামীর কাছে কিছু গোপন না করে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাও যদি স্বামীর কাছে খুলিয়া বলে, স্বামী মূর্খ হউক বা পণ্ডিত হউক তাঁহাকে নারায়ণ বোধ করিয়া যদি ভাল মন্দ সকল কথা, এমন কি যদি কোন শাস্ত্রনিষিদ্ধ অভিলাষও জাগে তাহাও যদি কৌশল করিয়া স্বামীকে বলিতে পারে তবে স্বামী নিজে উপযুক্ত হইবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করিয়াও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেনই। এই সহায়তার জন্য শ্রীভগবান্ স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি শোনাও যায়, নারায়ণই তখন স্বামী হইয়া স্বামীর মধ্যে উদিত হন, হইয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন। স্ত্রীর প্রাণে যথার্থ সতী হইবার বাসনা যদি জাগে, ব্যভিচারিণী হইয়া স্বামীর কাছে কোন কিছু গোপন করিতে প্রাণ যদি না চায় তবে এমন পাষণ্ড স্বামী কেহ নাই যে নিজের ব্যভিচার-স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর হিতের জন্য স্বয়ং ভাল হইয়া স্ত্রীকে ভাল করিবার চেষ্টা করে না। ভক্ত যথার্থ প্রাণে যদি ভাল হইতে চায় ভগবান্ যেমন কখনও তাহাকে উপেক্ষা করেন না সেইরূপ স্বামীও যথার্থ স্ত্রী যে হয় তাহাকে উপেক্ষা করেন না। কিন্তু ভাল হইবার ইচ্ছাও যাহার জাগে না সেই পশু-প্রকৃতি মানুষের ইচ্ছা জাগাইবার জন্য 'জোর' করিয়া সৎসঙ্গ করান আবশ্যক। আর ইহাও সত্য যে "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি"। শ্রীভগবানের প্রীতি অনুভব জন্য সকল কর্ম্ম করা—শ্রীভগবানকে অগ্রে জানাইয়া, তাঁহার সহিত অগ্রে কথা কহিয়া, তাঁহাকে উগ্রভাবে প্রথমে স্মরণ করিয়া সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করাই কল্যাণ-কর কর্ম্ম করা। এরূপ ভাবে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম এবং লৌকিক কর্ম্ম যিনি করিতে প্রাণপণ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে

বলেন—তাঁহার এরূপ ভক্তের কখন অসদ্গতি হইতেই পারে না। তাঁহার ভক্ত ছিন্নাভ্রের মত কখন বিনষ্ট হয় না।

আমরা এখন সাবিত্রী-চরণাশ্রিত স্ত্রীর দুঃখের কথা শুনিব। উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে কাতরতা চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম, প্রার্থনা ইত্যাদিও আবশ্যক।

স্ত্রী বলিতে লাগিল—

দেখ, কতদিন—কতদিন সংসার করিতেছি, কৈ ঠিক হইলাম? শোক তাপও ত কত পাইলাম। কৈ ভাল হইলাম কৈ? সেই কখন ভাল, কখন মন্দ। কোন দিন হওয়া, কোন দিন না হওয়া। কৈ স্থায়ী কোন অবস্থা লইয়া থাকিতে পারিতেছি কৈ? বল আমার কি হইবে? কতকি ত করিয়াছি। মরণ-মূর্চ্ছায় কোন্ বাসনা জাগিবে কি করিয়া বলিব? হায়! আবার কোথায় যাইতে হইবে কি করিয়া বলিব? তাঁহার দেশে যে যাইব সে আভাষ প্রতিদিনের জাগ্রত অবস্থায় বা স্বপ্নাদিতে কতটুকু পাই?

লোকে নিশ্চিন্ত হইতে বলে, কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? লোক-হিতকর কার্য্য কিছু কিছু করিয়া লোকে ভাবে তোমার প্রিয় কার্য্য করা হইল, এই জন্যই সংসারে আগমন। ইহা করিতে পারিলেই সব কর্ত্তব্য করা হইল। তোমার আজ্ঞা ত ইহা নয়। শত লোক-হিতকর কার্য্য কর কিন্তু প্রথমেই "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" তোমার এ আজ্ঞা যদি লঙ্ঘন করা হয় তবে লোক-হিতকর কার্য্যে কি হইবে? ইহাতে সামান্য একটু পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে বটে, কিন্তু লোক-হিতকর কার্য্যও যদি তোমার স্মরণে না করা হয় তবে কি হইল? ইহাতে কি যম-যাতনা ছুটিবে? ইহাতে কি মৃত্যু-সংসার-সাগর পার হওয়া যাইবে? ইহাতে কি অজ্ঞান দূর হইবে? ইহাতে কি আবার এই দুঃখময় অজ্ঞান-সংসারে পতন নিবারণ হইবে?

এখন আমার উপায় কি? কৈ আমার প্রাণ শান্ত হইল? কৈ আমার পূর্ব্ব কালিমা মুছিয়া গেল কৈ? কৈ আমার এখনকার নিত্য অসম্বন্ধ-প্রলাপ ছুটিল কৈ? কৈ আমার ভাগ্যে নিত্য তোমার সঙ্গ জুটিল কৈ? কৈ তোমার স্মরণ নিত্য হইল কৈ? আমার দুঃখের অন্ত হইল কৈ? কৈ সংসারে কাহাকেও পাইয়া অনুরাগ, কাহাকেও পাইয়া বিরাগ গেল কৈ? কৈ রাগ-দ্বেষের বশ হওয়া দূর হইল কৈ? তবে কি হইল?

তবে কি রাগ-দ্বেষের বশ হওয়া কখন দূর হয় না? তবে কি চিত্তশুদ্ধি চিরদিনের জন্য হয় না? না না তাও কি হইতে পারে? তুমি যে বলিয়াছ রাগ-দ্বেষও যায়! তুমি যে বলিয়াছ চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহার জন্য তেমন যত্ন কৈ হইল? সম্যক্ যত্ন করিলে সবই যে সিদ্ধ হয়।

তোমাকে লইয়া থাকিলে,—নিরন্তর থাকিলে মৃত্যু-সংসার-সাগর ত থাকে না। বিষয়-সাগরও ত তখন শুকাইয়া যায়! তোমাকে লইয়া থাকিলে, বিষয় লইয়া থাকা কি যায়? সর্ব্বত্রই যে তুমি দেখা হইয়া যায়! তাহা হইল কৈ? সর্ব্বত্র যদি দেখা মিলিত তবে ত কোন ভাবনা ছিল না। সংসার ত তখন দুঃখের হয় না। সংসার তোমার উপরে ভাসিয়াছে ইহা যদি দেখা হইত—ইহা যদি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্মরণও হইত, তখন সংসার যাহা দেখাক্ না কেন তাহার ভিতরে তুমি, তোমাকে দেখিয়া কখনও কোন ভয় হইত না? তাহা হইল কৈ?

আর কবে হইবে? যদি তাই না হইল তবে ত সব অজ্ঞান রহিয়া গেল। স্মৃতিতে ত সবই রহিয়াছে। কোন্‌টি ভুলিয়াছি? যত যত অন্যায় হইয়া গিয়াছে স্মরণ করিলেই ত সব আবার আসে! চেষ্টা করিয়া স্মরণও ত করিতে হয় না। কোন কিছু উদ্দীপক কারণ দেখিলে স্মরণ ত আপনা হইতেই হয়। কৈ তবে তোমাকে লইয়া থাকা হইল? কৈ তবে তেমন করিয়া নিরন্তর তোমাকে লইয়া থাকিলাম যাহাতে আর সব ভুল হইয়া গেল? ঈশ্বর-প্রণিধান কৈ হইল? বল আমার উপায় কি? বল কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইব?

আর জ্ঞান! তুমি বলিয়াছ জ্ঞানই সত্য। আর সব অজ্ঞান। অজ্ঞানই মিথ্যা। জ্ঞান-স্বরূপ তুমিই একমাত্র সত্য। তুমিই আছ ইহাই খাঁটি সত্য। স্থানুকে মানুষ দেখার মত, রজ্জুকে সর্প দেখার মত, তোমাকে জগৎরূপে দেখা হইতেছে, সংসার ভাবে দেখা হইতেছে ইহাই সত্য। স্থানুই আছে মানুষটা সত্যসত্যই নাই। এই দেহটা, এই মনটা রজ্জুর উপর সর্প ভাসার মত ভ্রমজ্ঞানে ভাসিয়াছে মাত্র। সর্প যেমন রজ্জুতে নাই, আদৌ নাই সেইরূপ দেহ মন সংসার ও কোথাও নাই। কেবল ভ্রম জ্ঞানে আছে মাত্র। ইহাত বুঝিলাম, ইহাত বিশ্বাসও করিলাম। তোমার কথা বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু মানিয়া লওয়াই কি জ্ঞান? হায়! সংসারের সকল দুঃখ, সকল রাগ দেষ, সকল আধি-ব্যাধি, সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সকল নিদ্রা-বিশ্রাম রহিয়া গেল, সকল অজ্ঞানের খেলা রহিল অথচ আমার জ্ঞান হইল—ইহা কি জ্ঞান? না না, ইহা আত্ম-প্রতারণা!! আত্ম-

প্রতারক আবার জ্ঞানী! মিথ্যা সংসার, মিথ্যা জগৎ মুখে মাত্র বলিলাম। রজ্জুতে সর্পভ্রমের কথা মুখে মাত্র মানিয়া লইলাম কিন্তু সর্প দেখিয়া ভয় পাওয়াও রহিল, পলায়ন করাও রহিল, সর্পকে বিনাশ করিবার কৌশলও রহিল। ভয় পাওয়াও মিথ্যা, পলায়নটাও মিথ্যা ইহাও যেন মুখে বলিলাম কিন্তু আমি শান্ত রহিলাম কৈ? কৈ মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া আমি 'আপনি আপনি' থাকিতেছি কৈ?

ব্যাখ্যা ত করিতে শিখিলাম অনেক। লোককেও ত বুঝাইতে শিখিলাম অনেক। কিন্তু সত্য তুমি—তুমি মাত্রই আছ; সাপ বাঘ, কর্কশ বাক্য, নির্দ্দয় ব্যবহার, দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা, রোগের আকুলি ব্যাকুলি, কৈ এসব মিথ্যা বোধ হইল কৈ? তবে আমার অজ্ঞান গেল কিরূপে?

আত্মা! আত্মাই আমি। আমার উপরে এই দেহ, এই মন—ইন্দ্রজাল মত ভাসিয়াছে। আমার জন্ম হয় নাই, মরণও নাই ইহার স্থির ধারণা হইল কৈ? আমার জন্ম-মৃত্যু নাই, কাম-ক্রোধ নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই এ সমস্ত মিথ্যা। ইহা হইল কৈ? ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুতে সর্প ভাসার মত দেহটা, মনটা আত্ম-কল্পনায় আত্মার উপর যেন ভাসিয়াছে। বাস্তবিক এগুলি সত্য নহে। কল্পনা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করায় কল্পনাই সত্য মত হইয়া গিয়াছে। এ সব ত তোমার কথা মানিয়া লইয়াছি মাত্র। কিন্তু কাজে কি করিতেছি? কৈ কবে সত্য সত্য ভুল হইল যে আত্মাই সত্য অন্য সব মিথ্যা? কৈ কবে এত সত্য লইয়া থাকিলাম যে মিথ্যাটা ভুল হইল?

আমি জন্মি নাই আমার মরণ নাই, এত তোমার কথা—বেদের কথা—গীতার কথা। কিন্তু আমি জন্মিয়াছি, আমার জন্মস্থান অমুক দেশ, আমার বালিকা অবস্থা ছিল, পিতা মাতা ছিল, যুবতী-অবস্থা হইয়াছে, বৃদ্ধাবস্থা হইবে, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব আছে—এ সব ত মিথ্যা। যে জন্মে নাই তার আবার জন্মস্থান কোথায়? এ সব ত তবে ভুল। কৈ ভুলকে ত্যাগ করিলাম কৈ? ভুলকে ভুলিলাম না, ভুলের কার্য্যও ত্যাগ হইল না, তবে আমার কোন্ জ্ঞান হইল? হায়! একি আত্ম-প্রতারণা! জীবন থাকিতে থাকিতে একবারও তোমাতে—সেই সত্যে স্থিতি লাভ করিতে পারিলাম না, মরিলেই তবে তোমাতে স্থিতি লাভ করিব—এ কথা বলি কিরূপে?

একটু আশাও হয় সত্য। মনে করি যতদিন দেহটা আছে, এই দেহটা পূর্ব্ব জীবনের মরণমূর্চ্ছার স্থূল বাসনা বলিয়া—দেহটা থাকা পর্য্যন্ত বাসনার কার্য্য

হইবে। জীবন্মুক্তি আমার হয় নাই। তার জন্য সাধনাও করিতে পারিলাম না। কিন্তু পূর্ব্ব বাসনাতেই এই দেহ-ধারণ হইয়াছে। এখন ত কোন বাসনা নাই। বেশ করিয়া ত বুঝিয়াছি—তুমি ভিন্ন জগতে যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায় করা যায় সবই অস্থায়ী, সবই ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী যাহা তাহাতে আবার আসক্তি কি? ইহা ত প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি। কোন কিছু ভোগের ইচ্ছাও ত নাই। ভোগ কিছু আসিয়া পড়িলে ক্ষণিক আসক্তি জাগে বটে, সেটা কিন্তু এই দেহ আছে বলিয়া। দেহ না থাকিলে আসক্তি আর কিসের হইবে? এই দেহ ছুটিয়া গেলেই আমি মুক্ত হইব। এই আশা হয় সত্য।

কিন্তু ইহাই কি নিশ্চিন্ত অবস্থা? কৈ তেমন বৈরাগ্য কৈ? আর কিছুই দেখিব না, আর কিছুই করিব না, আর কিছুই বলিব না, আর কোথাও যাইব না—এই সকলের বাসনাও নাই ইহা কি ঠিক হইয়াছে? করিব বা করিব না এই দুইই ত বাসনা। বাসনা কি গিয়াছে? কর্ম্ম কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক হইতেছে? না না তাহাত হয় নাই। তবে আসক্তি গেল কোথায়? ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতে যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহ জন্মে সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র বাসনা বীজ হইতে প্রকাণ্ড সংসার বৃক্ষ জন্মে। লোকের 'খাতিরেই' হউক বা নিজের ইচ্ছায় হউক কিছুমাত্র আসক্তিও যদি থাকে, তবে তাহা পুষ্ট হইয়া এইবারকার মরণমূর্চ্ছায় কি ঘটাইবে তাহা জানিব কিরূপে? অন্য কিছুতে আসক্তি থাকিলেই ত তোমাকে ভুল হইয়া যায়। তোমাকে মনে রাখিয়া যদি সব করিতে পারিতাম, আর সবকেও যদি তুমি ভাবিতে পারিতাম তবে বুঝিতাম সব করিয়াও কিছু করিতেছি না। যদি তোমাকে ভুল না হইত তবে ত সব হইত। তাহা কি হয়? তবে আমার উপায় কি বল?

বৈরাগ্য অভ্যাসে না হয় মনকে ফাঁকা করিয়া রাখিলাম। কোন কিছু দেখার সাধ নাই, কোথাও যাইবার সাধ নাই, কোন কিছু ভোগের সাধ নাই। ইহা যেন হইল। ইহা ত ত্যাগ। ইহাতেই কি সব হইবে? গ্রহণ হইল কি? না হয় যথা প্রাপ্তকর্ম্মে স্পন্দিত হওয়াও হইল। যেন অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্মমাত্র করা হইল। না হয় অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও কিছু হইল। না হয় বৈরাগ্য অভ্যাসের জন্য প্রাণপণ করা হইল। কিন্তু অনুরাগের বস্তু যে তুমি—তুমি কৈ থাকিলে? মনকে ফাঁকা করিলে যে শুদ্ধ-সত্ত্বগুণের উদয় হয়, মনকে লয় বিক্ষেপ ছাড়াইলে ইহা যে শুদ্ধ-সত্ত্বগুণে ভরিয়া গিয়া স্বভাবতঃ তোমার পাদপদ্মে মস্তক লুটাইতে ছুটিবে তাহা কৈ হইল? বৈরাগ্যের পরে যে তোমাকে লইয়া থাকা তাহা কৈ হইল?

'আপনি আপনি' থাকা ত অহং অভিমান শূন্য হইয়া সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব ইচ্ছা, সর্ব্ব অনিচ্ছা, সর্ব্ব কর্ম্মকরা, সর্ব্ব কর্ম্ম না করার অবস্থা। ইহা হইলে ত দেহ আছে বা নাই ইহার কিছুই বোধ হইবে না। তাহা কৈ হইল? যখন একান্তে চুপ করিয়া থাকি তখন সব ভুলিয়া তোমাকে লইয়া 'আপনি আপনি' ভাবে থাকি কৈ? তোমাকে লইয়া থাকাটি ত ভক্তিমার্গ। আর তুমিই যখন 'আপনি আপনি' হইয়া যাও, তোমাকে লইয়া থাকিতে থাকিতে যখন 'আপনি আপনি' ভাবে থাকা হইয়া যায় সেইটিই ত জ্ঞানমার্গ। ইহার কোন্‌টি হইল? কৈ ধারণাভ্যাসী হইলাম? কৈ বিচারবর্ত্তী হইলাম। প্রত্যহই ত সেই—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
স্তুত মিত রমণী সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমর্পিণু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।

নিরাশ হই সত্য কিন্তু যখন মনে করিতে পারি—

তুঁহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোঁহারি বিশোয়াশা॥

তখন ত প্রাণে উৎসাহ থাকে। কিন্তু সব সময়ে এই বিশ্বাস লইয়া থাকিতে পারি কৈ? বল এখন কি করিব? আমার দুঃখের কথা ত বলিলাম। এখন তুমি ভিন্ন আর গতি ত নাই।

স্বামী। তুমি যাহা বলিলে শুনিলাম। জীব শত অপরাধ করে। শাস্ত্রবিধিই তাঁহার আজ্ঞা। সর্ব্বশাস্ত্রে একরূপ আজ্ঞাই পাওয়া যায়। শাস্ত্র মত কর্ম্ম হয় না বলিয়া সর্ব্বদা ক্ষমা চাহিতে হয়। যখন সাধক আপনার শত শত ত্রুটি দেখে, যখন আপনার অজ্ঞান দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা অনুভব করে তখন তোমাকে পাইলাম না, তুমি দেখা দিলে না, তোমাতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলাম না এইরূপ দুঃখ করিবার পূর্ব্বেও নিজে যে তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছে না, নিজে যে ঠিক ঠিক সাধনা করিতে পারিতেছে না তাহা ভাবিয়াও দুঃখ করে। নিজের দিকে চাহিয়া সাধক বলে, মা! মন্ত্র যন্ত্র, স্তোত্র আবাহন, ধ্যান অর্চ্চনা, মুদ্রাবিধি, স্তুতি কথা ত জানি না, দুঃখের কথা কেমন করিয়া যে জানাইতে হয় তাহাও ত জানি না মা আমার অপরাধ আর কে ক্ষমা করিবে? কি করিয়া চরণ-

পূজা করিতে হয় জানি না, তোমার কার্য্যে কত আলস্য করি, মা! তুমি ভিন্ন আমার অপরাধ আর কে ক্ষমা করিবে? বাল্যাবস্থা দুঃখভোগে কাটিয়াছে, মললুলিতবপু হইয়া বিষ্ঠা-মূত্র মধ্যে পতিত থাকিতাম, কত রোগে কত ব্যথা পাইলাম, হে প্রভু! তখন তোমায় স্মরণ করিতে পারি নাই আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় বিষয়-ভুজঙ্গগণ মর্ম্মসন্ধিতে কতই দংশন করিত, তাহাতে আমার বিশেষ অনিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কেবল যুবতী-সম্ভোগের আস্বাদকে সুখজ্ঞান করিতাম; মন তোমার চিন্তা না করিয়া মানগর্ব্বে ভরা ছিল আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। বার্দ্ধক্যে এখন সব শিথিল হইয়া যাইতেছে, ইন্দ্রিয় শিথিল, শরীর শিথিল, বুদ্ধি ক্ষীণ, সর্ব্বদা আমি তাপে তপ্ত, রোগ শোক বিয়োগে শ্রান্ত। মন একবারও তোমার ধ্যানে মগ্ন হয় না। তুমি ভিন্ন আমার অজ্ঞানকৃত ও জ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমা আর কে করিবে? স্নানবিধি অনুসারে প্রভাতে কখন স্নান করি নাই, অরণ্যে গমন করিয়া বিল্বদল আহরণ করি নাই, সরোবর হইতে বিকসিত কমলদল আহরণ করি নাই, তোমার জন্য ধুপ দীপ আহরণ করি নাই, বিবিধোপচারে যথাবিধি অর্চ্চনা করি নাই, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এইরূপ ব্যাকুলতা যাঁহার সর্ব্বক্ষণ লাগিয়া থাকে তাহার জন্য সে বড় ব্যস্ত হয়। সে যে অদূরে আসিতেছে, এই ব্যাকুলতাই তাহার প্রমাণ। তোমাকে ইহা আমি অনুভব করাইয়া দিতেছি।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। এই মুহূর্ত্তে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। করিয়া দেখ একটা অবস্থা অনুভব করিবে। এই অবস্থা লইয়া তুমি তোমার নিত্য কর্ম্মগুলি আর একবার কর। এখনি যাও। এখন আর অন্য কার্য্য করিও না।

স্ত্রী তখন স্বামীর চরণযুগল হৃদয়ে স্পর্শ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। করিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল। পদধূলি হৃদয়ে মাখিয়া স্ত্রী নিত্যকর্ম্ম করিতে নিজ গৃহে প্রবেশ করিল। স্বামীও সেদিনকার মত আপন কর্ম্মে মনোযোগ করিলেন।

উৎসর্গ।

দেহ প্রাণ মন নবীন যৌবন
সকলি তোমারে দিব।
বিনিময়ে শুধু রাজীব-চরণে
সাধের সেবক হব॥

জটাজুট ধরি চাঁচর চিকুরে,
ঢাকি ভস্মে বরবপু্।
সে বিলাসে যদি, বিলাসিনি মম!
বিলাসে হৃদয়ে কভু॥

ছিঁড়ি ফুলকুল, পরি হাড়মালা
কণ্ঠের করিয়া হার।
তোমার আমোদে আমোদ আমার
কি আছে মধুর আর॥

খুলি পট্টবস্ত্র অজিন কঠোর
হরষে পরিব অঙ্গে।
কি কাজ বসনে, বাসনা আমার
তোমায় পাইলে সঙ্গে॥

ফেলি রাজভোগ, মোহের আকর,
খাব বন্য ফল মূল।
রুচি কি আবার সুখাদ্যে তাহার
তুমি যার ভাঙ্গ ভুল॥

ছাড়ি রম্য হর্ম্ম্য প্রিয় পরিজন
পশিব কানন মাঝে।
সদা যেন তথা, বাঞ্ছিতে আমার!
তোমার আনন রাজে॥

একাকী ভ্রমিব মহামরু বুকে
গাহিয়া তোমার নাম।
তুমি যদি শুন, জননি আমার!
সেই সে ত্রিদিব ধাম॥
দলিয়া তুষার পাষাণ চরণে
চলিব পাহাড় পথে।
কুসুমের পথ সেই সে আমার
তুমি যদি থাক সাথে॥
মথিয়া তরঙ্গ দমিয়া কল্লোল
খেলিব সাগরে সুখে।
বীরপনা তার চলে যেই জন
তোমায় লইয়া বুকে॥
অমৃত বলিয়া আদর করিয়া
তুলিব গরল মুখে।
ভাল যদি বাস আদরে সন্তান
কাতর নহিত দুঃখে॥
নাম নিতে নিতে আনন্দিত চিতে
পশিব বহ্নি মাঝারে।
অনল নিবিবে অনিল বহিবে
হৃদয়-কুঞ্জ-কুটীরে॥
প্রলয় ডাকিবে গম্ভীর আরাবে
বিনাশিয়া চারু সৃষ্টি।
রহিব প্রশান্ত, চিরশান্তিময়ি!
তোমাতেই বদ্ধ দৃষ্টি॥

নিবেদিত।

সঙ্গীহীন খেলা।

একা ভাঙ্গি, একা গড়ি,
সঙ্গী নাহি কেহ—
এ ধূলার খেলা ঘরে।
কা'র যেন করুণার বাঁশী
বেজে ওঠে দূরে মোর তরে।
সঞ্চিয়া উপল রাশি
জীবন বেলায়—
মনে হয় তাই বাঁধি ঘর।
একা আমি শক্তি হীন,
বহে নদী তীব্র খরতর।
কাল জলে পড়ে কাল ছায়া—
ঐ সন্ধ্যা আসে,
ছায়া সম ঘনায়ে জীবনে।
প্রকৃতির মূরতি শ্যামল,
ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে প্রাণে।
যুগ যুগান্তের অন্ধকার ভেদি,
অগ্রসরি অনায়াসে
মোরে যেন করে' দিয়ে পথ।
শ্যামাঙ্গিনী নিবিড় কুন্তলে
একে বারে ঢাকিল জগত।
জীবন মরণ যেন নাই—
অসময়ে, অসহায়ে
মধ্যে তায় খুঁজি আমি কোথা?
আমি বলে' নাহি যেন কিছু—
আছে শুধু অন্তহীন ব্যথা।

আছে শুধু আমার এ গান
ঝিল্লি রব মত—
সঙ্গীহীন নীরব খেলায়।
আর সেই মিলন আশ্বাস,
নিস্তব্ধ এ জীবন বেলায়।

শ্রী——

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? অসুখ হইতে মুক্ত করা।

ধর্ম্ম কি তা পারে? ধর্ম্মই পারে আর কেহই পারে না।

অসুখ না সারায় ডাক্তারে?

কতবার ত ডাক্তারে দেখিল—দেখিতেছে—দেখিবে—অসুখ কি সারিল?

ধর্ম্ম কি এমন করিয়া অসুখ সারাইতে পারে যাহাতে আর অসুখ কখন হইবে না?

পারে।

সকল রকম অসুখ?

হাঁ। সকল রকম।

টাকার অসুখ—কামিনীর অসুখ—পেটের অসুখ—শরীরের অসুখ—সব অসুখ?

হাঁ। দামড়ী চামড়ী পেট সব অসুখ ধর্ম্ম সারাইতে পারে। তাহা হইলে ধর্ম্ম কথা শুনিতে পারি, ধর্ম্ম করিতেও পারি।

তবে শুন। ধর্ম্ম মানব জাতির সকল অসুখ চিরতরে দূর করিতে পারে। আর কিছুতেই চিরতরে অসুখ দূর হয় না। এই যে ইয়ুরোপে হাহাকার পড়িয়াছে এই যে ভারতের নিত্য হাহাকার যাহা আছে, সমস্ত মানবের দুঃখ দূর করিবার জন্য একমাত্র ধর্ম্মকেই অবলম্বন করা উচিত।

বুঝাইয়া দাও নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-অবলম্বন করিব।

আচ্ছা। একজনের জ্বর হইয়াছে। খুব মাথা কামড়াইতেছে গা হাত ব্যথা করিতেছে কিছুতেই মানুষটি সুস্থ হইতে পারিতেছে না। ডাক্তার যদি দয়াশীল হন তবে রোগীর যাতনা সঙ্গে সঙ্গে দূর করিবার জন্য রোগীকে এমন ঔষধ প্রদান করেন যাহাতে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কার্য্যও চলিতে থাকে।

ইহাতে কি হইল? ঘুম ভাঙ্গিলেই ত আবার মাথার হাতের পায়ের যাতনা।

হাঁ তাই বটে। কিন্তু যতক্ষণ ঘুম থাকে ততক্ষণ যাতনা নাই।

ঘুম যদি সকল সময়ে থাকে তবে ত রোগ থাকে না। কিন্তু চিরদিন ঘুমাইয়া রোগ সারা কি প্রার্থনীয়?

না। তা কে বলিতেছে? ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতে পারিলে রোগ থাকে না কেন তাহাই বুঝিতে বলিতেছি। এইটি বঝিবার ভিতরে সকল অসুখ সারার ঔষধ আছে।

কিরূপে?

ঘুমাইয়া পড়িলে দেহটাতে আমার দেহ এই বোধ থাকে না। রোগটা থাকে দেহেই। দেহে যদি আমিটি মাখাইয়া ফেল তবে দেহটি হইবে আমার। দুঃখভোগের যে অনুভব সেটি করেন "আমি।" যতদিন দেহ মন জগৎ ইত্যাদি থাকে ততদিন আমি কর্ত্তা। যখন কিছুই নাই তখন কর্ত্তা অভিমানও নাই।

'আমি' অন্যের উপরে পড়িয়া অন্যকে এমন ভাবে আমার করেন যাহাতে অন্যের দুঃখটা সেই আমিরই দুঃখ হইয়া উঠে। নতুবা দেহটা এক জিনিষ আর আমিটি আর এক জিনিষ। এ দুইয়ে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমির এই এক ক্ষমতা আছে যে তিনি অন্যের সঙ্গে একটা কাল্পনিক মাখামাখি করিতে পারেন। এ কাল্পনিক মাখামাখিটা হয় অভিমান করিয়া; আমি ঐটি এই ভাবিয়া। যখন আমিটি 'আপনি আপনি' থাকেন কিছুতেই মাখামাখি করেন না তখন তাঁর কোন দুঃখ নাই. তুমি দেহ হইতে আমি পৃথক্ এইটি বুঝ, বুঝিয়া সাধনা দ্বারা এই অবস্থা লাভ কর—জগতের জন্য সব কাজ করিয়াও তোমার কোন দুঃখ হইবে না। জড় হইতে চেতনকে পৃথক করিয়া আমিকে আমি ভাবে রাখাই জ্ঞান। জ্ঞান না হইলে কখন চিরতরে অসুখ সারিবে না। যে যত অজ্ঞানী তার তত অসুখ বেশী। দেখনা কেন, কত লোক আদর পাইবার জন্য মিছামিছি অসুখের ভান করিয়া সত্য সত্যই অসুখ আনিয়া মহা কষ্ট ভোগ করে। ইহারা বোঝে না যে ভাবনাই অসুখ। আমি দেহ এই ভাবনা করিয়াই

না মানুষ চির অসুখে পড়িয়াছে! তবে ভাবনাটাকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন?

আচ্ছা বুঝিলাম। যত অজ্ঞান তত অসুখ। অসুখ সারাইতে হইলে জ্ঞান চাই। কিন্তু জ্ঞানীরও ত অসুখ করে।

মূর্খ তুমি। এই বলিতেছ জ্ঞানের অর্থ দেহ হইতে যে চৈতন্য পৃথক তাহা অনুভব করিয়া চৈতন্য-ভাবে স্থিতি লাভ করা। ইহা যিনি করেন তাঁহার অসুখ কি? দেহটা ফুলিতে পারে, ফাঁপিতে পারে, কাশিতে পারে, হাঁচিতে পারে, ছট্‌ফট্‌ করিতে পারে, কিন্তু তুমি যদি চেতন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পার তবে অসুখ কার? জ্ঞানী তিনিই যিনি চৈতন্যভাবে অবস্থিত।

এত বড় কঠিন!

কঠিনই ত। এই জ্ঞানী কি যে সে হইতে পারে? মুখে জ্ঞানের কথা কহিলেই জ্ঞানী হওয়া হয় না। জ্ঞানীকে অনেক খাটিতে হয়। অনেক সাধনা করিতে হয়।

কোন্ সাধনা করিলে জ্ঞানী হওয়া যায়?

কি জন্য জ্ঞানী হইতে চাও তাহাত বুঝিয়াছ?

চিরতরে অসুখ সারাইবার জন্য।

হাঁ তাই। শুন। অসুখ-মুক্তির জন্য জ্ঞান চাই। জ্ঞানের জন্য ভক্তি চাই। ভক্তির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম চাই। নিষ্কাম কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ জন্য সর্ব্ব ভাবনায়, সর্ব্ব বাক্যে, সর্ব্ব কর্ম্মে উগ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা চাই। বিনা সাত্ত্বিকভাবে এ স্মরণ হয় না। সাত্ত্বিক আহার, শুদ্ধ আচার ভিন্ন সাত্ত্বিক ভাব জাগে না। তবেই দেখ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও উপায় হইতেছে মুক্তি, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, সদাহার এবং সদাচার। অসুখ সারাইতে চাও, সবগুলি কর নতুবা "ঘট্টকুট্টাম্প্রভাত" করিলে কিছুই হইবে না। ন্যাজা মুড়া বাদ দিলে কি কিছু হয়?

জ্ঞান না হইলে মুক্তি হইবে না ইহা বুঝিলাম কিন্তু ভক্তি না হইলে যে জ্ঞান হয় না এ কথাত বুঝি নাই। বিশেষতঃ আজ কাল ত লোকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গেলে তবে ভক্তির ব্যাপার আরম্ভ হয়। তাই অগ্রে ব্রহ্মজ্ঞান শেষ করিয়া তবে ভক্তির ক্রিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা নিতান্ত আধুনিক; কিন্তু প্রাচীন দিগের নিকটে আমরা এ শিক্ষা পাই না।

তুমি ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে যাহা উল্লেখ করিলে তাহা কি তোমার মন গড়া? অথবা এরূপ ধর্ম্ম কোথাও আছে?

যোগিণী তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে পাওয়া যায়।

কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ।
জ্ঞানান্মুক্তির্ম্মহাদেবি! সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে॥

"ঈশ্বর প্রণিধানরূপ নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা ভক্তি লাভ হয়, ভক্তিদ্বারা জ্ঞান লাভ হয় আর হে মহাদেবি! জ্ঞানদ্বারা মুক্তি লাভ হয়। আমার এই কথা সত্য।" আবার বোধসারে পাওয়া যায়।

ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়-শতৈরপি॥
ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়॥

যদি তোমার ভক্তি ভাল লাগে আর জ্ঞানের নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয় তবে তোমার ভক্তিতে গোলযোগ আছে ইহা নিশ্চয় বুঝিবে।

প্রসাদী সুর।

মন্ আমার ঘরে আয়রে ফিরে, একবার বিষয় ছেড়ে ব'স্ দেখিরে;
কিঞ্চিৎ সুখের তরে, কত ব্যথা পাও অন্তরে
(ও মন্) সমুদ্র পিপাসায় মরে, লাজের কথা বল্‌ব কারে।
বিষয়েতে সুখ আছে মন, এ যুক্তি তোরে দিল কেরে,
(ও মন) দীপ জ্বেলে তুই দেখবি কিরে, স্বপ্রকাশ সেই দিবাকরে।
বিষয়-বিষে বিষম্ দিশে, না দেখ নিজ অন্তরে,
দেখে চাঁদের ছায়া সরোবরে, জলে ডোব ধরতে তারে।
যদি বল ঘরের দ্বারে, মোহ আমায় আছে ঘেরে,
(ও মন্) যারে বল মায়া, সে তোর আপন ছায়া বিচার করে দেখ দেখিরে।
সাধ করে, ফাঁস গলে প'রে, গাঁট দিয়েছ যত্ন ক'রে,
একবার্ বিবেক-বলে গ্রন্থিখুলে, কেবল হয়ে ধন্য হরে।

রাগিনী বাগেশ্রী—তাল আড়া।

মন মাত্র এ সংসার, সকলি মন-বিকার।
মন-জয়ী যেই জন, ত্রিভুবন অধীন তার॥
সুখ, দুঃখ, অভিমান,—মন সে সব কারণ।
মন-নাশে হয় বিলীন, সুষুপ্তি প্রমাণ তার॥
স্বপ্নবশে রাজ্যেশ্বর, ভিখারী অতি কাতর।
ভিখারী হয় রাজ্যেশ্বর,—মন তার নিদান সার॥
অসঙ্গ গগণে যেমন, নানাবর্ণ হয় ভাণ।
এ বিশ্ব মন-কল্পনা, নির্ব্বিকারে চরাচর॥

সংবাদ-সংগ্রহ।

আগামী ৫ই ফেব্রুরিয়ারী তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের রাজধানী কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন কল্পে এক বৃহদানুষ্ঠান হইবে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন বড়দিনের ছুটীর সময় যশোহরে হইবার কথা ছিল। আমরা অবগত হইলাম—সম্মিলন গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীর সময় হইবে।

জনরবে প্রকাশ—সম্প্রতি সারার হার্ডিঞ্জ পুলের উপর দিয়া পথিকগণকে পারাপার করিতে দেওয়া হইতেছে না। ইহা কি সত্য?

১৯১৪ সালে বঙ্গদেশে শুধু জ্বর রোগে ১০,৬৯,০৪১ জন লোক মারা পড়িয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ৯,৬৫,৫৪৬ জন লোক মারা গিয়াছে।

আগামী বড়দিনের ছুটীর সময় কাশীধামে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল অভ্যন্তর প্রদেশের ন্যায় স্নিগ্ধ দিক সমুদায়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইঁহারা চন্দ্রমণ্ডল ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিলেন। সেখানে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বদিগের মন্দার-কুসুম-মাল্যের-সুরভিবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ। এই বায়ু সেবনে ইঁহারা আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধগন্ধর্ব্বমন্দারমালামোদ মনোহরে।
চন্দ্রমণ্ডলনিষ্ক্রান্তে রেমাতে মধুরানিলে ॥ ৫ ॥

সূর্য্যতাপ অন্তে জলভর-মন্থর-মেঘমণ্ডলে যখন বিদ্যুৎ খেলা করিত তখন রক্ত-পদ্ম সুশোভিত সরোবরের ন্যায় সেই তড়িদ্ভরা মেঘমণ্ডলে তাঁহারা স্নান করিতেন। ভূতলসমূহে যেমন হিমালয় কৈলাসাদি মহাশৈল সেইরূপ সেখানকার দিঙ্মণ্ডলে কত কত মহাশৈল। সেই মহাশৈল সকল কোটি কোটি মৃণাল অঙ্কুরের মত। সেই মৃণাল অঙ্কুরে তাঁহারা সরোবর ভ্রমণকারিণী ভ্রমরীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোথাও বাতবিক্ষুব্ধ মেঘমণ্ডল-মণ্ডপ তাঁহাদের নিকট বীরগঙ্গাসলিল কণা-ধারী ধারাগৃহের মত বোধ হইতে লাগিল তাঁহারা তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মধুরগামিনী ললনাদ্বয় শক্তি-অনুরূপ পরিশ্রম ও বিশ্রাম করিয়া আকাশগর্ভে অপর এক মহারম্ভ দর্শন করিলেন। ঐখানে কত ভুবন ও কত লোকপুঞ্জ। লীলা এরূপ আর দেখে নাই। এই শূন্য দেশে কোটি কোটি জগৎ, তথাপি এ স্থান পূর্ণ হইয়া যায় নাই, ওখানে এখনও অনেক স্থান শূন্য। উপরে উপরে অসংখ্য ভুবনতল। কত কত বিমান সেখানে। তথায় মেরু প্রভৃতি কুলপর্ব্বত চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। ঐ সকল পর্ব্বতের তটপ্রদেশ হইতে কত কত পদ্মরাগ মণির ঝলক ঐ প্রদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মনে হয় যেন কল্পান্তকালীন অগ্নিশিখা চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। কোন কোন স্থান মুক্তাময় শিখরের কিরণজালে হিমাদ্রিসানুবৎ সুন্দর, কোন স্থান কাঞ্চনপর্ব্বতের প্রভায় শুভ্রবর্ণ। মরকত-মণির দীপ্তিতে কোন কোন স্থান শষ্পশ্যামল ভূভাগের ন্যায় নীলিমাক্রান্ত। মনে হয় যেন দৃশ্য-দর্শন-ক্ষয়-জন্য-সমুদ্ভূত অন্ধকারের কালিমা! কোথাও পারিজাত কল্পলতার বন; তাহার উপরে আলোক-বিমান সমূহের স্থান, নিকট হইতে বন-মঞ্জরিকার মত দেখা যাইতেছে কিন্তু দূর হইতে যেন বৈদূর্য্যময় ভূতলের মত

অবস্থিত। কোথাও সিদ্ধগণ মনোগতির মত বেগে গমন করিতেছেন, বায়ুর বেগ ও তথায় পরাস্ত, কোথাও দেব-স্ত্রীগণ বিমানগৃহে ঘুঙ্ঘুঙ্ ধ্বনিতে গীতবাদ্য করিতেছেন।

এই প্রদেশ এত বিস্তীর্ণ যে সুর ও অসুরগণ কে কোথায় বিচরণ করিতেছে তাহা কেহই জানিতেছে না। কোথাও কুষ্মাণ্ড, রাক্ষস পিশাচ, কোথাও বায়ু-বেগে গমন পরায়ণ বৈমানিকগণ। কোথাও প্রচলিত বিমান সমূহের ধ্বনি মহামেঘের ন্যায় গম্ভীর, কোথাও বা আকাশ মণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চার হেতু জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে।

আকাশচরদিগের বৈভব বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এখানে সমস্তই আছে। কোথাও চারিদিকে রাশি রাশি বায়স, পেচক, শকুনি, ডাক পক্ষী; কোথাও সাগরতরঙ্গের ন্যায় দলে দলে ডাকিনীর নৃত্য; কোথাও কুক্কুরমুখী, কাক-মুখী, উষ্ট্রমুখী, খরমুখী যোগিনীর নিরর্থক ভ্রমণ। কোথাও অন্তঃপুর কামিনী দেব স্ত্রীগণের দগ্ধ ধূপের ধূমরাজিতে অম্বরতল মেঘাবৃত, কোথাও ধূমান্ধকার সমাচ্ছন্ন অভ্রমন্দিরে গন্ধর্ব্ব মিথুনের সুরতোৎসব। কোথাও নক্ষত্রপুঞ্জমালী নভোমণ্ডল জ্যোতিশ্চক্রের নিম্নদেশে আকাশ গঙ্গা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন আর দেব বালকেরা ঐ আশ্চর্য্য সন্দর্শনার্থ ধাবিত হইতেছে। কোন স্থানে নারদ তুম্বুরুর গান হইতেছে। কোথাও ব্রহ্মপুরী, কোথাও রুদ্রপুরী কোথাও মায়াপুরী কোথাও বা আগামিপত্তন। কোথাও ভ্রমচ্চন্দ্র সরোবর—অমৃতপূর্ণ চন্দ্রসদৃশ মায়া সরোবর; কোথাও বা স্তব্ধময় সরোবর—দেবশক্তিতে ঘনীভূত জলময় সরোবর।

ক্বচিৎ সূর্য্যোদয়ময়ং ক্বচিৎ রাত্রি তমোময়ম্।
ক্বচিৎ সন্ধ্যাংশুকপিলং ক্বচিন্নীহারধূসরম্। ৪০ ॥
ক্বচিৎ হিমাভ্রধবলং ক্বচিৎ বর্ষৎ পয়োধরম্।
ক্বচিৎ স্থল ইবাকাশ এব বিশ্রান্ত লোকপম্ ॥ ৪১ ॥

অতি আশ্চর্য্য এই স্থান। সমকালে কোথাও সূর্য্যোদয়, কোথাও তমোময়ী-রাত্রি; কোন স্থান সন্ধ্যারাগে পিঙ্গলবর্ণ, কোন স্থান তুষাররাজি দ্বারা ধূসর।

কোন স্থান হিমসদৃশ মেঘে ধবলবর্ণ, কোন স্থানে বর্ষণকারী মেঘ সকল। আবার কোথাও ভূতলের ন্যায় আকাশ দেশেও লোকপালগণ বিশ্রাম করিতেছেন।

যেমন পরমেশ্বরের ভাবনায় নানা বিরুদ্ধ বস্তুর চিন্তা করিতে হয়—চিন্তা করিতে হয় সমকালে এক স্থান অত্যন্ত শীতল অন্য স্থান অতিশয় উষ্ণ ; এক স্থানে সন্তান প্রসব করিয়া মা আনন্দে নব প্রসূত বালককে দেখিয়া আনন্দে মগ্ন আবার ঐ কালেই অন্য স্থানে মৃত সন্তানের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জননী পাগলিনী ; পরমেশ্বরের চিন্তায় স্থিতি সৃষ্টি ও লয় সমকালে যেমন ভাবনা করা যায় না এখানেও সেই সমকালে বহুবিধ বিষয় দেখা ও বলা যেন দুঃসাধ্য।

কত আর বলা যাইবে ? কোন স্থান ময়ূর হেমচূড়াদি পক্ষিগণ দ্বারা আবৃত, কোন স্থান বিদ্যাধরী ও দেবীগণের বাহনসমূহে আচ্ছন্ন। কোন স্থানে অশ্বগণ তৃণভ্রমে কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড গ্রাস করিতেছে, কোথাও যমরাজের মহিষ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ধূম্রবর্ণ মেঘ খণ্ডকে অধঃকৃত করিতেছে। কোথাও কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর-সমূহ নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা পক্ষবিশিষ্ট বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় গরুড়পক্ষী নাচিতেছে। কোথাও মায়াকৃত আকাশ-নলিনী কোথাও বা আকাশ কমল-বিহারিণী হংসীরা উচ্চৈঃস্বরে অজবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে।

উড়ুম্বর মধ্যগত মশকের ন্যায় লীলা ও সরস্বতী আকাশোদরে ভ্রমণ করিতেছেন আর কতই আশ্চর্য্য দেখিতেছেন। তাঁহারা ঐ সমস্ত দর্শন করিয়া পুনরায় মহী-তলাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

যোগবাশিষ্ঠ। ২৪ সর্গ। ৩০১

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভূলোক বর্ণন।

নভঃস্থলাৎ গিরিগ্রামং গচ্ছন্ত্যৌ কঞ্চিদেব তে।
জ্ঞপ্তিচিত্তস্থিতং ভূমিতলং দদৃশতুঃ স্ত্রিয়ৌ ॥ ১

লীলা ও সরস্বতী নভস্থল হইতে গিরিগ্রামে যাইতে যাইতে এক অপূর্ব্ব জ্ঞপ্তিচিত্তস্থিত ভূমিতল দেখিলেন। গৌরবর্ণা বাগ্দেবীর চিত্তেই এই অপূর্ব্বস্থান। আত্মলীলা দ্বারা তিনি লীলাকে ইহাই দেখাইলেন। এই স্থান ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের হৃদ্পদ্ম মত।

হৃদ্পদ্ম সাধকের বড় প্রিয়বস্তু। হৃদ্পদ্মই ইষ্টদেবতার স্থান। যে আত্ম পুরুষ জাগ্রতে চক্ষে বাস করেন স্বপ্নকালে কণ্ঠায় আগমন করেন আর সুষুপ্তিতে হৃদ্পদ্মে শয়ান থাকেন অথচ যিনি সর্ব্বকালে আপনি আপনি থাকিয়াই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে নিত্য বিহার করেন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার জন্য ঋষিগণ হৃদয় কমলকেই প্রধান পীঠস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে স্থান জ্ঞপ্তিদেবী লীলাকে দেখাইলেন তাহা 'ব্রহ্মাণ্ডনরহৃদ্পদ্মম্।' ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী বিরাট পুরুষের হৃদ্পদ্ম। অষ্টদিক্ ইহার বৃহৎ অষ্টদল-পাব্ড়ী। ব্রহ্মাণ্ডের চতুষ্পার্শস্থ গিরিরাজি ইহার কেশর সমূহ। এই হৃদয় কমল 'স্বামোদ ভর সুন্দরম্।' ইহা আপনার আমোদভরেই সুন্দর। গিরি প্রবাহিত নদী সকল এই হৃদ্পদ্মের কেশর শ্রেণীর অন্তর শাখা। হিমকণা হৃদ্পদ্মের মকরন্দ বিন্দু। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্ম "শর্ব্বরী ভ্রমর ভ্রান্তং" "ভূতৌঘ মশকাকুলম্" শর্ব্বরী ভ্রমরী রূপে ইহাতে ভ্রমিয়া বেড়ায় এবং এখানকার অনন্ত প্রাণিপুঞ্জ মশকরূপে ইহাকে আকুল করে। পদ্ম নালের তন্তু হইতেছে ভোগ্যবস্তু ও তাহাদের গুণ, নালের রসপূর্ণ ছিদ্রসমূহ হইতেছে জলপূর্ণ পাতাল। ব্রহ্মাণ্ড পদ্ম 'দিবসালোক কান্তিমৎ' কিন্তু 'রাত্রিসঙ্কোচভাজনম্।' দিবালোকে পদ্ম সুন্দর শোভা ধারণ করে এবং শৃঙ্গারাদি মধুতে ইহা আর্দ্র হয় কিন্তু ব্রহ্মার রাত্রিকালে ব্রহ্মাণ্ডপদ্ম

সঙ্কুচিত হয়। সূর্য্য-হংস ইহার আকাশে ভ্রমণ করে। পাতালপঙ্ক নাগনাথ বাসুকি ইহার মৃণাল। জলমগ্না ধরা মহাবরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া জলের উপরে স্থাপিত বলিয়া ভূমির আস্পদভূত যে মহাম্ভোধি তাহার কম্পে যখন ভূমি কম্প হয় তখন এই ব্রহ্মাণ্ডপদ্ম কম্পিতদিগ্‌দল হয়। পদ্মের অধোনালগত অনন্ত দৈত্যদানব হইতেছে ইহার মৃণাল কণ্টক। এই পদ্মের নালমূলে স্বসন্ততিভূত প্রাণিবীজ পূর্ণ সম্ভোগ সুকুমারা অসুর স্ত্রীগণ। ইহারা ইহার বল্লরী-লতা। এই লতার আশ্রয় স্থান হইতেছে সর্ব্বজীবের মহাবীজ স্বরূপ পর্ব্বত সমূহ।

এই ভূপদ্মের মধ্যস্থলে নগর গ্রাম নদনদী ইত্যাদি কেশরিকা নালবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ। ইহা ইহার বিপুল কর্ণিকা। উত্তুঙ্গ সপ্তকুলাচল এই কর্ণিকার মহাবীজ। এই সপ্ত মহাবীজের মধ্যস্থলে নভঃস্থালী আক্রমণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে। ঐ কর্ণিকার হিমকণা এখানকার সরোবর সকল, উহার পরাগ বা ধূলিকা এখানকার বন জঙ্গল, কর্ণিকা পর্য্যন্ত স্থলে যে মণ্ডল সেই মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে সমস্ত জন-পুঞ্জ তাহাই ইহার অলিমণ্ডল।

তাং যোজনশতাকারৈঃ প্রতিরাকং প্রবোধিভিঃ।
সাগরৈর্ভ্রমরৈর্ব্ব্যাপ্তাং দিক্‌চতুষ্টয়শালিভিঃ॥ ১১॥

জম্বুদ্বীপ শত যোজন পরিসর। ইহার চারিদিকেই সমুদ্র। প্রতি পূর্ণিমায় সাগর যখন উচ্ছসিত হয় তখন পদ্ম যেমন ভ্রমর কর্ত্তৃক চুম্বিত হয় সেইরূপ জম্বুদ্বীপ রূপ মহাপদ্মও চারিদিকে নীলাম্বুরাশিরূপ ভ্রমর দ্বারা জোয়ার উচ্ছাসে চুম্বিত হয়। এই পদ্মও অষ্টদল। অষ্টদিকপাল ইহার অষ্টদলে। অষ্ট সমুদ্র ভ্রমরের ন্যায়।

জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। ভারতবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ ইত্যাদি। ভরত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল প্রভৃতি নয়জন পূর্ব্ব ভূপতি এই দ্বীপকে ঐ নয় বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। জম্বুদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ। নানা জনপদে পূর্ণ জম্বুদ্বীপের চতুষ্পার্শে লবণ সমুদ্র। ইহা ইহাকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার চারিধারে ইহার দ্বিগুণ ক্ষীর সমুদ্র। এইরূপ কুশ দ্বীপও ঘৃত সমুদ্র, ইহাদের দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ও দধি সমুদ্র। ইহাদের দ্বিগুণ শাল্মলীদ্বীপ ও সুরাসমুদ্র। ইহাদের দ্বিগুণ প্লক্ষ বা গোমেদক দ্বীপ ও ইক্ষু সমুদ্র। তৎপরে পুষ্কর দ্বীপ ও স্বাদুজল সমুদ্র। এক দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া এক সমুদ্র আবার দ্বীপ আবার সমুদ্র, আবার দ্বীপ

আবার সমুদ্র এইভাবে জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ এবং লবণ সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, দধি সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, এবং স্বাদু জল সমুদ্র পরস্পর পরস্পরকে বলয়াকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

ইহার পরে পুষ্কর দ্বীপেরও দশগুণ পরিমিত এক ভীষণ গর্ত্ত পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ভীষণ গর্ত্ত। চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত সমূহে ভীষণ লোকালোক পর্ব্বত ঐ সমস্ত পাতালগামী পদ্মের দশগুণ উচ্চে অবস্থিত। লোকালোক পর্ব্বতের উপরিভাগের অর্দ্ধাংশে সূর্য্য প্রকাশিত থাকায় ইহার অর্দ্ধভাগ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মনে হয় ইহা যেন নীলোৎপলমালামণ্ডিত। লোকালোক পর্ব্বতের শিখর দেশ নানাবিধ মণি মাণিক্য ও কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি কুসুম নিকরে সুশোভিত।

ইহার পরে ইহার দশগুণ প্রমাণ অজ্ঞাতভূতসঞ্চার নামক এক মহারণ্য। ইহার চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ আশ্চর্য্য বারি রাশি। ইহার চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ মেরু-দ্রব-করণ-সমর্থ ও ব্রহ্মাণ্ড-শোষণ-সক্ষম এক প্রলয় হুতাশনের জ্বালাজাল। ইহার চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ শব্দশূন্য মহা বেগশালী প্রলয় মহামারুত। ইহার পরে চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ ব্যোম মণ্ডল। ইহার পর শত কোটি যোজন ব্যাপী ব্রহ্মাণ্ড ভিত্তি।

লীলা এবম্বিধ জলধি, মহাদ্রি, লোকপাল, ত্রিদশালয়, অম্বর, ভূতল পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড কটাহ দেখিলেন। ইহার মধ্যে নিজ মন্দির যে গিরিগ্রামে তাহাও বিস্ময়ে দর্শন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সিদ্ধদর্শন হেতু।

আতিবাহিকতা প্রাপ্তি ভিন্ন কেহ কখন লীলার মত হইতে পারে না। আতিবাহিক ভাব প্রাপ্তির সাধনা হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায় তাহা অসত্য। তাহা ভ্রম জ্ঞানেই উপলব্ধি হয়। কাজেই অসত্য যাহা কিছু তাহাতেই অনাস্থা করা চাই। সর্ব্বদা অভ্যাস কর দৃশ্যাদি যাহা কিছু, কল্পনা, মন, দেহ ও জগৎ সমস্তই অনাস্থার বস্তু। কিছুতেই আস্থা করিও না—ইহাই প্রথম সাধনা। ব্যবহারিক কোন কিছুতেও ইহা যাঁহার ভুল না হয় তিনিই সাধক। ইহাই বৈরাগ্য সাধনা।

দ্বিতীয় সাধনাটি হইতেছে অভ্যাস সাধনা। পরব্রহ্মে কোন প্রকার কল্পনা নাই, কোন প্রকার সৃষ্টি নাই, কোন প্রকার বিকার নাই, কোন প্রকার উৎপত্তিই নাই। চেতন পুরুষ সর্ব্বদা, সর্ব্বভাবেই আপনি আপনি। ইনি শিব শান্ত এক অজ এবং অনুৎপত্তি স্বভাব।

যাহা কিছু ভাসমান দেখ তাহা নিরাময় ব্রহ্মই। মণির প্রতিচ্ছায়া মণি হইতে পৃথক বস্তু নহে। বন্ধন, মুক্তি, অবিচার, অবিদ্যা এসব কিছুই নাই। আছে একমাত্র কেবল শুদ্ধ বোধ। বোধই জগৎরূপে দেখা যাইতেছে। সংসার নামক দৃশ্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ইহা যিনি বুঝিয়াছেন তাঁহার দ্বৈত বাসনা উৎপন্ন হইবে না।

তত্ত্বকথা বুঝিলেই যে দৃশ্য দর্শন থাকিবে না তাহা ভাবিও না। যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুই অনাস্থার বিষয় হইয়া না যাইতেছে ততদিন বৈরাগ্য সাধনা ঠিক হইল না। যতদিন বৈরাগ্য সাধনা ঠিক না হইল ততদিন বাসনা ক্ষয় হইল না। সবই অনাস্থার বিষয় হউক তবেই বাসনা ক্ষয় হইল। বাসনা ক্ষয় হইলেই এই স্থূল দেহটাও অসৎ বলিয়া বুঝিবে।

তখন অন্য সমস্তই সহজে সিদ্ধ হইবে।

যাহা করিতে হইবে আবার বলি শুন।

যতদিন চিত্ত কোন কিছু বাঞ্ছা করে, কোন কিছুর জন্য শোক করে, কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করে কোন কিছুর জন্য হৃষ্ট হয় বা ক্রুদ্ধ হয় ততদিন বন্ধন। যখন এই সব থাকে না তখনই মুক্তি।

অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আস্থা-শূন্য হও। যেখানে তৃষ্ণা সেইখানে সংসার। দেহটাও থাক বা যাক্ তাহাতেও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই ভাবে জাগ্রৎ ভাবনার অন্ত হইলে অর্থাৎ স্থূল দেহের অহম্ভাব নিবৃত্তি হইলে আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইবে।

চিত্ত, বাসনা ত্যাগ করুক, তবে ইহা সমাধিপটু হইবে। তখন ইহা শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া যাইবে। ইহাই আতিবাহিকতা। শুদ্ধ সত্ত্বময় চিত্ত যখন হইল তখন আতিবাহিক দেহ পাওয়া গেল। সমস্ত দেব দেবীর দেহ আতিবাহিক। আতিবাহিক হইলেই তুমি সিদ্ধ শরীরে মিলিতে মিশিতে পারিবে।

লীলা আতিবাহিকতা লাভ করিয়াই আপন গুরু সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ঘুরিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া বরবর্ণিনীদ্বয় ব্রাহ্মণের গৃহে আসিলেন। সিদ্ধ রমণীদ্বয়কে কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহারা কিন্তু সমস্তই দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন দাস দাসী চিন্তাবিধুর—চিন্তা কাতর; অঙ্গনাগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শীর্ণপর্ণ পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণমুখী। এই পুরীর কোনই উৎসব নাই। ইহা নষ্টোৎসব পুরীর ন্যায়, ইহা অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায়, গ্রীষ্মদগ্ধ উদ্যানের ন্যায়, বিদ্যুদ্দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায়, বাতচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায়, হিমদগ্ধ অম্বুজের ন্যায়, অল্প স্নেহ অল্পবর্ত্তি দীপের ন্যায় এই পুরী নিতান্ত প্রভাশূন্য হইয়াছে।

আসন্ন মৃত্যু করুণাকুল বক্ত্র কান্তি
সংশীর্ণ জীর্ণ তরু পর্ণ বনোপমানম্।
বৃষ্টিব্যপায় পরিধূসর দেশ রুক্ষং
জাতং গৃহেশ্বর বিয়োগ হতং গৃহং তৎ ॥ ৬ ॥

গৃহেশ্বর বিয়োগে গৃহ আসন্ন মৃত্যু কাতরতায় আকুল মুখের ন্যায় কান্তিহীন,

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] পৌষ, ১৩২২ সাল। [৯ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

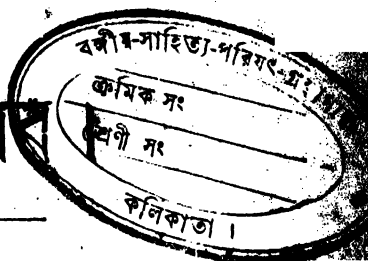
সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, পৌষ। [৯ম সংখ্যা।

মিলন-উৎসব।

হৃদয়-যমুনা-কুলে, দয়াল শ্রীহরি
বসি কল্প-তরুতলে, বাজায় বাঁশরী;
যমুনা উজান ধায়—পাগল প্রকৃতি—
প্রতিরন্ধ্রে গাহিতেছে আবাহন-গীতি।
স্থাবর জঙ্গম সবে, প্রেম আকর্ষণে,
ক্ষুদ্র জলবিন্দু প্রায় সাগর-মিলনে
ছুটেছে উধাও, নিজ নিজ কর্ম্মফলে
কেহ যায় ঋজু পথে কেহবা কুটিলে।
নারায়ণ! মোহ-বাসে বাঁধিয়া শ্রবণ
নারিনু শুনিতে তব প্রেম-আবাহন,
পরিশ্রান্ত এবে আমি ঘুরি বহু যোনি,
কেটে দাও মায়া-পাশ, হেরি পা'দুখানি।
টেনে লও মোরে, প্রভু! সে মহা-মিলনে,
উৎসব সফল হবে এ ব্যর্থ জীবনে।

শ্রীগুরুদাস।

কবে ডাকিবে ?

ওহো ! আমার যে অনেক কাজ। যার অনেক কাজ তারে তুমি ডাকিবে কেন ? যার অনেক কাজ তারে যে আমরাও ডাকি না। ডাকি কি ? যে আমার কাছে আসিলে ছট্‌ফট্‌ করে, যে বলে আমি বড় পরাধীন, কোথাও আমার থাকিবার যো নাই, আমার খোঁজ চব্বিশ ঘণ্টা, আমরা কি তারে ডাকি ? আমরা ত তারেও ডাকি না যে একদণ্ড হয়ত থাকে,—যে সময় করিয়া একবেলা হয়ত কাছে থাকে,—যে কাছে থাকিতে ভালবাসে কিন্তু তার যে অনেক কাজ,—তাকে যে কাজের জন্য যাইতে হইবে,—ইহাকে ত আমরাও ডাকি না। আবার এমন লোককেও আমরা কাছে রাখি না যার জন্য আমাকে বন্দোবস্ত করিতে হয়।

তাই এখন বুঝি, তুমি আমাকে ডাকনা কেন ? আমার অনেক কাজ, আমাকে সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে তবে আমি তোমার কাছে যাইব। ইহাতে কি আমার যাওয়া হয় ? না তুমি আমাকে কাছে ডাকিতে পার ? এত কাজ আমার কেন ? কে আমাকে এই সব কাজ করিতে বলিয়াছে ? এ সব কাজ কি আমার জন্যই করি, কিম্বা অন্যের উপকারের জন্য করি, অথবা তোমার আজ্ঞা বলিয়া করি ?

স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য ত অনেক কাজ করি ? এটা ত অন্যের উপকারের জন্য। না না এটা ত লোক-হিতকর কার্য্য নহে। একটি আমি আছে। সেই আমিটি যাহাতে মাখাইয়া দেই তাই হয় আমার। স্ত্রী পুত্র কন্যাতে আমিটি বেশ করিয়া মাখাইয়া দিয়াছি। তাই তাহারা আমার হইয়াছে। যাহাকে আমার আমার বলি তাহাও 'আমি' মাখান বলিয়া সে সব আমিই। তবেই হইল স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য যে কাজ তাহা আমারই জন্য। তাহা লোক-হিতকর নহে। কেননা স্ত্রীর জন্য যাহা করি, মায়ের জন্য তাহাত করি না। স্ত্রীটিতে 'আমি' যতখানি মাখাইয়াছি মাতে কি ততখানি মাখাইয়াছি ? স্বদেশে যদি আমিটি মাখাইতে পারিতাম তবে স্বদেশের কাজটিও আমার কাজ হইত। পর তখন থাকিত না। পরও তখন আমি মাখান হইয়া যাইত। আর কপটতা করিয়া যদি বলি পরের জন্য খাটি,—নিজের জন্য কি করি ?—অথচ পরটি 'পোষাকি' ঐটি বাহিরের জন্য,

ভিতরে 'আটপৌরে' একটি পোষাক আছে। আবার ঐ যে বলি সন্ধ্যা পূজা এ সব আমার হয় না, অন্য কাজ কিন্তু করিতে পারি, এস্থানেও আমিটিকে বহির্ম্মুখ করিয়া নিতান্ত চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছি। এটা আর বসিতেই পারে না তাই একটা আবরণ দিয়া চঞ্চলের কার্য্যই করি। সেটাও চঞ্চল 'আমি'র জন্যই করি।

থাক্ এ সব কথা। যিনি যাহা পারেন তাহাই বুঝিয়া লইবেন। আমি কিন্তু বলিতেছি, কবে ডাকিবে ?

তুমি তবে আমাকে ডাকিবে তখন, যখন আমার আর কোন কাজ থাকিবে না। এ হইবে কবে? এমন কি আহার নিদ্রার কাজও আমার থাকিবে না ? ইহা ত বড় শক্ত।

শক্ত বটে কিন্তু উপায় করিলে সবই হইতে পারে। 'আমি' কে প্রস্তুত করিবার জন্য যাহা যাহা আরম্ভ করিয়াছ—সেই গুলি অগ্রে শেষ করিয়া ফেল। যত শীঘ্র পার শেষ কর। শেষ করিয়া আর কাজ হাতে লইও না। আর যে সব কাজে আমি গড়া হয় না সে সব কাজ একবারেই করিও না। তবে কি দুঃখীর প্রতি তুমি উদাসীন হইবে ? তাহাও নহে। দুঃখীর জন্য যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে মাত্র স্পন্দিত হইবে। সত্য সত্যই দুঃখী কেহ নাই। যে দুঃখী সে তোমার কাছে কর্ম্মশূন্য হইয়া আসিবে। তুমি তাহার কাছে যাইবে কেন? তৃষ্ণা পাইলে নদীর কাছে যাইতে হয়। নদী তোমার কাছে আসে না। যে কিন্তু আসে তাহাকে নদী জল দিতে কাতর হয় না। নদীর লক্ষ্য কিন্তু থাকিবে সমুদ্রে যাইতে। অধিক আর কি—প্রচুর ভাবে যাহা আরম্ভ করিয়াছ তাহা শীঘ্র শেষ কর। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম শেষ হয় না জানিও। নিত্য কর্ম্ম বাদে আর সব কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেল, বুঝিবে সে তখন ডাকিয়াছে।

বর বড় কি ক'নে বড় ?

প্রথমে বরই বড়। শেষে ক'নে এত বড় যে বর যেন আর থাকেনই না।

এ হয় কখন ? যখন বর আত্ম স্বভাবটি—স্ব চৈতন্যটি ক'নে কে দিয়া সর্ব্বদা পদতলে থাকেন, তখন শুধু ক'নের মধ্যে বরের যেটুকু থাকে সেটুকু ছাড়া বর যেন আর নাই। বড় বর ছোট ক'নেকে আত্মবিক্রয় করিয়া আপনার বৃহত্ব ভুলিয়া,

থাকিয়াও যেন থাকেন না। যিনি স্বৈণ তাঁহার অস্তিত্ব যেন থাকিয়াও নাই। 'গোলামের' অস্তিত্ব যদি থাকে তাহা প্রভুর স্বীকৃতি মাত্র।

লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায় ব্রহ্ম আত্ম-মায়ায় জীব সাজেন কিরূপে? জ্ঞানীর অজ্ঞানী হওয়া কি সম্ভব? জীব ও ব্রহ্ম যদি একই হয় তবে জীবে ব্রহ্মত্ব কোথায়? জীব নিরন্তর দুঃখ করে, নিরন্তর অভাবগ্রস্ত আর ব্রহ্মে কোন দুঃখ নাই, কোন অভাব নাই, তিনি পূর্ণ। লোকে ভাবে এটা বড় গোলমেলে কথা। এটার মীমাংসা আবহমান কাল হইতে হয় নাই। শাস্ত্র ত তাহা বলেন না।

শাস্ত্র বলেন ব্রহ্মের মায়া অঙ্গীকারটা প্রথমে দেখ। তোমার কাছে জগৎটা কত বড়! কিন্তু এই জগতের মত অনন্তকোটি জগৎ মায়া রচনা করেন। অনন্তকোটি জগৎ যাঁহার মধ্যে ভাসে সে কত বড়? মায়া কত বড়! সত্যই। কিন্তু যদি মায়াকে অতি ছোট প্রমাণ করিতে পার তবে এই জগৎ কত ছোট হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন জগৎ ভুল হওয়া চাই। আচ্ছা আগে জগৎটাকে অতি ছোট দেখ তার পরে যাহা অতি ক্ষুদ্র তাহা ব্রহ্মে হারাইয়া যাইবে। তখন ব্রহ্মই থাকিবেন, জগৎ থাকিবে না। ইহাও জগৎ ভুলিবার একটা উপায় বটে, দৃশ্য মার্জ্জনের একটা সঙ্কেত বটে।

যে মায়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুলিতেছে তাহা কোথায়? চতুষ্পাদ ব্রহ্মের অবিদ্যা-পাদের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে। ব্রহ্মের তিন পাদ সর্ব্বদা শান্ত চলন রহিত অবস্থায় আছেন। এক পাদের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মায়ার তরঙ্গ উঠিল। সেই ক্ষুদ্র দেশে ব্রহ্ম মায়া-জড়িত হইলেন। মায়া-জড়িত ব্রহ্ম প্রকৃত ব্রহ্মের তুলনায় কতটুকু? তুমি যাহাকে আত্মমায়াচ্ছন্ন ব্রহ্ম বল তিনি কতটুকু? অথচ ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মভাবে লক্ষ্য রাখিলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন কিন্তু আত্ম-মায়ায় তিনি যাহা সাজেন তাহা জগতের কাছে ব্রহ্ম বা বৃহৎ হইলেও প্রকৃত ব্রহ্মের কাছে আছেন কি নাই বলা যায় না। মায়ার ভিতর দিয়া ব্রহ্মের ঈশ্বর সাজা ও জীব সাজা দেখ, অনেক বিষয় পরিষ্কার হইবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই আত্ম-মায়ায় যিনি জীব সাজেন বা ঈশ্বর সাজেন তিনি পূর্ণব্রহ্মের অবিদ্যা পাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে। আর লেখা গেল না। এখন যাহার ইচ্ছা তিনি বাকিটা চিন্তা করিয়া লইবেন। তাই বলিতেছিলাম,—বর বড় না ক'নে বড়?

সাধকের চিঠি।

(১)

এক নাম মুক্তা তাকো জপহি কবির।

অধম অজ্ঞানী দুর্ব্বল জীব তোমার সাধনা কি জানিবে? তুমি যাহা শাস্ত্রমুখে বল আমি তাহাই অনুভব সীমায় আনিতে চেষ্টা করি, সেই চেষ্টার নাম সাধনা বলিতে হয় বল, আজ্ঞা পালন বলিতে হয় বল। আসন শুদ্ধি, অঙ্গ শুদ্ধি, সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা কখন ত শিখাও নাই। আমারও কখন শিখিবার ইচ্ছা হয় নাই। নিত্যপূজা, গণেশাদি পঞ্চদেবতার ধ্যানকালে দেখি সেই এক নামই আমার সব। আচ্ছা, আবার ভাল ক'রে বলি, কি করি। কারণ আমার ভুলত পদে পদে। এ ভুল স্মরণ করিলে বড়ই দুঃখ হয়। এ ভুলে কি ক্ষতি হইয়াছে, আমার কতদূর অনিষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিলে কিছু দোষ কি আছে? যাক্ যাহা হইবার হইয়াছে। আর যেন না হয়, ইহাই করুণ প্রার্থনা। আচ্ছা। কি করি তাহাই অগ্রে বলি।

প্রাতে উঠিয়া আসনে বসি। আসন শুদ্ধি ত জানি না। পুস্তকে আছে কিন্তু এ সব শিখিতেও আমার ইচ্ছা হয় না। এ সব কি দুষ্কৃতির লক্ষণ? আসনে বসিয়াই শ্রীগুরু স্মরণ করি। গুরুই আমার সব সাজিয়া আছেন। এই ভাবিয়া বামে গুরুভ্যো নমঃ ইত্যাদি বলিয়া ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তোমরা শান্তি দাও। শ্রীগুরু চরণে অব্যভিচারিণী ভক্তি দাও। ইত্যাদি চিন্তার পর প্রা—করি, মূলাধারাদি পদ্ম লাল নীল লোহিত বর্ণ না ভাবিয়া অর্থাৎ অত রকম ভাবিতে পরি না, শুধু এইরূপ ভাবিতে চেষ্টা করি এই ছয়টি পদ্ম সূর্য্য সদৃশ জ্যোতির্ম্ময়। এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে প্রণব—আমাদের প্রণব। প্রণবের মধ্যে শ্রীগুরু বীজরূপী। অন্যান্য বীজ লং বং ইত্যাদি বসাইয়া আনন্দ আসে না। পূর্ব্বেও টানিয়া কুম্ভকে শ্রীগুরুর নিকট যতক্ষণ পারি প্রণামাদি করিতাম। আজ কাল তা আর করি না। অমনি ৬ নামা। এইটি এমন ভাবে করা চাই যেমন ঘড়ির কাঁটা টক্ টক্ করে। আমার শুধু এই চেষ্টা যে এই বীজের স্পর্শে স্পর্শে শ্রীগুরুর রূপটি যেন চক্রে চক্রে ভাসিয়া বেড়ায়। অর্থাৎ যেমন অগ্নি স্মরণ হইলেই তার রূপ গুণ স্মরণ হয়; আকাশ

সমুদ্র স্মরণে যেমন তাদের বিশালত্ব আপনা হইতে জাগে সেইরূপ জাগাইতে চাই। আমার বড় সাধ কি প্রা—কি ধ্যানে, কি জপে কি পাঠে, কি শুধু শুধু চিন্তায় যেন এই নাম রূপটি ভাসিয়া উঠে; যেন এই রূপ সাগরে আমার এই ক্ষুদ্র আমিত্বটুকু হারাইয়া যায়। কখন অহল্যা হইয়া নাম জপ করিতে বসি। এ দেহটা পাষাণের মত হউক। ভিতরে ঐ চেতনাটুকু থাক্। সত্যই ত এ দেহ নাই। যাহা নাই তার এত চিন্তা কেন? তবু এ চিন্তা ছুটে না। হায় দেহটাই বা আয়ত্ব হইল কৈ? এটা যদি কিছুই নয় তবে এটাকে ইচ্ছামত আকাশে পাতালে জলে পর্ব্বতে ফিরাইতে পারি না কেন? তার পর নাভি—যোনি—করিয়া যে কয়টা ধ্যান মুখস্থ আছে তাহা বলিয়া প্রণাম করি। তাহার পর গীতা রামায়ণ পাঠ করিয়া একটু সংসারের কাজ, তার সংসার বলিয়া দেখি।

---

(২)

রোগ হইয়াছে। তা হউক। শরীর থাকিলেই রোগ হইবে। তোমরা কেন এরূপ করিয়া আমার চিত্তে সংশয় আনয়ন কর? দেহ আধি ব্যাধির আগার। ছন্দমত এটাকে প্রথম হইতে স্পন্দিত করিতে পারি নাই; মাতৃগর্ভে আগমন অবধি যে সমস্ত সংস্কার এটার হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। রোগ শোক দুঃখে কর্ম্মফল ভোগ হয়। যাহা হইবার হউক। রোগে চিকিৎসার বিধি না করিলে অধর্ম্ম হয়, তাই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছি। তাই বলিয়া ভয়ে আমার সবের সবকে ছাড়িব কেন? মৃত্যু যদি এই মুহূর্ত্তে আইসে তবে পর মুহূর্ত্তের আশা কোথায়? ক্রিয়া ছাড়িলে আমার দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমি ইহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। এ রোগের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ কি? যখন না পারিব তখন ত হইবেই না। যতক্ষণ পারি ততক্ষণ করিব না কেন? ইহাতে রোগ বাড়িবে কেন? আমি দেখি ইহাতে বরং রোগ সারে। তবু যদি তোমরা বল রোগ বাড়ে? তা বাড়ুক। এই শুভ কর্ম্মেই মৃত্যু শ্রেয়ঃ। তথাপি নীরবে থাকিতে পারি না। এখন ত খুব বেশী বেশী প্রা—করি। খুব আনন্দ হয়। সেই কথা মতই করিতেছি। ইহাতে দেখি আরও সহজ ভাবে হয়। যাহা হয় সবই মঙ্গলের জন্য। একাসনে ৩০০। ৪০০ বা আরও বেশী পারি কিন্তু এখন তত করিনা। খুব ভোরেই উঠি। যত দিন না শয্যাশায়ী হইব ততদিন আমাকে শোয়ায় কে?

ঔষধ সেবন ভিন্ন চিকিৎসকের বৃথা কথা শুনি না, শুনিবও না। ধর্ম্ম বিষয়ে আমার অভ্যাস সম্বন্ধে তিনি কি জানেন? এই গরমে গরম জল ব্যবহার করিতে বলা কেন? কেন আমার কি হইয়াছে যে রাত দিন শুইয়া থাকিতে হইবে? যেন আমি মরিতে বসিয়াছি। সুস্থ সবল দেহকে কি রোগী সাজান যায়? অসুখ যদিও আছে কিন্তু ইহার জন্য কোন যন্ত্রণা বা দুর্ব্বলতা নাই। দেহ বেশ সুস্থ। এই সুস্থ দেহে, রোগের ভয়ে যদি সব ছাড়ি তবে বলত যখন সত্য সত্যই দেহ ছাড়িবার সময় আসিবে তখন কি, ষাঁড় ডাকিব? দেহ যায় যাক্ তাতে আমার বা তোমাদের কোনই ক্ষতি দেখি না। শুধু আশীর্ব্বাদ কর যেটুকু চাই সেইটুকুই যেন পাই। ছি! ছি! স্নেহের বশে উচিত কথা বলিতে ভোল কেন? বল ত দেহ ক্ষয় হইবে বলিয়া কে কবে তপস্যাকে সকল সুখের আলয় জানিয়াও তপস্যায় বিরত থাকে বা থাকিতে পারে?

দেহের ধর্ম্মই ক্ষয় বৃদ্ধি ইহাতে তোমার আমার বা আত্মার কি? তুমি জীবনের শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিও। আমিও করি। তাহার একটি কথায় আমার মধ্যে কত শক্তি সঞ্চার হয় তাহা কি তুমি জান না?

যোগ যাগ আমার নাই। করি কিন্তু সবই। শুধু উচিত বলিয়াই করিয়া যাইতে চাই। ঘরের কোণে একা আমি বেশ থাকি। সত্যই আমি আর কিছু চাই না। তুমি এখানে থাকিয়া কি করিতে? আমি বেশ আছি। একা আমি খুব ভালই থাকি। তাই অন্য সকলকে বিদায় দিলাম।

এ তীর্থে ও তীর্থে যাইতে পার না বলিয়া দুঃখ কেন? এমন কর্ম্ম পাইয়াছ। এই ত সব তীর্থ। তার উপরে যদি হয়, ভাল, না হয়, তাতেও কোন দুঃখ নাই। আর কোন বাসনা তুলিয়া নূতন কর্ম্ম সৃষ্টি করিও না। থাক্ তোমাদের কর্ম্ম তোমরা বুঝ। আমার অত মাথা ব্যথা কেন?

আমার অবস্থা ত শুনিলে এখন "নমামি রামং ভবরোগ বৈদ্যম্"। আর ঔষধ নাই গো! কোন অনুরোধ করিও না। যদি কাহাকেও কিছু বলিতে হয় বলিও সে মরিয়াছে। আর অন্য কোন আশা করিও না।

কি সব রোগ! কেমন যেন হইয়া যাইতেছি! ঠাকুর একবার এস। "সব জ্বালা যাক্ দূরে ধ'রে দুটি পায়"।

একবার আসিয়া সান্ত্বনা কর; একবার ডাক। প্রাণে শান্তি আসুক; দেহ অমর হউক। ফুল্ল ফুলের মত দেব সেবায় লাগি। নতুবা এ হাহাকারও বুকি

ভুল, প্রলাপ, উত্তেজনা মাত্র। সত্য কথা কত আর বলিব ক্ষমা কর, ভুল ভাঙ্গাও। ঠাকুর! এত পুনঃ পুনঃ ভুল ভাঙ্গাইতেও কি তোমার ঘৃণা আসে না? কত বড় তুমি। মহান্ হইতেও মহান্। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি! তোমার মহিমা আমি কি বুঝি? এই জন্যই বুঝি তোমার নাম পতিতপাবন,—দীননাথ—আমাকে দীনের দীন কর, ঠাকুর! আমি তোমার করুণা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। ইহাই আমার সুখ।

মৃত্যু চিন্তা—নিষ্কাম কর্ম্ম—আত্মচিন্তা।

তামসিক অবস্থায় মৃত্যুচিন্তা, রাজসিক অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সাত্ত্বিক অবস্থায় আত্মচিন্তা—এই তিনটি সাধনার ক্রম। মতি! তুমি আমার সহধর্ম্মিনী তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোন কর্ম্ম হইবে না। তোমাকে লইয়া আমি পরম-পুরুষের নিকটে যাইব, চিরদিন সেখানে আনন্দে খেলা করিব। পুরুষোত্তম-ধামে গমন করিলে আমাদের সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে।

তুমি সংসারে আছ। তুমিই গৃহিণী কিন্তু তুমি এত চঞ্চলা হইলে আমি কতদুঃখী হই, তুমিই ভাবিয়া দেখ। তুমি আমাকে ভালবাস কিন্তু সকল সময়ে তুমি ত একরূপ থাক না। তুমি তোমার রজোভাব ও তমোভাব ত্যাগ কর, নিত্য সত্ত্বস্থা হও তবেই আমরা আনন্দধামে যাত্রা করিতে পারিব।

তমোভাব আসিলে দমন করিতে পার না এই ত তুমি বলিতেছ; আচ্ছা আমি উপায় বলিয়া দিতেছি, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর।

তমোভাব প্রবল হইলে মৃত্যু চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতেই তুমি জড়তা কাটাইয়া কর্ম্ম করিবার বল পাইবে। যখন কর্ম্ম করিবার জন্য তুমি প্রস্তুত হইবে তখন বলিয়া দিব কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে। এখন কর্ম্ম করিবার অবস্থা লাভের জন্য মৃত্যু চিন্তা কর।

প্রথমেই দেখ মৃত্যুর সময় অসময় নাই। তুমি এখন সুস্থ আছ, ভাবিতেছ ভগবানকে সেই সময়ে স্মরণ করিতে পারিবে। ইহা কতদূর সত্য একটু বিচার কর। কত বার ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছ। রোগকালে তুমি শুইয়া থাক,

বসিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তোমার থাকে না। আসনে স্থির হইয়া বসিতে না পারিলে ঈশ্বরের চিন্তা হয় না। মেরুদণ্ড সরল না থাকিলে শ্বাস স্থির হয় না। শ্বাস চঞ্চল থাকিলে মনকে কিছুতেই স্থির রাখা যায় না, বল তখন জপ করিবে কে? ধ্যানই বা হইবে কিরূপে? তাহার উপর রোগের যন্ত্রণা, শিরঃ পীড়া—কোমরে বেদনা—শরীরের দুর্ব্বলতা—মুখের দুর্গন্ধ—সমস্ত দেহব্যাপী একটা গ্লানি, বল তখন কি করিতে পার? তখন কি কোন কিছু চিন্তা করিতে তুমি পার? পারনা—তবে এখন কেন সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া—সর্ব্বদা কাতর হইয়া ঈশ্বর চিন্তা কর না? এখন হইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত কেন থাক না? হাহা—হুহু—হিহি করিয়া দিন কাটাও কেন? কখন দুঃখে হায় হায় কর, কখন শীতে হুহু কর, কখন রঙ্গরসে হিহি কর, বল ইহাতে কি লাভ? আপন কর্ম্ম কর।

তার পর বিচার কর, তোমার পিতা, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতা সকলে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; কত বয়স পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত ছিলেন দেখ না কেন? কত যাতনায় তাঁহারা দেহ ছাড়িয়াছেন স্মরণ কর—কত দুঃখ তাঁহারা করিয়াছেন ভাবিয়া দেখ। তুমি সব দেখিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাক বল? আজ ভাল আছ, কাল রোগ আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে তখন ত কিছুই করিতে পারিবে না। সাবধান হওয়া কি উচিত নয়? মৃত্যু, রোগ ও শোকের ভয় কি তোমার রাখা উচিত নয়? ভাবিয়া দেখ কোন্ বিষয় তুমি লাভ করিলে, এতদিন ত গেল, কি করিয়াছ বল?

যখন মৃত্যু তোমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন তাহাকে কি বলিবে বল? রামপ্রসাদ ভক্ত ছিলেন তাঁহার মত কি বলিতে পারিবে "তিলেক দাঁড়াওরে শমন আমি বদন ভ'রে মাকে ডাকি"। ইহা বলিতে পারিবে কি? মৃত্যুর নাম যম, ইনি ধর্ম্মরাজ। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ তিনি সমস্তই জানেন। তোমার ইন্দ্রিয় কত কুকর্ম্ম করিয়াছে, তুমি মুখে কত কঠোর কথা উচ্চারণ করিয়া লোকের মনে ক্লেশ দিয়াছ, ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত অন্যায় করিয়াছ, কামের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া কত সর্ব্বনাশ করিয়াছ, ধর্ম্মরাজ আসিলেই তুমি ভয়ে অভিভূত হইয়া নিজের দুষ্কর্ম্ম সমূহ দেখিতে পাইবে। যাহা এখন ভুলিয়া নির্ভয়ে আছ, তাহা তখন তোমার মনে উদিত হইবেই। তুমি কি রামপ্রসাদের মত মায়ের শরণাপন্ন হইতে পারিবে? রোগকে কি মার নাম লইয়া কখন অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছ? তবে কেমন করিয়া—সব ভুলিয়া হাহা

হিহি করিতেছ বল? তখন কিরূপে তোমার 'জোর' আসিবে বল? কোন বিষয় ত আয়ত্ব করিতে পারিলে না, তবে কেমন করিয়া মৃত্যুকে বলিবে "তিলেক দাঁড়াওরে শমন আমি বদন ভ'রে মাকে ডাকি, তবে তারা নামের কবচ মালা বৃথা আমি গলায় রাখি"। এ ভরসা ত তোমার নাই। এখনও সময় আছে। দিন থাকিতে থাকিতে মায়ের বলে বলীয়ান হও। মায়ের নামে ভর করিয়া নির্ভয় হও। তখন শমন তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না, শরীর তোমাকে পীড়ন করিতে পারিবে না; শরীরের যতই দুর্ব্বলতা হউক না, তুমি তখন স্থির থাকিতে পারিবে, ঘন ঘন মাকে স্মরণ করিতে পারিবে। তবে এখন হইতে চেষ্টা কর দেখি। মতি! তুমি বল, আমার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার মিলনই তোমার কার্য্য। আমার এই ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার মিলন কর।

কেমন এখন ত তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি জাগিল? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতেছ কোন্ কর্ম্ম করিবে এবং কেমন করিয়া কর্ম্ম করিবে? কোন্ কর্ম্ম করিবে তাহাত জান। আবার নূতন করিয়া বলি শোন। প্রথমে মেরুদণ্ড সরল করিয়া আসনে উপবিষ্ট হও। এখন দেখ শ্বাস কিরূপে পড়িতেছে? আচ্ছা, শ্বাস যেমন চলিতেছে কতক্ষণ তাহার উপর লক্ষ্য কর। শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা কর, তুমি যে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তাহা নিষ্কামভাবে করিতে হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্ম কি তাহা ভাল করিয়া ধারণা কর। যে কর্ম্মে শ্রীভগবানের পূজা হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। কথা কহিবে তাহাতেও ভাবনা কর—কথা দ্বারা ভগবানের পূজা হইবে, সেইরূপ যাহা ভাবিবে এবং যাহা করিবে তাহাতে আগেই ভাবনা কর আমার ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের পূজা হইবে কাজেই তুমি দুষ্ট, কথা দুষ্ট ভাবনা দুষ্ট কর্ম্ম করিতেই পারিবেনা। আর জানত স্বামী নারায়ণ। ভাবনা করিলেই ইহা ভাবা যায়। স্বামী যাহাই হউন না কেন তুমি তাঁহাকে নারায়ণ ভাবিলেই ভাবিতে পারিবে। তাঁহার ব্যবহারিক কার্য্য গুলি তাঁহার মায়া ভাবিয়া ঐ সব নাই দেখিলে। ভিতরে তিনি যে শান্ত নারায়ণ, তাই দেখিতে সর্ব্বদা যত্ন কর। পারিবে। আমি তোমার স্বামী। আমি যেরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি তুমি ঠিক ঠিক সেইরূপভাবে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মটি তোমার নিষ্কামভাবে করা হইল। কারণ আমার অভিলাষ মত কর্ম্ম করিবার দিকে তখন তোমার লক্ষ্য রহিল। আমি বলিয়াছি বলিয়াই না তুমি কর্ম্ম করিতেছ? তবেই দেখ কত মনোযোগের সহিত তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

ধর তুমি জপ করিবে। আমি বলিতেছি শ্বাসের সহিত তোমাকে জপ করিতে হইবে। শ্বাস একবার উঠিতেছে একবার পড়িতেছে। স্থির হইয়া আসনে বসিয়া কোন 'জোর জুলুম' না করিয়া শ্বাস টানিবার সময় জপ কর আবার ফেলিবার সময় জপ কর; যদি অন্য চিন্তা আইসে তবে তুমি বুঝিবে আমার ইচ্ছামত তোমার কার্য্য হইতেছে না। তোমার ব্যভিচার হইতেছে। তুমি কার্য্যে ব্যভিচারিণী হইতেছ অথচ তোমার সতী হইতে প্রাণে প্রাণে ইচ্ছা আছে। তুমি কার্য্যে ব্যভিচারিণী, ইচ্ছায় সতী। ইচ্ছা ও কার্য্যে এক না হইলে সতী হওয়া যায় না। তুমি এইরূপে সতী হইতে পারিতেছ না এজন্য দেখ তুমি কতই কাতর হইতেছ। এই অবস্থায় জপ রাখ, রাখিয়া একটু প্রার্থনা কর।

প্রথমেই দেবতা ও গ্রহাদির কাছে যুক্ত করে প্রার্থনা কর। প্লুতস্বরে বলিতে থাক "ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃশশী ভূমিসুতো বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি—রাহু—কেতু কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্"। প্লুতস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর দেবতাগণ ও গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হইবেন। একবার মন্ত্র উচ্চারণে মন কিছু সুস্থ হইবে তখন দুই চারিবার উহা জপ করিয়া লও। পরে একবার শ্রীদুর্গাকে স্মরণ কর—তিনি মা, তিনি দুঃখহারিণী, তিনি দয়াময়ী। তিনি সন্তানকে কখন ত্যাগ করেন না "কুপুত্রো জায়েত কচিদপি, কুমাতা ন ভবতি" কুপুত্র যদিবা হয় কুমাতা কখন নয়। তুমি বল "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং, আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা"। সূর্য্য উদয়ে কি অন্ধকার থাকে? মা দুর্গার নাম লইলে কি ব্যভিচার থাকে?

দুর্গা নাম দুই চারিবার ঐ মন্ত্রে জপ করিয়া লও। সতি! তুমি আরও সুস্থ হইবে। পরে প্রাতঃস্মরণীয়া ভগবৎপরায়ণা সতীদিগকে একবার স্মরণ কর। প্রথমেই অহল্যা। কর্ম্মদোষে পাষাণী হইয়া শতানন্দের মাতা, চিরকারীর জননী বড় ব্যাকুল হইয়া রাম নাম জপ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার কন্যা ব্যভিচারিণী হইয়াও রাম নাম জপ করিয়া আবার সতী হইয়াছিলেন। তুমি বল "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্।"

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী ইহারা কন্যা, ইহারা সকলেই সতী। ইহারা তোমার পাতক—মহাপাতক নাশ করিয়া দিলেন—তুমি বড় পবিত্র হইলে। তুমি স্বামীর সোহাগে কত সুখে থাকিবে ইহাতে উৎফুল্লা হও। তারপর তুমি মহাজনদিগকে একবার স্মরণ কর।

ইঁহারা পুণ্যশ্লোক। নলরাজা, রাজা যুধিষ্ঠির—ইহাদের স্মরণে তুমি আরও পবিত্র হইতেছ। শেষে সীতা আরও শেষে জনার্দ্দন রাম—তুমি বল

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

এই মন্ত্রপাঠ কালে অশোকবনে সীতার রাম-স্মরণ একবার ভাল করিয়া মনে করিয়া লও। শুভ প্রভাতে দেবতা, গ্রহ, সতী-লক্ষ্মী, মহাজন এবং অবতার স্মরণ করিয়া তুমি পাপমুক্ত হইলে, তুমি পুণ্য স্নান করিয়া পাপ-বিধৌত হইলে, এখন আপন কর্ম্ম করিতে পারিবে।

যাহা করিতে হইবে তাহার স্বরূপ একবার স্মরণ কর দেখি। মরি! মরি! কি মধুর তাঁহার রূপ—কি মনোমুগ্ধকর তাঁহার গুণ—কত সুমিষ্ট তাঁহায় বিশ্বরূপ —কি ঘনিষ্ঠ তাঁহার সম্বন্ধ তোমার সহিত। বেশ স্থির হইয়া বল—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীঃ সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

বুঝিতেছ এই সদ্‌গুরু কে? দেখ কেমন আনন্দময়, কেমন জ্ঞানময়মূর্ত্তি! আরও ভিতরে দেখ, ইনিই ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, ইনিই তোমার স্বামী, হাসিলে যে? দেখনা কেন—একটু ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে ইনি সুখ দুঃখ শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ভাবের অতীত, ইনি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নহেন—ক্ষুদ্রমূর্ত্তি যাহা তুমি দেখিতেছ তাহা কেবল তোমার সাধনার নিমিত্ত মায়ামানুষমূর্ত্তি, নতুবা ইনি গগন-সদৃশ—তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে ইঁহাকে ভিতরে অনুভব করা যায়—ইনিই আছেন আর যাহা কিছু দেখ তাহা ইঁহারই উপরে ইন্দ্রজাল—পরমশান্ত সাগর বক্ষে তরঙ্গমালা। ইনি মলাশূন্য, ইনি চলনরহিত, ইনিই তোমার সর্ব্ব কার্য্যের সাক্ষী, ইনি সত্ত্ব রজস্তমাদি ত্রিগুণরহিত, ইনিই সদ্‌গুরু, এস আমরা ইঁহাকে নমস্কার করি! হরি! হরি। গুরু স্মরণেই তুমি কেমন হইতেছ দেখ। দেখ দেখ কোথায় তোমার সংসার-বাসনা উড়িয়া গেল—দেখ দেখ তুমি কত সুন্দর হইলে—কতরূপ তোমার হইল—বেশ ভাল করিয়া কূটস্থ সূর্য্য মধ্যে লক্ষ্য রাখ—দেখ দেখ ভাব-রূপী পরব্রহ্মে প্রণব-রূপী শব্দব্রহ্ম কেমন বিজড়িত। এই প্রণব তোমার ধ্যানের বিষয়। এই সদ্‌গুরু মূর্ত্তি তুমি ভাল করিয়া ধ্যান কর। আহা! ইনি কত সুন্দর, দেখনা কেন ইঁহা হইতে কি সুধা

স্ফুরিত হইতেছে, কি চমৎকার সৃষ্টি হইতেছে—তুমি কত শান্ত হইতেছ দেখ, একবার বল—

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাৎ আনন্দস্যাম্বরেবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

আকাশ ও অবনীতলে ইঁহা হইতেই আনন্দকণা স্ফুরিত হইতেছে, সেই আনন্দ কণা সকলের জীবন, এই আনন্দ-ব্রহ্মকে নমস্কার কর।

আর এই সৃষ্টি—দেখ দেখি সৃষ্টি কাহার রূপ? দেখ দেখি বিন্দু স্থানে যাঁহার ধ্যান করিতে ছিলে তিনি কিরূপে সাজিলেন—একবার স্তব কর দেখি—একবার প্রণাম কর দেখি—

নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তর্ব্বর্ত্তিনে নমঃ।
অর্ব্বাচীন পরাচীন বিশ্বরূপায় তে নমঃ॥

অনিত্য নিত্যরূপায় সদসৎপতয়ে নমঃ।
সমস্ত ভক্তরূপয়া স্বেচ্ছয়া কৃতবিগ্রহঃ॥

তবনিশ্বসিতং বেদাস্তবস্বেদোখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষোদ্যৌঃ সমবর্ত্তত॥

নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যস্তব প্রভো॥

ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং
স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব।
ঈশত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং
নমোহস্তু ভুয়োহপি নমোনমস্তে॥

মতি! ভিতরে বাহিরে তোমারই প্রাণেশ্বর বর্ত্তমান। সর্ব্বদা বর্ত্তমান—আর কিছুইত নাই। যাহা এখনি দেখিতেছ তাহা দর্শন-কালেই অতীত হইয়া গেল। নদী যাহা দেখিলে তাহা নিমেষ-মুহুর্ত্তে সরিয়া গেল, তাহার স্থানে আর এক জলরাশি আসিল। প্রভাত কালে যাহা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সরিয়া গেল। কিছুই এখানে স্থির নাই। তোমার পতি মাত্রই স্থির। তাঁহার অঙ্গে আর সমস্ত চঞ্চল হইয়া স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাঁহার এই মূর্ত্তি যাহা তুমি দেখিতেছ তাহাকে অগ্রাহ্য করিওনা। "ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" বলিয়া মনে করিও না ব্রহ্মের রূপ নাই, ব্রহ্মের মূর্ত্তি

যাহা তাহাই কল্পনা মনে করিও না, ভাবিওনা মূর্ত্তি কল্পনা, এজন্য মিথ্যা, ব্রহ্মের মূর্ত্তি হইতে পারে না। কল্পনা ধাতুর অর্থ বিচার কর। 'কৃপ সামর্থ্যে'। কৃপ ধাতুর অর্থ সামর্থ্য। ব্রহ্মের রূপ-ধারণ করিবার সামর্থ্য আছে। ব্রহ্মের রূপ কে কল্পনা করিবে বল? তিনিই আপন শক্তিতে আপন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ভক্তের উপর কৃপা করিয়া তিনি স্বেচ্ছা-কৃত-বিগ্রহ ধারণ করেন। তাঁহার অনন্তনাম—তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তি—তাঁহার অনন্ত রূপ। গুরুমূর্ত্তি ইনিই, মন্ত্ররূপ ইষ্টদেবতা মূর্ত্তি ইনিই, অন্য কিছুই নাই! তুমি সাধক ভাবে থাকিয়া সর্ব্বদা পতি সেবা কর। দেখ কত সুন্দর ভাব তোমাতে আসিয়াছে।

এখন ত স্থির হইলে এখন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর। মনোযোগের সহিত আমার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার মিলনের জন্য চক্রে চক্রে প্রাণকে ধীরে ধীরে তুলিতে থাক, ফেলিতে থাক আর তোমার প্রাণেশ্বরের প্রিয় নাম জপ করিতে থাক। তোমার প্রাণেশ্বরের প্রিয় নাম প্রণব।

"ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্টং
তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি
প্রিয় নাম গ্রহণ ইব লোকঃ"

ওঁ এই অক্ষর পরমাত্মার ঘনিষ্ট নাম। প্রিয় নামে ডাকিলে লোকে কেমন সন্তুষ্ট হয় তাহাত জান। আদর করিয়া ডাকিলে লোকে যেমন সন্তুষ্ট হয় সেইরূপ এই নামে ভগবান্ আত্মাকে ডাকিলে প্রাণেশ্বর সেইরূপ প্রসন্ন হয়েন।

তুমি প্রাণেশ্বরকে ডাকিতে থাক। নিয়মপূর্ব্বক ডাক। ডাকিতে ডাকিতে তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্যই তোমার নিষ্কাম কর্ম্ম। তোমার চিত্ত যখন প্রসন্ন হইয়া গেল তখনই জানিলে তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন। নিত্য কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা প্রাণে অনুভব কর। যখন আনন্দরসে হৃদয় ভরিয়া গেল—যখন তাঁহার স্পর্শে স্পর্শে বিভোর হইলে তখন আর ডাকাডাকি নাই। কর্ম্মের পরাবস্থায় স্থির শান্ত হইয়া যাও।

ইহাতেই তোমার ভাবনা সিদ্ধি হইবে। ভাবনা সিদ্ধির পরে তত্ত্বমসির বিচার কর—আত্মা পরমাত্মার মিলনে তুমি জীবন্মুক্ত হও।

উপাসনা তত্ত্বে বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়।

স্বামী ও স্ত্রী ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তের পূর্ব্বে জাগ্রত হইয়া শয্যাকৃত্য সমাপন করতঃ বাহিরে আসিলেন। ক্রমে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া অভ্যাস মত স্নান যজ্ঞ সমাপন করিলেন। স্ত্রী আহার যজ্ঞের আয়োজনে গমন করিল আর স্বামী স্বাধ্যায় লইয়া রহিলেন। পরে যথা সময়ে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনান্তে সেবা শেষ হইল। তখন উভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া কথারম্ভ করিলেন।

স্ত্রী। তুমি ভিন্ন আমাকে আর কে জাগাইবে? সত্যই প্রাণাধিক কল্য এবং অদ্য আমি এক নূতন অবস্থা অনুভব করিলাম। অতি সুন্দর! এ তোমারই কৃপা। কোন প্রকার ধর্ম্মালোচনার পরেই অন্য কর্ম্ম না করিয়া একবারে একান্তে গিয়া তোমাকে পাইবার কার্য্য করিতে হয়। আমার মনে হয়, যে ইহা করে সেই সাধক। করিলেই একটা অপূর্ব্ব কিছু অনুভব করা যায়। কিন্তু সকল দিন ইহা থাকিবে কিনা জানিনা। যাহাতে থাকে তাহাই তোমাকে করিতে হইবে।

স্বামী। তাহারই জন্য এই আয়োজন। দেখ প্রাতঃকালেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন না হয় ততক্ষণ তুমি একটিও কথা কহিও না।

স্ত্রী। কেন ইহা বলিতেছ?

স্বামী। জাগ্রতের পরে নিদ্রা, নিদ্রার পরে সুষুপ্তি, সকল জীবেরই ইহা হয়। প্রকৃতি তখন পরমপুরুষে আত্মদান করেন। সপ্তঋষি শরীরে অধিষ্ঠিত। স্বপ্নকালে ইঁহারা সুপ্ত জীবের সহিত ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। করিলে দুই আর থাকেনা একটিতে স্থিতি হয়। এইটি 'আপনি আপনি' অবস্থা। অজ্ঞানের দ্বারাও সর্ব্ব জীবের এই অবস্থা লাভ হয়। কিন্তু সাধনা বলে সজ্ঞানে এই অবস্থা লাভই স্থিতি লাভ বা সর্ব্বোচ্চ উপাসনা।

সুষুপ্তির পরে যখন আবার জাগ্রত অবস্থায় জীব আসিতে থাকে তখন জীবের সমস্ত বাসনা, সমস্ত কর্ম্ম করিবার শক্তি গুলি যেন কোথাও আবদ্ধ থাকে। নিদ্রাভঙ্গের পর নানা কথা কহিলে আবদ্ধ স্থান হইতে প্রবল বেগে উহারা বাহিরে আসিতে আরম্ভ করে। একবার বাহিরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে আবার তাহাদিগকে ভিতরে লইয়া যাওয়া বড়ই ক্লেশ কর। আবদ্ধ জলরাশি যখন বহু পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহিরে ছুটিতে আরম্ভ করে তখন বহিঃপ্রবাহিত জল

রাশিকে আবার ভিতরে গুটাইয়া আনা যেমন অতিশয় কষ্টকর সেইরূপ চিত্ত হইতে বৈখরী শব্দরূপে যখন বাসনা গুলি প্রবল বেগে বাহির হইতে থাকে তখন তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করাও তেমন ক্লেশকর ব্যাপার। এই জন্য প্রাতঃকৃত্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন কথা কওয়া উচিত নহে। ঐ সময় পর্য্যন্ত মৌন থাকিতে অভ্যাস করা উচিত। আর যাহাতে মনের মধ্যে শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা কওয়া চলিতে থাকে তাহাই তখন করা উচিত। শয্যা-কৃত্যাদি করার পর হইতে প্রাতঃকৃত্যে বসিবার সময় পর্য্যন্ত নাম জপ মনে মনে রাখা উচিত। আর প্রতিনাম জপে শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া যেন তাঁহার চরণেই প্রণাম করিতেছি এই ভাবে প্রণামের সহিত জপ রাখা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত—ইহাও স্মরণ রাখা উচিত। বুঝিতেছ কেন কথা কহিতে নিষেধ করিলাম ?

স্ত্রী। বুঝিয়াছি। ঠিক তাই। এখন তুমি আমাকে প্রত্যহ তিন বেলায় যাহা করিতে হইবে তাহা আর একবার বল। কিন্তু এমন বিশদ ভাবে বলিতে হইবে যাহা স্ত্রীলোক হইয়াও আমি বুঝিতে পারি।

স্বামী। তুমি দেখিতেছি শিক্ষিতা মহিলাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে।

স্ত্রী। কেন এ কথা বলিতেছ ?

স্বামী। আজকাল স্ত্রীলোকেরা কি পুরুষ অপেক্ষা কিছু কম বোঝে ? তোমার কথা শুনিয়া তাহারা তোমাকে উপহাস করিবে না ?

স্ত্রী! তা করুক। উপহাস ত করিবেই। কিন্তু তাহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে যেমন উপহাস করে আর ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত আচার, ব্যবহার, আহার উপাসনা ইত্যাদি প্রথাকে যেমন কুসংস্কার বলে সেইরূপ তাহাদের নিজের আচার অনুষ্ঠানে, নিজের শিক্ষায় যদি তাহারা নিজেদের মনকে শান্ত করিতে পারিত এবং আপনি আচরণ করিয়া অন্যকেও মনের শান্তি কি করিয়া লাভ হয় তাহা শিক্ষা দিতে পারিত তবে তাহাদের মত আমিও সবই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম।

তোমার অনুগ্রহে আমি প্রাচীন শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। প্রাচীন শাস্ত্রের উপদিষ্ট সতীত্ব, পতি-নারায়ণ ব্রত আমি প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে শিখিয়াছি। নিত্যকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সংসার-ধর্ম্ম, জীব-সেবা-ব্রত পালন করা আমি বেশ করিয়া ধারণা করিয়াছি। করিয়াছি বলিয়াই আমি আপনাকে ধন্য মনে করি।

আজকালকার শিক্ষিতা মহিলারা আমাকে উপহাস করিলে কি হইবে, আমি জগন্মাতা শ্রীপার্ব্বতী, দেবাদিদেব মহাদেবকে বিজ্ঞানের সহিত যে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত যে অনুভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহার অনুকরণেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীপার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং
যথা তথা ব্রূহি তরন্তি যেন।

"যেন জ্ঞানেন জনাস্তরন্তি পুনর্জন্মাদি সংসারং ন প্রাপ্নুবন্তি তৎ সবিজ্ঞানং জ্ঞানং তথা ব্রূহি যথা যোষিদপি অহং ত্বদুক্তং জানামি।"

"যে জ্ঞান দ্বারা নরনারী জনন মরণরূপ সংসারে আর না পড়ে, অনুভবের সহিত সেই জ্ঞান এইরূপ করিয়া বলিতে হইবে যাহা স্ত্রীলোক হইয়াও আপনার কথায় তাহা বুঝিতে পারি।"

আজকালকার কোনও স্ত্রীলোক কি স্বামীর সঙ্গে এই সব কথা কয়? আমি তোমার প্রসাদে জগন্মাতার অনুকরণেই উপাসনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহাতে যে যাহা বলে বলুক. আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। তুমি বল।

স্বামী। প্রাচীন শাস্ত্রে তোমার শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইতেছি। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন তুমি সর্ব্বদা চিত্ত-প্রসন্নতা রূপ তাঁহার কৃপা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পার। তুমি যে উপাসনা-তত্ত্ব জানিতে চাও তাহা যতদূর সরলভাবে পারি আমি তাহা বলিতেছি, তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ কর।

স্ত্রী। ধৈর্য্য ধরিয়াই শ্রবণ করা উচিত। তুমি বোধ হয় বড় ঘরের মেয়েদের অধৈর্য্যের কথা এখানে মনে করিয়া বলিতেছ। সত্যই কোন ভাল কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, ইহারা ভাল কথার উপরে নানা অসম্বন্ধ প্রলাপ তুলিবেই আবার যাঁহারা দুই চারিখানা পুস্তক অনায়াসে পড়িয়া ফেলিয়াছেন তাঁহাদের ধৈর্য্য রক্ষাত প্রায়ই অসম্ভব। আমি কোন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিব না। কোন চপলতা করিব না। ধৈর্য্য ধরিয়াই শুনিব। তুমি বল। উপাসনা সম্বন্ধে যে যে বিষয় বলিবে তাহা অগ্রে বলিয়া দাও।

স্বামী। বেশ কথা। উপাসনা সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবতারণা করিব।

(১) উপাসনা কি 'জোর' করিয়া করাইতে হয় অথবা উপাসনা আপনা

হইতে হয়? অর্থাৎ উপাসনা কি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম না উপাসনা একটা অস্বাভাবিক বিড়ম্বনা?

(২) উপাসনা করিতে হইবে কার? উপাস্য বস্তুটির স্বরূপ কি?

(৩) উপাসনা করিতে হইবে কিরূপে? উপাসনা ব্যাপারের প্রধান কার্য্যটি কি? এবং উপাসনার প্রধান কার্য্যটি সুন্দর মত করিতে হইলে আনুসঙ্গিক কোন্ কোন্ কার্য্য করিতে হইবে? অর্থাৎ কিরূপভাবে কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে উপাসনা করার অবস্থায় আমরা পৌঁছিতে পারি এবং কিরূপ কার্য্য করিলে উপাসনা হইতে পারে না তাহার আলোচনা।

(৪) উপাসনা দ্বারা আমাদের কি প্রাপ্তি হইবে?

স্ত্রী। দেখ এইগুলি জানিলে আর আমার জিজ্ঞাস্য কিছুই থাকিবে না। এইগুলি তুমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দাও। আমি উপাসনার জন্য প্রাণপাত করিয়াও জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিব। আর বোধ হয় যাহারা ভাল হইতে চায় তাহারা সকলেই আমার মত চেষ্টা করিবে। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। কল্য আবার আরম্ভ করিও। এখন সায়ংসন্ধ্যার সময় আসিতেছে।

প্রচোদয়াৎ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে যে চারিটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রথমটির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।* এখন উপাসনায় আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে আমরা অগ্রে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

বলা হইল উপাসনা স্বাভাবিক। উপাসনা সকলকেই করিতে হয়। তবে যাহাদের রজস্তম প্রবল তাহারা বিষয়ের উপাসনা করে। কিন্তু রজস্তমকে যাঁহারা বশীভূত করিতে পারেন, যাঁহারা রজস্তম বশীভূত সত্ত্বগুণ লাভ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়াই থাকিতে পারেন না।

ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়। উপাসনার প্রথম প্রাপ্তি মিলন-সুখ, দ্বিতীয় প্রাপ্তি চিরদিনের জন্য স্থিতি।

---

* কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "উপাসনা স্বাভাবিক" দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র যাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলেন তাহা রজস্তমকে অধঃকৃত করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণে মগ্ন হওয়া। সত্ত্বগুণ প্রকাশকাত্মক, সত্ত্বগুণ আনন্দ পূর্ণ। প্রকাশ যাহা তাহাই পরম প্রকাশে মিশিতে পারে। খণ্ড আনন্দই অখণ্ড আনন্দে প্রবেশ করিয়া অখণ্ড ভাবে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উপাসনার অঙ্গীভূত ধর্ম্ম অর্থ কাম সাধনায় পূর্ণানন্দ স্বরূপ মোক্ষলাভ হয়। কিরূপে ইহা লাভ হয় সেই কথা আমরা আলোচনা করিতেছি।

উপাসনা করিলে তিনি কিরূপে আমাদিগকে আমাদিগের গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করেন তাহা অগ্রে বুঝিতে হয়। বুঝিবার সময় প্রচোদয়াৎটি অগ্রে কিন্তু প্রত্যক্ষের সময় বা কার্য্যের সময় ইহা শেষে এবং বিগ্রহে ধীমহি অগ্রে। সন্ধ্যা বন্দনাদি উপাসনার কার্য্য করিলে শ্রীভগবান্ আমাদিগকে দুঃখনিবৃত্তিতে যে প্রেরণ করেন ইহা যখন আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, ইহাতে আমাদের লাভ কি হয় তাহা যখন বিশেষ রূপে জানিতে পারি তখন উপাসনা কার্য্যে আমাদের বিলক্ষণ উদ্যম জাগে। উদ্যম জাগাইবার জন্য শেষের কথা অগ্রে বলা হইতেছে।

তাঁহাকে জান, জানিয়া ধ্যান কর। করিলে প্রথম লাভ হইবে ধর্ম্ম। পরে অর্থ। পরে কাম। এবং সর্ব্বশেষে মোক্ষ।

ঈশ্বরের জন্য আমি, আমার জীবন, আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসার। আমার সকল প্রকার কর্ত্তব্যই ঈশ্বরকে লইয়া। এইটি যাঁহার হয় তাহাকে আমরা ধার্ম্মিক বলি। ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহাদের কর্ম্মকে আমরা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলি। এই কর্ম্ম গুলিই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত কর্ম্ম। শাস্ত্র সর্ব্বত্রই বর্ণাশ্রম মত কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত কর্ম্ম করাই স্বধর্ম্মে থাকা, শাস্ত্র ইহা বলেন। এই জন্য ভগবান্ মনু হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সংহিতাকারই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমেই বিশ্বাস। জীব! বিশ্বাস কর তোমার এক জন নিয়ন্তা আছেন। বিশ্বাস কর ঈশ্বর আছেন, তিনি রক্ষা কর্ত্তা। বিশ্বাসে ঈশ্বরকে ভাল বাস। তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া ধর্ম্ম কর। পরোপকার, জীবে দয়া, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা যখন ঈশ্বর প্রীতি লাভের জন্য করা হয় তখনই ধর্ম্ম হইল আর লাভ হইল চতুর্ব্বর্গের প্রথম বর্গ। বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম গুলি যখন স্বাভাবিক হইয়া গেল তখন যাহাকে যথার্থ ধর্ম্ম বলা হয় তাহাই লাভ হইল।

ধর্ম্ম দ্বারাই অর্থ লাভ হয়। বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য

করিলে যে সমস্ত অধিকারী ধন ইচ্ছা করেন তাঁহাদের ধনও লাভ হয়। আর তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি বলিয়া ঈশ্বর প্রীতিতে হৃদয় ভরিয়া থাকে। ইহাই হইল প্রকৃত অর্থ বা পরমার্থ। ঈশ্বর প্রীতি অনুভবের জন্য যখন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় তাহা অপেক্ষা আনন্দ আর কোথায় আছে? লোকে অর্থ চায় আনন্দের জন্য। সেই আনন্দই যদি লাভ হয় তবে তাহাত অর্থ বটে। শুধু অর্থ নহে তাহা পরমার্থও বটে।

সকল কর্ম্মে সকল বাক্যে সকল ভাবনায় যখন ঈশ্বর স্মরণ হইল, যখন ঈশ্বরের জন্য ভাবনা বাক্য ও কর্ম্ম হইতে লাগিল তখন চিত্তপ্রসন্ন হইল। চিত্তের প্রসন্নতাই চিত্তশুদ্ধি। যেখানে চিত্তশুদ্ধি সেখানে সত্বগুণের আধিক্য জাগিবেই। সত্বগুণে হৃদয় ভরিয়া গেলে ঈশ্বর ভোগের যে ইচ্ছা তাহার নাম কাম। সর্ব্বদা ঈশ্বর লইয়া থাকিব, সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিব, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কথা কহিব, সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিব এই যে কাম ইহাই হইল অনৃশংস কাম। ঈশ্বর ভাবে হৃদয় পূর্ণ হওয়া তারপরে তাঁহার দর্শন স্পর্শন ভোগ হওয়া এসব যাঁহার হইতে লাগিল তাঁহার জ্ঞান হইতে বাকী থাকিবে কেন? জ্ঞান লাভ হইলেই ত সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটিবেই! ইহাই চতুর্ব্বর্গ পথে প্রেরণা। উপাসনা দ্বারা এই জন্য সর্ব্বদুঃখশূন্য অবস্থা আসিবেই। এখন আমরা প্রচোদয়াৎ যদ্দ্বারা হয় তাহার কথা বলিব।

বিদ্মহে।

স্বামী। বিদ্মহে, ধীমহি, প্রচোদয়াৎ এই তিনটির ভিতরে উপাসনার সমস্ত কার্য্য ও তাহার ফল ঋষিগণ রাখিয়া দিয়াছেন। বুঝিলেই দেখিতে পাইবে।

স্ত্রী। তিন বেলায়ত গায়ত্রী জপ করিতে হয়। কিন্তু বিদ্মহে, ধীমহি, প্রচোদয়াৎ ইহাদের অর্থত কৈ কেহ বলিয়া দেয় নাই।

স্বামী। আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগের যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা শুধু বিশ্বাসের উপর চলিতেছে। বিশ্বাসে শুধু মানিয়া লইয়া কার্য্য করা হয়। কিন্তু

কর্ম্ম করিতে করিতে বিশ্বাস যখন অনুভবে পরিণত হয় তখন কার্য্য সিদ্ধি হয়। বুঝিয়া কর্ম্মটি না করা পর্য্যন্ত বিশ্বাসটি অনুভবে দাঁড়াইবে না।

স্ত্রী। আমাদের দেশের প্রায় স্ত্রীলোকেরা বিশ্বাস লইয়াই থাকে সত্য কিন্তু আমিও ত স্ত্রীলোক। আমি জানি কত সহজেই কপট ধার্ম্মিকেরা আমাদিগকে ভুলাইয়া আমাদের দ্বারা তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারে। লোকে যেমন বুঝাইয়া দেয় আমরা সেইরূপ বুঝি বলিয়াই বিপদে পড়ি। এখন তুমি বুঝাইয়া দাও বিদ্মহে কি?

স্বামী। বিদ্মহের অর্থ "এস আমরা জানি"।

স্ত্রী। "আমরা" কেন?

স্বামী। আমরা বলায় বাধা কি?

স্ত্রী! সদ্দার পড়ুয়া যেমন এঁকের পিঠে এক এগার বলিলেই আর সবাই তাই বলিয়া উঠে, ধ্যান কি আর তেমন করিয়া হয়? সকলের সঙ্গে কি ধ্যান হয়? স্বামী সঙ্গ যখন পাঁচজনের সঙ্গে হয় না তখন জগৎ স্বামীর সঙ্গ কি 'পড়তা' লোকের সঙ্গে হয়? তাই বলিতেছিলাম একা বসিয়া পূজা করিতেছি তার মধ্যে কেন বলা হয় এস আমরা জানি, এস আমরা ধ্যান করি?

স্বামী। যাহারা নিতান্ত শিশু প্রকৃতির মানুষ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য লোক সঙ্গে ধ্যানের অভিনয়ের মত একটু কিছু করা যাইতে পারে কিন্তু আমাদের জাতির উপাসনার ধ্যান ঐ ভাবে হয়না। একা বসিয়া উপাসনা করিবার সময়ও বলিতে হয় এস আমরা জানি; এস এস আমরা ধ্যান করি।

স্ত্রী। "বিদ্মহে" যখন উচ্চারণ করি তখন আমার সঙ্গে আর কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করিতে হয়?

স্বামী। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, বাক্য, পায়ু, উপস্থ এই সমস্তই শক্তি। শরীরের পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্র অবলম্বন করিয়া ইহারা কার্য্য করে। আবার চৈতন্যকে লইয়াই শক্তি স্পন্দিত হইতে সমর্থ হয়। কাজেই যেখানে শক্তি জড়িত চৈতন্য সেইখানেই ব্যক্তির অভিব্যক্তি। এইজন্য একজন মানুষের মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় যত গুলি আছে সকলগুলিরই পৃথক্ সত্তা আছে। ইন্দ্রিয়গুলি তবে মানুষের ভিতর মানুষ। পূজার স্থানে বসিয়া তোমার সকল ইন্দ্রিয়কে সম্বোধন করিয়া বল দেখি, এস আমরা জানি—'বিদ্মহে'; করিয়া দেখ ক্ষণকালের জন্যও কোন্ অবস্থা

তোমার লাভ হয়। আরও আমি যেমন দুঃখী আরও কত লোক এইরূপ দুঃখী আছে। আমার আমিটার সঙ্গে বহু দুঃখীজনকে মানসে আনিয়া সকল দুঃখীজনের জন্যও যদি ভগবানকে ডাকা যায় তবে প্রাণটা শীঘ্রই জাগিয়া উঠে।

স্ত্রী। সত্যই ত হয় কিছু। এই করিলে সকল ইন্দ্রিয় যেন প্রবুদ্ধ হইয়া কি খুঁজিতে থাকে। আচ্ছা এস আমরা শ্মশানবাসিনীকে জানি—ইহাতে কি চিন্তা আসিবে?

স্বামী। সকলের চক্ষু অনুভব করে বিষয়ের রূপ, সকলের কর্ণ অনুভব করে বাহিরের শব্দ ইত্যাদি। আমার চক্ষু কর্ণাদি সকলের চক্ষু কর্ণাদির সহিত যেন মিলিয়াছে—ইহাদিগকে ডাকিয়া বল এস আমরা শ্মশানবাসিনীকে জানি। ইহাতে সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্মশান বাসিনীর দিকে ফিরান হইতেছে। চক্ষু তাঁর রূপ দেখ, কর্ণ তাঁর নাম শুন ইত্যাদি। আর তোমরা অন্তরেন্দ্রিয়! তোমরা মন, বুদ্ধি ইত্যাদি! তোমরা তাঁহার রূপ গুণ লীলা জান; তিনিই যে আত্মা তাহাও জান; তিনি যে অব্যক্তভাবে বিশ্বরূপে রূপ মিশাইয়া আছেন তাহাও জান এবং তিনিই যে আবার নির্গুণভাবে 'আপনি আপনি' তাহাও জান। এখন বুঝিতেছ 'শ্মশানবাসিনৈ বিদ্মহে' বলিলে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় কোন্ ভাবে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল?

স্ত্রী। বড় সুন্দর। যখন সাধক আপনার ভিতরে আপনাকে ভাবে, যখন দেখে আপনার হৃদয়ের ভিতরে আমি নামক জীব অসৎ সঙ্গে পড়িয়া কি হইয়া কাহার ভয়ে কি সাজিয়া আছে, যখন দুষ্ট সঙ্গে জীবের পাপ স্মরণ করে, যখন নিজের অকথ্য যাতনা অনুভব করিয়া কাতর হয়, যখন জীবের অনভিলষিত কর্ম্ম দেখিয়া ব্যথিত হয়, যখন নিজের কয়েদীর মত অবস্থা দেখিয়া বড়ই ছট্‌ফট্ করে—তখন অন্য কেহ তাহার আশ্রয় দাতা নাই জানিয়া, অন্য কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেনা জানিয়া জীব উপাসনার জন্য প্রস্তুত হয়। গুরু বাক্য মত সাধক তখন কাতর প্রাণে নিত্য কর্ম্ম করিতে থাকে, করিয়া যখন রজস্তমকে পরাভূত করিতে পারে, তখন সত্ত্বগুণের উদয় হইতে থাকে। এই অবস্থায় সাধক বুঝিতে পারে ঈশ্বরকে না ডাকিয়া জীব থাকিতে পারে না। উপাসনা 'খোসামুদি' নহে—উপাসনা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহার উপাসনা করিতে যাইতেছি তাঁহাকে যদি না জানি তবেত উপাসনা হইতেই পারে না। এইজন্য প্রথমেই 'বিদ্মহে' বলা হয়। তুমি বিশেষরূপে বল—তাঁহাকে জানাটি কিরূপ?

স্বামী। সত্যই উপাস্যকে জানা চাই। অনেকে উপাস্যকে জানেনা এবং জানিতেও চাননা। তাঁহাদের মতে বিশ্বাস করিলেই সকলই সিদ্ধ হয়। বিশ্বাসে যে জানা হয় তাহা শ্রবণ হইতে জন্মে কিন্তু যাহা শ্রবণ মাত্র করিয়াই বিশ্বাস করা যায় বা মানিয়া লওয়া যায় তাহাতেই সব হয় না; কিছু হয় সত্য। বিশ্বাস ত করাই চাই কিন্তু তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইলে মনন দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধেও সন্দেহ শূন্য হওয়া চাই। শ্রুতি গায়ত্রী উপাসনার প্রথম কার্য্য বলিতেছেন "বিদ্মহে"। এস আমরা তাঁহাকে জানি। ব্রাহ্মণের গায়ত্রীতে "বিদ্মহে" কথাটি নাই কিন্তু "বিদ্মহে" এই বাক্য দ্বারা যাহা জানা আবশ্যক তাহা দেওয়া আছে। কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রাহ্মণেতর যিনিই হউন না কেন, কুল মন্ত্রে সকলকেই 'বিদ্মহে, ধীমহি ও প্রচোদয়াৎ' ইহা বলিতে হয়।

ভারতবর্ষে ঋষিগণ যে উপাসনা পদ্ধতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সম্পূর্ণ উপাসনা আর কোন জাতির মধ্যে আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

উপাসনার মূল অংশই হইতেছে 'বিদ্মহে'। এস আমরা তাঁহাকে জানি, জানিয়া ধ্যান করি, ধ্যান করিয়া অনুভব করি কেমন করিয়া তিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম অর্থ কাম কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পথে প্রেরণা করেন।

স্ত্রী। সেই জন্যইত জিজ্ঞাসা করিতেছি যাঁহার উপাসনা করিতে যাইতেছি তাঁহাকে জানা চাই। যাঁহাকে না জানি তাঁহার উপাসনা হইবে কিরূপে? বিশ্বাসে যাহা হয় তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে শ্রবণ মনন ধ্যানের সাহায্য চাই। তিনি কে, তাঁহাকে জানিতে হইলে কি করিতে হইবে তাহাই তুমি বল। আর এক কথা আমার মনে হয় জগতে লোকে চিরদিন এক পরমেশ্বরকেই উপাসনা করে। সকল যুগেই উপাস্য বাস্তটি এক। কিন্তু এই "বিদ্মহে" কথাটি বুঝিতে চায়না বলিয়া এক ঈশ্বরকে লোকে বহু করিয়া ফেলিয়াছে, এক ঈশ্বর একই আছেন, কিন্তু মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া তাঁহাকে বহু ভাবে বুঝিলে নানা প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে। এই ভারতে বহু সম্প্রদায় আছে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পল্লবাদি যেমন বৃক্ষের সজীবতার লক্ষণ, ধর্ম্মের বহু সম্প্রদায়ও সজীবতার লক্ষণ কিন্তু যখন তাহারা নানাবিধ বিরুদ্ধ মত সৃজন করে তখন এক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরকে অন্য সম্প্রদায়ে মানিতে চায় না। বেদান্তের ব্রহ্মকে ভক্ত ঈশ্বর বলিতে চায় না। আবার শাক্তের ঈশ্বরকে বৈষ্ণব মানিতে চায়না আবার বৈষ্ণবের

ঈশ্বরকে শাক্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। ভারতের বাহিরেও এইরূপ বিবদমান কত সম্প্রদায় যে ধর্ম্ম লইয়া মারামারি করিতেছে তাহাও ত তোমার মুখে শুনিয়াছি। তুমি এখন "বিগ্রহের" অর্থটি বুঝাইয়া দাও ; এবং বলিয়া দাও যে সকল মানুষের উপাস্য যিনি তিনি একই বস্তু।

স্বামী। উপাস্যকে জানিলেই তুমি বুঝিবে উপাস্যটি এক। কিন্তু তাঁহার নাম ও রূপ অনন্ত। মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন। সেই এক পুরুষই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে উদয় হয়েন মাত্র। যেমন এক ব্যক্তিই কাহারও পিতা, কাহারও সখা, কাহারও স্বামী, কাহারও পুত্র, কাহারও প্রভু সেইরূপ এক ঈশ্বরই নানা ভাবে লোকের মধ্যে প্রকট হয়েন। নানা লোকে নানাভাবে সেই এক জনকেই ভজনা করেন।

স্ত্রী। তাঁহাকে যে ভাবে জানিতে হইবে তাহাই তুমি বল।

স্বামী। এক পরমেশ্বরই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার এবং আত্মা। যিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। চিৎ স্বরূপ যিনি তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

স্ত্রী। চিৎ, আনন্দ, সৎ এই গুলি ত বিশেষণ। তবে নির্ব্বিশেষ কিরূপে?

স্বামী। চিৎ অর্থে জ্ঞান। আমরা জ্ঞান অর্থে যাহা বুঝি জ্ঞান স্বরূপ অর্থে তাহা নহে। জ্ঞান অর্থে আমরা বুঝি কোন বস্তু থাকিলে সেই বস্তুর জ্ঞান হয়। কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি "কোন বস্তু নাই তথাপি শুদ্ধ জ্ঞানটি"।

স্ত্রী। ইহা কি মানুষের অনুভবে আইসে? বস্তু নাই অথচ জ্ঞান ইহা কি?

স্বামী। হাঁ—অনুভবে আনিতে হইলে প্রবল সাধনা চাই। কিন্তু প্রতিদিন মানুষ সুষুপ্তিতে এই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করে। মহাপ্রকৃতি প্রতিদিন জীবকে জ্ঞান স্বরূপে স্থিতি লাভ করায়। জীব অজ্ঞান পূর্ব্বক সেই একে, সেই 'আপনি আপনি' ভাবে—সুষুপ্তিতে স্থিতি লাভ করে। সাধনা দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারিলে সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছে।

স্ত্রী। সুষুপ্তিতে এক পুরুষেই স্থিতি লাভ করে কিরূপে? ইহা অনুভব দ্বারায় কি জানা যায়?

স্বামী। যায়। যখন তুমি জাগ্রত তখন যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে তুমি জড় না চেতন? সকলেই বলিবে আমি চেতন। বাস্তবিক চৈতন্য বস্তুটি

জাগ্রৎ কালে সমস্ত দেহটি ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া জড় দেহটাকে চেতনের মত বোধ হয়।

অতি ক্ষুদ্র কীটও যদি দেহের উপর দিয়া চলিয়া যায় মানুষ তাহা অনুভব করিতে পারে। এই মানুষ আবার যখন নিদ্রা যায় তখন নিজ দেহে ক্ষুদ্র কীটের গতি অনুভব করে না। কেন করে না? জাগ্রৎ কালে যে চৈতন্য দেহ ব্যাপিয়া বিরাজ করেন তিনিই স্বপ্ন কালে জড় স্থূল দেহ হইতে আপনাকে গুটাইয়া লয়েন। লইয়া সংস্কার সমূহে বিরাজ করেন। তাই স্বপ্নের বস্তু অনুভূত হয় কিন্তু দেহের কোন কিছু অনুভব হয় না। স্বপ্নের পরে সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে চৈতন্যপুরুষ স্বপ্নের সংস্কার হইতে আপনাকে গুটাইয়া লয়েন। লইয়া আপন অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপে মিলিত হইতে থাকেন।

দেহ ব্যাপী যে চৈতন্য তিনি স্ব স্বরূপে অখণ্ড হইলেও দেহ ব্যাপী বলিয়া খণ্ড চৈতন্যরূপে থাকেন। এই খণ্ড চৈতন্য যখন অখণ্ড চৈতন্যে মিশিয়া যান তখন দুই থাকে না। এক ভাবেই স্থিতি হয়। সে সময় স্থূল জগৎ নাই, স্থূল দেহ নাই, মনোময় সূক্ষ্ম জগতও নাই, কোন কিছুই নাই; যিনি থাকেন তিনিই 'আপনি আপনি' ভাবে আছেন, তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। "স্বরূপ" কথা দ্বারা সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হয়।

জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, নিত্য বস্তুটি 'আপনি আপনি'। ইহারই শক্তিটি আত্মমায়া। নির্গুণ যিনি তিনিই আত্মমায়া দ্বারা সগুণ হয়েন। যখন সগুণ হয়েন তখন তিনিই আপনাকে বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত করেন। আবার মায়িক জগতের বিপ্লব উপস্থিত হইলে ইনিই ভক্ত চিন্তানুসারে কালী দুর্গা শিব রাম কৃষ্ণাদি অবতার রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। আবার এই পুরুষই আত্মা রূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করেন।

স্ত্রী। তুমি আরও অনেকবার এই কথা বলিয়াছ বটে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে আত্মাকে লোকে আমি আমি করিয়া লক্ষ্য করে সেই আত্মাই কি সেই সনাতন, অজ, অবিনাশী পরম পুরুষ? এই আত্মাই সেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্? এই আত্মাই সমকালে সগুণ, নির্গুণ ও অবতার?

স্বামী। হাঁ। এই আত্মাই স্ব স্বরূপে নির্গুণ মায়া অবলম্বনে সগুণ ও ভাবনা রাজ্যে অবতার। যিনি দেহ দ্বারা যেন খণ্ডমত তিনি জীব চৈতন্য। ভাবনা রাজ্যে অবতার ভজনা করিয়া তিনিই অবতার। অব্যক্তভাবে তিনি সর্ব্বব্যাপী

সগুণ ব্রহ্ম। আবার সর্ব্বশূন্য হইয়া তিনি 'আপনি আপনি' ভাবে নিগুর্ণ ব্রহ্ম। দেখ বহু শাস্ত্র কোটি কোটি প্রমাণে ইহা দেখাইয়াছেন। দুই চারি কথায় ইহা তুমি বুঝিবে না। উপাসনার জন্য এই পুরুষকে যেরূপে অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। পরে সাধনা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রী। জীবাত্মাই যে পরমাত্মা—ইহার আভাস যদি একটু দাও তবে আমার মনটা সন্দেহশূন্য হইয়া পূর্ণ বিশ্বাসে কার্য্য করিতে পারে।

স্বামী। আচ্ছা। যে চৈতন্যকে আমি আমি লোকে করে তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলেন, শ্রুতির সেই মন্ত্রই গীতাতে পাওয়া যায়। শ্রুতি ও গীতা জীবাত্মা সম্বন্ধে বলেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"। আচ্ছা বল দেখি আমি জীবাত্মা, আমি জন্মি নাই, আমার মরণও নাই—শ্রুতি ত এই কথা বলেন—তবে যখন মানুষ বলে আমার জন্ম স্থান 'অমুক' দেশ, আমার পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে—যাঁহার জন্ম নাই, যিনি জন্মেন নাই তাঁর আবার জন্ম স্থান 'অমুক' দেশ, তার আবার পিতা মাতা সংসার এসব তবে কি? প্রকৃত পক্ষে তিনি জন্মেন নাই, তিনি মরেন নাই, তিনিই তিনি। সর্ব্বদাই তিনি 'আপনি আপনি' ভাবে স্থিতি লাভ করেন। কেবল ভ্রম জ্ঞানে রজ্জুকে যেমন সর্পভাবে দেখা হয়, স্থানুকে যেমন মানুষভাবে দেখা হয় সেইরূপে সেই 'আপনি আপনি' পুরুষকে জন্মিলেন, মরিলেন, সংসারী হইলেন এইভাবে দেখা হয়। আত্মাশ্রিত ভ্রম জ্ঞানেই ইহা হয়। দেখিতেছ না জীবাত্মাই কিরূপে অধিষ্ঠান চৈতন্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ?

স্ত্রী। ভাল করিয়া ধারণা করিতে না পারিলেও বুঝিতেছি এইটি তত্ত্ব কথা। সাধনা করিতে করিতে যদি কখন উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারি তখন এই সমস্ত ভাল করিয়া বুঝিব। এখন তুমি বল, যিনি সমকালে নিগুর্ণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা তাঁহাকে যে উপাসনা করিব তাহা কোথা হইতে আরম্ভ করিব?

স্বামী। ইহাই তোমার প্রয়োজন। বিগ্রহের পরে ধীমহি। ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে যখন বুঝাইব তখন সেই কথা বলিতেছি। কিন্তু বিগ্রহের সম্বন্ধে আর কি কোন সন্দেহ আছে?

স্ত্রী। যে যাহা কেন উপাসনা করুক না যদি বুঝিতে পারে অন্ততঃ বিশ্বাসেও জানে যে তাহার উপাস্য বস্তুটিই আত্মা, এইটিই যুগে যুগে স্থূল জগতে মূর্ত্তি ধরিয়া সকলের চক্ষুগোচর হয়েন এবং সর্ব্বকালেই ইনি চিত্ত-জগতে মূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থান

করেন, সাধনা দ্বারা চিত্ত-জগতে উঠিতে পারিলেই ইহাকে পাওয়া যায়; আবার চিত্তাকাশে স্থায়ীরূপে পাইতে পারিলেই ইহাকে স্থূলেও পাওয়া যায়; এই পুরুষই আবার সর্ব্বদা বিশ্বরূপে অব্যক্তভাবে আছেন আবার এই পুরুষই দৃশ্য দর্শন রূপ ভ্রমজ্ঞানশূন্য হইয়া, মায়াকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা স্ব স্বরূপে 'আপনি আপনি' ভাবে সর্ব্বকালে স্থিতিলাভ করিয়া আছেন—উপাসনা কালে এইগুলির আভাসও যদি হৃদয়ে আলোচনা করা যায় তবে আর জগতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন বিরোধ থাকে না। সকলেই বুঝিতে পারে এক পরমেশ্বরকেই সকলে উপাসনা করে। একজনের পরমেশ্বর আর একজনের পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন। তবে যে নামরূপে বা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় সেটা কেবল ভক্তের প্রকৃতি গত পার্থক্য অনুসারে। যেমন এক সূর্য্যের ছায়া লাল জলে লাল, কাল জলে কাল, নীল জলে নীল—সেইরূপ। এইত ?

স্বামী। তোমার বুদ্ধি খুলিয়াছে। এখন "ধীমহি" কিরূপে করিতে হইবে. তাহা শ্রবণ কর।

স্ত্রী। আজ সায়ংসন্ধ্যার কাল উপস্থিত হইয়াছে। সূর্য্যাস্ত হইতে আর অল্পই বাকী আছে ? এখন আহ্নিক করিতে যাই। কাল আবার আরম্ভ করিও।

ছাইভস্ম।

কেমন খেয়াল দু'পয়সার যোগাড় করিতে পারিলেই ভারতের অতীত, অতি প্রাচীন, গৌরবের স্থান দেখিতে ইচ্ছা জাগে। সংসারে আমার বিশেষ কোন বন্ধন নাই। অতি শৈশবে পিতার মৃত্যু হয়, তাঁহার মুখ আর এখন মনে পড়ে না। তাহার পর কতকষ্ট, কত দুঃখ গিয়াছে, তাহাও এখন আর সর্ব্বদা মনে পড়ে না; বর্ত্তমানে তত কষ্ট নাই, সুতরাং অতীত দুঃখের কথা সর্ব্বদা মনে জাগে না। স্নেহময়ী জননী একমাত্র বন্ধন ছিলেন। তিনিও স্বর্গে গিয়াছেন। আমার শেষ বন্ধন ছিঁড়িয়াছে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ

ভ্রাতা আছেন, ভ্রাতৃবধূরা আছেন। তা তাঁহাদের জন্য আমার কোন বিশেষ ভাবনা নাই, কারণ তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট নাই। আমি অবিবাহিত,—সুতরাং নূতন বন্ধন কিছু সৃষ্ট হয় নাই। সংসারের মান প্রতিপত্তি আমার বন্ধন নহে, কারণ, তাহা আমি বড় একটা চাহি না। এমন বন্ধন শূন্য অবস্থায় ইচ্ছামত স্থানে যাতায়াতের প্রতিবন্ধক আমার বিশেষ কিছু নাই। এক অভাব অর্থের। তা দিন আনি দিন খাই। ইহারই মধ্যে যদি কিছু কষ্টে জমাইতে পারি তাহা লইয়াই বাহির হইয়া পড়ি। কোথায় যাইব, কাহার আশ্রয়ে থাকিব, এই ভাবনা কখনও করি নাই, কষ্টও কখন পাই নাই। সোনার ভারত এখনও অতীত আতিথেয়তা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সুবিমল স্রোতে এখনও ভারতের সকল গৌরব ভাসিয়া যায় নাই,—এখনও ভারতে প্রকৃত ভারতবাসী আছেন, বিদেশী দেখিলে এখনও ভারতবাসী আশ্রয় দিয়া থাকেন। প্রার্থনা করি, ভগবান্ ভারতের এই শেষ গৌরব টুকু কাড়িয়া লইবেন না। সকলইত গিয়াছে, দরিদ্রের এই শেষ অবলম্বন যদি তিনি কড়িয়া লয়েন তবে কি লইয়া আর এই শ্মশানে থাকিব ?

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। অযোধ্যা দেখিতে গিয়াছিলাম। ষ্টেসনে নামিয়া কোথায় যাইব ভাবিতেছি এমন সময় পাণ্ডা মহাশয় আসিলেন। অযোধ্যায় আমি এই নূতন আসিয়াছি। অযোধ্যা চিনি না। পাণ্ডার আগমনে নিশ্চিন্ত হইলাম। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেসন হইতে বাহির হইলাম। তখনও রাত্রি আছে। অদূরে, নৈঋত কোণে, তালগাছের মাথার উপর চাঁদ হাসিতে ছিলেন। চাঁদের আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত। শান্ত, উজ্জ্বল, গম্ভীর, আলোক। আকাশে নক্ষত্র বড় একটা ছিল না। একটু একটু শীত বোধ হইতেছিল। পাণ্ডা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিকালেই বাসায় যাইবার জন্য বাহির হইব, কি রাত্রি প্রভাতে যাত্রা করিব ? 'মুসাফের খানায়' থাকিবার কষ্ট দেখিয়া রাত্রিকালেই বাহির হইলাম। বিদেশ বলিয়া বড় একটা ভয় হইল না। কারণ সঙ্গে মালপত্র টাকা কড়ি বিশেষ কিছু ছিল না। জীবনের ভয়, তা বোধ হয় নাই। মরণের ভয় কাহার হয় ? যাহার বন্ধন আছে তাহারই মরণে ভয় হয়—মরিলে প্রিয়জনকে দেখিতে পাইব না, স্নেহের পুত্তলি কষ্ট পাইবে, এই মমতা যাহার আছে মরণে ভয় তাহার হয়। আমার প্রিয়জন কেহ নাই, মরণ হইলে আমি কোন ক্ষতি মনে করি না। আর পাপীর মরণে ভয় হয়। আমি

পাপ করি নাই এমত কথা বলিতেছি না। তবে পাপী হইলেও মরণে আমি ভীত নহি; কারণ, কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, ইহ জীবনেই হউক আর পরজীবনেই হউক—যে জীবনেই হউক ভোগ যখন করিতেই হইবে তখন আর তাহাতে ভয় করিয়া লাভ কি?

ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া, আম্রকানন সমীপে দাঁড়াইয়া স্থির মনে চাঁদের পানে চাহিলাম। অতি সুন্দর দেখিলাম। অযোধ্যার চাঁদ বুকের মাঝে সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছিলেন; আকাশের চাঁদ বড়ই সুন্দর লাগিল। মন প্রাণ শান্ত হইল। মনে যে কত কথা উঠিতে লাগিল; পুরাতন কালের কত কথাই যে আসিয়া হৃদয়ে জমাট বাঁধিতে লাগিল তাহা আর কি বলিব। পুণ্যভূমির পূতস্পর্শে হৃদয় শান্তিসাগরে ডুবিল। কে বলে তীর্থ গমনে উপকার নাই? যাঁহারা দল বাঁধিয়া, হাস্যকোলাহলে মগ্ন হইয়া, চা-চুরুটের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে সরল হারমোনিয়মে তরল আলাপ করিতে করিতে, কঠোর তবলা ঠুকিয়া ঠুংরি বাজাইয়া রসভরে বাজে টপ্পা গাহিতে গাহিতে, তীর্থে "হাওয়া খাইতে" যান তাঁহারা তীর্থ-গমনের উপকারিতা কিছুই অনুভব করিতে না পারেন। কিন্তু যিনি ভক্তিপূর্ণ অন্তরে অতীত কাহিনী ধ্যান করিতে করিতে তীর্থে গমন করেন তিনি সেই পবিত্র ভূমির প্রতি রজঃ কণাতে মহিমা দর্শন করেন, তিনি তীর্থ-দর্শনে শান্তি লাভ করেন, জন্ম সফল বোধ করেন। এইরূপ ভাব লইয়া তীর্থ গমন করিয়া দেখিলে সত্যাসত্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আশা করি, আমরা আবার তীর্থ দর্শন করিতে শিখিব। জন-মানব-শূন্য বিন্ধ্যাচল চূড়ায় একজন যোগীও তীর্থদর্শন সম্বন্ধে এক সময়ে এইরূপই বলিয়াছিলেন।

আমি রাত্রি থাকিতে থাকিতেই রওনা হইতে সম্মত দেখিয়া পাণ্ডাজী গাড়ী আনিতে গেলেন। আমি দাঁড়াইয়া ষ্টেসনের ভিড় দেখিতে লাগিলাম। কত দেশের ভিন্ন রকমের লোক। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ছুটির সময় অবকাশ পাইয়া অনেকেই বাহির হইয়াছিলেন। আজকাল অবসর পাইলে আমরা—বাঙ্গালার বাবুরা দল বাঁধিয়া "পশ্চিমে" "তীর্থগমন" করি। অনেকে বলেন প্লেগের ন্যায় ঐটী বাঙ্গালার একটা নূতন ব্যাধি। কিন্তু ক্ষতি কি? তবে যেমন ভাবে তীর্থদর্শনে যাওয়া হয় অমন ভাবে না যাইয়া একটু পৃথক্ ভাবে যাওয়া ভাল বলিয়া বোধ হয়। তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়াও যদি অন্য সময়ের ন্যায় বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও দাস দাসী লইয়া তরল আমোদ প্রমোদে

ব্যাপৃত থাকিলে, তীর্থ মহিমা কি সম্যক্ প্রকারে অনুভব করিতে পারা যায়? আধ্যাত্মিক রাজ্যের খেলা মন লইয়া। সেই মনই যদি বিষয়ান্তরে নিমগ্ন রহিল তবে আর রসাস্বাদ করাইবে কে? তবে একেবারে না যাওয়া অপেক্ষা এমন ভাবে যাওয়াও ভাল, কাহারও ভাগ্যে হয়ত ভাল ফল ঘটে, মুহূর্ত্তে জীবন প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হয়। যাঁহার ভাগ্যে তেমন ফল না ঘটে তাঁহার দেশভ্রমণ করাও ত হয়। ঘরের কোণে সারা বৎসর বসিয়া না থাকিয়া মাঝে মাঝে এমন বাহিরে গেলে অভিজ্ঞতা জন্মে, শরীর ভাল হয়, প্রাণও বড় হয়।

পাণ্ডাঠাকুর গাড়ী লইয়া আসিলেন। এমন গাড়ী পূর্ব্বে আর কখনও চড়ি নাই। দুচাকার গাড়ী। উপরে একটু খড়ের ছাউনি আছে। সামনে একটী মানুষে টানে, পশ্চাতে একটী মানুষে ঠেলে। কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে যানে উঠিলাম। লোক দুটি বেশ স্ফুর্ত্তি পূর্ব্বক গাড়ী টানিতে ও ঠেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ হইতে ঐরূপ আর একখানি গাড়ী আসিয়া পড়িল। আর একখানি গাড়ী পশ্চাৎ হইতে বেগে আসিতেছে দেখিয়া আমাদের গাড়ীর লোক দু'জনা ছুটিতে লাগিল। আমাদের গাড়ী প্রবল বেগে চলিতেছে দেখিয়া পশ্চাতের গাড়ীও অত্যন্ত বেগে চলিতে লাগিল। দুইখানি গাড়ীরই বাহকের (চালক বলিব না বাহক বলিব?) মুখেই বেশ স্ফুর্ত্তির মৃদু হাসি। বুঝিলাম "পাল্লা" লাগিল। ভারি বিস্ময় জন্মিল,—মানুষে গাড়ী টানিতেছে, এত সামান্য কাজে এত স্ফূর্ত্তি! শেষে ভাবিয়া দেখিয়াছি এই স্ফূর্ত্তি ভাল। আমাদের যাহার যে কাজ তাহা যদি আমরা স্ফূর্ত্তিসহ সুচারু রূপে সম্পন্ন করি তবে তাহাতেই আমাদের মর্য্যাদা, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। আর যদি সামান্য কার্য্য বলিয়া কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকি তবে আমাদের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, আমাদের অমর্য্যাদা হয়, সুখও হয় না।

ক্রমে চাঁদের আলোক ম্লান হইয়া আসিল। পূর্ব্বাকাশে পিঙ্গল আভা ফুটিয়া উঠিল। আমাদের গাড়ী দুসারি বাড়ীর মধ্যদিয়া চলিতে লাগিল। গৃহচ্ছাদ হইতে গৃহচ্ছাদে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, শাখা হইতে শাখান্তরে হনুমান্ লাফাইয়া পড়িতেছিল! এক এক স্থানে বহু হনুমান্ বিচরণ করিতেছিল! বাঙ্গালা দেশে পাড়া গাঁয়ে মাঠে যেমন দলে দলে গরু চরে ইহারাও সেইরূপ ভ্রমণ করিতেছিল। কাহারও বক্ষে একটী বাচ্ছা; কাহারও বক্ষে একটী, পৃষ্ঠে একটী; কাহারও বক্ষে একটী, পৃষ্ঠে একটী, পশ্চাতে দুইটী। সে অতি মনোরম দৃশ্য! সাক্ষাৎ

জীরের প্রাণে কত স্নেহ, কত মমতা। মায়ের স্নেহ কত অত্যাচারই সহিয়া থাকে,—জননীর জীবন কত ভারের! বক্ষে পৃষ্ঠে পশ্চাতে বৎস সহ হনুমান্ দেখিয়া আমাদের দেশের কৃষক পত্নীর কথা মনে পড়িল! স্কন্ধে একটী শিশু, কক্ষে একটী বৃহৎ কলসী, পশ্চাতে হাসিমুখে বালক বালিকা,—বাঙ্গালার লক্ষ্মী হাস্যমুখে প্রতিবেশিনী বয়স্যার সহিত রহস্য করিতে করিতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী পথ সরস মধুর করিয়া চলিয়াছেন! আসুন, আমরা এই নয়নাভিরাম, হৃদয় বেদনাপহারী দৃশ্য দেখিয়া নয়ন সফল করি। কে বলে ভারতে সুখ নাই? কে বলে ইউরোপের আদর্শে ভারতরমণীকে গড়িয়া তুলিতে হইবে? হাবভাবপূর্ণা, বিলাস-বিভ্রমময়ী পাশ্চাত্যরমণী অপেক্ষা আমার এই কৃষকবধূ কত সুন্দর! আমরা সাহেব সাজিয়াছি, আমরাই সাহেব থাকি, আমাদের জননী, ভগিনীকে আর মেম্ করিব না। বাহিরে সবুট পদাঘাত খাইয়া ঘরে আসিয়া শান্তিলাভের পথ রোধ করিও না। ভারত মন্দিরের আভাময়ী, শান্তিদায়িনী দেবীকে এমন করিয়া নিষ্প্রভ করিও না।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া একখানি বৃহৎ দ্বিতল বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পাণ্ডার আদেশমত গাড়ী হইতে নামিলাম। গাড়ীভাড়া দিয়া পাণ্ডার সহিত দ্বিতলে গেলাম। পাণ্ডা বলিলেন সেই বাড়ী হনুমান প্রসাদ ছ'ভাইয়ার। এই বাটীতে আমার বাসা দেওয়া হইল। আমি হাতের গাঁটরী ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। কি সুন্দর! পূর্ব্বে সরযূ প্রবহমানা। তাহার জলরাশির উপর বালসূর্য্যের হেমরশ্মি ক্রীড়া করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলি আনন্দে নৃত্য করিতেছে, প্রভাতে সূর্য্যের কিরণ ধারা তাহাদের গাত্রে ঢলিয়া পড়িতেছে। পবিত্রতায় পবিত্রতা মিশিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বাকাশে প্রকাণ্ড থালার ন্যায় লোহিত ভানু কাঁপিতেছে। সরযূর ওপারে, বহুদূরে পর্ব্বতশ্রেণীর কালরেখা দিগন্ত ব্যাপিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। অদূরে বটবৃক্ষে পালে পালে হনুমান্ খেলা করিতেছে। এই ত রামের অযোধ্যা! সরযূ গমনের ঐ পথে আমাদের রাম লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই স্নানের জন্য কখনও না কখনও সরযূ গিয়াছিলেন, ঐ পূত বালুকা কণা কত পবিত্র! ঐ সরযূ-সলিলে পরমাসতী মা-জননী সীতাদেবী কখনও না কখনও স্নান করিয়াছেন, ঐ সরযূর সলিলকণা কত পবিত্র! ঐ হনুমানেরা সেতুবন্ধনের সহায়তা করিয়াছিলেন, উহাঁরা রামসীতা ভিন্ন জানেন না, হনুমান্ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন রামচন্দ্র ব্যতীত তথায় অন্য কাহারও স্থান

নাই। উহাঁরা সীতারামের কত প্রিয়! ভক্তিভরে কক্ষ মধ্যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। উঠিতে ইচ্ছা হইল না, বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম।

(২)

প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া স্নান করিবার জন্য সরযূ অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। কিছুদূর বালুকার উপর দিয়া যাইতে হইল। বোধ হয় এই বালু ভূমির উপর দিয়া এক দিন সরযূর প্রবাহ বহিত। যদি তাহা হয় তাহা হইলে সরযূ নিশ্চয়ই একদিন বড় নদী ছিল।

"লক্ষ্মণ-ঘাটে" উপস্থিত হইলাম! এই স্থানেই "কি লক্ষ্মণ বর্জ্জন" হয়? এই স্থানেই কি হিন্দুর সত্যপালনের কঠোর ভাতৃ বর্জ্জন সম্পাদিত হইয়াছিল? বাল্যের সখা, বনবাসের একমাত্র সহায়, সীতা-উদ্ধারের প্রধান অবলম্বন, রাজ্যপরিচালনের পরম মিত্র, একান্তানুগত ভ্রাতা, বীর লক্ষ্মণকে কি ভ্রাতৃ-বৎসল রামচন্দ্র এই স্থানেই বর্জ্জন করিয়াছিলেন? আজ দু'পয়সার জন্য আমরা মিথ্যা বলি, আজ সামান্য কারণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, আর একদিন সত্যের জন্য, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রামচন্দ্র সরযূতটে কি কঠোর কর্ত্তব্যই সাধন করিয়াছিলেন? আবার কি সে দিন আসিবে, আবার কি আমরা সেইরূপ সত্যপালন, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা শিক্ষা করিব? আজ যদি সেইরূপ সত্যপালন করিতে আমরা সমর্থ হইতাম তবে আমাদের অনুষ্ঠানগুলির এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত কি? যাহার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত নহে, যাহার ভিত্তি চরিত্রবলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নহে,—যাহার ভিত্তি বাক্‌চাতুর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,—তাহা কয়দিন থাকিতে পারে? প্রবল-বাত্যা-তাড়িত তরঙ্গমালা বালুকার বাঁধ ধ্বংস করিয়া ফেলে, কঠোর পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রতিহত হইয়াই ফিরিয়া আইসে। যখন আমরা আবার হিন্দু হইব, আবার আর্য্যোচিত সত্য-পালন শিখিব তখনই আমরা বিজয় লাভ করিব। যাবৎ তাহা না হইবে তাবৎ অসার চিৎকার, সাময়িক উত্তেজনা বিশেষ স্থায়ী সুফল প্রসব করিবে না।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জনরূপ কঠোর সত্যপালনের শোকপূর্ণ, মধুর কথা চিন্তা করিতে করিতে সরযূ সলিলে অবতরণ করিলাম। চারি পার্শ্বে কত কচ্ছপ ভাসিতে ছিল। পদতলে কচ্ছপ লাগিতে লাগিল, তাহারা পদতল হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] মাঘ, ১৩২২ সাল। [১০ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের চাঁদা এবং উৎসব সম্পাদক মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ অন্যূন ৪০০৲ চারি শত টাকা এখনও উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকের নিকট প্রাপ্য আছে। তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় টাকা সত্বরে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। তাঁহাদিগের এই সহানুভূতি না পাইলে শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যে আমরা সক্ষম হইব না।

বিনীত—

"উৎসব" সেবক মণ্ডলী।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা অক্ষম হইব।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

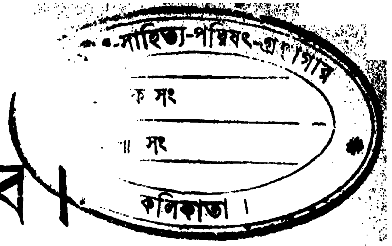
৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲, টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা।

পুরুষ-প্রকৃতি।

সে কি সখি! অনুরাগে
চেয়েছে আমার পানে?
তবে কি—তবে কি তারে
ভোলা যায় এ জীবনে?

সে যদি তেমন করে
ডাকে গো "আমার" বলে
কে না তবে যায় ছুটে
বিকাতে চরণ তলে?

ফুটিতে তাহারি তরে
যদি সাধে ভরে প্রাণ
তবে কিরে মলিনতা
সাধে এই ব্যবধান?

জানি সে মুরতি ধরে
বিলাতে চরণ তারি
লুকায়ে লুকায়ে সখি!
আমি কি রহিতে পারি?

আমার কলঙ্কে তারে
কলঙ্কী সকলে বলে
জগতে শিখায় সেই
ভালবাসা কারে বলে।

নয়নে উছলে ধারা
এ সুধা কি সাধে ঝরে,
সে যেন রয়েছে মম
সর্ব্বাঙ্গ পরশ ক'রে।

শ্রবণে পরশে নাম
পুলকে রোমাঞ্চ ধরে
দাও সে মধুর কণ্ঠ
গাব আমি প্রাণভ'রে।

চরণ কমল যদি
হৃদয় আসনে রাজে
মলিন বাসনা তবে
কেননা লুকায় লাজে ?

অনুরাগে অনুরাগী
ব্যাকুল বাঁশরী তানে
অনুদিন অনুক্ষণ
কি কথা শুনায় কানে ?

আঁখিতে রাখিয়া আঁখি
সে দিঠি সোহাগে পুরি
ভালবাসি ভালবাস
বলিল কি কণ্ঠে ধরি ?

ভবানীপুর।

ঋষিগণের সরস্বতী পূজা।

সকল পূজাই সেই একেরই পূজা। যখন বহু দেখ তখন সেই বহুর মধ্যে সেই এককেই ভাবনা কর, করিয়া সেই একেরই পূজা কর।. সেই এক যিনি তিনি চৈতন্য। তাই বলা হয় "চৈতন্যং মম বল্লভম্"। আমার হৃদয় বল্লভ এই চৈতন্যই। চৈতন্য ভিন্ন বল্লভ আর কেহ হয় না, হইতেও পারে না। সরস্বতী পূজাই বল, আর দুর্গা পূজাই বল বা কালী পূজাই বল; শিব পূজাই বল, আর রাম পূজাই বল আর কৃষ্ণ পূজাই বল অথবা গণপতি পূজাই বল বা সূর্য্য পূজাই বল, পূজা মাত্রই সেই এক বল্লভেরই পূজা।

আচ্ছা সরস্বতী পূজা করিয়া কাহারও কি অভীষ্টলাভ হইয়াছে?

হইয়াছে বৈকি। স্ত্রীলোকের পর্য্যন্তও হইয়াছে।

একটির নাম করিবে কি?

দুটির নয়?

একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোক—ইহাই যথেষ্ট হইবে। পুরুষের নাম করিলাম "আশ্বলায়ন ঋষি" আর স্ত্রীলোকের নাম করিলাম "লীলা"।

"লীলা" কি করিয়া পাইয়াছিলেন?

একশত ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া। তিন দিন উপবাস করিয়া সরস্বতীর পূজা এবং চতুর্থ দিনে আহার—ইহাই একটি ত্রিরাত্র ব্রত। এমন একশতটি ব্রত একাদিক্রমে। ত্রয়োদশ মাসের কিছু অধিক কাল লীলা এই ব্রত আচরণ করিয়া পাইয়াছিলেন; জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আপনি জীবন্মুক্ত হইয়া স্বামীকে জীবন্মুক্ত করিয়াছিলেন। জীবন্মুক্ত যিনি তিনি চিরদিন আছেন; চিরদিন জাগ্রত স্বপ্ন লইয়া খেলা করেন আবার সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থাও তাঁহার আয়ত্বাধীন। ব্রহ্ম যেমন স্ব স্বরূপে—আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও সৃষ্টি স্থিতি লয় লইয়া খেলা করেন, জীবন্মুক্তও সেইরূপ করেন। ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত সুখের অবস্থা কেহই ধারণা করিতে পারে না।

আর আশ্বলায়ন ঋষি কত দিনে পাইয়াছিলেন?

ছয় মাসে।

কিরূপে এই সরস্বতীর পূজা করিয়া ইঁহারা পাইয়াছিলেন?

শুধু জানিতে চাও না কিছু করিতে চাও?

করিবার জন্যই জানিতে চাই। শুধু জানিয়া কি হইবে?

সত্যই। শ্রীভগবানের পূজা না করা পর্য্যন্ত মানুষ কিছুতেই মনকে সুস্থ করিতে পারিবে না। মনের অসুখ যদি না সারিল তবে তোমার টাকা কড়ি, বাগান বাড়ী, গাড়ী যুড়ী, বল তোমাকে কি সুখ দিবে?

বল কিরূপে আশ্বলায়ন ঋষি পূজা করিয়াছিলেন?

পূজার প্রধান ব্যাপার দুইটি অগ্রে জানিয়া লও। পরে বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। হইবে।

প্রধান ব্যাপার দুইটি কি?

যাঁহাকে পূজা করিতে যাইতেছ অগ্রে তাঁহাকে জান। এইটি প্রথম। এই যে জানা এ জানা হইতেছে শুনিয়া জানা। এ জানা হইতেছে বিশ্বাসে জানা। এ জানাতেও বিচার আছে। বেশ করিয়া জানিবার বস্তুটিকে বুঝিয়া লইতে হইবে। আর এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা যাহা আছে তাহাও যে ভুল কথা তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। এই জানা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানটি লাভ কর, করিলে তোমার মনটি শীতল হইবে। তুমি শ্রবণ মনন করিয়াও বলিতে পারিবে আহা বেশ কথা। আহা এই কথা শুনিয়া মন জুড়াইয়া গেল।

জানার পরে ধ্যান করা চাই। ধ্যান করিলে তবে প্রাণ জুড়াইবে। তুমি তখন দেখিবে যাহা শ্রবণ মনন করিয়া জানিয়াছিলে তাহাই অনুভবে আসিতেছে আর তুমি পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতেছ। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। ইহাই তাহাকে ভজিয়া তাই হইয়া থাকা। আহা! ইহা কত সুখের। যখন যেমন থাকিবে তাহাতেই সর্ব্ব অঙ্গ আপ্যায়িত, চক্ষু শ্রোত্র আপ্যায়িত, প্রাণ মন আপ্যায়িত অথচ সর্ব্বদা আপন স্বরূপে, সর্ব্বদা 'আপনি আপনি' ভাবে থাকাটি আছেই। ইহা অসম্ভব ভাবিওনা। বুঝিতে পার না বলিয়া একবারে উড়াইয়া দিওনা। চেষ্টা কর বুঝিবে।

সরস্বতী দেবীকে জানা চাই আর ধ্যান করা চাই, এইত বলিলে?

হাঁ। অগ্রে তিনি কিরূপ গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শ্রবণ কর। পরে ধ্যানের অগ্র পশ্চাতের কর্ম্মগুলি বিধিপূর্ব্বক কর তবে অপরোক্ষানুভূতি আসিবে।

যাহা যাহা করিতে হইবে—অগ্র পশ্চাতের কর্ম্ম ইত্যাদি সকলই বল।

"বিদ্মহের" বা জানার অন্তর্গত অনুষ্ঠানগুলি হইতেছে—

১। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রের অর্থ-চিন্তা।

২। মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যিনি তাঁর স্বরূপ, রূপ, গুণ ও কর্ম্মের পরোক্ষ জ্ঞান রূপ মন্ত্র চৈতন্য।

৩। ঋষিন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস দ্বারা নিজ শরীরকে দেবতা-শরীর রূপে ভাবনা।

৪। প্রাণায়াম।

এই বিদ্মহের পরে "ধীমহি" বা ধ্যান। ধ্যান একবার করিলেই স্থিতি হইবে না। ধ্যানের সঙ্গে স্তুতি, কবচ, প্রণাম ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি অভ্যাস করিতে করিতে তবে পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটিবে। একদিন করিলেই যদি হইত তবে আর ভাবনা কি ছিল?

আশ্বলায়ন ঋষিও কি এই সব করিয়াছিলেন?

নিশ্চয়ই। তিনি সরস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিধিমতে সরস্বতীর উপাসনা করিয়াছিলেন। ঋষ্যাদি ন্যাস, ধ্যান সকলই উঁহাকে করিতে হইয়াছিল শ্রুতিতে ইহা দেখিও।

জানার পরে ধ্যান আর ধ্যানের পরে স্থিতি, ইহা স্থূলস্থূল ভাবে সরস্বতী পূজার ব্যাপার হইতে যদি দেখাইয়া দাও তবে বড় ভাল হয়। মাকে লক্ষ্য করিয়াই সকল কথা কহিলে আরও নিকটের কথা বলা হইবে।

আচ্ছা। শ্রবণ কর।

মা! এই তোমার স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ। আহা! কি সুন্দর তোমার রূপ! এরূপের বুঝি বর্ণনা হয় না।

নীহার, মুক্তারহার, ঘনসার কর্পূর, আর সুধাসার চন্দ্রের ধবলতা তোমার অঙ্গকান্তি। আর ঐ হস্ত! কল্যাণ দায়িনি—কল্যাণ দিবার জন্যই তুমি বরদণ্ড-মণ্ডিত করা। মা! সুবর্ণময় চম্পকমাল্যে তোমার কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে। উত্তুঙ্গ পীন কুচকুম্ভ মনোহরাঙ্গি! মা বাণি! মন বাক্য ও বিভূতি দ্বারা আমি তোমাকে প্রণাম করি।

মা! বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বই তোমার স্বরূপ। সত্যই এ তত্ত্ব অব্যক্ত। তথাপি তুমি নামরূপের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছ। মা! আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি দেবী—দানাদি গুণযুক্তা তুমি। তুমি সরস্বতী। যে ক্রিয়ার ফলে অন্নলাভ

হয় তুমি তৎসমন্বিতা। যাঁহারা তোমার ধ্যান করে, তোমার স্তব করে তাঁহাদের বুদ্ধিকে তুমি রক্ষা কর। মা সরস্বতি! অন্নসমূহ দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা কর।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত চারি বেদ তোমার গান করেন। তুমিই ব্রহ্মের অদ্বৈতশক্তি। মা সরস্বতি! আমাকে রক্ষা কর।

মা! দ্যোতমান দ্যুলোক হইতে তুমি আমাদের এই পূজা-যজ্ঞে আগমন কর। জনতৃপ্তিকর মহৎ অন্তরীক্ষ হইতে মা সরস্বতি! তুমি আগমন কর। মা! আমরা তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদের কথা শ্রবণ কর। মা! আমাদের এই স্তুতি-ভাষা তুমি আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

মা! তুমি বর্ণ, পদ, বাক্য এবং তাহার অর্থরূপে বর্ত্তমান। তোমার উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই বলিয়া তুমি অনাদিনিধনা। তুমি অনন্তা। মা সরস্বতি! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

যাহারা এই পূজা যজ্ঞ করে তুমি তাহাদিগকে পবিত্র কর, তুমি প্রচুর অন্ন-সমন্বিত যজ্ঞাদি ব্যাপারের সম্পাদয়িত্রী। মা! তুমি ইচ্ছা কর আমাদের এই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হউক।

মা! তুমি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সমস্ত দেবতাগণের ঈশ্বরী। মা সরস্বতি! আমার দেহে যে আত্মা আছেন তাহা তুমিই বলিয়া দিয়াছ বলিয়া আমি জানিতেছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

মানুষ যে প্রিয় বাক্য বলে, যে সত্য কথা বলে তাহা তুমি মানুষকে প্রেরণা কর বলিয়া। যাহারা সুবুদ্ধি পূর্ব্বক এই পূজা অনুষ্ঠান করে তুমি তাহাদিগকে যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা জানাইয়া দাও। মা! তুমিই যজ্ঞ ধারণ করিয়া আছ।

মা! তুমিই অন্তর্যামিনীরূপে এই তিন ভুবন নিয়মিত করিতেছ। রুদ্র, আদিত্যরূপে অবস্থিত দেবগণ তোমাতেই আবিষ্ট আবার তাঁহারাও তোমাকে ধ্যান করেন। মা সর্ব্বময়ি! মা সরস্বতি! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

তোমার দুই রূপ। তুমি দেবতারূপে বিগ্রহবতী এবং নদীরূপে প্রবাহবতী। প্রবাহরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রভূত উদকরাশি তুমি জ্ঞাপন করিতেছ। আবার তুমিই দেবতারূপে বিশ্ববাসী তোমার পূজকগণের প্রজ্ঞাকে বিশেষরূপে উদ্দীপিত করিতেছ।

মা! জীব যখন নিজ নির্ম্মল বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত আপন চৈতন্যকে দর্শন করে তখন তুমি তাহার অনুভব সীমায় উপনীত হও। তুমি সর্ব্বব্যাপিনী, তুমি জ্ঞপ্তিরূপা, তুমি সরস্বতী। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

মা! পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী শব্দরাশি স্বরূপিণী তুমি। মনীষী ব্রাহ্মণগণ যোগনেত্রে তোমার এই চারি অবস্থা বিশিষ্ট পদ সমূহকে জানেন। পরা পশ্যন্তী ও মধ্যমা এই ত্রিপাদ গুহা নিহিত, লোকবুদ্ধির অতীত, কেবল বৈখরী বাক্ মাত্র মনুষ্যলোকে পরিচিত। মানুষ বৈখরী সাহায্যেই কথা বার্ত্তা কয়।

মা! সরস্বতি! তুমি নির্ব্বিকল্প স্বরূপে অব্যক্তা। তথাপি নাম জাতি ইত্যাদি অষ্টবিধরূপে ব্যক্ত হও। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

মা! তুমি দীপ্তিশালিনী। তুমি দেবতৃপ্তি বিধায়িনী। তুমি মাধ্যমিকা বাক্। মা মধ্যমিকা বাক্! তুমি যখন অচেতন বস্তুসমূহকে জ্ঞাপন করিয়া যজ্ঞদেশে উপবেশন কর তখন তুমি অন্ন ও জল প্রদান কর। কিন্তু তোমার পরম স্বরূপ কোথায় তাহা দেখা যায় না।

সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় তোমার কথা বলেন। সর্ব্ব কামধেনু স্বরূপিণী তুমি। তুমি আমাকে রক্ষা কর। মা! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্গতা এবং ধর্ম্মাভিবাদিনী। শ্রুতি তোমার কতই বিভূতি প্রকট করিয়াছেন। আমাদের আত্মাকেও আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে তাহাও আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক দেবগণ মধ্যমিকা বাক্‌রূপিণী বাগ্‌দেবীকে আবিষ্কার করেন। বিশ্বরূপধারিগণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় সেই বাক্ ব্যবহার করেন। মধ্যমা বাক্‌ই বৈখরীর মূল। আনন্দজননী মধ্যমাবাক্‌রূপিণী তুমি। মা বাগ্‌বাদিনি! তুমি বৃষ্টিদানে আমাদের জন্য অন্ন ও ঘৃতাদিরস ক্ষরণ কর। মা! কামধেনু স্বরূপিণী তুমি। তুমি আমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাদের নিকটে আগমন কর।

তোমাকে জানিয়া যোগিগণ সংসারবন্ধন উন্মথিত করিয়া নির্ম্মল পথ দিয়া পরমস্থানে গমন করেন। মা সরস্বতি! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়াও কেহ বাক্‌রূপিনী তুমি তোমাকে দেখিতে পান না; কেহ তোমাকে শুনিয়াও শ্রবণের ফল পান না। ইহারা অজ্ঞ। কিন্তু তুমি যাহাকে কৃপা করিয়া বেদের অর্থ জানাও, ঋতুকালে সম্ভোগাভিলাষিণী জায়া যেমন সাজ সজ্জা করিয়া পতির নিকট আপনাকে বিবৃত করেন "জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ" সেইরূপে তুমিও তোমার কৃপা পাত্রের নিকট আত্মপ্রকাশ কর।

মা! নামরূপাত্মক নিখিল বিশ্ব তোমাকে আশ্রয় করিয়াই ভাসিয়াছে। রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া যেমন স্বপ্ন ভাসে সেইরূপ। বিশ্ববাসিগণ আবার তোমারই স্তব করিয়া থাকে। মা সরস্বতি! তুমি অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপা। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

সারস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্র দ্বারা আশ্বলায়ন ঋষি কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। এই মহামন্ত্রের ভাব উপরে যাহা প্রকাশ করা গেল তাহাতে সরস্বতী যে আপন-স্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং মায়া অবলম্বনে সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপিণী তাহা আমরা পাইলাম। কিন্তু যাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া বলিতে হয়, মা! সৃষ্টি যখন না থাকে তখন তুমি অবিজ্ঞাত স্বরূপা 'আপনি আপনি' আবার সৃষ্টি হইয়া গেলে তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বান্তর্যামিনী। যাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া ঋষিগণ বলিতেন, মা! তুমি নির্গুণ ব্রহ্ম, তুমিই আবার সগুণ বিশ্বরূপ, তিনি কিন্তু মূর্ত্তিধারিণী। আশ্বলায়ন ঋষি ঋষ্যাদি ন্যাসের পরে যে ধ্যান করিয়াছেন তাহার ভাব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ধ্যানটি এই—

নীহার-হারঘনসার-সুধাকরাভাং কল্যাণদাং কনক চম্পকদামভূষাম্।
উত্তুঙ্গপীন কুচকুম্ভমনোহরাঙ্গীং বাণীং নমামি মনসা বচসা বিভূত্যৈ॥

ইহার পরেই প্রার্থনাসমন্বিত স্তব। ইহা কতই মনোহর! ঋষিগণ আপনারা এইভাবে সরস্বতী পূজা করিয়া, যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের জন্য ইহা রাখিয়া গিয়াছেন। কর ভাল। না কর মহৎ ভয়।

চতুর্ম্মুখ-মুখাম্ভোজ বন হংসবধূর্ম্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥১
নমস্তে শারদে দেবি! কাশ্মীর পুরবাসিনী।
তামহং প্রার্থয়ে নিত্যং বিদ্যাদানং চ দেহি মে॥২
অক্ষসূত্রাঙ্কুশধরা পাশ পুস্তকধারিণী।
মুক্তাহার সমাযুক্তা বাচি তিষ্ঠতু মে সদা॥৩
কম্বুকণ্ঠী সুতাম্রোষ্ঠী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
মহাসরস্বতী দেবী জিহ্বাগ্রে সন্নিবেশ্যতাম্॥৪
যা শ্রদ্ধা ধারণা মেধা বাগ্‌দেবী বিধিবল্লভা।
ভক্ত জিহ্বাগ্রসদনা শমাদিগুণদায়িনী॥৫
নমামি যামিনীনাথ লেখালঙ্কৃত কুন্তলাম্।

ভবানীং ভবসন্তাপনির্ব্বাপণসুধানদীম্ ॥৬
যঃ কবিত্বং নিরাতঙ্কং ভুক্তিমুক্তিং চ বাঞ্ছতি।
সোঽভ্যর্চ্যৈনাং দশশ্লোক্যা নিত্যং স্তৌতি সরস্বতীম্ ॥৭
তস্যৈবং স্তবতোনিত্যং সমভ্যর্চ্য সরস্বতীম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাঽভিযুক্তস্য ষণ্মাসাৎ প্রত্যয়োভবেৎ ॥৮
ততঃ প্রবর্ত্ততে বাণী সেচ্ছয়া ললিতাঽক্ষরা।
গদ্যপদ্যাত্মকৈঃ শব্দৈরপ্রমেয়ৈর্বিবক্ষিতৈঃ ॥৯
অশ্রুতো বধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায়ঃ সারস্বতঃ কবিঃ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ সা হো বাচ সরস্বতী ॥১০

দশশ্লোকী মহামন্ত্রে বিধি পূর্ব্বক পূজা কর। ছয় মাস ধরিয়া নিত্য কর, পরে এই নিতান্ত সুন্দর স্তব সঙ্গে সঙ্গে নিত্য পাঠ কর। শ্রুতি বলিতেছেন যদি তুমি ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই অনুষ্ঠান কর তোমার হইবেই। ঋষিগণের এই স্তব। অর্থ বুঝিয়া একটু ধারণা করায় দোষ কি? আহা! ইহা বড় সুন্দর!

মা! তুমি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখরূপ কমলবনের হংসবধূস্বরূপিণী। মা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতি! আমার মানস সরোবরে একবার আসিয়া বিহার কর।

হে কাশ্মীরপুরবাসিনি! হে দেবি! শারদে! তোমাকে প্রণাম। মা তোমার নিকট নিত্য এই প্রার্থনা করি যে তুমি আমাকে বিদ্যা দাও, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান কর।

মা তুমি অক্ষসূত্র, অঙ্কুশ আর পাশ ও পুস্তক হস্তে ধারণ করিয়া আছ। তোমার গলদেশে মুক্তার হার। মা! তুমি সর্ব্বদা আমার বাক্যে অধিষ্ঠান কর।

মা! শঙ্খের মত ত্রিরেখাযুক্ত ঐ কণ্ঠ, সুন্দর আরক্ত ঐ ওষ্ঠ। মা! সর্ব্বাভরণে ভূষিত ঐ মূর্ত্তি কতই সুন্দর হইয়া চক্ষে ঝলসিতেছে। দেবি! মহাসরস্বতি! তুমি আমার জিহ্বাগ্রে সন্নিবিষ্ট হও।

বাগ্দেবী তুমি। তুমি শ্রদ্ধা, ধারণা ও মেধাস্বরূপিণী। তুমি ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রহ্মাণী। তুমি ভক্তজনের জিহ্বাগ্রবাসিনী। তুমিই শম দমাদি গুণ প্রদান করিয়া থাক নতুবা মানুষে ঐ সমস্ত গুণ কোথায় পাইবে?

মা! আমি তোমাকে প্রণাম করি। আহা! কি সুন্দর চন্দ্রলেখালঙ্কৃত ঐ অলকমালা—ঐ চূর্ণকুন্তলরাজি। মা তুমি ভবরাণী। মা তুমি ভবসন্তাপ নির্ব্বাপণের সুধানদী।

যদি কেহ মায়ের ভাবভরা কবিত্ব চাও, যদি কেহ সর্ব্বদা সকল অবস্থায় মায়ের ক্রোড়ে নির্ভয় হইয়া থাকিতে চাও, যদি কেহ মায়ের প্রসাদ ভোগ আর মায়ের মত মুক্তি চাও তবে এস এই দশশ্লোকী মহামন্ত্রে নিত্যই মা সরস্বতীর অর্চ্চনা করি।

মা সরস্বতীকে নিত্য এইরূপে পূজা করিতে হইবে তাহার পরে শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া এই স্তব পাঠ করিতে হইবে। ছয়মাস ধরিয়া এইরূপ পূজা কর, স্তুতি পাঠ কর, দেখিবে নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

তখন স্বেচ্ছাক্রমে, সুললিত বর্ণে, গদ্য পদ্যময়, ভাবভরা ভাষা তোমার মুখ-বিবর হইতে বাহির হইবে। মা তখন জিহ্বাগ্রে বসিয়া কথা কহিবেন নতুবা এত সুন্দর কথা কি কখন মানুষে কহিতে পারে?

সরস্বতীর উপাসক প্রায়ই ভক্ত কবি। গুরুমুখে না শুনিলেও তিনি অর্থ বোধে সমর্থ হন। সরস্বতীই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন।

(২)

আশ্বলায়ন ঋষি তখন বলিতে লাগিলেন—আমি ছয়মাসকাল এত ধারণ করিয়া দশশ্লোকী মহামন্ত্রে মায়ের পূজা ও স্তব করিয়া যে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যাই আত্মবিদ্যা। মা আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। যে জীব-চৈতন্যকে এতদিন "আমি" "আমি" করিতাম, মা শিক্ষা দিলেন—আমি তাহাকে "তুমি" "তুমি" করিতে লাগিলাম আর সকলের মধ্যেই এই খণ্ড-চৈতন্য দেখিয়া 'তুমি' বলিতে শিখিলাম। মা দেখাইয়া দিলেন বলিয়া আমার আমিকে সর্ব্বদা বলিতে লাগিলাম, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিত্যকালেই তুমি ব্রহ্ম। অর্থাৎ জীব-চৈতন্য আমার নিকটে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত।

কি কৌশলে মা এইরূপ বিদ্যা আমাকে দিলেন জান? শুধু বই পড়িয়া কি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়? আর ঐ যে বল—তুমি বৈদান্তিক, 'ভক্তি টক্তি' আবার কি? লোকের এই সব কথা ভ্রষ্ট কথা মাত্র। ভক্তি না থাকিলে কিছুই হইবে না। যিনি ভক্তি চান না তাঁহার বেদান্ত আলোচনা বৃথা। বই পড়িয়া যদি বেদান্ত জ্ঞান হইত তবে কত 'বেদান্তপড়া' নরনারী এই ঘোর কলিযুগে কতভাবে দেখা দিতেছেন বলিয়া এই সময়ের জগৎটা স্বর্গ হইয়া যাইত। 'আটপৌরে' আর 'পোষাকী' বলিয়া কিছুই থাকিত না। 'সভা জীবনে' একরূপ আর 'বাড়ী জীবনে' অন্যরূপ, ইহা আর হইত না। কিন্তু আজকালকার জগৎটা আজকালকার

তোমার আমার সংসারটা আর আজকালকার তোমার আমার হৃদয়টা স্বর্গ কি? না এটা কি?

আশ্বলায়ন ঋষি সরস্বতী পূজা করিয়া, সরস্বতী স্তুতি নিত্য করিয়া করিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া মায়ের নিকট হইতে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তি না থাকিলে জ্ঞানের সম্ভাবনা আদৌ থাকিতে পারে না। শুন ইহার ক্রম কি?

প্রথমে পূজা ইত্যাদি কর, করিয়া চিত্তকে প্রসন্ন কর। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা কর তবে বুঝিবে কাহার মায়াতে তুমি কেমন করিয়া অখণ্ড হইয়াও খণ্ড জীব ভাব পাইয়াছ। ব্রহ্ম নিজে জীবভাবে ভাসেন কিরূপে ইহা বেশ করিয়া যখন ধারণা করিতে পারিবে তখন জীবও কি ছাড়িলে ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে ইহাও বুঝিবে। ভক্তি ব্যাপারের পরে এই সমস্ত করিলে তবে হইবে ব্রহ্মবিদ্যা। এখন যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা কর তাহাই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! তাঁহারা যে উপনিষদ্ বিদ্যা অরণ্যে গিয়া আলোচনা করিতেন, নিষ্কামকর্ম্মে সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব বাক্য এবং সর্ব্ব ভাবনাতে ভগবৎ প্রসন্নতা লাভে ভরিত-চিত্ত হইয়া একান্তে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা জনিত সমাধি অভ্যাসে তাঁহাদের যে ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হইত তাহা কি আর এই সকল ব্যবহারিক কার্য্য করিতে করিতে হয় গো? না একটু গলা কাঁপাইয়া, এক ফোঁটা চক্ষের জল মাখান 'ভক্তি ভক্তি প্রেমা প্রেমা' করিলেই হয় তাই বল? এসব বৃথা। শাস্ত্রমত অনুষ্ঠান করিলে তবে হয়, কিন্তু ইহা গালবাদ্যের কর্ম্ম নয়।

আশ্বলায়ন ঋষি বলিতে লাগিলেন—

সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই আছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া গুণসাম্যরূপিণী তাঁহার শক্তি ভাসেন। তখন 'অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং, অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং, নিবাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপং' শক্তিজড়িত চৈতন্য ভাসেন।

সাম্যাবস্থারূপিণী শক্তি যখন ভাসেন তখন দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরূপ সাম্যাবস্থাতে জ্ঞান বা চিতের প্রতিবিম্ব পড়ে। জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেইরূপে ইহাও যেন অনুভব-চক্ষে দেখা যায়।

চিতের প্রতিবিম্ব গর্ভে ধরিয়া সাম্যাবস্থাটি তখন বৈষম্যাবস্থায় আসিতে

থাকে। গুণসাম্যাবস্থার ভিতরেই গুণবৈষম্যাবস্থাটি ছিল, চিৎপ্রতিবিম্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে গুণসাম্যাবস্থাই ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়েন।

সাম্যাবস্থারূপিণী শক্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়াতেই চিৎপ্রতিবিম্ব পুরুষ নামে অভিহিত হয়েন। আর ত্রিধা ভেদভিন্না সাম্যাবস্থার নাম হয় সত্ত্বপ্রকৃতি, রজঃ-প্রকৃতি ও তমঃপ্রকৃতি। একবারে কিন্তু প্রকৃতি পৃথকরূপ ধারণ করেন না। প্রথমে সত্ত্ব প্রকৃতি প্রকাশিত হন আর রজস্তম প্রকৃতি তাঁহার সহিত মিশিয়া দেখা দিলেও ইঁহারা সত্ত্বগুণ দ্বারা অভিভূত থাকেন।

রজস্তম অভিভূত করিয়া যে প্রকৃতি থাকেন তাঁহারই নাম সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি। ইনিই মায়া। অজপুরুষ শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন।

মায়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্ববশীভূত উপাধি। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও তাঁহার বশীভূত শুদ্ধ সত্ত্ব যে প্রকৃতি তাঁহারাই হইলেন লক্ষ্মী নারায়ণ, শিবশক্তি, হরপার্ব্বতী, সীতা রাম, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। এই ঈশ্বর-বশীকৃত মায়া ইনিও সর্ব্বজ্ঞা ইনিও এক। ইঁহারই নাম বিদ্যা। ইঁহারই নাম ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীচণ্ডী ইঁহারই সম্বন্ধে বলেন—

"সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥"

সেই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণা পরমাবিদ্যা মুক্তির কারণ স্বরূপা। তিনি সদাই আছেন। তিনিই সংসার বন্ধনেরও হেতু এবং সকলের নিয়ন্ত্রী। আবার বলিতেছেন

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

এই মহামায়া নিত্যা। আবার জগৎরূপে আকার ধরেন বলিয়া ইনি জগন্মূর্ত্তি। সেই মহামায়া দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। এই মহামায়া ও তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য এক। শ্রীগীতা এই চৈতন্য পুরুষকে দিয়াও আত্মপ্রকাশ করাইতেছেন আর বলিতেছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।"

চৈতন্য ও সত্ত্ব প্রকৃতি মায়া অথবা কালী ও কৃষ্ণ যে এক শাস্ত্র তাহা বলিতেছেন। আরও বলিতেছেন যিনি শিব তিনিই শক্তি, যিনি রাধা তিনিই কৃষ্ণ, যিনি রাম তিনিই সীতা. যিনি হর তিনিই পার্ব্বতী অর্থাৎ যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি।

শ্রুত্যাদি শাস্ত্র ইহাদের কোন ভেদ করেন নাই, তুমি যদি ভেদ জ্ঞান কর আর সাম্প্রদায়িকতা কর তবে তুমি কি তুমিই বুঝ।

শ্রীচণ্ডী শ্রীগীতার মত আরও বলিতেছেন—

তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

মহামায়ার উৎপত্তি বহুপ্রকার, তাহার কথা শ্রবণ কর। মহামায়া দেবতাগণের কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূত হন তৎকালে নিত্যা হইয়াও মহামায়া উৎপন্না হয়েন বলিয়া বলা হয়। কখন চৈতন্যে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলা হয় নিত্যা, কখন প্রবাহক্রমে মায়া আছেন বলিয়াও তাঁহাকে নিত্যা বলা হয়। শ্রীদেবী বলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈত দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

একা আমিই এই জগতে আছি। আমা ছাড়া অপর দ্বিতীয়া আর কে আছে? এই যাহাদিগকে তুই দেখিতেছিস্, রে দুষ্ট! ইহারা আমারই বিভুতি। দেখ্ ইহারা আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

শ্রুতি তাই বলিতেছেন ঈশ্বরের উপাধিভূতা সর্ব্বজ্ঞা মায়া সাত্ত্বিক বলিয়া, সমষ্টি উপাধি বলিয়া তিনি এই জগৎ রচনা করিতেও পারেন আবার না করিতেও পারেন অথবা অন্যরূপে জগৎ রচনা করিতেও পারেন। মায়ার প্রভাব এইরূপ বলিয়া মায়ারাণী সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণে ঈশ্বরী বলিয়া কীর্ত্তিতা হন।

মায়ার দুইটি শক্তি। বিক্ষেপ ও আবরণ। বিক্ষেপ শক্তি হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি লিঙ্গ শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করেন।

আবরণ শক্তির কার্য্য হইতেছে ভিতরে দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য যাহা কিছু ইহাদের যে ভেদ এবং বাহিরে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির যে ভেদ এই উভয়বিধ ভেদকে আবরণ করা। এইরূপ আবরণ দ্বারা সংসারের সৃষ্টি হয়।

আবরণ শক্তিটি দৃশ্য ও দর্শনের ভেদ এবং সৃষ্টি ও ব্রহ্মের ভেদ আবরণ করিয়া লিঙ্গদেহের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাক্ষীপুরুষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়েন। চিতের ছায়া বৈষম্যাবস্থার উপরে পড়িয়া ব্যবহারিক জীব আখ্যা গ্রহণ করে। আরোপ বশতঃ সাক্ষী-চৈতন্যেই জীবত্ব ভাসে।

এই আবরণ শক্তিটি বিনষ্ট হইলে তবে দৃশ্য ও দর্শনের যে ভেদ এবং ব্রহ্ম ও

জগতের যে ভেদ সেই ভেদবুদ্ধির উদয় হইবে। তখন বুঝিবে চৈতন্য দেহ নহেন এবং ব্রহ্মও জগৎ হন না। এইভাবে আপনাকে দেহ হইতে ও জগৎ হইতে পৃথক জানিলে তবে আরোপিত জীবভাব অপগত হইবে। আবরণ শক্তি চৈতন্য ও জড়ের যে ভেদ সেই ভেদকে আবরণ করে বলিয়া ব্রহ্ম জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। আবরণ বিনাশে ব্রহ্ম ও সংসারের ভেদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। আবরণ শক্তিই ব্রহ্ম ও সৃষ্টির যে ভেদ সেই ভেদকে আবরণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দেখাইতেছে যে রজ্জুটাই সর্প, দেহটাই আত্মা, এই জগৎটাও মিথ্যা নহে। এই আবরণ শক্তিটার বশেই ব্রহ্ম যেন বিকার-প্রাপ্ত হইয়া জগৎ হইয়াছেন এইভাবে ভাসেন। ব্রহ্ম ও জগৎ এইখানেও আবরণটি নাশ হইলেও ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদটি ভাসিয়া উঠে। ব্রহ্মের বিকার এই জগৎ—এই যাহা দেখিতেছিলে সেই বিকারটি কোথাও নাই। ব্রহ্মেও নাই কারণ চেতনের বিকার হইতেই পারে না আর সৃষ্টিতেও নাই কারণ সৃষ্টিটা যাহা তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র। কাহারও বিকার ইহা নহে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে পাওয়া যায় অস্তি ভাতি প্রিয় নাম ও রূপ এই পাঁচটি অংশের মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রহ্মরূপ এবং শেষ দুইটি জগৎরূপ।

সচ্চিদানন্দ-পরায়ণ হও। হইয়া নাম ও রূপ সাহায্যে হৃদয়েই হউক বা বাহিরেই হউক সর্ব্বদা সমাধি অভ্যাস করিতে থাক।

হৃদয়ে যে সমাধি করিবে তাহা সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প দুই প্রকার। আবার সবিকল্প সমাধি দুই প্রকার। দৃশ্য ও শব্দানুবিদ্ধ।

চিত্তগত কাম ক্রোধাদি হইতেছে দৃশ্য। ইহাদের সাক্ষীস্বরূপ যে চেতন তিনি হইতেছেন দ্রষ্টা। কামাদি দৃশ্য এবং তৎসাক্ষী চেতনের যখন ধ্যান কর তখন হয় দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি।

আর আমি অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, স্বয়ংপ্রভ বা স্বপ্রকাশ এবং দ্বৈতবর্জ্জিত এবং এইরূপ আমি আছি, এই যে শব্দানুবিদ্ধ সমাধি ইহাও সবিকল্প সমাধি।

দৃশ্য ও শব্দের সাহায্যে অনুভব রসের যে আবেশ তদ্দারা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। এই সমাধিতে 'অস্মি' আছি এই ভাবটি নির্ব্বাতস্থানে দীপশিখার মত শান্তভাবে অবস্থান করায়।

অন্তরের কাম ক্রোধাদি এবং তাহার দ্রষ্টা এবং আছি এইটিতে স্থিতি। এই তিন প্রকারের সমাধির মত বাহিরের যে কোন বস্তু অবলম্বনে আদি৺সন্মাত্র অবস্থা

হইতে যে নামরূপ পৃথক করা এবং সচ্চিদানন্দ রসাস্বাদনে স্তব্ধীভাব লাভ করা তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি।

বাহিরেই হউক বা ভিতরেই হউক এই ছয় প্রকার সমাধি দ্বারা নিরন্তর কালযাপন করিবে।

এইরূপ সমাধি করিতে করিতে রসাস্বাদন-রূপ পরমাত্ম-জ্ঞানে দেহাভিমান গলিত হইলে মন যেখানে যেখানে যাইবে সেইখানেই পরমামৃত-স্বরূপ শ্রীভগবান আত্মদেবের দর্শন হইবেই।

সেই পরাবর মূর্ত্তি দর্শনসীমায় উপনীত হইলে তখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইবে সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইবে এবং কর্ম্ম ক্ষয় হইবে।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম যিনি তিনি বলিতেছেন জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব আমাতেই কল্পিত, বস্তুতঃ নহে। যে ব্যক্তি বিশেষরূপে ইহা জানে সে ব্যক্তি মুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই।

ভগবান আশ্বলায়ন ঋষি এই আত্মজ্ঞানের কথা বলিলেন। সরস্বতী পূজা করিয়া এই আত্মজ্ঞান লাভ কর। কে করিবে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তর শেষে বলা হইতেছে।

(৩)

পূজা কেহ মানে ও করে; কেহ মানে কিন্তু করে না; আর কেহ মানেও না আর করেও না বরং অন্যকে করিতে দেখিলে দুঃখিত হয়, কেহ জ্বলনাত্মিকা বৃত্তিতে উৎপীড়িত হয়, হইয়া মুখর হইয়া চারিদিক মুখরিত করিতে না পারিলে 'সোয়াস্তি' পায় না।

উত্তম, মধ্যম, অধম শাস্ত্র এই তিন রকমই প্রায় বলিয়াছেন। কেহ কেহ অধমাধমও ইহার সহিত যোগ দেন। বস্তু সকলে এবং মানুষ সকলে কি এই চারি প্রকার আছে?

শ্রীগীতা জীবের কোন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন নাই। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসে যেরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেই সব হইয়া গেল না। কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ হইয়া গেলেও যাহা বাকী থাকে তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীগীতা। গীতা কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করাইতে হয় কিরূপে তাহারই জন্য। শ্রীঅর্জ্জুন ক্ষত্রিয় হইয়াও স্বধর্ম্ম ত্যাগ

করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা করিতেছিলেন আর শ্রীভগবান্ কর্ত্তব্য বিমুখকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

পূজা যাঁহারা মানেন ও করেন তাঁহাদের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

পূজাত করিবে কিন্তু কতক কতক না করিয়া ভালরূপে করিলে কি হয় না? কতক কতক করায় যে কিছুই হয় না তাহা বলিবে কে? কতক কতক করিলেও জিনিষটি থাকে একবারে লোপ পায় না। শাস্ত্রও বলেন "অকরণাৎ মন্দ করণ-মপিশ্রেয়ঃ"।

একবারে না করা অপেক্ষা মন্দভাবে করাও ভাল। আমাদের জাতিতে এখনও তাই চলিতেছে বলিয়া সময়ে সময়ে পরমহংসদেবের মত কেহ আসিয়া বহু বিকৃত মস্তককে প্রকৃত করিয়া দিয়া যান। নতুবা শাক্ত মানুষ বিষ্ণু উপাসনার কথা বলিলে বৈষ্ণবে তাহা কি সহ্য করিত? যদি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মা মা করিয়া অপূর্ব্ব ভাব না দেখাইতেন, যদি কালী ভাবিয়াও কৃষ্ণকে পূজা করা যায় ইহা না দেখাইতেন তবে চণ্ডী রামায়ণও বুঝি থাকিত না। শ্রীরামপ্রসাদ মা মা করিয়াও গান বাঁধিয়াছিলেন "হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে" কিন্তু ইহাতেও যেন কুলাইতে ছিলনা, তাই পরমহংসদেব আরও একটু তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। আরও উঠিতে হইবে। শ্রুতি পর্য্যন্ত না উঠিলে কুলাইবে না।

সকল পূজাই শ্রুতি সম্মত। সরস্বতী পূজাও তাই। ১৩১৭ সালের পৌষের উৎসবে সরস্বতীরহস্য উপনিষদে যাহা আছে তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া আবার বলা হইল।

পূজাত করেন পূজক ব্রাহ্মণ, আর পুষ্পাঞ্জলি দেয় আর সকলে। অন্ততঃ পূজকও ঠিক ঠিক সরস্বতী পূজা করুন এবং আর যাঁহারা পুষ্পাঞ্জলি দেন তাহা-দিগকে ইহা বুঝাইয়া দিন। এইরূপ করিতে করিতেই হইবে।

অভিমান।

শুধু কর্ম্মক্ষয় করিতেই কি আমার আগমন? এ কর্ম্মক্ষয়ের কি শেষ নাই? যদি শুধু কর্ম্মক্ষয়ের জন্য এই সাধনোচিত মানবজন্ম শেষ করিতে হয়, তবে প্রাণের অন্তঃস্থলে ক্ষীণ আশার আলোক জ্বালিলে কেন? তবে বৃক্ষ লতা পল্লবে, আকাশ সমুদ্র পর্ব্বতে, চন্দ্র সূর্য্য তারকায় সর্ব্বত্র তোমার বিশ্বরূপের ছায়া ছায়ামত মূর্ত্তি দেখাইলে কেন? আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঐ মূর্ত্তি দেখাইতে কে বলিয়াছিল? সুন্দর হাসি হাসিয়া, সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করিয়া, মৃদু অঙ্গুলী সঞ্চালনে আশা-বাণীর তড়িত প্রবাহ হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে কে বলিয়াছিল? যদি একবার পরশ-মাণিক ছোয়াইয়া এ দেহটী স্বর্ণময় করিয়া দিলে তবে এটা আবার লৌহময় হইয়া যায় কেন? মনে হয়, আমি একরকম ভালই ছিলাম। "বিষের কৃমি বিষে থাকে মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই। আমি তেম্‌নি বিষের কৃমি বটি আমি করি বিষের বড়াই।" আমিত বিষের "বড়াই" করিতে করিতে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম তবে দয়া করিয়া টানিয়া তুলিলে কেন? তুমিত দয়া না করিয়া থাকিতে পার না। "দদাম্যেতৎ ব্রতং মম"। দয়া করাইত তোমার ব্রত। তাই সাধ্য সাধনা করিয়া—মন প্রাণ পাগল করিয়া কুলের বাহির করিতে কে তোমাকে বলিয়াছিল? আর যদিইবা করিলে তবে চিরকালের জন্য সাথের সাথী করিয়া লওনা কেন? এ উঠা নামার স্রোতে ডুবিতে ভাসিতে আমিত আর পারি না। যদি ডুবাইতে হয় তবে একেবারে ডুবাইয়া দাও নতুবা তীরে লইয়া যাও।

হায়! একথা কাহাকে বলিব? বলিয়া গেলে—ডাকিলেই আসিবে? যতটুকু সাধ্য তোমাকে ডাকিতে প্রাণপণত করি কিন্তু তুমি আসিবার মত আসা আসিলে কই? আর কতদিন অপেক্ষা করিব? এত অপেক্ষা কি করা যায়? তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তোমাকে পাইলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। কর্ম্মক্ষয়ে তোমার কাছে যাইতে পারিব—এত বিলম্ব কি সহ্য করা যায়? এত প্রারব্ধ ভোগও কি আমার কপালে আছে? তুমি আমার সর্ব্বশক্তিমান—আমার প্রারব্ধভোগ শেষ করিয়া দেওয়া কি তোমার এতই মুস্কিল?

আর কাহাকেই বা এই দুঃখের কথা বলিব। সন্তান মায়ের নিকট প্রহৃত হইলে মা মা করিয়াই কাঁদে। তাহার যে আর কেহ নাই। তাই মা দুষ্ট সন্তানকে

আপন স্নেহময় অঙ্কে টানিয়া লয়। তুমি দয়া করিয়া না আসিলে আমার সাধ্য কি ডাকিয়া আনি? স্বামী আপন শক্তি জায়াকে, যোদ্ধা আপন প্রিয়তম সহচর অশ্বকে, গাভী আপন আবাসস্থান গ্রামকে স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত হয়। তবে তোমার অসীম করুণায় এত কৃপণতা কেন? আমার হৃদয়ে শত সাধ আছে। কোন সাধইত মিটিল না। তুমি এস। আসিয়া আমার ভাঙ্গা হৃদয় জুড়িয়া ব'স। আমি তোমাকে লইয়া তোমার ধ্যান ধারণায় অন্তরে বাহিরে ডুবিয়া থাকি।

তোমার ভাবনা করিতে করিতে তোমার প্রাণ-মন-পাগল-করা মধুর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সময় সময় যেন কেমন হইয়া যাই; সব শূন্য হইয়া যায়—সেই শূন্য স্থানে—সেই পরম ব্যোমে শুধু তুমিই থাক। আবার তোমাকে দেখি। দেখিতে দেখিতে তোমার তত্ত্ব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তখন যেন তোমাকে হারাইয়া ফেলি। তোমার মধুর মূর্ত্তিতে তন্ময় না হইয়া তোমার তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমি রস পাই না। তুমি রসময়, তোমাকে দেখিতে দেখিতে কত রসের ফোয়ারা ছোটে কত তত্ত্ব-ভাবনা মনে আইসে। কেন তোমার মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগে না—কেন তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে কত তত্ত্ব-ভাবনার লহরী তুলিয়া দিয়া আমাকে যেন কেমন করিয়া দেয়, তাহা আর কি বলিব। এই আনন্দে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতে আমাকে বঞ্চিত কর কেন ঠাকুর! আমার অনুপায়ের উপায় ত তুমি। তুমি সকলই ত পার। লীলাচ্ছলে শুধু শুধু কত ইন্দ্রজাল তুলিতে পার। কত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা ও ধ্বংস করিতে পার; আর আমাকে তোমার দাস করিয়া লইতে—তোমার মনের মত করিয়া লইতে কি তোমার এত ক্লেশ? সত্য বটে আমি অনেক ব্যভিচার করিয়াছি কিন্তু সে ত তুমি আমাকে এতদিন পায়ে ঠেলিয়াছ তাই। তুমি আমাকে তোমার করিয়া লইলে যদি ব্যভিচার থাকে তবে আমাকে ত্যাগ করিও। তোমার নাম স্মরণ করিলেই আমি কত পবিত্র হই। আর তোমার দর্শনই যে আমার পবিত্রতা। তদ্ভিন্ন আর পবিত্রতা কোথায়?

দুঃখের কথা আর কতই বলিব? তুমিত সবই জান তবু বলি। সন্তান না কাঁদিলে নাকি জননীর স্তন্য দিবার কথা মনে থাকে না। মা নানা কাজে বড়ই ব্যস্ত থাকেন। থ'লের মধ্যে পুরিয়া দুরন্ত বিড়াল ছানাকে যেমন নদী পার করিয়া দেওয়া হয় আমাকেও তেমনি সুখময় পূর্ব্ব স্মৃতি বিস্মরণ করাইয়া নদীর পরপারে এই জনন মরণ রূপ সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছ · বিড়াল ছানা নিরুপায়

হইয়া ম্যাও ম্যাও করিতে থাকে। আমিও তেমনি মা—ওমা—মা করিতেছি। বাহিরে যাইবার সাধ্যত নাই। থ'লের মুখ যে বন্ধ। তুমি যদি দয়া করিয়া থ'লের মুখ খুলিয়া দাও এবং সঙ্গে করিয়া পর-পারে লইয়া যাও তবেই না আমার মুক্তি!

হে কৃপাময় শ্রীগুরু! একবার প্রসন্ন হও। সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া হে স্বপ্রকাশ! আমাতে প্রকাশিত হইয়া আমাকে মহা-মিলনের শুভ বার্ত্তা শুনাইয়া দাও। আমি মহানন্দে যাত্রা করি। ঠাকুর! আজ আমি কর্ম্মদোষে বিপন্ন তাই তোমার চরণ ধূলার ভিখারী কিন্তু আমার যেদিন সুসময় ছিল যেদিন তুমি কৃপা করিতে—সেদিন চরণে কেন হৃদয়েও স্থান দিয়াছ কিন্তু আজ তোমার উল্লাসের এই জগৎ তোমার স্পর্শ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে। মা যেমন মললুলিত বপু সন্তানকে কোলে তুলিয়া লয় তেমন ভাবে তুমি আমাকে তোমার শান্তিময় বক্ষে টানিয়া লও। তুমি আমাকে স্বহস্তে দণ্ড দিয়া পাপমুক্ত কর, পরের হাতে আর দণ্ডভোগ করাইও না। "ভদ্রার" মত তোমার বিশ্ব রচনা আর কখনও দেখিতে চাহিব না।. আর যদি বা এরূপ বাসনা কখনও মনে আইসে তবে শুধু "যাইও না" বলিয়া ক্ষান্ত হইও না। যাহাতে তোমার সঙ্গ-সুখ হইতে তিলেকের জন্যও বঞ্চিত না হই তাহার বিধান করিও। ঠাকুর! তুমি এস—তোমাকে ছাড়িয়া আমার কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কিম্বা "অকামো বিষ্ণুকামোবা" এরূপ ত হয় না। আমার সকাম কর্ম্ম ত আরও কর্ম্ম বাড়াইয়া দেয়। স্বর্ণ শৃঙ্খল কিম্বা লৌহ শৃঙ্খল দুইটিইত বন্ধনের কারণ। আমার বাসনা ক্ষয় ত হয় না। বাসনা ক্ষয় না হইলে মনোনাশ হইবে না। মনোনাশ না হইলে তোমার তত্ত্ব আলোচনায় বিভোর হইয়া সর্ব্বদা তোমাকে লইয়া থাকিতে না পারিলে "ভুঞ্জন্ প্রারব্ধ মখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা" আমার কি করিয়া হইবে? তাই এখন একবার এস—একবার শ্রীগুরু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এস। আসিয়া আমার জীবন প্রদীপ আবার উজ্জ্বল করিয়া দাও। আমি হাসিমুখে প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিয়া ফেলি।

শ্রীগুরুদাস—

আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবলই চলিয়াছি। কোন্ অশুভ প্রত্যুষের অশুভ মূহুর্ত্তে এই অশুভ চলন আরম্ভ হইয়াছে স্মরণ নাই। কত বাধা বিঘ্ন—কত বন উপবন, কত পর্ব্বত কান্তার, কত নদ নদী, কত খাল বিল, কত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহার ইয়ত্বা নাই তথাপি সম্মুখে যে পথ সেই পথ। যতদূর দৃষ্টি চলে কোথায়ও সীমা আছে বলিয়া মনে হয় না। কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় গিয়া থাকিব কিছুই জানিনা। পদে পদে বিঘ্ন, তথাপি চলিতেছি। পথে কত যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। ক্ষণেকের জন্য কত পান্থশালায় আশ্রয় লইয়া কতজনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিলাম, কত হাসি কান্নার অভিনয় করিলাম—তাহার হিসাব নাই। শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে শান্তি পাইবার আশায় কতজনকেই না আকুল প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেকেই বাতুল মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। যাঁহারা দয়া করিয়া উত্তর দিলেন তাঁহারা বলিলেন "বেশ ভাবিয়া দেখ—ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া, পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া অনন্তের পথে এই যাত্রাতেই শান্তি আছে। নিজের দিকে না তাকাইয়া নাম ডাকিয়া ডাকিয়া পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর এই জগতেই শান্তি পাইবে। দেখিতে জানিলে এই জগতই সুখের।" তাঁহাদের কথাগুলি আশাপ্রদ হইলেও যেন একটু "খাপ ছাড়া" বলিয়া বোধ হইল। তথাপি নিজকে ভ্রান্ত বলিয়া ধিক্কার দিয়া সকল বিষয়েই আবার নূতন করিয়া শান্তির অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন, জানিনা কোন সৌভাগ্যবশে, কোন এক শুভ মূহুর্ত্তে অপর এক যাত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনিও অন্যান্য যাত্রীর মত সম্মুখে চলিতেছেন বটে কিন্তু গতি মন্থর অচঞ্চল। নিকটে গিয়া একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাঁহার বাহ্যিক গতি সম্মুখে থাকিলেও দৃষ্টি কিন্তু পশ্চাৎ দিকে। পরে আরও একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি প্রকৃতই কোন শাশ্বত শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন। ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, তোমার পশ্চাতে অতি নিকটে এক নিত্য বস্তু অনাদি কাল হইতে নির্ব্বিকার ভাবে দণ্ডায়মান আছেন। তিনিই একমাত্র সুখ ও শান্তির আকর। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত কর সকল জ্বালা

জুড়াইয়া যাইবে, চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া তাঁহাতেই স্থিতিলাভ করিতে পারিবে। দেখিবে তোমার কোনই চলন নাই, উহাই তোমার প্রকৃত অবস্থা—তোমার স্বরূপ। তুমি যাহা তাহাই আছ—যেখানে ছিলে সেইখানেই আছ। তুমি তাঁহার দিকে—তোমারই স্বরূপের দিকে "পিছন" করিয়া দাঁড়াইয়া আছ তাই তোমার এই দুঃখের স্বপ্ন দেখা মাত্র। তোমার সম্মুখে যাহা তাহা ঐ পশ্চাতস্থিত স্বপ্রকাশ চিন্মণির অনন্ত প্রসারি, অনন্ত কোটী ঝলক রশ্মি মাত্র। তুমি তোমার ঐ ঝলক-নিবদ্ধ-দৃষ্টি প্রত্যাহার করিয়া যাঁহার ঝলক সেই স্বপ্রকাশ, চলন রহিত চিন্মণিতে আবদ্ধ কর, তোমার দুঃখের স্বপ্ন ঘুচিয়া যাইবে।" কথাগুলি শুনিবা-মাত্রই প্রাণে আশার সঞ্চার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চকিতের ন্যায় একবার পশ্চাতে দৃষ্টি পড়িল, তখন ক্ষণকালের জন্য সকল জ্বালা জুড়াইল বটে কিন্তু একেবারে স্থির হইতে পারিলাম না। তখন তিনি স্নেহ করিয়া আবার বলিলেন—"দীর্ঘকাল যে সাধের "কাজল" পরিয়া আসিতেছ তাহা হঠাৎ মুছিবে কিরূপে? তথাপি কোনই ভয় নাই, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর, ঠিক হইয়া যাইবে। হতাশ হইও না, আমি তোমার সঙ্গেই থাকিব, তোমাকে অকুল পাথারে ফেলিয়া যাইব না।" এখন সেই মহা পুরুষের চরণ ধূলিই ভরসা—দেখি এ ভ্রমণের শেষ কোথায়?

ভ্রান্ত পথিক—

রাগিণী—খাম্বাজ।

আর সহেনা ভবে যাতনা, যড় রিপুর তাড়না।
চৌদিকে কেন মা হেন প্রলোভন, অন্তরে দুরন্ত বাসনা॥
সুধা দিয়ে হাতে, নিবারিলি খেতে, ভুঞ্জিলে কর লাঞ্ছনা।
(ওমা) সুখ দিবি বলে, আনিলি ভুতলে, সে সব দেখি ছলনা॥
রূপ রস কত, গড়ি শত শত, দিলি মোরে আঁখি রসনা।
হ'লে মিটাইতে সাধ, ঘটাও প্রমাদ এ কেমন করুণা॥
বুঝেছি মা এবে, সুখ নাই এ ভবে, আশা মাত্র বিড়ম্বনা।
তাই দেখাইতে জীবে, প্রমাণ দেয় সবে, তাই বুঝি হেন রচনা॥

শ্রীদী—

রাগিণী—পিলু।

লোকে বলে ওমা শ্যামা, তুই নাকি গো বেদের মেয়ে।
ভোজের বাজী সাজে কি মা কৈবল্য দায়িনী হয়ে॥

ভেল্‌কি খেলা দেখাও কত, লোকের চখে ধুলো দিয়ে।
অনন্তরূপ একলা ধর, অবাক্ হয়ে থাকি চেয়ে॥

লুকিয়ে থেকে আঁধার ঘরে, আলো দাও জ্বেলে বাহিরে।
উল্‌টো দিকে সবাই ঘোরে, ঘরে না কেউ খোঁজে ভয়ে॥

মা সেজে সন্তানের মুখে, স্তন্য দাও দেখি গো সুখে।
(আবার) কালরূপে ব'ধে তাকে, আপনি কাঁদ অধীর হয়ে॥

যদুকুলে জন্ম লয়ে, স্ববংশে নাশ হাসিয়ে।
(আবার) কালীদয়ে নারি হয়ে, করী গ্রাস উগারিয়ে॥

কভু ভুবন মোহিনী, কভু করাল বদনী।
গোকুলেতে নীলমণি, জ্ঞানরূপে মম হৃদয়ে॥

রঙ্গ দেখে যাইমা ভুলে, চিন্‌তে নারি আপন বলে।
(একবার) খেলা ভেঙ্গে আয় মা কোলে, রাখিব হৃদে মিশায়ে॥

শ্রীদী-

ছাইভস্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি নদী তীরের লোক, কিন্তু কচ্ছপকে এমনভাবে বেড়াইতে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ইহারা কাহাকেও কিছু বলে না। তীর্থ মাহাত্ম্য শুনিয়াছি এবং সংস্কৃত গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, তপোবনে সিংহশিশু মুনিতনয়ের সহিত ক্রীড়া করে, তপোবনে ব্যাঘ্র এবং হরিণ একসঙ্গে খেলা করে। এই ত তাহার নিদর্শন! যাহারা পবিত্র সরযূ সলিলে নিত্য সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করে তাহারা কি কখন হিংস্র হইতে পারে? আবার কি ভারতে তপোবন হইবে, আবার কি বাঘে হরিণে খেলা করিবে? আবার কি বালকে সিংহের মুখ ব্যাদান করিয়া

তাহার দাঁত গণিবে!! হিন্দুর আদর্শ অতি মহৎ ও উজ্জ্বল। সর্ব্ব প্রকার পার্থিব বিভবের অধীশ্বরী, মণি মুক্তা হীরকময়ী, বিচিত্র পরিচ্ছদ ধারিণী সসাগরা বসুন্ধরা রাণী, মহীয়সি পাশ্চাত্য সভ্যতা সুন্দরী বলেন "অনাহার ক্লিষ্ট বসন ভূষণ পরিশূন্য, ধনরত্নহীন, অবহেলিত, ঘৃণিত হিন্দুর লাঞ্ছনা তাহার কুহেলিকা পরি বৃত সাধনাতীত আদর্শের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল।" তিনি দয়া করিয়া উপদেশ দেন "যে আদর্শ লাভ করা যায় না সে আদর্শ ত্যাগ কর; যাহা লাভ করা যায় তাহার সাধনা কর, মঙ্গল হইবে।" দীনহীনা, বসন ভূষন বিহীনা, নিরাভরণা হিন্দু সভ্যতা আপনার হেঁট মুখ উচু করিয়া প্রায়ই কথা বলে না, কিন্তু সময় সময় তাঁহার মনে হয় "গৌরবময়ি! আমাকে উপদেশ দিলে বলিয়া তোমাকে শত ধন্যবাদ দিতেছি, আমার শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রহণ কর; তোমার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক। তুমি এক্ষণে ভোগ বাসনায় মুগ্ধা, আমার কথা অধুনা তোমার ভাল লাগিবে না। যখন তোমার অবসাদ আসিবে, প্রমোদ কাননের নৃত্য গীত যখন তোমার ভাল লাগিবে না তখন আমার কথা তোমার মনে উঠিবে, তখন তুমি বুঝিবে যে, যে অমূল্যধন সুদুর্লভ সেই সাধনার ধনই আমাদের একমাত্র উপাস্য, আরাধ্য, লক্ষ্য হওয়া উচিত তখন তুমি বৈরাগ্যের মহিমা খুঁজিবে। হিন্দু-আদর্শ বুঝিবার শক্তি, সাধনা ব্যতীত লাভ হয় না। বহু জন্মের সাধনা বলে হিন্দু-আদর্শ বুঝিবার শক্তি জন্মে।

স্নান করিয়া আর্দ্র বসনে সরযূ সলিলে সচন্দন পুষ্প ও দুগ্ধ ভাসাইয়া দিলাম। অশ্রু ধারায় গণ্ডদেশ ভাসিতে লাগিল; আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই বুঝি না, আমার ভক্তি নাই এই দুঃখে অন্তর বিদীর্ণ করিয়া গভীর বেদনা উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সাশ্রু নয়নে পশ্চাৎ দিকে চাহিতে চাহিতে বাসায় ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। প্রাণে বাজিতেছিল "সরযূ, সরযূ, সরযূ।"

(৩)

সরযূতটে ভ্রমণ করিয়া, সরযূ সলিলে স্নান করিয়া, সরযূর জলে চাঁদের আলোর খেলা দেখিয়া, সরযূর সহিত মনের কথা বলিয়া রামচন্দ্রের বাড়ী দশরথের কিল্লা ইত্যাদি দেখিয়া দিন কাটাই। একজন ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া দেন; সময়ে হউক আর অসময়ে হউক ভাল হউক আর মন্দ হউক সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করি।

আমার তীর্থ পুরোহিত, পাণ্ডা হনুমান প্রসাদের যে প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক কক্ষে আমি বাস করিতাম সেই অট্টালিকার আমার কক্ষ সমীপস্থ দুই তিনটী

কক্ষ লইয়া একটী বাঙ্গালী পরিবার অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিদেশে সহজেই বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় এবং ভাব হয়। আমাদেরও তাহা ঘটিল। দু'একদিনে আমার সহিত এই বাঙ্গালী পরিবারের বিশেষ পরিচয় হইয়া গেল। আমি ব্রাহ্মণবংশজাত, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। মেয়েরা বলিলেন "তুমি একাকী কষ্ট করিয়া অমন আহারাদি কর কেন? আমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া কল্লে পার। আমরা তাতে খুব সুখী হ'ব।" অমি বলিলাম "আমার বিশেষ কোন কষ্ট নাই। দু' চার দিন যা' এখানে থাকিব তা এমনভাবে থাকিলেই কাটিয়া যাইবে।" তখন স্নেহময়ী রমণীগণ এবং স্নেহময় পুরুষ সকল, উভয় দলে মিলিয়া, আমার প্রতি মধুর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। একটী বালক আমাদের বিচারের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা না করিয়া ছুটিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। আমার মাল পত্র, আসবাব এক হাতে করিয়া ছুটিয়া ফিরিল। মাল পত্র আর কি? একখানি কাপড়, একখানি গামছা, একটী চাদর, একটী পেন্সিল এবং একখানি ছোট খাতা। এই মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার একখানি নেকড়ায় বাঁধা ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল। বালক এই আসবাব লইয়া আসিল। আমার বাসা পরিবর্ত্তিত হইল। আমার ঘরকন্না উঠিল। একটী বালক একলম্ফে আমার জীবনের এই মহা-পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিল।

বালক বালিকারা কাঁধে পিঠে চড়ে। মেয়েরা আদর যত্ন করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়ান। পুরুষেরা হাস্য আমোদে আমার অবসরমত আমাকে পরিতুষ্ট করেন। আমি আজ এই বাঙ্গালী পরিবারের একজন। এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতবার যে এইরূপে কত বিভিন্ন পরিবারের "একজন" হইয়াছি তাহা আর কি বলিব! হে সহৃদয় ভ্রাতৃগণ, অয়ি করুণাময়ী বিদেশিনী ভগিনীগণ, কতকাল চলিয়া গিয়াছে তোমাদের স্নেহ প্রীতি-সমুজ্জল চাঁদমুখ দেখি নাই, তোমাদের শান্তিময় আশ্রমে আদরের অতিথি হইয়া তোমাদের স্নেহ-করুণা-মধুর খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া ধন্য হই নাই, কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ এই শৈলশিখরে, কাল ঐ সমুদ্রবক্ষে, পরশ্ব ঐ মরুমাঝারে ঘুরিতেছি,—হয়ত সারা-বৎসরেও একবার তোমাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করি না, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভাই, কিন্তু তা' বলিয়া কি বহিন্, তোমাদের সেই আদর যত্ন বিস্মৃত হইয়াছি! তোমাদের সেই শান্তিময় আশ্রয় ভুলিয়া গিয়াছি? তোমাদের সেই চন্দ্রানন, সেই মধুর অধরের মৃদু হাসি কি নয়ন হইতে অপসৃত হইয়াছে? না, ভাই, আমি

তোমাদিগকে ভুলি নাই। না ভগিনী, আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হই নাই। সেই বিদায়ের দিনে, সেই বিদায়মুহূর্ত্তে, যখন "আমি তবে" বলিয়া তোমাদের নিকট বিদায় চাহিতাম তখন তোমাদের মুখমণ্ডল যে গভীর বিষাদ অন্ধকারে আবৃত হইত সেই অন্ধকার আজিও আমার নয়নপথাতীত হয় নাই, তখন তোমরা নীরবে যে রোদন করিতে সেই বেদনাপূর্ণ নীরব রোদন আমার মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া আছে—সেই পবিত্র নয়নজল আমার প্রতি শোণিতবিন্দুতে মিশ্রিত হইয়াছে, যাবৎ আমার ধমনীতে শোণিতপ্রবাহ বহিবে তাবৎ ভাই, তাবৎ বহিন্, তোমাদের পুণ্যস্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরুক রহিবে। তোমরা জানিতে আমি বিদেশী, তোমরা জানিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আজ তোমাদের আশ্রমে আসিয়াছি কাল আবার অন্যত্র চলিয়া যাইব, তোমরা জানিতে জীবনে আর কখনও হয়ত আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না তবুও এই নিষ্ঠুর পাষাণের প্রতি তোমাদের এত স্নেহ, এত মমতা! তোমাদের ভুলিব কেমন করিয়া? এই বিশ্বে যত কিছু সুন্দর মধুর সকলই আমার আদরের। অরুণোদয়ে পূর্ব্বকাশের মনোহারিণী শোভা, দিনান্তে পশ্চিমগগণের মধুরিমা, জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার সৌন্দর্য্যসম্ভার, তারকাকিরীটিনী অমানিশার সুষমা, চিত্রবিচিত্র-মৃগ ময়ূর-সম্বর্দ্ধিত মহানহীধর-মহিমা, কল্লোলময়ী, স্রোতস্বিনীর সৌন্দর্য্য, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সহায় অসীম বারিধির গাম্ভীর্য্য—যেমন আমার চিরসহচর চিরসহচরী তোমরাও আমার তদ্রূপ চিরসহচর চিরসহচরী, যখন যে স্থানে যে অবস্থায় থাকিনা কেন তোমরা আমার সঙ্গে থাক—এই দেখ আমার এই ভগ্ন কুটীরে আমার আসনের চতুর্দ্দিকে তোমরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছ,—তোমাদের নয়নে সেই স্বর্গীয় প্রীতি, তোমাদের অধরে সেই ত্রিদিবের হাসি। তোমরা দেব দেবী। আসন পরিত্যাগ করিয়া সাষ্টাঙ্গে আমি তোমাদিগকে প্রণাম করিতেছি; আশীর্ব্বাদ কর দেব, আশীর্ব্বাদ কর দেবি, আমি যেন তোমাদেরই মত হই!

(৪)

কিছুদিন হইতে স্বভাবটা কেমন "একাযেঁড়ে" হইয়া গিয়াছে। একাকীই থাকি ভাল। তাই ভ্রমণের সময় একাকী ভ্রমণ করি। যেস্থানে বসিতে ইচ্ছা হয় দু'দণ্ড বসি। যেস্থানে বৃক্ষপত্রান্তরাল হইতে পাখীর মধুর কাকলি বায়ুস্রোতে সঙ্গীত তরঙ্গ তুলিতে থাকে সেস্থানে যতক্ষণ প্রাণ চায় ততক্ষণ দাঁড়াই। যেস্থানের নদীর স্বচ্ছ সলিল উপলখণ্ডের উপর দিয়া ঝিক্‌মিক করিয়া বহিয়া যায় সেস্থানে বসিয়া ভাবি অমন নির্ম্মল হৃদয় পাইব কি? সন্ধ্যার আগমনে যখন ভূমণ্ডল

অন্ধকার আবরণে বেষ্টিত হইতে থাকে তখন ভাবি জীবনসন্ধ্যারও ত স্বভাব এই। বৃক্ষের লোহিতাভ কিসলয়ে তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ খেলিতে দেখিলে অনেক সময় নৃত্য করি। অন্য কেহ সঙ্গে থাকিলে ইচ্ছামত বসা দাঁড়ান যায় না। অন্য লোকের সম্মুখে আবার লজ্জা করে। যে সবুজ বৃক্ষপত্রটী যত্নে ঝাড়িয়া চুম্বন করি অন্য কেহ সঙ্গে থাকিলে সে পত্রটী চুম্বন করিতে পারি না, সে কি মনে করিবে? যে কথাটী মনে আসিলে নাচ পায় সে কথাটী মনে আসিলেও নাচিতে পারি না, লোকে মনে করিবে এত বাড়াবাড়ি কেন? শূন্যে যে আলাপ করি, অন্যের সম্মুখে নীলাকাশের সহিত সে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে পারি না, মনে করিবে লোকটা পাগল নাকি? এইরূপ নানা কারণে অনেকদিন হইতে একাকীই থাকি ভাল, একাকীই ভ্রমণ করি। অযোধ্যায়ও একাকী বেড়াই।

আমি যাঁহাদের সঙ্গে থাকি আমার সঙ্গে তাঁহাদের ভ্রমণ করা ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা প্রায়ই বেলা পড়িলে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়েন। প্রত্যহই একজন না একজনকে বাসায় থাকিতে হয় কারণ তাঁহাদের আসবাব অনেক, ভয়—পাছে চুরি যায়—হনুমানে লইয়া যায়। দু'একদিন আমি জোর করিয়া বাসায় থাকি, তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে বেড়াইতে যান। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি এই পরিবারের কেহই অপরাহ্নে বাসায় থাকিতে চাহেন না, সকলেরই ইচ্ছা বেড়াইতে যাওয়া। কিন্তু একটি রমণী নিত্যই বাসায় থাকিতে চাহিতেন, অধিক দিন তিনিই বাড়ীতে থাকিতেন। রমণীর বয়স এখনও ত্রিশ বৎসর হয় নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জননী ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত আযোধ্যায় আসিয়াছেন। এই বাঙ্গালী পরিবারের সকলেই যেন একটু তরল। হাস্যরহস্য, অকারণ সঞ্জাত আনন্দ কোলাহল ইত্যাদি তরল আমোদে তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই রমণীকে কখনও চপলতা করিতে দেখি না। মুখে চাঞ্চল্য বা তরলতা নাই, দুঃখ বা বিষাদ নাই; কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন উদাস ভাব। আমি তাঁহাকে দিদি বলি। দিদির সহিত আমার নূতন পরিচয়, সুতরাং কৌতুহল হইলেও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি, "তোমার বুড়ী মা হাসিতেছেন, তোমার বড় ভাই রাগ করিতেছেন, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী ত রঙ্গরহস্য তরলতা ছাড়া জানেন না, তবে তুমি অমন কেন?"

একদিন দ্বিপ্রহরের সময় বাহিরে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিলাম। দ্বিতলে উঠিয়াই বুঝিলাম সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। কারণ,

মহাকোলাহল ত হইতেছে না, হাসির রোল ত উঠিতেছে না। ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটী পুঁটুলি খুলিয়া দিদি কি দেখিতেছেন। আমার পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়াই "দাদা যে আজ এত সকালে ফিরেচ?" বলিতে বলিতে পুঁটুলি বাঁধিয়া তাঁহার বাক্সে রাখিলেন। আমি বলিলাম, "হ্যাঁ দিদি, ক্ষিধে পেয়েচে, তাই এসেচি।" দিদি তাড়াতাড়ি খাবার ও জলের গ্লাস আনিয়া যত্নের সহিত খাওয়াছিলেন। আমার মনে হইতে-ছিল, "দিদি কি করিতেছিলেন? আমাকে দেখিয়া লুকাইলেন কেন? বোধ হয় ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা প্রস্তুত করিতেছিলেন,—তা' ছিন্ন কাপড়গুলি ভয়ে ভয়ে বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন কেন?" মুখ ফুটিয়া কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বাড়ীতে অপর কেহ নাই দেখিয়া জল খাইয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হনুমানের খেলা দেখিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যে দাদা, মা ও ভগিনী হাসিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। দাদার হাতে এক ঠোঙ্গা লুচি। অযোধ্যার লুচি সকল বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত নহে। কাল বড় মোটা। আমাকে দরজায় দেখিয়া দাদা বলিলেন "কি গো, আজ যে এর মধ্যেই ফিরেছ? রাস্তায় দাঁড়িয়া কি দেখ্‌চ? রোজই ত হনুমান দেখ। ওর আর কি দেখ্‌চ? লুচি এনেছি, বেশ লুচি গো, খাবে এস।" এই কথা বলিয়া দাদা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন। এত আদর যত্ন কি উপেক্ষা করা যায়? কাহারও মিষ্ট কথা কখনও অনাদর করিতে পারি না। সংসারে যথার্থ স্নেহ মমতা অত্যন্ত বিরল। যে স্থানে এক বিন্দু স্নেহ পাই সে স্থানে প্রাণ গলিয়া যায়। লুচির লোভে যত হউক আর নাই হউক, আদরের লোভে দাদার সহিত উপরে উঠিলাম। আমাদের পদ শব্দে এবং কোলাহলে দিদি আসিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন। দাদা বলিলেন, "নে ত বোন্, লুচি ভাগ কর। সকলে খাওয়া যাক্। ম্লান হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতিঃ মুখে ফুটিতে যাইয়া গাম্ভীর্য্যে বিলীন হইয়া গেল। দিদির অন্য কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। পরম যত্ন করিয়া দিদি আমাদিগকে লুচি ভাগ করিয়া খাওয়াইলেন।

(৫)

দুইদিন পরে সরযূর ওপারে গিয়াছিলাম। লক্ষ্মণ এই সরযূ পার হইয়া সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের আদেশে বনবাস দিয়া আসিয়াছিলেন। মিথিলাধিপতি জনকের নন্দিনী, অযোধ্যার ঈশ্বর দশরথের পুত্রবধূ, শ্রীভগবানের আদরিণী

প্রেয়সী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী দেবীকে লক্ষ্মণ কোন স্থানে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সন্ধান করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। যেন চতুর্দ্দিকে মহা বিষাদের ছায়া ছড়াইয়া রহিয়াছে, যেন দুঃখবার্ত্তা প্রকৃতিদেবী আজিও বিস্মৃত হয়েন নাই। সরযূতীরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, হয়ত এইস্থানে বসিয়া, অযোধ্যার দিকে চাহিয়া "রাঘববাঞ্ছা" কত অশ্রুই বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সতীর পবিত্র অশ্রু হয়ত সরযূ প্রবাহে মিশিয়াছে। বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। গভীর বেদনা বুকে করিয়া সরযূর জল ভক্তিভরে মস্তকে দিলাম। আশা, যদি সতীর পবিত্র নয়নজল স্পর্শে পাপীর পাপ বিমোচন হয়!

জানকীর জীবন বাস্তবিকই দুঃখের জীবন। যেদিন হইতে রামচন্দ্রের সহিত সীতার ভাগ্য বিজড়িত হয় সেই দিন হইতে অন্তর্দ্ধানের দিন পর্য্যন্ত সতী কেবলই কাঁদিয়াছেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই পরশুরামের সহিত রামের যুদ্ধ, সীতার প্রাণ এই যুদ্ধের সময় কতই না কাঁদিয়াছিল! তাহার পর অভিষেকের প্রারম্ভেই বনবাস। জনকের ঐশ্বর্য্যময় অবরোধে সুখপালিতা বালিকা কেবল স্বামী মুখ সন্দর্শন করিয়াই বনবাসক্লেশ সহিয়াছিলেন! তাহার পর রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ। সীতার আর্ত্তনাদে তরুলতা কাঁদিয়াছিল। তাহার পর স্বর্ণালঙ্কার অশোক-কাননে বাস। সে ত শোকের একশেষ! তাহার পর অগ্নি পরীক্ষা। সতী লজ্জায় ঘৃণায় মরমর হইয়াছিলেন! তাহার পর অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বর্জ্জন। রামের সন্তান জঠরে আছে বলিয়া সীতা জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন! তাহার পর লবকুশের যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ বধ। সীতার পাষাণ বুক আর কত সহিবে! তাহার পর সভাস্থলে পুনরায় পরীক্ষার প্রস্তাব। রমণীর প্রাণে আর কত সহিবে, সর্ব্বসন্তাপহারিনী ধরিত্রী আপনার আজন্মদুঃখিনী তনয়াকে অঙ্কে লইয়া প্রস্থান করিলেন; রাম বিরহে সতীর প্রাণ ফাটিল! কে বলে পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ! পার্থিব সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যের পরিচায়ক নহে। তবে পাপ পুণ্যের পার্থক্য পাপী বা পুণ্যাত্মার প্রাণে। দুঃখে পুণ্যাত্মার যে সুখ, সুখে পাপীর ততোধিক দুঃখ। ইহা অনুভব করিবার কথা, বুঝাইবার কথা নহে। এস ভাই, দুঃখে ভীত না হইয়া পুণ্যের জন্যই পুণ্যপথে ধাবিত হই।

"ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে, সে নাম কি তুই রহিবে ভুলিয়ে?"

জন্মদুঃখিনী সীতার দুঃখ-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে সরযূ পার হইয়া অযোধ্যার

পারে আসিলাম। অন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলাম। মুখ দেখিয়া দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, তোমার মুখ আঁধার কেন?" উচ্ছ্বাসভরে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার এই বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া দিদি নীরব হইয়া রহিলেন। দেখিলাম এই রমণী শোকের স্বভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিলে শোক বাড়িয়া যায়। এমন অবস্থায় কিছু না বলিয়া নীরব থাকিলে প্রকৃত সহানুভূতি দেখান হয়। বাঙ্গালীর মেয়ে মানবহৃদয়ের এই তত্ত্ব জানেন এই প্রথম দেখিলাম। আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইলে দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" "ওপারে সীতা পরিত্যাগের স্থান অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সীতার দুঃখস্মৃতিতে হৃদয় বড়ই কাতর হইয়াছে। কেবলই মনে হইতেছে সীতা বড়ই দুঃখিনী"। এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আবার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু প্রবাহ বহিল।

এই দিন হইতে আমার প্রতি দিদির স্নেহের আধিক্য দেখিলাম।

(৬)

পুণ্যধাম বারাণসীর * * * অগস্ত্যকুণ্ডে বাস করেন। কথা প্রসঙ্গে আমার অযোধ্যাদর্শনেচ্ছা জানিতে পারিয়া তিনি মণিপর্ব্বত দেখিতে বলিয়াছিলেন। মণিপর্ব্বতে তখন একশত দুই বর্ষ বয়স্ক একজন সাধু ছিলেন। সাধুর চরণ দর্শনেচ্ছা চিরদিনই প্রবল। একদিন দিবাবসানে মণিপর্ব্বতে যাইবার জন্য একাকী বাহির হইলাম। পথে আসিয়া লোকের নিকট শুনিলাম, মণিপর্ব্বত দূরে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া একখানি গাড়ী করিলাম। যখন মণিপর্ব্বতের পাদদেশে পঁহুছিলাম তখন ঘন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। একজন মাত্র পথ প্রদর্শক সমভিব্যাহারে মণিপর্ব্বতে আরোহণ করিলাম।

পর্ব্বত-চূড়ায় মন্দির। মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে রামসীতার আরতি হইতেছিল। ধীর সমীরণে প্রবাহিত হইয়া পবিত্র ধূপের গন্ধ প্রাণে প্রবেশ করিতে লাগিল। শান্ত সন্ধ্যায়, শান্তিময় স্থানে, সাত্ত্বিক ধূপামোদে প্রাণ শান্তিলাভ করিল।

দেবারতি সম্পন্ন হইলে মন্দির প্রবেশের অনুমতি পাইলাম। ধীরে ধীরে, সংযতচিত্তে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দীপালোকে রামসীতার পবিত্রমূর্ত্তি জ্বলিতেছিল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীসীতারামের চরণকমল বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। মনের কথা রাজীব চরণে নিবেদন করিলাম।

শ্রীশ্রীসীতারামের চরণতলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সেবক সাধুর চরণবন্দনারবাসনা জানাইলাম। একখানি ক্ষুদ্র, মলিন বসন জড়ান, এক অতিবৃদ্ধ আসিলেন। একপ্রকার নগ্নাবস্থা। প্রণাম করিলাম। সাধুর দৃষ্টিশক্তি বয়সে হীন হওয়ায় তিনি হস্ত চালনা দ্বারা আমি কোন স্থানে আছি তাহা ঠিক করিয়া লইয়া দু'হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মুখে ফুটিতেছিল, "রাম কহ, রাম কহ"। বৃদ্ধের ভক্তিস্রোতে আমার পাষাণ হৃদয় গলিল। আমি তাঁহার চরণযুগলে মস্তক রাখিয়া রাম নাম করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল। তাহার পর অন্যান্য কথা হইল। শেষে সাধুর চরণে বিদায় লইয়া, রামসীতা প্রণাম করিয়া পর্ব্বতগৃহ হইতে বাহির হইলাম।

পথপ্রদর্শকের আগ্রহাতিশয্যে ধীরে ধীরে পর্ব্বতাবরোহণ করিয়া নিম্নভূমিতে আসিলাম। নিকটেই গাড়ী ছিল, গাড়ীতে চড়িলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়া রহিলাম। গাড়ী দ্রুত চলিয়া অযোধ্যার লোকালয়ে প্রবেশ করিল। সাশ্রুনয়নে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম। মণিপর্ব্বতের চতুপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি দূরে অদৃশ্য হইয়াছে। পর্ব্বতশিখরে এখনও চাঁদ তেমনই হাসিতেছে। এখনও তারকা তেমনই জ্বলিতেছে। কি সুন্দর! যাবৎ এ পৃথিবীতে রহিব তাবৎ এ সুখস্মৃতি বিস্মৃত হইব না।

গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। গভীর ভাবপূর্ণ হৃদয়ে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বিতলে উঠিলাম। গৃহ নিঃশব্দ। কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখি, প্রদীপের আলোকে দিদি বসিয়া অত্যন্ত মনঃসংলগ্নের সহিত কি দেখিতেছেন। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম সেই পুঁটুলি। আজ তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আমার ধীর পদবিক্ষেপ শব্দ তাঁহার কাণে পহুঁছায় নাই। দাঁড়াইয়া দেখিতেছি এমন সময় দিদি আমাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি পুঁটুলি বাঁধিবার উপক্রম করিলেন। আমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার হাত ধরিলাম। বলিলাল, "দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, নিত্য বাড়ী বসিয়া একটী পুঁটুলি খুলিয়া কি দেখ? সকলে আমোদ আহ্লাদ করিয়া যখন বেড়াতে যায় তখন নির্জ্জন পাইয়া একাকী তুমি কি কর আজ তাহা আমাকে বলিতে হইবে"। হাত ছাড়িয়া পা ধরিলাম। দিদির হৃদয় তখন উচ্ছ্বাসময়। তাঁহার নয়নজল টপ্ টপ্ করিয়া আমার হস্তে পড়িতে লাগিল। নীরবে আমার হস্ত ধরিয়া তাঁহার চরণ সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "কি শুনিবে ভাই?" আমি দুঃখিনী। আজ চারিবৎসর হইল আমার

"অসিমালা" চলিয়া গিয়াছে, আমি হতভাগিনী আজিও বাঁচিয়া আছি। এই দেখ তাহার জুতা, (অতি ছোট এক জোড়া chamois lather এর সুন্দর বুট জুতা দেখিলাম) এই দেখ এখনও তাহার জুতায় ধুলা লাগিয়া রহিয়াছে। এই জুতা চারি বৎসর পুর্ব্বে আমার একবৎসরের মেয়ে "খুনে" পরিত। সে আজ চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আমি জুতার ধুলা ঝাড়ি নাই। (দিদির চক্ষু হইতে শ্রাবণের ধারা বহিতেছিল; মায়ের পবিত্র স্নেহ-বারিধারা জুতায় পড়িয়া আমার হাতে পড়িতেছিল। আমার দেহ পবিত্র হইতেছিল)। এই দেখ তাহার গায়ের জামা। এই জামা ময়লা হইলেও আমি কাচি নাই। এই জামায় তাহার গায়ের ময়লা লাগিয়া আছে, কাচিলে ময়লা উঠিয়া যাইবে, "খুনের" দেহের ময়লা আর আমি গায় মাখিতে পাইব না। এই দেখ তাহার "চুষিকাটি"। তাহার মৃত্যুর সময় হারাইয়া গিয়াছিল, আমি কত খুঁজিয়া তাহার ভাঙ্গা "চুষিকাটি" বাহির করিয়াছি। এই দেখ তাহার দুধ খাওয়ার ভাঙ্গা ঝিনুক। আমি এই ঝিনুক আজিও মাজি নাই, তাহার দুধের গন্ধ পাছে চলিয়া যায়—এই বলিয়া জননী ঝিনুক শুঁকিতে লাগিলেন, যেন খুকির দুধের গন্ধ পাইতেছেন। চার বৎসর কি গন্ধ থাকে? কি জানি? হয়ত মায়ের ঘ্রাণশক্তি মৃতকন্যার দুধের ঝিনুকে চার বৎসর পরেও দুধের গন্ধ পাইয়া থাকে। জুতা, জামা, চুষিকাটি ও ঝিনুক বুকে লইয়া দিদি মেঝেয় শুইয়া পড়িলেন, আমি অবাক্ হইয়া পাশেই বসিয়া রহিলাম। আমার জননীর মৃত্যুকালে মায়ের প্রাণের পরিচয় কিছু পাইয়াছিলাম, আর আজও কিছু পাইলাম।

এই ঘটনায় পরদিন আমার অযোধ্যাবাস শেষ হইল। সন্ধ্যার পরে দিদিদের নিকট বিদায় লইয়া, সরযূর কাছে বিদায় লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ষ্টেশনে আসিলাম। ষ্টেশনের নিকটে সেই তালগাছের কাছে তেমনি করিয়া চাঁদ হাসিতেছিল কালসাগরে যে কত চাঁদ ডুবিয়া গেল কে তাহার খোঁজ করে! তেমনই করিয়া চাঁদের সুধা ধারাকারে ষ্টেশনের গাছপালা ভাসাইয়া হাসিতেছিল। গাড়ী আসিলে উঠিয়া পড়িলাম। অযোধ্যা ও সরযূ দৃষ্টিপথে আর পড়ে না। মনে জাগিতেছে অযোধ্যা, সরযূ আর স্নেহময়ী জননী!

(পরিশিষ্ট)

অযোধ্যা ভ্রমণের পর পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অধিক সময় কলিকাতায় থাকি, মাঝে মাঝে অন্যত্র যাই। পর্ব্বত শেখরে, গহন কাননে, নদীবক্ষে, সমুদ্রকুলে কোথায় স্থির হইতে পারিতেছি না। এই যে কলিকাতায় অবস্থিতি, ইহাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তবুও এস্থানে থাকিতে হইতেছে। বাল্যে সুশিক্ষা পাই নাই, কষ্ট সহিষ্ণু হই নাই, শীতোষ্ণ সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি শরীরের নাই, এখন ইচ্ছা করিলেই মনোমত স্থানে নিয়ত বাস করিতে পারি না। যদি দয়া করিয়া দয়াময়ী কখনও ফাঁস কাটিয়া দেন তবে তাঁহার সংসারের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিব। নতুবা এই দুঃখ সহিতে হইবে।

সেই বাঙ্গালী পরিবার কলিকাতায় বাস করেন। আমার সহিত তাঁহাদের বেশ আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে দেখিতে যাইয়া থাকি। এক প্রকার "ঘরের ছেলে" হইয়া গিয়াছি।

আজ কয়েকদিন হইল অপরাহ্নে ঐ বাড়ীতে বেড়াইতে যাই। পথে বাহির হইয়া দেখি পথের দু'ধারে বহুলোক জমিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "উড়ো জাহাজ" উড়িতেছে একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি পাত করিরা আপন মনে চলিয়া গেলাম। বাটির দরজায় উপস্থিত হইলে দ্বারবান বলিল, "বাবুরা সব মাঠে উড়ো জাহাজ দেখ্‌তে গিয়াছেন"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়িতে কে আছেন?" সে বলিল "বড় দিদিমনি"। এখন আমি ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র আমার অবারিত দ্বার। দিদির কক্ষের দরজায় যাইয়া দেখি, দুগ্ধফেননিভ শয্যা পড়িয়া রহিয়াছে, ঘরের মেঝেয় দিদি শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার বক্ষের উপর সেই chamois lather এর ধুলিমাখা জুতা, তাঁহার মস্তকে সেই ময়লা ছোট্ট জামা, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সেই ভগ্ন "চুষিকাটী" এবং দুগ্ধের ঝিনুক। বামহস্ত ললাটে পড়িয়া রহিয়াছে। মুদিত চক্ষু হইতে বারিধারা বহিয়া 'মাটী' ভিজাইতেছে। এই স্বর্গীয় ভাবের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হইল না। কক্ষে প্রবেশ না করিয়া নিঃশব্দে দরজা হইতে ফিরিয়া অসিলাম। দ্বারবানকে বলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। নয় বৎসর লইল এক বৎসরের "অসি" * মায়ের বুকে অসি দিয়া মাকে খুন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার "অসি" ও "খুনে" নাম সার্থক হইয়াছে।

আসুন, পাঠক, আমরা জননীকে প্রণাম করি। পূজ্যপাদ, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর পূজনীয় শ্রীযুত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভক্তির জন্য বিখ্যাত। আজকাল মাতৃভক্তির স্রোতের কেমন ভাঁটা লাগিয়াছে, স্ত্রীর প্রতি আদরের ঢল্ নামিয়াছে। যাবৎ আমরা আবার জননীকে ভক্তি করিতে না শিখিবে তাবৎ আমাদের মনুষ্যত্ব জাগিবে না। জননীর মূল্য বুঝি না, জন্মভূমির মর্য্যাদা রাখি কি প্রকারে?

পথিক।

---

* কন্যা যে সময় দুই মাস জননী জঠরে তখন তাহার পিতা নিরুদ্দেশ হয়েন। আজ নয় বৎসরেরও তিনি ফিরেন নাই। এই দুঃখের সময় কন্যার জন্ম বলিয়া তাহার মাসীমা তাহার নাম "অশ্রুমালা" রাখেন। মায়ের আদরে "অশ্রুমালা" "অশিমালায়" পরিণত হয়। অবশেষে কন্যাকে তাহার জননী আদর করিয়া "অসি" বলিয়া ডাকিতেন।

* স্তনয়ার স্নেহময়ী জননী কন্যাকে প্রথমে "খুকু" বলিতেন। শেষে "খুনু" অবশেষে "খুনে" নাম হয়।

বিশীর্ণ পত্রবিশিষ্ট শীর্ণ তরু দ্বারা বন যেমন শোভাশূন্য হয় সেইরূপ; অনাবৃষ্টিতে দেশ যেমন ধূলি ধূসরিত ও রুক্ষ হয় সেইরূপ শোভাশূন্য হইয়াছে।

কেহ কি এই নষ্টোৎসব পুরী দেখিতে আসে? আসে বৈকি! নতুবা সময়ে সময়ে এই পুরীর এই দীপক দুইটি কেমন করিয়া উজ্জ্বল হয়? নতুবা এই পুরীর এই ছিন্নপ্রায় ত্রিতন্ত্রী কখন কখন এমন ছন্দে বাজে কেন? আসে—কেহ দেখিতে আসে। কিন্তু যে আসে সে কি লীলার মত বলে—এই পুরীর লোক "পশ্যন্তু তাবৎ সামান্য ললনারূপধারিণীম্" আমাকে আর দেবীকে ইহারা সামান্য ললনার ন্যায় দর্শন করুক?

লীলা বহুদিন ধরিয়া নির্ম্মল জ্ঞান অভ্যাস করিয়াছে; অভ্যাস করিয়াছে এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহাতে কিছুমাত্র আস্থা করা যায় এখানে সবই ক্ষণিক, এখানে সবই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়। স্থায়ী কোন কিছুই এখানে নাই। হায় দুর্ভাগ্য—ভাবও এখানে স্থায়ী হয় না একমাত্র স্থায়ী বস্তু চৈতন্য। লীলা তাই বলিত—

ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।
তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভম্॥

ক্ষুধাকাতরের কাছে অন্নই ইষ্ট, কৃপণের চক্ষে ধনই প্রিয়, তৃষিতের কাছে জল বড় মিষ্ট, আর আমার কাছে? আমার কাছে তুমি চৈতন্য! তুমি আত্মদেব! তুমিই আমার বল্লভ। লীলা জগতের সকল বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সত্য বস্তু লইয়া থাকিত বলিয়া লীলা এখন সত্যসঙ্কল্পা; লীলা এখন দেবতার মত সত্যকামা। লীলা সঙ্কল্প করিল গৃহজন আমাদিগকে দেখুক।

সত্যই গৃহবাসিগণ কি অপূর্ব্ব দেখিল! দেখিল লক্ষ্মী আর গৌরী যেন যুগপৎ মন্দির সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। কাননামোদকারিণী বসন্ত লক্ষ্মীর ন্যায় দুইটি রমণীমূর্ত্তি আপাদবিলম্বী বিবিধ অম্লান কুসুমের মালায় সুশোভিতা।

ভাবে ও ভাষায় বশিষ্ঠদেবের রূপ বর্ণনা অতুলনীয়। আমরা আমাদের ভাষায় তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া পরে তাঁহার দেবভাষায় তাঁহার বর্ণনা তুলিয়া দিব। এ লোভ সম্বরণ করা যায় না। ইহাতে বিশেষ উপকার হওয়াই সম্ভব।

যোগবাশিষ্ঠ। ২৬ সর্গ। ৩০৭

জ্ঞানের আলোচনা যেখানে থাকিবে সেখানে বাহিরের প্রকৃতি-মিশ্রিত মানব প্রকৃতি বাহিরের রূপেও বড় মধুময়ী, বড়ই শীতলাহ্লাদ-সুখদায়িনী।

বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন—

গৃহজন তখন সেই অঙ্গনাদ্বয়কে দর্শন করিল; দেখিল যেন লক্ষ্মী ও গৌরী যুগপৎ মন্দির সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। বসন্তকালে যখন ফুলে ফুলে বনভূমি হাসিতে থাকে তখন বসন্তলক্ষ্মী আপাদবিলম্বী বিবিধ অম্লান কুসুমের মালা গলে দোলাইয়া এবং তাহার সৌগন্ধে কাননভূমি আমোদিত করিয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন! গৃহজনেরা দেখিল কাননে বসন্তলক্ষ্মী যুগলের মত সেই দুই অঙ্গনা বিবিধ অম্লান কুসুমের মালা পরিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতে করিতে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সবাই দেখিল শীতলাহ্লাদ সুখদ দুইটি চাঁদ যেন চন্দ্রিকামৃতে ওষধী, বন ও গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়া উদিত হইয়াছেন।

আহা! ঐ মধুর আলোল লোচন-বিলোকন! লম্বিত অলকলতাবলী পরিবেষ্টিত লোচন যুগল ভ্রমর চুম্বিত কুবলয়ের মত। আর সেই কটাক্ষ! মনে হয় যেন নীলপদ্মজড়িত মালতীকুসুম চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। গৌরবর্ণ মনোহর দেহের অঙ্গপ্রভা গলিত সুবর্ণ-রস-পূরিত সরোবরের উপরে মৃদু তরঙ্গ প্রবাহের ন্যায় খেলা করিতেছে আর সেই সুবর্ণপ্রভা কানন প্রদেশে প্রতিফলিত হইয়া সর্ব্বস্থান কনকায়িত করিতেছে। এই দুইটি অঙ্গনা স্বভাব সুন্দর ব্রহ্ম সমুদ্রের যেন দুইটী প্রসিদ্ধ তরঙ্গ। আর ইহাদের সহজাত শরীর লাবণ্যের বিলাস যেন লীলার্থ বিলাস দোলা। অরুণবর্ণ পাণিতল বিশিষ্ট বিলোল (চঞ্চল) বাহুলতিকার প্রতিক্ষণ বিন্যাসভেদ যেন সুবর্ণ বর্ণ নব নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন কল্পনা করিতেছে। দেবীদ্বয় ভূতলে নামিতেছেন। চরণ ভূতল স্পর্শ করিতেছে। কি সুন্দর চরণকমল! অমর্দ্দিত বলিয়াই এমন অম্লান পুষ্পের ন্যায়, কোমল পল্লবের ন্যায়, শ্রীচরণ। মনে হইতেছে যেন স্থলপদ্মদল-মালার আভা ধীরে ধীরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে। শুষ্ক পাণ্ডুরবর্ণ তালতমালবনখণ্ড তাঁহাদের নয়ন সুধা বর্ষণে নূতন পল্লবে যেন পল্লবিত হইয়া উঠিল।

দেবভাষায় পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

ততো গৃহজনস্তত্র স দদর্শাঙ্গনাদ্বয়ম্।

লক্ষ্মীগৌর্য্যোর্যুগমিব সমুদ্ভাসিত মন্দিরম্॥ ৯॥
আপাদ বিবিধাম্লান-মালা-বলন সুন্দরম্। (ক)
বসন্তলক্ষ্ম্যোর্যুগলমিবামোদিত কাননম্॥ ১০॥
সর্ব্বৌষধি বন গ্রামং পূরয়ন্ত্যৌ রসায়নৈঃ। (খ)
শীতলাহ্লাদসুখদং চন্দ্রদ্বয়মিবোদিতম্॥ ১১॥
লম্বালকলতা-লোল-লোচনালি-বিলোকনৈঃ
কিরৎ কুবলয়োন্মিশ্র-মালতী কুসুমোৎকরান্॥ ১২॥ (গ)
দ্রুতহেম রসাপূরসরিৎ সরণহারিণা। (ঘ)
দেহ প্রভাপ্রবাহেন কনকীকৃত কাননম্॥ ১৩॥
সহজায়া বপুলক্ষ্যা লীলা দোলাবিলাসিনঃ। (ঙ)
তে এতে চ তরঙ্গাঢ্যা নিজলাবণ্যবারিধেঃ॥ ১৪॥
বিলোল-বাহু লতিকা যুগেনারুণ পাণিনা। (চ)
কিরন্নব নবং হৈমং কল্পবৃক্ষলতাবনম্॥ ১৫
পাদৈরমৃদিতাম্লান পুষ্পকোমল পল্লবৈঃ। (ছ)
স্থলাব্জ-দল-মালাভৈরস্পৃশদ্ভূতলং পুনঃ॥ ১৬॥
তালীতমাল খণ্ডানাং শুষ্কাণাং শুচিশোচিষাম্। (জ)
আলোকনামৃতাসেকৈর্জ্জনয়ৎ বালপল্লবান্॥ ১৭॥

(ক) [মালানাং বলনৈর্ব্ব্যাপনৈঃ]

(খ) [রসায়নৈশ্চন্দ্রিকামৃতৈঃ]

(গ) [অলকলতানাং চূর্ণকুন্তলানাং সন্নিধৌ আলোলত্বাৎ অলিত্বেন পরিণতৈঃ লোচনৈঃ] [কটাক্ষাণাং নীলোন্মিশ্রধবলচ্ছবিত্বাৎ কুবলয়োন্মিশ্রমালতী কুসুমমোচ্চয়ত্বেনোৎপ্রেক্ষা]

(ঘ) [দ্রবীকৃত স্বর্ণরস-প্রবাহায়াঃ সরিতঃ সরণং বেগ ইব মনোহারিণা]

(ঙ) [লীলার্থং দোলাঃ ইব] [বিলাসিনঃ বিলসনশীলা]

(চ) [বিলোলত্বেন-চঞ্চলত্বেন; প্রতিক্ষণং বিন্যাসভেদেন]

(ছ) [অমৃদিত=অমর্দ্দিত]

(জ) [শুচি শোচিষাম্পাণ্ডুর বর্ণানাম্]

আটদিন হইল ব্রাহ্মণ দম্পতীর মৃত্যু হইয়াছে। গিরিগ্রামে মৃত্যুর পরেই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালীন সঙ্কল্প বশে ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশে সেইদিনেই পূর্ব্বসঙ্কল্প-সংস্কার-প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরে রাজা হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব সঙ্কল্প মত রাজত্ব অনুভব করিতেছেন। ব্রাহ্মণী অরুন্ধতীও লীলার মত সরস্বতীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনিও দেবীর নিকট বর পাইয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে যেন স্বামীর জীবাত্মা তাঁহার মণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীও ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া ভাবনাময় দেহে তাঁহার সেই আকাশ-রূপী ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইলেন

এই সেই গিরিগ্রাম। সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সেই সমস্ত ধন; সমস্তই সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত ব্রাহ্মণদম্পতীর জীবাত্মাও সেই গৃহমণ্ডপে রাজারাণী হইয়াছেন। আর বাহিরে ইহারাই মৃত পদ্মরাজা ও লীলারাণী।

ব্রাহ্মণদম্পতীর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম জ্যেষ্ঠশর্ম্মা। জ্যেষ্ঠশর্ম্মা গৃহজন সমভিব্যাহারে "নমস্ত বনদেবীভ্যাম্" বনদেবীদ্বয়কে প্রণাম এই বলিয়া কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তাঁহাদের গৃহে সেই কুসুমাঞ্জলি দেবীদ্বয়ের চরণে পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইল, মনে হইল যেন পদ্মলতার উপর সুশোভিত পদ্মফুলে হিমাম্বু-কণা বর্ষিত হইল। জ্যেষ্ঠশর্ম্মা পুরবাসিগণের হইয়া বলিতে লাগিলেন, বনদেবীদ্বয় আপনাদের জয় হউক। আমাদের দুঃখ-নাশার্থই আপনারা আসিয়াছেন। প্রায়ই পরকে রক্ষা করা সাধু দিগের স্বভাব।

দেবীদ্বয় বড়ই প্রীত হইয়াছেন। আদর করিয়া বলিলেন "আখ্যাত দুঃখং যেনায়ং লক্ষ্যতে দুঃখিতো জনঃ" সকলকে বড় দুঃখিত দেখা যাইতেছে। কি তোমাদের দুঃখ তাই বল।

জ্যেষ্ঠশর্ম্মা তখন বলিতে লাগিলেন—"স্বর্গংগতৌ নঃ পিতরৌ তেন শূন্যং জগত্রয়ম্" আমাদের পিতামাতা স্বর্গে গিয়াছেন তাই আমরা ত্রিজগৎ শূন্যময় দেখিতেছি। আহা! তাঁহারা আমাদিগকে কত ভাল বাসিতেন। তাঁহারা কেমন অতিথিবৎসল ছিলেন। আজ আপনারা আসিয়াছেন, হায়! তাঁহারা থাকিলে আজ তাঁহারা কতই কি করিতেন! দ্বিজগণের মর্য্যাদা তাঁহারাই রক্ষা

করিতে জানিতেন। এই পিতা মাতা আমাদের সকলকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মা! আমরা তাই দুঃখী। ঐ দেখুন পক্ষিগণ গৃহের উপরে বসিয়া কিরূপভাবে শূন্যে পক্ষ বিক্ষেপ করিতেছে আর কতই করুণ স্বরে শোক প্রকাশ করিতেছে। মা! আমাদের দুঃখ হইয়াছে বলিয়াই বুঝি আজ সমস্ত জগৎ দুঃখ করিতেছে। এই পর্ব্বত-গুহাও ত কতবার দেখিয়াছি, এই গুহা-নিঃসৃত নির্ঝরিণীও ত দেখিয়াছি; কিন্তু এখন মনে হইতেছে যেন পর্ব্বত সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে আর সরিৎরূপ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। আকাশে মেঘ সমূহ বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া সরিয়া পড়িতেছে কিন্তু আমার মনে হইতেছে যেন দুঃখ-সন্তপ্ত দিগাঙ্গনাগণের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পবন দ্বারা তাঁহাদের স্তনবস্ত্র উন্মুক্ত হইতেছে। গ্রামবাসিজনগণ ভূমির উপরে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত বিলুণ্ঠিত হওয়ায় ক্ষত-বিক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ, উপবাস পরায়ণ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করতঃ মরণোন্মুখ হইয়াছে। এই গ্রামের পথ সকল জন সঞ্চার-রহিতা, আনন্দশূন্যা; শূন্যহৃদয়া বিধবার ন্যায় ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। শোক সন্তপ্তা লতাসকল বৃষ্টিরূপ বাষ্পে আহত হইয়া কোকিল কূজন ও অলিগুঞ্জনচ্ছলে রোদন করতঃ পল্লবপাণি দ্বারা স্বীয় শরীরে আঘাত করিতেছে। আত্মাকে শতধা করিবার অভিপ্রায়ে তাপতপ্ত নির্ঝর সকল যেন প্রবল বেগে শুভ্র শিলাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখুন গৃহ সমুহের অবস্থা কি? কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস নাই। গতশ্রী, নিস্তব্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্যের মত ইহাদিগকে বোধ হইতেছে। ভ্রমরগুঞ্জনব্যাজে রোদন পরায়ণ উদ্যান খণ্ড হইতে উত্থিত সৌগন্ধ যেন পূতিগন্ধের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। চৈত্য—বৃক্ষবিলাসিনী লতা সকল গুচ্ছরূপ লোচন সঙ্কুচিত করায় দিন দিন বিরস ও কৃশ হইতেছে। কুলুকুলুধ্বনিকারিণী নদী সকল সমুদ্রে দেহত্যাগ করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছে ও ভূতলে দেহ দোলায়িত করিতেছে। সরোবর সকল এরূপভাবে নিস্পন্দ রহিয়াছে যে তাহাদের নিকটে মশকপতনজনিত স্পন্দনও অতি চঞ্চল বোধ হইতেছে হে দেবীযুগল! স্বর্গে যে স্থানে কিন্নরী গন্ধর্ব্ব ও সুরাঙ্গনাগণ গান করেন নিশ্চয়ই আমার পিতামাতা সেই স্থানে গমন করিয়া সে স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছেন। হে

দেবীদ্বয়! আপনারা আমাদের শোক দূর করুন। কারণ "মহতাং দর্শনং নাম ন কদাচন নিষ্ফলম্" কারণ মহতের দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না।

লীলা আপন পুত্রের মস্তক করপল্লবদ্বারা স্পর্শ করিলেন। মনে হইল যেন পদ্মিনী আনত হইয়া পল্লব দ্বারা স্বীয় মূলগ্রন্থি স্পর্শ করিল। "পল্লবেনানতা নম্রং মূলগ্রন্থিমিবাব্জিনী"। ৪৩। লীলার স্পর্শে তাহার দুঃখ দৌর্ভাগ্য সঙ্কট দূর হইল, যেমন প্রাবৃটকালে জলদের স্পর্শে পর্ব্বতের গ্রীষ্মতাপ দূর হয় সেইরূপ। দেবী-দ্বয়কে দর্শন করিয়া অপরপরিজনবর্গেরও শোক দূর হইল এবং সৌভাগ্যের উদয় হইল।

লীলা মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই। প্রপঞ্চ মিথ্যা—এ বোধ লীলার হইয়াছিল। এজন্য পুত্র-স্নেহ রূপ মায়িক ব্যাপার তাহার ছিল না। পুত্রের মস্তকে লীলা যে হস্ত প্রদান করিয়াছিল তাহা পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত নহে পরন্তু তাহা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে। ইহা তাহার ভাবি শুভের পরিচায়ক।

যতদিন ভ্রম থাকে ততদিন শরীরটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। ভ্রম নিবৃত্তি হইলে চিদাকাশ স্বভাবেই স্থিতি লাভ করে। পৃথিবী, দেহ ইত্যাদি বাস্তবিক নহে। ভাবনা বলে আছে বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্নে নগর, সমতল, ভূমি, খাদ, স্ত্রীলোক, কত কি দেখা যায়। এ সব কিন্তু নাই তথাপি ইহারা ক্রিয়া করে; সেইরূপ পরমাকাশ স্বরূপ পরম চৈতন্যই আছেন। অজ্ঞান স্বপ্নে সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে পৃথ্ব্যাদি ভাবে জানা হয় বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড যেন জগৎরূপে দণ্ডায়মান হয়েন। লীলার জ্ঞান হইয়াছিল একমাত্র তিনিই আছেন। লীলা জানিয়াছিল পৃথ্ব্যাদি কিছুই নাই। ভ্রান্তি দ্বারাই চিদাকাশকে নানা আকার বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। এক অদ্বয় জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহার আবার পুত্র কলত্র কি? তিনি জানেন দৃশ্য বলিয়া কোন কিছু উৎপন্নই হয় নাই। তাই লীলা মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জন্মান্তর।

সেই গিরিতটস্থিত গ্রামের মণ্ডপ কোটরে থাকিয়াও সেই দুই সিদ্ধ রমণী দেখিতে দেখিতে যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল। আর গৃহজনেরা মনে করিল বনদেবীগণ আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়া তাহারা সুখী হইল। সুখী হইয়া তাহারা গৃহ কার্য্যে মন দিল।

মণ্ডপাকাশ সংলীনাং লীলামাহ সরস্বতী।

ব্যোমরূপা ব্যোমরূপাং স্বয়াং তূষ্ণীমিবস্থিতাম্॥ ৩॥

লীলা বিস্ময়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে। লীলা কোন কথাই কহিতেছে না দেখিয়া আকাশরূপিণী সরস্বতী আকাশরূপিণী লীলাকে বলিতে লাগিলেন লীলা! কি ভাবিতেছ?

লীলা। তা কি মা তোমার অজ্ঞাত?

দেবী। তা নয়। তবুও বল। ইহাতে লোকের উপকার হইবে।

লীলা। মা! আমি ত অরুন্ধতী ব্রাহ্মণীর সঙ্কল্পের মূর্ত্তি। আর তুমি সঙ্কল্প মূর্ত্তির আবার যে সঙ্কল্প তাহার মূর্ত্তি। অন্যের সঙ্কল্প অন্যের কাছে ত অদৃশ্য। আমরা দুই অদৃশ্যা রমণী। আমাদের কথোপকথন প্রচার ইহা কি আবার সম্ভব?

দেবী। ঊষা ও অনিরুদ্ধের কথা ত শুনিয়াছ? তাহাদের কথোপকথন হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন ও সঙ্কল্প দেবতার অনুগ্রহে কখন কখন সত্যও হয়। এইজন্য ঊষা ও অনিরুদ্ধের কথোপকথন কার্য্যে পরিণত ও লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। তোমার আমার কথোপকথনও সেইরূপ। আমাদের পার্থিব শরীর নাই। তা নাই থাক্। স্বপ্নের মত বা সঙ্কল্পের মত আমাদের পরস্পর আলাপের জ্ঞান উদিত হইয়াছে।

লীলা! যাহা জানা উচিত তাহাত তুমি জানিয়াছ। সংসার ভ্রমও দেখিলে। ব্রহ্মসত্তাই, অলীক দৃশ্যজগৎ মত দেখাইতেছে তাহাও জানিতেছ। "কিমন্যদ্বদ পৃচ্ছসি"। আর কি বলিবে বল।

লীলা। আমার মৃত ভর্ত্তার জীব যেখানে রাজত্ব করিতেছেন সেখানে আমি যখন গিয়াছিলাম তখন আমাকে কেহ দেখিতে পায় নাই আর এখানে আমার পুত্রেরা আমাকে দেখিতে পাইল কিরূপে ?

দেবী। তখন তোমার অদ্বৈত অভ্যাস পাকা হয় নাই। তখনও তোমার দ্বৈতজ্ঞান ছিল। দ্বৈতজ্ঞান বা অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। অদ্বয়জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিয়া যে অদ্বৈত আয়ত্ব না করিতে পারে সে সত্যসঙ্কল্প হইবে কিরূপে? তাপের মধ্যে থাকিয়া ছায়ার গুণ জানিবে কিরূপে? "আমি রাজমহিষী লীলা" এ ভাব তখনও তুমি ভুলিতে পার নাই তাই সত্যসঙ্কল্প হইতেও পার নাই। এখন তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছ। তুমি সত্যসঙ্কল্প হইয়াছ। তাই এখানে আসিয়া যখন তুমি বলিলে আমার পুত্রেরা আমাদিগকে দর্শন করুক তখনই তোমার সঙ্কল্প সত্য হইল। তুমি এখন স্বামীর কাছে যাও—দেখিবে যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই হইবে। বুঝিতেছ অদ্বয়জ্ঞানে স্থিতি লাভ না করা পর্য্যন্ত সত্যসঙ্কল্প হওয়া যাইবে না।

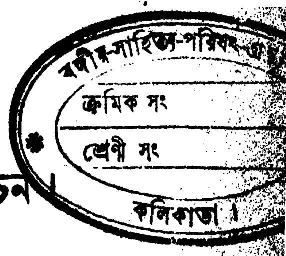
লীলা। এই মন্দিরাকাশে আমার স্বামী বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এইখানেই তাঁহার দেহান্ত হয়। মৃত্যুর পরে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি রাজা হন এইখানেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজধানীপুরে আমিই তাঁহার পুরন্ধ্রী ছিলাম। আবার তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি নানা জনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন। মা! নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই মণ্ডপাকাশেই রহিয়াছে। আমি আমার ভর্ত্তৃসংসারমণ্ডলস্থ বস্তু সমূহ যাহাতে দেখিতে পাই তাহাই করুন।

দেবী—পুত্রি! ভূতলবাসিনি অরুন্ধতি! তোমার ভর্ত্তাত অনেক। সকলকে দেখা অসম্ভব। সন্নিহিত তিন স্বামীর মধ্যে কাহার মণ্ডল দেখিতে চাও? তোমার প্রথম স্বামী বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেহান্তে পদ্ম নামক নরপতি হইয়াছিলেন। ইহারই মৃতদেহ তুমি স্বীয় অন্তঃপুরে পুষ্পমণ্ডপে রাখিয়াছ। এই পদ্মরাজা এক্ষণে বিদূরথ নরপতি হইয়া জন্মিয়াছেন। রাজা বিদূরথ এক্ষণে নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া সংসার জলধির মহাকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। জড়প্রায় চিত্তবৃত্তি লইয়া তিনি "সংসারাম্ভোধিকচ্ছপঃ" ভোগ তরঙ্গ সঙ্কুল সংসার সমুদ্রের কচ্ছপ স্বরূপে অবস্থান

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩২২ সাল। [১১শ সংখ্যা।





মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ এম,এ, বিরচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী উৎসব অফিসে পাওয়া যায়।

(১) আহ্নিকম্ মূল্য ॥০ আনা। (২) উচ্ছ্বাসাঃ মূল্য ৸০ আনা। (৩) লোকালোক মূল্য ১৲ টাকা। (৪) লক্ষ্মীরাণী মূল্য ১॥০ টাকা।

উৎসবের চাঁদা এবং উৎসব সম্পাদক মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ অন্যূন ৩০০৲ চারি শত টাকা এখনও উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকের নিকট প্রাপ্য আছে। তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় টাকা সত্বরে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। তাঁহাদিগের এই সহানুভূতি না পাইলে শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যে আমরা সক্ষম হইব না।

বিনীত—

"উৎসব" সেবক মণ্ডলী।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা অক্ষম হইব।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

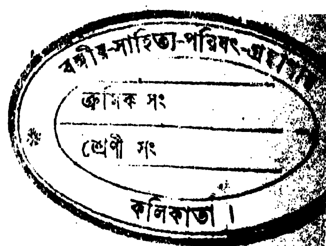
৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

সফলতা।

কোন্ মহা সঙ্কল্পের ধরি অবয়ব,
আব্রহ্ম হিমাচল, হে প্রিয় উৎসব।
সাধনার গুপ্ত কথা করিতে প্রচার,
শুভদিনে শুভক্ষণে জনম তোমার?

সত্যবটে, ব্যথিতের তপ্ত অশ্রুধার,
মুছিয়াছে চিরতরে প্রসাদে তোমার,
দূরে গেছে যৌবনের দুষ্ট ব্যভিচার,
হয়েছে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার।

বিনাশি বাসনারাজি, নিত্য তত্ত্বাভ্যাসে
ভেঙ্গে ফেলি ঘটাকাশ, স্থিতি মহাকাশে,
স্বপ্ন জাগরণ আর সুষুপ্তি বিলাস
লভে যদি কোন জীব—সাধনার শেষ—

সফল জনম তব সফল প্রচার
হবে মধুময় ধরা পরশে তোমার।

শ্রীগুরুদাস—

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি।

আমার বাক্য আমার প্রাণ আমার চক্ষু আমার শ্রোত্র আমার অঙ্গসকল— হায়! ইহারাত আপ্যায়িত হইল না। অঙ্গ, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, ইন্দ্রিয় আপ্যায়িত হইলে কি হয় তাহাত আমি বুঝি। কি করিয়া বুঝি তাহা যেন কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না।

এইত কেমন হইয়াছিলাম। জগৎসংসারে আমার যেন কেহই ছিল না। আমার মন, আমার প্রাণ, আমার ইন্দ্রিয় ইহারা কেহই যেন আমার নয়। সকলেই অসুখী। সকলেই দুঃখী। কি যেন কি আমার হইয়াছিল। কি যেন কি আমার হারাইয়া গিয়াছিল। আহা! কি কষ্টের অবস্থা তখন? কি হয় তখন? কি তখন হারাইয়া যায় যাহাতে আমার সংসারে এত হাহাকার উঠে? চক্ষু কিছু দেখিয়া সুখ পায় না, কর্ণ কিছু শুনিয়া সুখ পায় না, বাক্য কোন কথা কহিয়া তৃপ্তি পায় না, প্রাণ যেন কি এক যাতনায় অস্থির হইয়া পড়ে। আমার সংসারের সকলকে তখন তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে ডাকিলে দেখা যায় সকলেই যেন মরিয়া আছে। কাজ করিতে আসিয়াও করিতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে যেন প্রাণের প্রাণান্ত হয়। তবুও করিতে হয়। সেই যে বলিয়াছিল "তথাপি যাইতে হবে যমুনার তীর। তথাপি হেরিতে হবে কুঞ্জকুটীর"। হায় কি কষ্ট তখন!

এই সময়ে প্রার্থনা উঠিল "অঙ্গানি চ ম আপ্যায়ন্তাম্" ইত্যাদি। আমার অঙ্গ সকল আপ্যায়িত হউক। বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র আপ্যায়িত হউক। এক মুহূর্ত্তে কি অপূর্ব্ব হইল। মন প্রাণ যেন কোন্ হারানিধি পাইয়া জাগিয়া উঠিল। কে যেন আমার কাতরোক্তি শুনিল। কে যেন আমার প্রাণ মন বাক্য চক্ষুর উপরে কি সুধা ঢালিয়া দিল।

"সই! কোকিল অব্ লাখ ডাক্ ডাকয়ু" যেন এই অবস্থার কথা। আহা! এখন ত সবই মধুময়। সব সুন্দর! সব অপূর্ব্ব!

কি হারাইয়া গেলে "অব্ সব বিষ সম লাগই" আর কি পাওয়া গেলে "কোকিল অব্ লাখ ডাক্ ডাকয়ু" হয়?

আমার অঙ্গ সকল আপ্যায়িত হউক এ প্রার্থনা কে কাহার নিকটে করে? হউক বলিলেই যেন কখন কখন হয়, এ কেমন করিয়া হয়? কে শোনে আমার

কথা? কে এই তাপিতের তপ্ত প্রাণে শীতল চরণ ছায়া দিয়া একমূহুর্ত্তেই সব জুড়াইয়া দেয়?

অহো! এই তুমি। যে তুমি সর্ব্বত্রই আছ সেই তুমি। যে তুমি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, স্বর্গ, সূর্য্য, দিক, চন্দ্র তারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলকে চালাইতেছ, যে তুমি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতে ভূতে থাকিয়া ভূত সকলকে প্রেরণা করিতেছ, যে তুমি প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে ত্বগিন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে, বীর্য্যে সর্ব্বত্র আছ, যে তুমি ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ—আহা! সেই তুমি আমার আছ। সেই তুমিই আমার সব জুড়াইয়া দাও।

মানুষ তোমাকেই ডাকে। যে ডাকিতে জানে সে ত তোমাকেই ডাকিবে। লোকে তোমাকে জানেনা তাই ডাকে না। যাহারা ডাকিতেও চায় না, জানিলেও চায় না তাহারাই দুর্ভাগ্য। যাহারা জানিতে চায়, ডাকিতে চায়, যাহারা জানিয়া ডাকে তাহারা কত সুখই পায়। সত্যই তাহাদের সকল অঙ্গ সকল ইন্দ্রিয় আপ্যায়িত হইয়া যায়।

ঋষিরা জানিয়াছিলেন আর ডাকিয়াছিলেন। "মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু।" হে দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল! হে জগতের প্রসবিতা! হে সূর্য্য! তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও। "মেধাং দেহি সরস্বতি।" হে বাগ্‌দেবি! হে সরস্বতি! আমাকে বুদ্ধি দাও। বুদ্ধি নাই বলিয়াই আমি জানিনা, আমি ডাকিনা, বুদ্ধি পাইলে আমি ডাকি আর আমি আপ্যায়িত হইয়া যাই।

আজ আমি বড় হীন হইয়া গিয়াছি। প্রাণ ভরিয়া আমি কাহারও সুখ্যাতি করিতে পারি না। প্রাণ ভরিয়া কাহাকেও ভাল বাসিতে পারি না। হিংসা, দ্বেষে আমার হৃদয় ভরা। ইহাতে কাহার কি হয়? জ্বালা ত আমিই পাই। আমার শরীর ইন্দ্রিয় একবারও যেন আপ্যায়িত হয় না। আমি একবারও যেন সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারি না। আমি যদি বুঝিতাম, যদি জানিতাম, যদি অন্ততঃ বিশ্বাস করিতেও পারিতাম যে তুমিই এই আকাশরূপে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ; তুমিই সূর্য্যরূপে, বায়ুরূপে, অগ্নিরূপে, স্থলরূপে, জলরূপে আছ; তুমিই পশু পক্ষীরূপে আছ; তুমিই সব রূপেই দাঁড়াইয়া আছ তবে ত আমি যখন কোন ব্যথা পাই তখনই তোমাকে ডাকিতে পারি।

সেই আমি।

"সেই আমি" তোমার উপাস্য। সন্দেহ করিও না। আকাশ দেখিয়াছ? এই যে রূপ আমার দেখিতেছ, ইহা আকাশের রূপ। আমিই তোমার গুরু। আমিই তোমাকে উপদেশ প্রদান করি। আমিই তোমার বক্ষে দাঁড়াইয়া নীল নলিনাভ চক্ষে তোমার দিকে আদরভরে চাহিয়াছিলাম। আমিই চাহিয়া চাহিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি। আমার চক্ষুই তোমার প্রতি কত স্নেহ ছড়াইয়াছে। তুমি যাহার উপাসনা কর, সেই আমি। আমিই তোমার গুরু। আমিই মা, আমিই স্ত্রী, আমিই কন্যা, আমিই সখা, আমিই স্বামী, আমিই দাসী, আমিই দাস, আমিই তোমার সর্ব্বস্ব। তুমি যতদিন আমার উপাসনা করিয়াছ, ততদিন তুমি দ্রষ্টা আমি দৃশ্য, তুমি চেতন আমি জড়, এখন তুমি জড় হও, আমি চেতন থাকি।

আমি গুরু হইয়া প্রথমে শিষ্য সাজিয়াছিলাম। তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। তোমাকে না দেখিলে আমি অস্থির হইতাম, বড় যাতনা অনুভব করিতাম। তোমার অপেক্ষায় আমি দাঁড়াইয়া থাকিতাম। তুমি আসিলে যেন আমার সব জুড়াইয়া যাইত। তোমার ভালবাসা পাইবার জন্য আমি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠা-স্ফুটিত চিত্তে কাল যাপন করিতাম। কতদিন গোপনে তোমাকে দেখিতাম—তোমার জন্য আমি নায়িকা সাজিয়াছিলাম।

তুমি কি ছিলে আর কি হইয়াছ? আমার ভালবাসা ক্রমে তুমি অনুভব করিতে পারিলে। আমি ভালবাসিয়া তোমার হৃদয় ফুটাইলাম। আমার ভালবাসা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাতে নূতন জীবন সঞ্চার করিল। তখনও তোমার দোষ সম্পূর্ণরূপে গেল না। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কাররাশি মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তুমি সেই সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া ফেলিতে। আমি সব জানিতাম কিন্তু কিছুই বলিতাম না। আমি জানিতাম তুমি মন্দ কিছুই করিতে চাও না, প্রাণে প্রাণে আমাকেই ভাল বাসিতে চাও। চেষ্টা করিয়াও পার না কিন্তু চেষ্টা হইতে তুমি কখন বিরত ছিলে না। ক্রমে আমার ভালবাসার উপর তোমার অধিক লক্ষ্য পড়িতে লাগিল, তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া আপন ইন্দ্রিয় দমন করিতে শিক্ষা করিলে। তখন আমার প্রতি

তোমার অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। তুমি আর ব্যভিচার করিতে পারিলে না। তুমি বুঝিলে যে তোমার ব্যভিচারে আমার ভালবাসা তোমার হৃদয়ে যেন শিথিল হইয়া যায়। তোমার ব্যভিচার ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইল। তখন তুমি আমার ধ্যানে, আমার পূজায় সময় যাপন করিতে আরম্ভ করিলে। তুমি মনে করিতে "আমি কেন তোমার জন্য ব্যাকুল"—মনে করিতে—"আমি এত শুদ্ধ, এত পবিত্র, এত নির্ম্মল, কিন্তু তুমি ত বড় মলিন তবে কেন আমি তোমার জন্য এত ব্যাকুল।" ক্রমে তোমার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল। তোমার মধ্যে কোন এক অপূর্ব্ব বস্তু আছে যাহা আমার বড় আদরের তাহা তুমি বুঝিলে। তোমার চেষ্টা হইল এই আত্মবস্তুটি দেখা। তুমি প্রথমে আমার প্রণয়-মহিমা দেখিলে; দেখিয়া তোমার নিজের প্রণয়-মহিমা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, আর তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমার প্রেম কোন আকার ধারণ করিত তাহাও স্বচক্ষে দেখিলে। তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমি কিরূপ বিভোর হইতাম, আমি কত শান্ত হইতাম, কত স্থির হইতাম, কত সৌন্দর্য্য আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়াইয়া পড়িত, সান্ধ্য গগণের মেঘমালার মত কত বর্ণ আমার অঙ্গে ভাসিত, আমার গতি, আমার ভঙ্গী, আমার স্বর কত সুন্দর হইত, কত মধুর হইত, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছ। আমাকে দেখিয়া দেখিয়া তোমার তৃপ্তি হইত না, আমার কথা শুনিয়া শুনিয়া তোমার সাধ মিটিত না। তুমি সর্ব্ব ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই চিন্তা করিতে। বিনা আয়াসে তোমার বৈরাগ্য অভ্যাস হইল। বড় সুখের সহিত তোমার মন অপর বিষয় ভোগ ত্যাগ করিল। আমার অনুরাগ ভোগ করিয়া তোমার জগৎ-বিরাগ জন্মিল। একসঙ্গে অভ্যাস ও বৈরাগ্য চলিতে লাগিল। আমার ধ্যান ভিন্ন তোমার কিছুই ভাল লাগিল না। তোমার মন আমাতে একাগ্র হইতে লাগিল। এই একাগ্র মনে তুমি সাধনা করিতে লাগিলে। জগৎ তোমার চক্ষে ভস্মরাশি হইয়াছে। এখন এই ভস্মরাশি হইতে আর একটি নূতন জগৎ উঠিবে। তাহা তন্মাত্র গঠিত আমার বিশ্বরূপভরা জগৎ। এজগতে আর কেহই নাই, আমিই শত শত মূর্ত্তিতে তোমার সহিত খেলা করিব। তুমি সর্ব্বত্র আমাকে দেখিবে, সর্ব্বত্র আমাকে নমস্কার করিবে, আমি সর্ব্বত্র তোমার সহিত আনন্দ করিব, এ ভিন্ন এ নূতন জগতে আর কিছুই নাই। এজগতে তরুলতা আনন্দে গড়া—এজগতে চন্দ্র তারকা আনন্দে ভরা—এজগতে বায়ু আমার স্পর্শ—এজগতে চন্দ্র আমার মন—

এজগতে সূর্য্য আমার চক্ষু—এজগতে মেঘমালা আমার কেশপাশ—এজগতে ভূলোক আমার পদতল—ভুবলোক আমার নাভীদেশ—স্বর্লোক আমার শিরপ্রদেশ—এজগতে বিদ্যুৎ আমার মণিমুক্তা খচিত চঞ্চল হস্তালঙ্কার-প্রভা। তুমি এখন ইহাই সাধনা করিতেছ।

এখন আমি তোমার বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া আছি। তুমি বড় আদরে আমার সুন্দর মূর্ত্তির পানে গোপনে গোপনে চাহিতেছ। আমার সুন্দর মূর্ত্তি তোমার চক্ষে অনন্ত সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছে। তুমি দেখিতেছ আমিই তোমার প্রণবময় মরুৎ, তুমি প্রতিশ্বাসে আমারই ধ্যান কর। কখন দেখ আমি কি অদ্ভুত। আমি পূর্ণ থাকিয়াও তোমার বক্ষে সঙ্কীর্ণ। আমি এক কালেই নিরাকার ও সাকার, এক সঙ্গেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি, এক মুহূর্ত্তেই পরমাত্মা ও জীবাত্মা, একক্ষণেই বিশ্বমূর্ত্তি ও গুরুমূর্ত্তি।

আকাশ পূর্ণ থাকিয়াও ঘটমধ্যে যেমন ঘটাকার আমিও সেইরূপ স্ব স্বরূপে থাকিয়াও তোমার অভীষ্ট মূর্ত্তি। তুমি কখন ঘটাকাশ মত হইয়া ঘট-চিন্তা ত্যাগ করিতে করিতে মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের মিলনের মত তোমার আমার একত্ব দেখিয়া বিভোর, কখন বা আমাকেই হৃদয়ে চলিতে ফিরিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হও। কখন দেখ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময়ী আমিই তোমার মধ্যে তোমার ক্ষুদ্র বদ্ধ-চৈতন্যকে জাগাইবার জন্য স্বস্থান হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত নীচে নামিতেছি আবার তোমাকে মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া আমার স্বস্থানে লইয়া যাইতেছি, সেই সময়ে আমি বলিতেছি "সোঽহং"। আজ্ঞা চক্র হইতে মূলাধারে নামিয়া তোমাকে হৃদয়ে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় বলিতেছি "সঃ" আবার আমার স্বস্থান হইতে নীচে নামিবার সময় তোমাকে বলাইতেছি "অহং"। এই "সঃ" ও "অহং" এর একত্বেই তোমার সাধনা সম্পূর্ণ হইবে—তুমি আমি এক হইয়াও পৃথক্ থাকিয়া নিত্য আনন্দ উপভোগ করিব।

তুমি এখন "ওঁ" কারকেই তোমার আমার একত্ব নিশ্চয় করিয়া ঐ মন্ত্র জপে তোমার হৃদয়স্থিত আমার নীল-নলিনাভ-চক্ষে চেয়ে-চেয়ে-ডাকা মূর্ত্তির ধ্যান কর। আর কোন বাসনা রাখিও না। সকল ভার আমাকে দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমাকে লইয়া থাক।

ধীমহির পূর্ব্বে ধারণা অভ্যাস।

উপাসনা তত্ত্ব।

(১)

স্ত্রী। দেখ আজ কত সুন্দর হইয়াছি। হাসিলে কি হইবে? সত্যই সুন্দরী হইয়াছি। দর্পণ ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। জান কিসে এমন হইয়াছি?

স্বামী। জানি।

স্ত্রী। তুমিত সবই জান। আমি বলি শোন।

স্বামি। কি?

স্ত্রী। তুমি যে আমাকে ভালবাস তাহা অনুভব করিতেছি, তাই তোমার অনুরাগ আমার মধ্যে আসিয়া আমাকে রূপ দিয়াছে।

স্বামী। এতদিন বড় কুরূপিনী ছিলে?

স্ত্রী। তোমার আদরেই আমি গরবিণী সত্য। কিন্তু তখন তোমার সব আজ্ঞাত শুনিতাম না। এখন মনে হয় তোমার আজ্ঞা মত চলার জন্যই আমার এই জীবন। তুমি যেমন যেমন বলিয়াছ ঠিক সেইরূপ শয্যাকৃত্য হইতে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছি। চিত্ত কতই প্রসন্ন হইয়াছে। জানিতেছি এই চিত্ত প্রসন্নতার অনুভবই নারায়ণের প্রসন্নতার অনুভব। তুমিই আমার নারায়ণ।

স্বামী। দেখ! আজ ধ্যানের কথা হইবে। তুমি এই ভালবাসার কথা যদি উঠাও তবে সকল কথা শুনিবার সময় হইবে না। করিবার কাজটি ঠিকমত জানিয়া লইয়া পরে ভালবাস আর ভালবাসিয়া যাহা করিতে হয় কর।

স্ত্রী। আচ্ছা বল। ভালবাসা অনন্ত। ইহার শেষ কোথায়?

স্বামী। তাই সত্ত্বগুণের উদয়ে যে ভালবাসা জাগে তাহাই শ্রীভগবানের কাছে পৌছাইয়া দেয়। দেখ পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসার-দুঃখ দূর করাই জীবের সংসার-আগমনের প্রয়োজন। অজ্ঞান জন্যই জীব সংসার-বিদেশে আগমন করে। জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সংসার আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। অজ্ঞান নাশ হইলেই সে মুক্ত হইয়া স্বদেশে চলিয়া যায়।

সংসারটা কপট 'মাসীর' বাড়ী। 'সাজা মাসী' নানা প্রলোভনে ছেলেকে মুগ্ধ

করিয়া মাকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। মাসী জানে যে মাকে মনে পড়িলেই ছেলে আর নিকটে থাকিবে না, মায়ের কাছেই পলাইয়া যাইবে। মাসী তাই নানা প্রকারে "ছাঁকিয়া ছানিয়া" ছেলেকে নানা বস্তু ভোগ করায়। ছেলে ভোগকালে একটু সুখ পায় বটে কিন্তু শেষে ভোগে দুঃখ-ভোগই হয়। যুবা বয়সের যে সংসার সুখ-ভোগ তাহাই ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজ। 'কপট মাসীর' স্বার্থ, ছেলেকে অজ্ঞানে মুগ্ধ করিয়া নিকটে রাখিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা। কিন্তু ছেলে ঠকিয়া ঠকিয়া যখন দুঃখটা বেশ করিয়া বুঝিতে পারে তখন মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়। ছেলে যখন বুঝিতে পারে যে মা কখনও অজ্ঞানে ডুবাইয়া রাখিয়া বিষয়ভোগরূপ মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেন না। মা যাহা ভোগ করান তাহাতে অমরত্ব লাভ হয়। মাসীর ইচ্ছামত কার্য্যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণ-দুঃখ আর মায়ের আদেশ মত কার্য্যে জরা-মরণ হইতে মুক্তি।

যেখানে মা ও মাসী এক হইয়া যায়, যেখানে রজস্তম সত্ত্বের অধীন হয় সেখানে মাসীর কাছেও মায়ের সংবাদ সর্ব্বদা পাওয়া যায়—সেখানে সংসারে থাকিয়াই সংসার-পারে অমর ধামে যাইবার আয়োজন হয়।

এইটির জন্য প্রাচীন ভারতবাসী সাধনা করিতেন। এই সাধনাটিই প্রাচীন ভারত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ জন্মজরামরণরূপ অসহ্য দুঃখ অতিক্রম করিবার জন্যই উপাসনা।

হায়! দুরন্ত কলিযুগ, একালে সবই বিকৃতি। এখনকার লোকের কথা শুনিলে তুমি আশ্চর্য্য হইবে। এখনকার শিক্ষা—কষ্ট করিয়া সাধনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা কষ্টসাধ্য সাধনা তাহা অস্বাভাবিক।

নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান এসকল কষ্ট সাধ্য। উপাসনাতে কোন ক্লেশ নাই। চাষারা যে ক্ষেত্রে হাল চাষ করে তাহা উপাসনা। দাঁড়ী মাঝিরা যে নৌকা টানে তাহা উপাসনা। পশু পক্ষী যে খেলা করে তাহাও উপাসনা। বালকেরা যে খেলা করে তাহাও উপাসনা। স্ত্রীলোকেরা যে সংসার করে তাহাও উপাসনা। সূর্য্য যে আলোক বিতরণ করেন তাহা পাইতে যেমন আমাদের ক্লেশ নাই সেইরূপ ঈশ্বরকে পাইতে আমাদের ক্লেশ নাই। বায়ু পাইতে যেমন কষ্ট করিতে হয় না সেইরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্তিতেও কষ্ট নাই। কাজেই শাস্ত্র যে সাধন ভজনের শিক্ষা দেন তাহা অস্বাভাবিক।

উপস্থিত কালের এই যে মত দাঁড়াইয়াছে তাহাও নূতন নহে। এইগুলির

নাম চারু বাক্। ইহা পূর্ব্বকার চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের মত। খাও দাও আনন্দ কর। আনন্দে থাকাত সুখের কিন্তু বিষাদও যে হয়। পাখী ফড়িং ধরিয়া খায়, সর্প ভেক ধরিয়া খায়; রজস্তম গুণ বিশিষ্ট মানুষ পরস্পর 'খাওয়া খায়ি' করে। প্রবল জমীদার নিরীহ গরীব প্রজার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। 'খাও দাও সুখ কর' ইহা হয় কিরূপে? ভিতরে যে রজ ও তম আছে তাহার সহিত সত্বগুণের যে সর্ব্বদা বিরোধ। এ বিরোধ না ঘুচিলে ত 'খাও দাও সুখ কর' হয় না। কাজেই রজস্তমকে বশীভূত করিবার জন্য সাধন ভজন করিতে হয়। বেদাদি শাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন, বিনা সাধনায় ঈশ্বরের নিকটে যাওয়া যায় না। শত চার্ব্বাক আসিলেও ত সাধনা ত্যাগ হইতে পারে না। শত চার্ব্বাক উঠিল, শত চার্ব্বাক ডুবিল কে কবে সাধনা ত্যাগ করিয়া সব হারাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে?

সর্ব্বজীবে ঈশ্বর আছেন। তিনি "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাম্"। তিনি সকল জীবের বন্ধু। আমার একজন আছেন। সকল দুঃখ তিনি দূর করিতে পারেন, সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও যখন তিনি আমার দুঃখ দূর করিতে আসেন না তখন অবশ্য দুঃখ দ্বারাই আমার মঙ্গল হয়। এইটি ধারণা করিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহাকে জানিবার জন্য উপাসনা করা চাই। বন্ধু আছেন সত্য কিন্তু যতদিন না তাঁহাকে জানিতেছি ততদিন আমার শান্তি কিরূপে আসিবে? শুধু মানিয়া লওয়া রূপ বিশ্বাসেই কি সব হয়? তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহাকে ধ্যান করা চাই। তবে কার্য্য হইবে। সেই জন্যই উপাসনা। সত্বগুণ জাগিলেই আপনা হইতে ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। রজস্তম যতদিন আছে ততদিন ও উপাসনা হয়। তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু রজস্তম জনিত ভোগের উপাসনায় প্রাপ্তি যম-মন্দির, আর সত্বগুণ জনিত ঈশ্বরোপাসনায় প্রাপ্তি নিত্যসুখ-ধাম। তাই বলিতেছি ঈশ্বর-উপাসনা আবশ্যক। গাভীর শরীরে দুগ্ধ আছে। সেই দুগ্ধে ঘৃত থাকে। কিন্তু তাহাতে গাভীর পুষ্টি হয় না। দুগ্ধ দোহন করা চাই। তাহা হইতে মাখন তোলা চাই। তাহা মথিয়া জ্বাল দিয়া ঘৃত বাহির করা চাই। সেই ঘৃত আহার করা চাই, তবে না পুষ্টি? সেইরূপ সর্ব্ব দেহে ঈশ্বর আছেন। উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে জানা চাই। তবে জনম-মরণ হইতে পরিত্রাণ, নতুবা শত চার্ব্বাকের বাক্যে মৃত্যু ভয় নিবারণ হইবার নহে।

উপাসনার প্রাণ হইতেছে "বিদ্মহে" জানা। জানার প্রাণ হইতেছে "ধীমহি"

ধ্যান। ধ্যানের প্রাপ্তি হইতেছে "প্রচোদয়াৎ"; শ্রীভগবান যে জীবকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে প্রেরণা করেন তাহার অনুভব।

যখন শ্রীভগবানের প্রেরণা অনুভব হয় তখন আর সংসার-ভ্রমণ দুঃখের হয় না। সংসার-ভ্রমণ তখন বড় সুখের। এই সুখ-ভ্রমণের জন্যই ধ্যান আবশ্যক। আবার ধ্যানের জন্য জ্ঞান আবশ্যক। জান, ধ্যান কর, প্রেরণা অনুভব কর, এইগুলিকেই উপাসনা-তত্ত্বের অন্তর্গত বলিতেছি।

স্ত্রী। আমার বড় লোভ হইতেছে। বিগ্রহের কথা একরূপ বলিয়াছ। এখন ধ্যানের কথা ভাল করিয়া বলিতে হইবে। কারণ ধ্যানের সঙ্গে "করিবার কার্য্য" গুলি জড়িত।

স্বামী। বিগ্রহের কথা কতটুকু ধরিতে পারিয়াছ বল দেখি?

স্ত্রী। তা ঠিক পারিয়াছি। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা বুঝিয়াছি। যাঁহার উপাসনা আমি করি তিনি কত সুন্দর। তুমি জানাইয়া দিয়াছ যিনি আত্ম-চৈতন্যরূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই অব্যক্তভাবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে পরিবেষ্টন করিয়া ভিতরে বাহিরে অবস্থিত, আবার তিনিই অবতাররূপে উপাসনার অবলম্বন এবং উপাসনার শেষে সেই 'আপনি আপনি' ভাবে স্থিতিই জীবের সংসার-যাত্রা সমাপনান্তে পরমানন্দরূপ মোক্ষপদ। এইত তুমি বলিতেছ?

স্বামী। হাঁ! ঠিক ধরিয়াছ। ইহা শ্রবণ। পরে মনন চাই। পরে ধীমহি।

স্ত্রী। এখন বল ঋষিগণ কোন সাধনা দ্বারা এই পরমানন্দ-পদে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন? বল কোন্ সাধনা দ্বারা সুরগণ সর্ব্বদাই সেই বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিতেন?

স্বামী। বলিতেছি। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য লক্ষ্য কর। তুমি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ মাত্র। ঐকান্তিকতা মাত্র তোমাতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু তোমার ভাব যাহা বাহির হইতেছে তাহাই শাস্ত্রের ভাব। যদি সংস্কৃত ভাষা তোমার জানা থাকিত তবে শাস্ত্রের ভাষাতেই ঋষিদিগের ভাব বাহির হইত। শরীর ও মন ছন্দমত স্পন্দিত হইলেই দেবভাব আসিবে। আর দেবভাষা জানা থাকিলে দেবভাব দেব ভাষায় প্রকাশ হইবেই।

স্ত্রী। কি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতেছ?

স্বামী। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥" এই ভাবের কথা তুমি বলিয়াছ। ইহা শ্রুতি বাক্য।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগতব্যক্ত মূর্ত্তিনা" ইহাও তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। ইহা গীতা বাক্য।

স্ত্রী আশ্চর্য্যই বটে। আমাকেও শ্রীভগবান—

স্বামী। সাবধান, অভিমানটা যেন না আসে। তোমাদের একটুতেই যে অভিমান হয়। তাই এ কথা বলিতেছি। কতবার ত বল—দেখ আমাকে সকলেই ভালবাসে। এটাও অভিমান।

স্ত্রী। সত্যই বলিয়াছ। একটুতেই আমরা বেহুঁস হইয়া পড়ি। একটু সাধনা করিয়া একটু ভাল অবস্থা ক্ষণকালের জন্য আসিলেই কত কি মনে হয়। কোথায় সেই অনন্তরত্ন আর কোথায় সেই চিন্মণির জ্যোতির এক অতি অস্পষ্ট রেখা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার কখনও কোন অভিমান না আসে। আমি যেন চিরদিন দাসী থাকিয়াই তোমার সঙ্গে বেড়াইতে পারি। একটি স্তবের প্রার্থনা-অংশটি আমার বড় ভাল লাগে।

স্বামী। কোন্‌টি? এখানে উহা উঠিতেছে কেন?

স্ত্রী। যখন অভিমান আসিয়া পড়ে তখন দেখি আমার নানা প্রকার অপরাধ হয়। সেই জন্য বলি—হে হরি! আমার অবিনয় দূর কর, আমার মনও নানাভাবে চঞ্চল হয়, তুমি আমার মনটি দমন করিয়া দাও। আবার বিষয় বৈরাগ্যও ত আমার প্রবল নহে তুমি আমার বিষয়-মৃগতৃষ্ণা শান্ত কর। সকল ভূতে আমি দয়া করিতে পারি কৈ? আমার এই দেহে যে জীব আবদ্ধ সেই জীবের দুঃখ আমি সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি না বলিয়া আমার জীবে দয়া হয় না। হে প্রভু! ভূতদয়া বিস্তার কর। হে দীননাথ! আমাকে সংসার-সাগর পার কর। এইটি আমার বেশ লাগে।

স্বামী—অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়-মৃগ-তৃষ্ণাম্।
ভূতেদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার সাগরতঃ॥

কিন্তু এ স্তব কোথায় শিখিলে?

স্ত্রী। ছেলে বেলায় মহাকালী পাঠশালায় পড়িতাম। 'মায়ী' আমাকে বড় ভালবাসিতেন।

স্বামী। মায়ী?

স্ত্রী। একি অদ্ভুত দেখি! কখন ত এমন দেখিনি। তুমি এত ভাল বাসিতে?

স্বামী। অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল।

স্ত্রী। তা আসুক। সবই ত শুনিব। এমন হইল কেন?

স্বামী। জানিতেই বা এত আগ্রহ কেন?

স্ত্রী। এত ভালবাসিতে?

স্বামী। ইহাও বুঝি অসহ্য? ভালবাসার নাম শুনিলেই ভাব—তোমার সাত রাজার ধন মাণিক—

স্ত্রী। তাই কি বলিতেছি?

স্বামী। বলিতেছ কি না বলিতেছ একখানা আয়না আনিয়া দিব?

স্ত্রী। না—তার আর কাজ নাই, সময়ে সময়ে "উল্টা বুঝলু রাম" হইয়া যায়।

স্বামী। দেখ, স্ত্রীজাতি বড়ই তরঙ্গে নাচে। বিশেষতঃ যাহাদের মধ্যে একটু ভালবাসার 'ছক্কাই পঞ্জাই' থাকে। এটাতে নিন্দা করা হইতেছে বুঝিও না। তরঙ্গে নাচা স্বাভাবিক। মা যে আমার বিশ্বনর্ত্তকী তাত জান! তাঁর অংশে নারী। শুধু নারী মূর্ত্তিই বা কেন, মূর্ত্তি যেখানে যা আছে তাহাই যে মায়ের দেওয়া। মাই যে ছন্দরূপিণী। তিনিই যে সব অচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আচ্ছাদন করিয়া রূপ দেন বলিয়া আমরা দেবতার মূর্ত্তি দেখি। ঋষি, ছন্দ, দেবতা এই তিনটি মন্ত্রে থাকাই চাই। মন্ত্ররূপীকে যাঁহারা দেখেন তাঁহারা ঋষি। যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত দেখেন তিনি ছন্দে—ছন্দরূপিণী মা। ছন্দ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যিনি প্রকাশিত হয়েন তিনি দেবতা। দেবতা যিনি তিনি ক্রীড়াশীল আর দীপ্তিমান্।

জান আমার মা কে? কেনই বা মায়ের নামে এমন হয় জান?

স্ত্রী। কি আর বলিব? তুমি কি অপূর্ব্ব শুনাইতেছ? ব্রাহ্মণের মন্ত্র, ব্রাহ্মণেতর গণের দেবতা কোন বস্তু তাহা বুঝিতেছি। তথাপি কেন ওরূপ হইল শুনিতে হইবে। বল না?

স্বামী। প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
শেষে চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ী বুঝেনে মন ঠারে ঠোরে॥

স্ত্রী। ঠারে ঠোরেই না হয় একটু বলিলে?

স্বামী। মায়ের রূপ? সে কি বলা যায়? এমন রূপ কি ত্রিভুবনে আছে? কিরূপে বলিব? তথাপি বলিতে বলিতেছ। শুন।

স্ত্রী। বল। অবান্তর কিছুই হইবে না।

স্বামী। দেখ! মা আমার চৈতন্যমাত্রতনু—মা আমার বিদ্যুৎ বিলাস বপু—মা

আমার অপার কৃপাম্বুরাশি। এমন আর কোথায় আছে? এই আলম্বি কুন্তলভরা চারু মুখশ্রী, এই অনুরাগ-তরল দৃষ্টি, এই লাবণ্যবারি ভরা নব যৌবন, এই মন্দহাস্য কালে দর ফুল্ল কপোল রেখা, এই অশেষ জগতের নব বসন্ত শোভা, এই নিদাঘ জল শীকর শোভি বক্ত্র, এই সুন্দর মুখারবিন্দ, সাক্ষাৎ শব্দ ব্রহ্মস্বরূপিণী মাকে ভাবনা করিতে করিতে কি বলিতে ইচ্ছা করেনা "মাত র্নমামি মনসা তব গৌরি মূর্ত্তিম"—বলিতে কি ইচ্ছা করেনা "মাতর্ম্মমস্মৃতি পথং ন বিলঙ্ঘয়েতাম্।" বলনা, বলিতে কি সাধ যায় না—মা অতি কোমলা তুমি, তবুও "মূর্ত্তিস্তব স্ফুরতু মে হৃদয়স্য মধ্যে"—বলিতে সাধ কি করে না "শিরসৈব দধে তবাঙ্ঘ্রী।"

স্ত্রী। আমি কি অত জানি যে তুমি অত সংস্কৃত বলিতেছ?

স্বামী। দেখ বড় সুন্দর। ঐ সব কথা আর অন্যরূপে বলিলে শোভা পায় না। দেখ দেখি কত সুন্দর!—

প্রাতর্যা স্যাৎ কুমারী কুসুমকলিকয়া জাপমালাং জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকশিত দশনা চারুনেত্রা নিশায়াম্।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালাং বহন্তী
সা দেবী দেব দেবী ত্রিভুবন জননী কালিকা পাতু যুষ্মান্॥

কুসুমকলিকয়া জপমালাং জপন্তী—কত সুন্দর বল দেখি!
এই সমস্ত বড়ই সুন্দর! ত্রিভুবনে সমস্তই তাঁহার মূর্ত্তি। আবার দেখ—

শম্ভুস্তমদ্রিতনয়া কলিতার্দ্ধভাগো
বিষ্ণুস্তমম্ব কমলা পরিবদ্ধ দেহঃ।
পদ্মোদ্ভব স্তমসি বাগধিবাস ভূমি
স্তেষাং ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব।
নারায়ণীতি নরকার্ণবতারিণীতি
গৌরীতি খেদশমনীতি সরস্বতীতি।
জ্ঞানপ্রদেতি নয়নত্রয় ভূষিতেতি
ত্বামদ্রিরাজতনয়ে বহুধা ভজন্তি॥

দেখিতেছ আমার মা কেমন? মা কখন কুমারী হইয়া গলদেশে হস্তবেষ্টন করিয়া কোলে উঠিতে আসিতেছেন, কখন যুবতী হইয়া পূজার ভান করিয়া পূজা লইতে আসিতেছেন, কখন বা বৃদ্ধা হইয়া কোলে মাথা তুলিয়া লইয়া ঘুম

পাড়াইবার ছলে মস্তকের কেশ ধীরে ধীরে নাড়িয়া মস্তকাঘ্রাণ করিতেছেন, তবুও যে তাঁহাকে চিনিতে পারি না ইহাই বিচিত্র মায়া।

স্ত্রী। কত সুন্দর, এই সব বলিতে বলিতে তুমি যাহা হও তাহা আর কি করিয়া তোমাকে দেখাইব? মনে হয়, আমার চক্ষু তারকায় মিশিয়া আপনাকে আপনি একবার যদি দেখ? আমি তোমার কথা শুনিতে শুনিতে কথা ভুলিয়া শুধু দেখি। মনে হয় তুমিই যেন কত সাধের সমষ্টি।

(২)

স্বামী। এখন ধ্যানের জন্য অন্য আবশ্যকীয় কথা বলিব। মনোযোগ কর।

স্ত্রী। বল। আমি তন্ময়ী হইতেছি।

স্বামী। "বিগ্রহের" মধ্যে শ্রবণ আছে আর মনন আছে। তার পরে ধ্যান।

স্ত্রী। ঋষিরা শ্রবন মনন নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে যাহা বলিতেন তাহাই কি হরি কথা বা দেবী কথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—ভগবানের এই নবধা ভক্তির সমান ব্যাপার?

স্বামী। বেদের কথাই পুরাণে নবধা ভক্তি। পুরাণ বেদেরই ব্যাখ্যা। "বেদ বিধির অগোচর" এই যে একটা কথা রটিয়াছে এটাও যেমন ব্যভিচার, সেইরূপ পুরাণ মানিনা বেদ মানি এটাও সেইরূপ ব্যভিচার। পুরাণ (বায়ু পুরাণ) স্পষ্টাক্ষরে বলেন পুরাণ না মানিয়া যিনি বলেন বেদ মানি তিনি বেদের অঙ্গভঙ্গ করেন। আবার যিনি বলেন যে বেদে প্রেম-ভক্তির ব্যাপার নাই তিনিও নিতান্ত শিশু। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

গাব ইব গ্রামং যূযুধি বিবশ্বান্,
বা শ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভিনো ন্যেতুধর্ত্তাদিবঃ
সবিতা বিশ্ববারঃ।

হে বিশ্ববার! হে সর্ব্বজন বরণীয়! হে সবিতা! হে সর্ব্বপ্রসবিতা! হে দ্যুলোকের ধারয়িতা! তুমি এই। তোমার নিকটে যাইবার যোগ্যতা আমার নাই। তুমি এস। ধেনুকুল অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া, যেমন শীঘ্র গ্রামকে প্রাপ্ত হয় তুমি সেইরূপ আমাকে প্রাপ্ত হও। যোদ্ধা যেমন স্বীয় অশ্বের নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপে এস। দুগ্ধবতী গাভী যেমন

প্রফুল্লমনে হাম্বারব করিতে করিতে আপন বৎসের নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপে এস। স্বামী যেমন ভার্য্যার নিকটে আগমন করেন তুমি সেইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হও। কে বলিবে ইহা অনুরাগের কথা নহে? লোকে আবার যে বলে বেদে ভক্তি নাই তাহাই বা কোন্ বুদ্ধিমানের কথা?

সংসার-সাগর হইতে যে মুক্তি তাহা আত্মজ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান আবার ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই হইবে না। তারপর ভক্তি যোগটি অন্য সমস্ত সাধনা অপেক্ষা নিরুপদ্রব। শ্রুতি বলেন—"তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ। বুদ্ধিমতামনায়াসেনাহচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তৎ কথমিতি? ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান পরিপালয়তি। সর্ব্বাভিষ্টান্ প্রযচ্ছতি। মোক্ষং প্রাপয়তি। ভক্ত্যাবিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাঽপি ন জায়তে। তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠোভব। ভক্তিনিষ্ঠোভব।"

অধিকারী অনধিকারী সকলের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ভক্তিযোগে সকলেরই অধিকার। ভক্তিযোগ সাধনে কোন উপদ্রব নাই। ভক্তিযোগ হইতে মুক্তি। যাঁহারা বুদ্ধিমান যাঁহারা শুধু একটিতেই আটকাইয়া থাকেন না—যাঁহারা জ্ঞানের নাম শুনিলেই ভক্তি শুপাইয়া গেল ইহা ভাবেন না—যাঁহারা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা পড়িলেই ভাবেন না যে ব্রজের শুদ্ধ মাধুর্য্য 'উপিয়া' গেল তাঁহারা অনায়াসে শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

শ্রুতি বলিতেছেন—ভক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়, আর জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। তুমি জ্ঞানী ধ্যানী যোগীর নিন্দা করিলে তোমার কথা শ্রদ্ধা করিবে কে? শ্রুতি আরও বলিতেছেন অনন্ত বিপদরূপ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত ভীম ভবার্ণব-পারে লইয়া যাইবার কাণ্ডারী কে? ভক্তিযোগে সংসার-সাগর পার হওয়া যায় কিরূপে?

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান আপনিই সমস্ত মোক্ষবিঘ্ন হইতে সকল ভক্তকে রক্ষা করেন। তিনি ভক্তের সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। তিনিই মোক্ষদান করেন। ভক্তি ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কখনও জন্মায় না। সেই জন্য তুমিও অন্য উপায় ত্যাগ করিয়া ভক্তিকেই আশ্রয় কর। ভক্তিনিষ্ঠ হও। ভক্তিনিষ্ঠ হও।

অন্য উপায় ত্যাগ করিয়া অর্থে অন্যরূপ বুঝিও না। যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, ধ্যান এ সমস্তই ভক্তির অঙ্গ জানিও। ভক্তিশূন্য হইয়া বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম যে গুলি

তাহা করিও না। শ্রীভগবান্ শবরীকে যে নবধা ভক্তির কথা বলিয়াছেন তাহা তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি। সেখানে যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তকেই ভক্তির অঙ্গ বলা হইয়াছে। ঋষিগণ যে শ্রবণ মননের কথা বলিয়াছেন তাহাই সর্ব্ব সাধারণের জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি-ব্যাপার।

স্ত্রী। ঋষিগণ শ্রবণ মনন সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সংক্ষেপে যদি বলিতে?

স্বামী। তোমার ইহাতে অনধিকার হইলেও শুনিয়া রাখা মন্দ নহে। আমি শ্রুতি হইতেই ইহা বলিতেছি। তুমি বেদ শুনিতে চাও কিন্তু শ্রুতি ইহা নিষেধ করেন। বেদ তোমাদের জন্যও পুরাণরূপে ভাঙ্গিয়া বলেন। পশু পক্ষীরাও ঋষিদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিত। করিয়া ধন্য হইয়া যাইত।

শ্রবণ মনন সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

মায়াবিম্বে বিহায়ৈব উপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরব্রহ্ম বিলক্ষ্যতে॥

ইত্থং বাক্যৈস্তথাহর্থাহনুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।
যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বাহনুসন্ধানং মননং তু তৎ॥

পরমেশ্বরের উপাধি হইতেছে মায়া। আর জীবের উপাধি হইতেছে অবিদ্যা। ঐ উপাধি যখন না থাকে তখন তাঁহারাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।

স্ত্রী। একটা দৃষ্টান্ত সাহায্যে কি ইহা বুঝান যায়?

স্বামী। সমন্তাৎ প্রসারিত মেঘশূন্য নীল আকাশ ঝুলিতেছে। এইটিকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ধরিয়া লও। তারপরে, আকাশে একটি—একটি মাত্র অতি বৃহৎ মেঘ উঠিল মনে কর। এখন এই একটি মেঘযুক্ত যে আকাশ তাহাই হইলেন ঈশ্বর। ইনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, অন্তর্যামী, সর্ব্বভূতেরসুহৃৎ, মায়াধীশ প্রভু। মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়াই ইনি সগুণ। মেঘের সহিত জড়িত হইয়াও আকাশ যাহা যেমন তাহাই থাকে সেইরূপ মায়ার সহিত জড়িত হইয়াও ব্রহ্ম আপন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সর্ব্বদাই অবস্থান করেন। অথচ মায়া আশ্রয়ে তিনিই আপন স্বরূপে থাকিয়াও পরমেশ্বরভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন।

স্ত্রী। মায়া উপাধি দ্বারা কি হয় বুঝিলাম। অবিদ্যা উপাধির কথা বল।

স্বামী। মায়া এক। এক মায়া বহুখণ্ডে যখন খণ্ডিত মত বোধ হয় তখন

ইহাকেই বলে অবিদ্যা। সেই একখানি মেঘ যখন বহু খণ্ড খণ্ড মেঘে পরিণত হয়, তখন সেই খণ্ড খণ্ড মেঘের কোলে কোলে যে খণ্ড খণ্ড আকাশ মত দেখা যায় তাহাদের সহিত জীবের তুলনা হয়। অবিদ্যা জড়িত ব্রহ্মকেই বলে জীব।

প্রকৃতপক্ষে বুঝিতেছ—একখানি মেঘ বা খণ্ড খণ্ড মেঘ যেমন আকাশকে খণ্ড করিতে পারে না, তথাপি মনে হয় যেন আকাশ বহু খণ্ডে খণ্ডিত, সেইরূপ মায়া ও অবিদ্যা উপাধিতে ব্রহ্ম খণ্ডিত হন না। তথাপি মনে হয় যেন উপাধি দ্বারা তিনি আপন স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। মেঘ যখন না থাকে তখন যে আকাশ সেই আকাশই যেমন থাকে সেইরূপ উপাধি দূর করিলে, বুঝিবে ব্রহ্মস্বরূপে ব্রহ্মই আছেন।

শ্রুতির এই বাক্যে ঐরূপ অনুসন্ধানকে বলে শ্রবণ। আর যুক্তি দ্বারা ইহাই সম্ভব এই অনুসন্ধানের নাম মনন।

স্ত্রী। ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বাক্যের অর্থ যাহা তাহা বেদভক্ত জ্ঞানীর নিকট যে শ্রবণ তাহাই শ্রবণ। আর নিজে বিচার করিয়া শ্রুতি যাহা জানাইতেছেন তাহার মধ্যে কোন সংশয় নাই; অর্থাৎ শুনিয়া যাহা মানিয়া লওয়া হয়, বিচার দ্বারাও তাহার সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় ভঞ্জনের নাম মনন। এই ত?

স্বামী। হাঁ। ধ্যান কি তাহাই এখন শ্রবণ কর।

তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতস স্থাপিতস্য তৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসন মুচ্যতে॥

সংশয়শূন্য শ্রুতি বাক্যের অর্থ দ্বারা যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া যায় তখন মনের মধ্যে যে একতান প্রবাহ—একটানা ভাব তাহাই হইল নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। বেদে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে তাহা সকলে পারে না তাই যোগিগণ বলেন বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে অগ্রে আত্মার অভিমুখী করিবে পরে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে আত্মাতে নিয়োগ করিবে। এইভাবে দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে দেহ ও মন হইতে ছাড়াইয়া ব্রহ্মজ্ঞকে ব্রহ্মে ন্যাস করিবে। ইহার নাম ধ্যান, ইহাই যোগ। দক্ষ সংহিতা ইহা বলেন।

স্ত্রী। এই সব কি আমাকে করিতে হইবে?

স্বামী। ঈশ্বর ও জীবের উপাধি ত্যাগ করিতে যদি পার ত কর। কিন্তু উপাধি ত্যাগের কার্য্য বা সাধনা করাত দূরের কথা, জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দেখা যাইতেছে, যেমন রজ্জুকে সর্প মত দেখা হয় এই কথা

ধারণা করাও সহজ নহে। নিগুর্ণ উপাসনায় তোমার অধিকার নাই। উহাতে সন্ন্যাসীর অধিকার। তোমার অধিকার সগুণ উপাসনায়। অধিকার অর্থে 'জোর জবরদস্তি' নহে, যে যাহা পারে না তাহাতে তাহার অধিকার নাই। উপযুক্ত হইলেই অধিকার আইসে। ইহাও স্বাভাবিক।

স্ত্রী। আমি যাহা পারিব তাহা বল।

স্বামী। তোমার কাজের কথা এখন বলিতেছি শুন।

উপাসনার মুখ্য প্রাণ হইতেছে ধ্যান, পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে। প্রাণ না থাকিলে দেহের সব অঙ্গই অবশ, মৃত। সেইরূপ ধ্যান না থাকিলে উপাসনার সমস্ত অঙ্গই মৃত। ধ্যানটি মূলে যদি না থাকে তবে উপাসনা আদৌ হয় না। ধ্যানের বহুবিধ প্রকার ভেদ আছে। সাধক যত যত উপরে উঠিতে থাকেন তত তত ধ্যানের উচ্চ উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। শেষ অবস্থায় সমাধি ও স্থিতি।

স্ত্রী। ভাল করিয়া বল। ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামী। ধ্যান বলে চিন্তাকে। ধৈধাতুর অর্থ চিন্তা। প্রকৃত ধ্যান বলে একচিন্তা প্রবাহকে। কিন্তু সকল প্রকার চিন্তাতে কিছু কিছু ধ্যান থাকেই। সেই জন্য পঞ্চনদ (পাঞ্জাব) অঞ্চলে স্ত্রীলোকের মধ্যেও কোন কিছুতে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে বলা হয় "বান্দর কা উপর ধ্যান দেনা"। তাই বলিতে-ছিলাম ধ্যানের অনেক প্রকার ভেদ আছে।

দেখ অবোধ শিশু ক্ষুধা পাইলে "মা" "মা" করে। ইহাও তাহার এক প্রকার ধ্যান। ক্ষুধা দূর হইলে কিন্তু মায়ের চিন্তা থাকে না। প্রকৃত ধ্যান তাহাই যাহাতে সর্ব্বদা একটি চিন্তার প্রবাহ চলে। ক্ষুধা হউক, চাই নাই হউক মাকে যে ক্ষণকালও ভুলিয়া থাকিতে পারে না তাহারই হয় যথার্থ ধ্যান।

স্ত্রী। একটা অবান্তর কথা উঠিল। বলিব?

স্বামী। বল।

স্ত্রী। আচ্ছা বুড়ো ছেলে মা মা করে কিরূপে? হাসিলে যে?

স্বামী। লক্ষ্য কোন্ দিকে?

স্ত্রী। দেখ, সাধে কি তোমাকে কত কি বলি—

স্বামী। এই আবার ঢেউ তুলিতেছ। শুন বুড়ো ছেলে "মা" "মা" করে কিরূপে। আহা বড় সুন্দর। দেখ আমার শরীর কণ্টকিত হইতেছে।

স্ত্রী। আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আমি কি কখন তোমাকে বুঝিতে পারিব?

স্বামী। পারিবে। শুন। দেখ, বৃদ্ধ বয়সে শরীর অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়। এজন্য কেহই বৃদ্ধত্ব চায় না। যুবতী স্ত্রীলোকেরা---যাহারা বাহিরের রূপ লইয়া বেশ এক রকম কেমন কেমন থাকে—তাহারা ভিতরের বৃদ্ধকে ভালবাসিতে পারে না। তবে যাহারা বাহিরের রূপের ভিতরে আর একটা রূপ যে আছে তাহা দেখিয়াছে তাহারা বৃদ্ধকে বৃদ্ধ দেখেনা। বাস্তবিক সাধক কখন বৃদ্ধ হয় না।

স্ত্রী। তাই কি "মা" "মা" করিতে লজ্জা করেন না?

স্বামী। সাধকের শরীর বৃদ্ধ হইলে তিনি মনে মনে আর এক জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা বড় সুখের। মরিয়া আবার নূতন জন্ম গ্রহণ করিবে কেন? এই জীবনেই আবার একবার জন্মাও না। জীবনে কত "ঝড়্তি পড়্তি" হইয়া গিয়াছে। দৃঢ় ভাবে ভাবনা কর আবার নূতন জন্ম হইল। ভাবনা রাজ্যে বালক হইয়াছ বা বালিকা হইয়াছ ইহা দৃঢ় ভাবনা করিতে থাক। বালক কি মা ভিন্ন কাহাকেও জানে? বাহিরে যা কর, কর, কিন্তু ভিতরে অতিবাহিক দেহে ভাবনা কর, সংসারের কাহাকেও চিনিনা; কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই; শুধু মাকেই চিনি। বৃদ্ধ কি কখন মায়ের কোলে উঠিতে পারে? না মায়ের স্তন পান করিতে পারে? তাই সাধক ভিতরে বালক হইয়া যায়, যাইয়া মায়ের কোলে উঠে, স্তন পান করে—সকলকেই মা মা করে। সর্ব্বদা মা মা করে। বৃদ্ধ শিশু কিন্তু অবোধ নহে। তবে সব জানিয়া সব শুনিয়াও ভিতরে অবোধ শিশুর মত মা মা সাধনা করে। শুধু ক্ষুধার সময়ে নহে—সকল সময়ে।

স্ত্রী। আহা এই বয়সে বালিকা সাজিয়া ভিতরে মায়ের সংসার করা বড় সুখ। আবার বিবাহের বয়স হইলে মাকে প্রাণেশ্বর বলায় আরও সুখ। ভাবনা রাজ্যে থাকিতে পারিলে সর্ব্বদা ধ্যান থাকে।

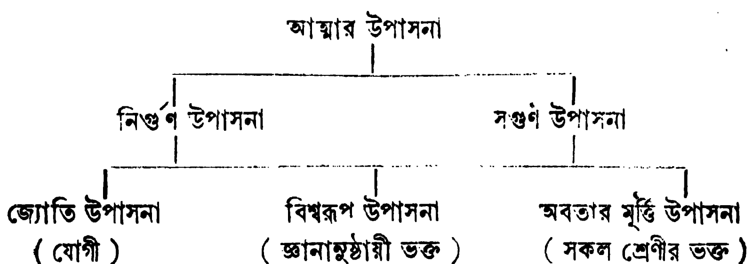
স্বামী। "তুলসি! অ্যায়সা ধ্যান ধরো য্যায়সা বিয়ানকা গাই"—সাধুরা ইহা বলেন। গাভী সর্ব্বদা চরিতেছে, ঘাস খাইতেছে কিন্তু বৎসের উপর মনটি সর্ব্বদা পড়িয়া আছে। শরীর ইন্দ্রিয় মন সমষ্টি স্বরূপ যে গাভী সংসার-মাঝে চরিতে আসিয়াছে তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই কিন্তু আত্মবৎসের উপরে থাকা চাই। যে দিকে পার মিলাইয়া লও, ক্ষতি নাই। বলিতেছি "বিয়ানকা গাই" মত যিনি তিনিই

ধ্যান বুঝিবেন। বেহুঁস হইয়া সংসারে চলিলে জ্ঞানবৎস চুরি হইয়া যাইবে। মনটি সর্ব্বদা ভগবানের কাছে রাখিয়া যাহা পার তাহাই কর। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন—অন্ততঃ উপাসনাকালে—"মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" হওয়া চাই। যাহাতে ইহা হয় তাহা কর শ্রীভগবান হাতে ধরিয়া সংসার-সাগর পার করিয়া দিবেন। "অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ" ইহা তাঁহারই আশ্বাস বাণী।

স্ত্রী। আমি ত ঐরূপ ধ্যানই করিতে চাই। "মৌলিস্থ কুন্তপরিরক্ষণধির্নটীব" ইহাত তোমার মুখে কতবার শুনি। কিরূপ ইহা হইবে তাহাই বল।

স্বামী। নির্গুণ উপাসনাতে যে ধ্যান এবং সেই স্থিতির জন্য যে সাধনা তাহা বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য। সগুণ উপাসনায় যে ধ্যান তাহা অন্য সকলের জন্য। আত্মার উপাসনাই উপাসনা।

সমস্ত উপাসনা-ব্যাপারটির চিত্র দিতেছি।



ইহা ভিন্ন "মৎকর্ম্মপর" ও "সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপ" নিষ্কাম কর্ম্মে উপাসনা আছে। "সর্ব্বদেবাঃ প্রাকৃতিকা যাবন্তো মূর্ত্তিধারিণঃ অহমাত্মা নিত্যদেহী ভক্তধ্যানানুরূপতঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—জন্মখণ্ড।

স্ত্রী। সকল উপাসনাই আত্মার উপাসনা ?

স্বামী। নিশ্চয়ই। শ্রীভাগবতও শ্রীভগবান্‌কে সম্বোধন করেন হে আত্মন্।

স্ত্রী। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন তাঁহারা বলেন আত্মার নাম করিলে অভক্ত হইতে হয়। কৃষ্ণকে আত্মদেব বলিলে তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না।

শ্রীরামচন্দ্রকে যদি আত্মারাম বা স্বাত্মারাম বলা যায় তবে তাঁহারা নিতান্ত ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা তবে কি?

স্বামী। সমস্ত উপাসনা শ্রুতি হইতেই জাত। শ্রুতি বলিতেছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। আত্মাকে দেখিতে হইবে। তজ্জন্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন চাই। এই আত্মা যখন উপাধিশূন্যভাবে "আপনি আপনি" থাকেন সেই স্বরূপে স্থিতিলাভের জন্য যিনি উপাসনা করেন তিনি নির্গুণ উপাসক। তিনি সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। আবার এই আত্মাকে যিনি সগুণ-ভাবে উপাসনা করেন তিনি ক্রম মুক্তি লাভ করেন! আত্মাই দেবীভাবে, রাম কৃষ্ণ ভাবে অবতার গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি আত্মা না হন তবেত তিনি অনাত্মা। অনাত্মার উপাসনা আর্য্যশাস্ত্রে কোথাও নাই। আত্মা মায়া অবলম্বনেই সগুণ মত হয়েন। তাই রামকৃষ্ণাদি অবতারকে মায়ামানুষ বলে। শ্রীকৃষ্ণ যিনি তিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ, তিনিই জ্যোতি, তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই চতুর্ভুজ, তিনিই দ্বিভুজ মুরলীধর নন্দ-নন্দন। এই সব আবার সমকালে। ভাগবত, গীতাদি শাস্ত্রত ইহাই বলেন। শাস্ত্রমত অগ্রাহ্য করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণকে শুধু ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণ, এতদ্ভিন্ন তিনি আর কিছুই নহেন বলা যায় তবে ত সে শ্রীকৃষ্ণ 'মনগড়া' কৃষ্ণ হয়েন। অতি আশ্চর্য্য যে ঐশ্বর্য্যের নাম করিলেই, এমন কি ব্রহ্মাদি ব্রজের কৃষ্ণকে তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করেন—ইহা বলিলেই যদি ব্রজের মাধুর্য্য রস শুখাইয়া যায় তবে ত শ্রীভাগবতেও ব্রজের রস নাই। ব্রজের রসের উল্লেখ যদি গীতাতে না থাকে, ভাগবতে না থাকে, বেদে না থাকে, অধ্যাত্ম রামায়ণে ঐ রকমের রস না থাকে তবে আধুনিকের 'মনগড়া' রস লইয়া থাকাটা ধর্ম্মের বিকৃতিই বটে। 'মনগড়া' উপাসনায় আধুনিক উপাসককে আর সনাতন ধর্ম্মের উপাসক বলা যায় না। শ্রীগীতা বলিতেছেন

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম চারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া যিনি 'মনগড়া' উপাসনা করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। সুখও পান না এবং পরম গতিও প্রাপ্ত হয়েন না। উপস্থিত কালে একথার সত্যতা প্রায় সর্ব্বত্র উপলব্ধি হয়।

স্ত্রী। সমাজে বহু প্রকারের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সেই সংশয়গুলি একবার শুনিলেই মন আর স্বচ্ছন্দে থাকে না। তাই তোমাকে পুনঃ পুনঃ

গোলমালের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এখন তুমি ধ্যান কিরূপে করিব বিশেষতঃ "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" কিরূপে করিব তাহাই বেশ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

স্বামী। নিগুর্ণ উপাসনায় কি করিতে হয় এখানে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সগুণ উপাসনাতে একটি অবলম্বন চাই। সেটি জ্যোতিও হইতে পারে আর অবতারের মূর্ত্তিও হইতে পারে। যোগীগণ ধ্যান করেন জ্যোতি অবলম্বনে আর ভক্তগণ ধ্যান করেন মূর্ত্তি অবলম্বনে। মূর্ত্তির ধ্যান যাহা তাহা প্রবৃত্ত সাধকের জন্য কিন্তু মূর্ত্তি অবলম্বনে যে ধ্যান তাহাই প্রশস্ত। জ্যোতিঃ সম্বন্ধেও তাই।

স্ত্রী। উপাসনায় কিরূপ অবলম্বন আবশ্যক তাহা এখনি শুনিব। মূর্ত্তি অবলম্বনে ধ্যান করিতে করিতে যখন মূর্ত্তিটিই গুণ ও লীলার বিলাস ক্ষেত্র হয় তখন বড় সুন্দর হয়। এখন নিগুর্ণ উপাসনায় কি করিতে হয় তাহা অতি সংক্ষেপে একটু বল না? অধিকার নাই তাহাত বুঝিতেছি তথাপি শুনিতে কেন ইচ্ছা হয় কে জানে?

স্বামী। কে আর জানিবে!

স্ত্রী! কি?

স্বামী। "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে" স্মরণ কর। মিলনের পরে মিশ্রণ। যাক্ সে কথা—এখন শুন।

অক্ষরের উপাসনাই নিগুর্ণ উপাসনা। শাস্ত্র সাহায্যে অক্ষর পুরুষের কথা শুনিয়া এবং দৃশ্য দর্শনটা ভ্রম মাত্র ইহা বিচার দ্বারা নিশ্চয় করিয়া 'আমিই আছি আর কিছুই নাই, সৃষ্টিও হয় নাই' এইরূপ 'আপনি আপনি' ভাবে যে স্থিতি তাহাই নিগুর্ণ উপাসনার লক্ষ্য। "ব্রহ্মৈবাস্মীতি যদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ ধ্যান শব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী।" বিনা অবলম্বনে আমি ব্রহ্ম এই ভাবে স্থিতিই ধ্যান।

স্ত্রী। শুনিলাম। ইহাতে আর কাজ নাই। এখন অবলম্বন ধরিয়া ধ্যান কিরূপে করিব তাহাই বল।

স্বামী। "শাস্ত্রোক্ত দেবতাদ্যালম্বনেষচলো ভিন্নজাতীয়ৈরন্তরিতঃ প্রত্যয়সন্তান একাগ্রতেতি"। প্রথমেই শাস্ত্রোক্ত দেবতাদি অবলম্বন চাই। চিত্তকে সেই মূর্ত্তিটিতে অচলভাবে ধরিয়া রাখা চাই। দেবতার রূপ, গুণ, লীলা ও স্বরূপ ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোন বিভিন্ন জাতীয় চিন্তা উঠিবেই না এইরূপ একাগ্রতা চাই।

স্ত্রী। অচলভাবে চিত্তকে স্থির রাখাটা কিরূপ ?

স্বামী। জলের যে ধারা পড়ে তাহাতে একবিন্দু জলের পরে আর একবিন্দু না পড়িবার পর্য্যন্ত একটা বিচ্ছেদ থাকে। কিন্তু তৈলধারার কোন বিচ্ছেদ থাকে না। একটি প্রবাহ সেখানে থাকে। সেইরূপভাবে অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রবাহ হইলেই ধ্যান হইতেছে বুঝিবে।

গরুড় পুরাণ নির্গুণের ধ্যান সম্বন্ধে অবলম্বন-রহিত ব্যাপার যাহা বলেন আবার সগুণের ধ্যান সম্বন্ধেত সুন্দরভাবে অবলম্বন-যুক্ত ব্যাপারও বলেন।

ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ ধারণা মনসো ধৃতিঃ।
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ॥

জলধারার মত চিত্তবৃত্তির প্রবাহ যখন হয় তখন হয় ধারণা। ব্রহ্মই আত্মা, তৈল ধারার মত এই চিন্তা যখন হয় তখন হয় ধ্যান। আবার আমিই ব্রহ্ম এইভাবে যে স্থিতি তাহাই হইল সমাধি। যোগিগণ এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি লাভের জন্য প্রত্যাহার [চিত্তকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা] করেন। প্রত্যাহারের জন্য প্রণায়াম করেন। প্রণায়ামের জন্য আসন করেন, নিয়ম অভ্যাস করেন, যম অভ্যাস করেন।' যোগশাস্ত্র এই জন্য। এখানে ইহা উত্থাপন করা হইবে না। গরুড় পুরাণ ভক্তদিগের করণীয় সম্বন্ধে বলিতেছেন—

ধ্যেয়সক্তং মনো যস্য ধ্যেয় মেবানুপশ্যতি।
নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যান মেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন্।
আবার— ধ্যেয় মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যাত্বা তন্ময়তাং গতঃ।
পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥

ধ্যেয় বস্তুতে প্রথমে মনটি আসক্ত হওয়া চাই। ধ্যেয় বস্তুটি মাত্রই দেখিতে পাই আর কিছুই দেখি না। এইরূপে যখন অন্য পদার্থ আর কিছুই জানা যায় না, আবার যদি কোথাও নেত্র পড়ে তবে "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" যখন হইয়া যায় তখন হয় ধ্যান। আর ধ্যেয় বস্তুতে মন যখন এমন নিশ্চল হয় যে কেবল ধ্যেয় পদার্থেরই চিন্তা একতান প্রবাহে চলিতে থাকে, চিন্তার সেই একটানা স্রোতের নাম ধ্যান। আবার সর্ব্বত্র যখন ধ্যেয় বস্তুর স্ফুরণ হয় আর যিনি ধ্যান করেন তিনি ধ্যেয় বস্তুতে লয় হইয়া যান, সর্ব্বত্র দ্বৈতরহিত ভাব যখন দেখা হইয়া যায় তখন হয় সমাধি।

স্ত্রী। ইষ্টমূর্ত্তি অবলম্বনে ধ্যানের ব্যাখ্যাত বেশ শুনিলাম ও বুঝিলাম। এখন যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে তাহা প্রথম হইতে বেশ করিয়া বল।

স্বামী। শ্রীভগবানের দর্শন, তাঁহার দৃষ্টিমধ্যে যে অবস্থান তাহার অনুভব, এবং প্রতি ভাবনা, বাক্য ও কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে যাঁহার বাসনা তাঁহাকে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ও কতকগুলি বিশেষ নিয়মে সাধনা করিতে হইবে।

সাধারণ নিয়মগুলি প্রথমে শ্রবণ কর—

(১) প্রতিদিন আমরা ২৪ ঘণ্টা সময় পাই। যাহা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সেগুলি যথা সময়ে করিতে হইবে। শয্যাকৃত্য, প্রাতঃকৃত্য, স্নান, উপাসনা, আহার, নিজ নিজ আশ্রমের অন্যান্য ব্যবহারিক কার্য্য, স্বাধ্যায়, যথাপ্রাপ্ত লোক-হিতকর কার্য্য, নির্জ্জনবাস, নিদ্রা এই সমস্ত কর্ম্ম যথাসময়ে করা চাই।

(২) প্রধানতঃ নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা যথাসময়ে প্রতিদিন করা চাই। অন্য কর্ত্তব্যের কথা তুমি জান! "অহঃরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ব্রাহ্মণের প্রতি, শ্রুতির এই আজ্ঞার মত তোমাদের উপরেও এইরূপ আজ্ঞা আছে। কোন একটি সময় ঠিক করিয়া সেই সময়ে অন্ততঃ একবার করিয়া শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যহ তিন বেলায় ত নিত্যকর্ম্ম করিবেই। তাহার উপরে একান্ত বাসের সময়ও একটি থাকিবে। নিত্য কর্ম্মের সময়, আমি তোমার শরণাপন্ন এইটি মনে রাখিয়া প্রণাম, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ব্যাপারের সহিত জপ ধ্যানাদি করিবে। একান্তে ঈশ্বর চিন্তাটি প্রতিদিন করিতে করিতে, এবং তিন বেলায় নিত্য কর্ম্মগুলি করিতে করিতে ঈশ্বর-ভাবে চিত্তটি এরূপ ভাবিত হইয়া যাইবে যাহাতে কোন ভাবনা, কোন বাক্য বা কোন কার্য্য অগ্রে তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া হইবেই না।

(৩) শরীরের মধ্যে নাভি, হৃদয়, ভ্রূমধ্য, এবং সহস্রার এই স্থান গুলিতে চিত্ত ধারণা করিতে হয়। অন্য অন্য স্থানও আছে। যখন ধারণা অভ্যাস চলিতে থাকিবে তখন প্রাতে নাভিতে, মধ্যাহ্নে হৃদয়ে, সায়াহ্নে ললাটদেশে এবং একান্তে যেখানে বেশী ভাল লাগে সেইস্থানে ধ্যান করিতে হয়। স্থানটি ধারণা হইতে সেইস্থানে সূর্য্যমণ্ডল, ইহা সমস্ত চিন্তার সময়েই করা চাই।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে হৃদয় পদ্মাদির কোন এক পদ্মে ধ্যেয় বস্তুকে বসাইয়া নিত্য-কর্ম্ম করিতে হয়। এবং ধ্যেয় বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই একান্তে চিন্তা করিতে হয়।

স্ত্রী। একান্তে চিন্তাটি কিরূপ করিতে হইবে তাহাই একবার বলনা?

স্বামী। প্রথমেই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া স্বস্তিকাসনে বা পদ্মাসনে উপবেশন কর। যদি দেখ আলস্য বা অনিচ্ছা কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছ না তখন বদ্ধ-পদ্মাসন করিয়া প্রথমে শরীরের জড়তাটা কাটাইয়া লও; লইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কতক্ষণ ধরিয়া প্রণাম কর। এইরূপ প্রণাম করিতে করিতে সহস্রারে শ্রীগুরুর পরম পদ স্মরণ কর। যদি ইহাতেও ঠিক না হয়, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে হাতে তালি দিতে থাক, শরীরকেও মৃদু মৃদু দোলাইয়া নৃত্যের ভাবে স্পন্দিত কর, কখনবা 'পায়চারি' করিতে করিতে যেন প্রদক্ষিণ করিতেছি এই ভাব আন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যথাসময়ে কর্ম্ম করিতে বসিতে হইবে। যে দিন ইহা না হইবে সেদিন আপনাকে আপনি দণ্ড দাও। ইহা প্রায়শ্চিত্ত। দশের স্থানে শত—তাহাতেও যদি মন প্রাণ জাগিয়া না উঠে তবে হাজার। ভবিষ্যতে যাহাতে সময় অতিক্রান্ত না হয় তজ্জন্য পূর্ব্বরাত্র হইতে প্রস্তুত হও; শয়নের পূর্ব্বে বেশ করিয়া তাঁহাকে জানাও যাহাতে সময়ের কার্য্য যথাসময়ে করিতে পার। পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে করিতে যথাসময়ে কর্ম্ম করিতে বসিবার সঙ্কল্পটি দৃঢ় কর। লোকের 'খাতিরে' কিছুতেই নিয়মভঙ্গ করিও না। লোকে যাহা বলে বলুক নিয়মভঙ্গ করিয়া সঙ্কল্প শিথিল করিও না। যথাসময়ে নিত্যকর্ম্ম করিবার জন্য আসন করিয়া বসিয়া প্রথমেই মৃত্যুচিন্তা, করণীয় কর্ম্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তায় মন প্রাণকে জাগাইয়া লও।

স্ত্রী। আপনাকে আপনি জাগ্রত করাইত নিতান্ত আবশ্যক। কিরূপ চিন্তায় হৃদয় সজাগ হয় ভাল করিয়া বল।

স্বামী। শুন। মনকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতে থাক, কত লোককেই ত মরিতে দেখিয়াছ। মরণ সময়ের সেই অকথ্য যাতনা স্মরণ কর। মরণ সময়ের সেই কাতর দৃষ্টিতে আশ্রয় ভিক্ষা স্মরণ কর। হে জগত্তারণ! আর আমার ত্রাণ কর্ত্তা কেহই নাই। কেহই ত্রাণ করিতে পারে না, প্রভু! আর আমার আশ্রয় দাতা কেহ নাই। হে দীনবন্ধু! সত্যই আজ দীনের দীন সাজিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতেছি। তুমি ভিন্ন এই ত্রিতাপ-তাপিতের আর গতি নাই। এই অপরিমিত ষড়োর্ম্মিক্ষুব্ধ সংসার-সাগরে পতিত পাতকীজনের তুমি ভিন্ন আশ্রয়দাতা আর কে হইবে প্রভু! আমার এই বিপদকালে কে আর আমার কাছে দাঁড়াইবে প্রভু! আমি তোমার শরণাপন্ন, আমাকে রক্ষা কর। হায়! আর যে আমার কেহ

নাই। মৃত্যুশয্যায় শায়িত জনের শয্যাকণ্টক অবস্থা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শরণ লও। ইহাতে মন জাগিবে।

তারপর যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে যাইতেছ সেইগুলি একবার মনে করিয়া লও। কোনটির পরে কোনটি করিতে হয়, কেন করিতে হয় তাহা একবার আলোচনা কর। নিষ্কামভাবে এই সমস্ত কর্ম্মাঙ্গগুলি করিবে, তাহাও মনে কর। মৃত্যুচিন্তায় যেমন তমোভাব কাটে সেইরূপ কর্ম্ম চিন্তায় কর্ম্মের উদ্যম আসিবেই। তারপরের কর্ম্ম—যাঁহাকে ডাকিতে যাইতেছ তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে তিনি বিরাজ করেন তাহাও স্মরণ কর। করিতে করিতে প্রার্থনা কর।

এই যাহা ভাবিতে বলিতেছি তাহাতে আমি কে, তুমি কে, কোথায় আমি পতিত, কোন্ দেহ কারাগারে ভ্রান্ত পথিক আবদ্ধ, কোন্ কর্ম্ম করা হইলে কিরূপে তিনি পতিতস্থান হইতে উদ্ধার করেন, এই সমস্ত চিন্তা করা হইল। এই ভাবনা দ্বারা মন ও প্রাণ ব্যাকুল হইয়া করণীয় কর্ম্মগুলি করিতে পারিবে। যদি দেখ কর্ম্ম করিতে গিয়া কষ্ট হইতেছে, কষ্ট করিয়া কর্ম্ম করিতে গেলে যদি বা আর কিছু হয় এই ভয় আসিয়া উদ্যম শিথিল করিতেছে তখন ক্ষণকালের জন্য বায়ুর কর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া জপাদি কর্ম্ম করিতে থাক। ইহাতে কোন প্রকার ভয় নাই। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা কর—মরিবার জন্য ভয়ই বা কি? মরে ত সকলেই, মরি ত মরিব, তাঁহাকে ডাকিয়াই মরিব, এই ত দৃঢ় বাসনা। ইহাতেই মনে বল পাইবে।

স্থির জানিও তাঁহাকে ডাকিলে কেহ মরে না; বরং অমর হয়। গাধা কুকুরের ডাক ডাকিয়া মরিবে কেন—মরিতে হয় "জপই জপই শ্যাম নাম ছার তনু করব বিনাশ"। ইহাই সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম কর।

স্ত্রী। শুনিতে শুনিতেই প্রবুদ্ধ হইতে হয়। এখন যাঁহাকে ডাকিতে যাইতেছি, যিনি ত্রাতা, তিনি কেমন, কোন সুখময় স্থানে তিনি থাকেন সেই সম্বন্ধে প্রার্থনার কথা একবার বল। বিগ্রহেতে তাঁহার ভাব যাহা জানাইয়াছ প্রার্থনা করিয়া একবার তাহা বলিয়া দাও। ইহার পরে আমার পক্ষে যেরূপ ধ্যান উপযোগী তাহা বলিও।

স্বামী। আত্মার নির্গুণ ভাব, অন্তর্যামী ভাব, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করিয়া যে ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে হয় শ্রবণ কর। ইষ্ট

দেবতাকে যথাস্থানে জ্যোতির মধ্যে বসাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রার্থনা করিতে হইবে।

হে সর্ব্বান্তর্যামী সাক্ষিচৈতন্য! হে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা পরম পুরুষ! হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও।

তুমি সর্ব্বদোষ হীন, তুমি পরমহংস ও ঈশ্বর। তুমি অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম স্বরূপ। ভগবান ধাতা ব্যতীত তোমার তত্ত্ব কেহই অবগত নহেন।

কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট এই সমস্ত বিশ্ব ও ভূতগণ তোমাতেই অবস্থিত। লোকে তোমাকে সহস্রশীর্ষ, সহস্র বদন, সহস্র চক্ষু, সহস্র বাহু, সহস্র মুকুট নারায়ণ বলে। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতেই অভিব্যক্ত। তোমার প্রীতির জন্য তপানুষ্ঠান করিলে কদাচ উহা নিষ্ফল হয় না।

মনুষ্য হৃদয়াকাশে তোমাকে নিরীক্ষণ করিলে মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পরমারাধ্য, আমি তোমার উপাসনা করি।

তুমি এক হইয়াও বহু। তুমি সর্ব্ব অভিলাষ সম্পাদক। নীর মধ্যে হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ যেমন বিহার করে, সেইরূপ তোমাতে সমস্ত জীব বিহার করিতেছে। তুমিই দুঃখ নাশের একমাত্র উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষকে অনুসন্ধান করেন সেই তুমি, তোমাকে নমস্কার। তোমার কেশপাশে জলদজাল, অঙ্গ সন্ধিতে নদী, জঠর মধ্যে চারি সমুদ্র, তুমি জলস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

অগ্নি তোমার আস্যদেশ, স্বর্গ মস্তক, আকাশ মণ্ডল নাভি, ভূমণ্ডল চরণদ্বয়, সূর্য্যমণ্ডল চক্ষু, দিঙ্মণ্ডল কর্ণ। সর্ব্বলোক স্বরূপ তুমি, তোমাকে নমস্কার।

বায়ুর্ভূত্বা বিক্ষিপতে চ বিশ্বং অগ্নির্ভূত্বা দহতে বিশ্বরূপঃ।
আপোভূত্বা মজ্জয়তে চ সর্ব্বং ব্রহ্মা ভূত্বা সৃজতে বিশ্বসংঘান্॥
জ্যোতির্ভূতঃ পরমোঽসৌপুরস্তাৎ প্রকাশতে যৎ প্রভয়া বিশ্বরূপঃ।
অপঃ সৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতাত্মযোনিঃ পুরাকরোৎ সর্ব্বমেবাথ বিশ্বম্॥
ঋতূনুৎপাতান্ বিবিধান্যদ্ভুতানি মেঘান্ বিদ্যুৎ সর্ব্বমৈরাবতং চ।
সর্ব্বং কৃৎস্নং স্থাবরং জঙ্গমং চ বিশ্বাত্মানং বিষ্ণুমেনং প্রতীহি॥

হে প্রভু! হে সর্ব্বসাক্ষিন্! চেত্যরূপিন্! তুমি ব্রহ্ম স্বরূপ, তুমি রুদ্র

স্বরূপ, তুমি উগ্র স্বরূপ, তুমি শান্ত স্বরূপ, তুমি সর্ব্ব স্বরূপ, তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। তোমাকে নমস্কার।

আমি ভূতাতি কালত্রয়ে তোমার অবস্থিতি অবলোকনে সমর্থ নহি; কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তোমার সনাতন মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছি।

আর কি বলিব প্রভু! তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গ ও পদযুগল দ্বারা মর্ত্তলোক ব্যাপ্ত। বিশ্ব সংসার নারায়ণাত্মক। হে নারায়ণ! তুমি সর্ব্বদা সকল বস্তুতে বিরাজমান রহিয়াছ।

এইভাবে একান্তে বসিয়া চিন্তা কর। আর প্রার্থনা কর। বল—কত আর বলিব, তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার লীলা, তোমার বিশ্বরূপ, তোমার স্বরূপ স্মরণ করিয়া ধন্য হইয়া যাই। তোমার বিচিত্র জন্ম ও কর্ম্ম স্মরণ করিয়া, তোমার মধুর স্বভাব অনুকরণ করিয়া, তোমার প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া, তোমার চরণে জ্বলিত মস্তক লুণ্ঠন করিয়া আমি জন্মের মত শান্ত হইয়া যাই। তুমি প্রসন্ন হও। আকাশ ছাইয়া যে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, হৃদয় ভরিয়া যে তুমি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ, আবার চক্ষুর সম্মুখে ঐ নয়নাভিরাম —ঐ মনোভিরাম বেশে যে তুমি খেলা কর, সকলের কাছে আকাশ যেমন সুলভ আমি সেই আকাশের মত তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া ভিতরে বাহিরে শান্ত হইয়া জীবন্ত গগন-সদৃশ হইয়া যাই।

স্ত্রী। আহা! এইভাবের চিন্তা কত সুন্দর। কিন্তু আমি ত এভাবে ভাবনা করিতে পারি না। কি করিলে পারিব?

স্বামী। "বিদ্মহে"র ভিতরেই ত এই চিন্তা আছে। যদি সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিয়া থাক আর আত্মতত্ত্বটি আভাসেও ধারণা করিয়া থাক, আর অবতার তত্ত্বের জন্ম ও কর্ম্ম কিরূপ, আলোচনা করিয়া থাক, তবে একান্তে বসিয়া তোমার যে চিন্তা প্রবাহ ছুটিবে তাহার শেষ কোথায়? তিনি নির্গুণ, তিনি সগুণ তিনি বিশ্বরূপ, তিনি অবতার, তিনি আত্মা—ইহার প্রত্যেকটিতে অপূর্ব্ব ঈশ্বর-চিন্তা রহিয়াছে।

স্ত্রী। সেই যে সব এই বিষয়ের একটি স্তুতি আমাকে একবার বল। ইহার সঙ্গে সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহাকে কি ভাবে ভাবিতে হয় তাহাও একবার বল। তারপরে ধ্যানে আমার করণীয় কি বলিও।

স্বামী। ঋষি প্রণীত যে কোন স্তব চিন্তা কর—দেখিবে তাহার মধ্যে তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং তিনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এই দুই ভাব থাকিবেই।

তিনি নিত্য, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি আনন্দ স্বরূপ,পরিপূর্ণ অধিষ্ঠান চৈতন্য তিনিই। চৈতন্যের জন্ম নাই। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার হয় তাহা চেতন হইতে পৃথক্। জগতের বাহিরের রূপ ঐ পৃথক বস্তু, কিন্তু ভিতরে তিনিই। অথচ বাহিরেরটি না হইলেও সৃষ্টি নাই। জগতে যে কর্ম্ম চলিতেছে তাহার মধ্যে আদর অনাদর উভয়ই আছে। ঘোরা প্রকৃতি অনাদরের কর্ম্ম তুলিলেও আঘোরা প্রকৃতি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। এই অঘোরা প্রকৃতি ভিন্ন আর কেহই আমাদিগকে সেই রমণীয় দর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারে না। সৃষ্টি মধ্যে ইহার কার্য্যই শ্রীভগবানের কার্য্য বলিয়া চিন্তা করিবার যোগ্য।

এই জগতে প্রকৃতি পুরুষকে পূজা করেন এবং পুরুষও যে প্রকৃতিকে আদর করেন—ইহা লক্ষ্য করিতে পারিলে ভগবদ্ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করে। দণ্ডে দণ্ডে প্রকৃতি যে নূতন নূতন বেশ পরিবর্ত্তন করেন—প্রভাতে সুন্দর ফুল প্রভৃতি ফুটাইয়া, তাহাতে শিশির বিন্দুর মালা গাঁথিয়া, সুন্দর আকাশে বহু বর্ণের মেঘের সাটী পরিয়া, আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া, ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতে করিতে যে আচমন করেন ইহা পুরুষের পূজার জন্য; মধ্যাহ্নে যুবতী সাজিয়া কি জানি কি ভরা আঁচল দোলাইয়া আর সায়াহ্নে ও শয়নকালে কত হীরা মতি চুনি পান্নায় অঙ্গ ভরিয়া—নানা ভাবে নানা ঋতুতে প্রকৃতি পুরুষেরই পূজা করেন। নদী পর্ব্বত সমুদ্র আকাশাদি রূপ প্রকৃতিই পুরুষের সঙ্গে ধারণ করেন, করিয়া উভয়ে কি এক বিচিত্র খেলা খেলেন, এ সকলে তিনি পুরুষকেই পূজা করেন।

স্ত্রী। আর পুরুষ আদর করেন কিরূপে?

স্বামী। তাকি তুমি আর জাননা?

স্ত্রী। তবুত শুনিতে ইচ্ছা করে। এযে নিত্য নূতন।

স্বামী। প্রকৃতির প্রেমে তরঙ্গায়িত হইয়া পুরুষ যখন প্রকৃতিকে আদর করেন, সে আদর যে দূর হইতেও দেখিতে পায়, অথবা অনুমানও করিতে পারে তখন তার কি যে হয় তাহা বলা যায় না।

যাহা বলি তাহা দিনান্তে একবার করিয়াও করিও। সুন্দর ফুল কে ফুটায় ইহা দেখিতে একবার উদ্যানে যাও দেখি, গিয়া একবার দেখ দেখি পুষ্পে পুষ্পে, প্রজাপতির পাখায় পাখায় কি সৌন্দর্য্য আঁকা আছে? ফুলটি দেখিয়া কি মনে হয় না, কে যেন এইমাত্র রং দিয়া কোথায় লুকাইয়াছে? মনে হয় যেন রং দিতে দিতে

(পড়তা) লোকের সাড়া পাইয়া পুষ্পেই মিলাইয়া লুকাইয়া আছে। কোন কোন পুষ্পে রং‌এর ছিটা দেখিয়া মনে কি হয় না কে যেন গোপনে আদর করিয়া সাজাইতে ছিল, যেন কাহাকে দেখিয়া এখনি ফুলের গায়ে, পাতার গায়ে রং‌এর তুলি ঝাড়িয়া কোথাও লুকাইয়াছে। যেন কাছে কাছেই আছে; সুন্দর ছাড়িয়া সুন্দর কোথাও কি যায়? কত সুন্দর সে, যখন পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, পাখায় পাখায় তুলি ধরিয়া শান্ত হইয়া রং করে আর রং করিয়া কোথায় লুকায়? কত সুন্দর সে যখন প্রকৃতির সহিত প্রণয়-বিবাদ করিয়া উত্তাল তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সাগরের তলে বসিয়া একাকী নির্জ্জনে ঝিনুক শুক্তি শঙ্খের গায়ে গায়ে ফাঁকা মনে কি জানি কি হিজি বিজি আঁকিয়া রাখে? আবার অতি প্রভাতে যখন কেহ দেখে না তখন পাতায় পাতায় শিশির বিন্দুর মুক্তামালা গাঁথিয়া কার গলায় পরাইয়া কোথায় চলিয়া যায়? সে কত সুন্দর! একবার বনে বনে ঘুরিয়া তাঁহাকে খোঁজ না? নিঃশব্দে বন মধ্যে পুষ্প বৃক্ষের আড়ালে একাকী তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকনা? সে যখন আবার রং করিতে আসিবে তখন যদি একবার তাহার ভাবভঙ্গী দেখিতে পাও।

তার পরে গুঞ্জনমত্ত মধুব্রতের ঝঙ্কার একবার একাকী শুন দেখি, একাকী বনবিহঙ্গের কাকলী তাঁহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া শুন দেখি—এ স্বর কে দিতেছে? এই পুষ্পগন্ধ! কত মনোহর! কখন কে আসে, কেমন করিয়া সূক্ষ্মকে স্থূলের উপরে মাখাইয়া যায়—ভাবনা কর দেখি, যে সুন্দর তাহার কার্য্যও কত সুন্দর! উপরে আকাশের গায়ে মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা—এ খেলা দেখিয়া দেখিয়া তাহাকে ডাক দেখি! বলনা—"অভিনব ইব বিদ্যুৎমণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ শময়তু মমতাপং সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ"। চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, আকাশের গায়ে নানাবর্ণের মেঘ সেই আঁকে। তাহাকে খোঁজ। এই যে বিচিত্র জগৎ দেখিতেছ—এই যে বিচিত্র শোভা দেখিতেছ—এই নদী, সমুদ্র, ফুল, ফল, আকাশ তারা এসব তাঁহার গাত্রে পরা অলঙ্কার। শুধু অলঙ্কার দেখিয়া এই সুখ পাও! আর এই অলঙ্কার যে পরিয়াছে, এই অলঙ্কার-সাজান-মূর্ত্তি একবার দেখ দেখি—কে এই সুন্দর পুরুষকে নিরন্তর সুন্দর সাজে সাজাইতেছে, সাজাইয়া জগৎ খেলা খেলিতেছে—এসকল একবার দেখ, একবার ভাব—বুঝিবে সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহাকে ভাবিলে সে কি ভাবে দেখা দেয়।

সেত অমনি কথা কয় না! যাহাদের সঙ্গে কথা কয় তাহাদের কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে,

ব্যাকুলতায় প্রসন্ন হইয়া কথা কয়। তাঁহার জন্ম নাই। কিন্তু তাহাকে যে ভালবাসে তাহার জন্য সে অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করে, অরূপ হইয়াও রূপ ধারণ করে, তার ভাষা অব্যক্ত হইলেও সে ব্যক্ত ভাষায় কথা কয়।

তাঁহার কথা শুনিলে মানুষ বড় নির্ভয় হইয়া যায়। সে যেন বলে মৃগ, পশু, পক্ষী, মানব, দেব, গন্ধর্ব্বাদি যেখানে যে রক্ষা পাইতেছে তাহা আমার দ্বারা রক্ষিত ইহা জানিও। সৃষ্টিও আমি করি, লয়ও অমি করি, রক্ষাও আমি করি। মানুষ রক্ষা ভাবটাই বুঝিতে চায়। বুঝিতে না পারিয়া মনে করে যেন নিজের বলে নিজকে রক্ষা করে। ভুল কথা। তোমার দায় উদ্ধার করিয়া—তোমার শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমিই তোমাকে বাঁচাইতেছি। বিপদে পড়িয়া যে, মানুষ দুহাত তুলিয়া ভগবানকে ডাকে, তুমিও যে আমাকে স্মরণ কর, তখন আমি কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও তোমার অলক্ষ্যে তোমাকে বাঁচাইয়া দিয়া থাকি। তোমাকে নিত্য রক্ষা করিতেছি। সাধুকর্ম্মে অনুভব কর কিরূপে রক্ষা কার্য্য চলিতেছে। এখন যে স্তবের কথা শুনিতে চাও তাই শুন।

স্ত্রী। আর একটি কথা মনে জাগিল। এইটি বলিয়া স্তবের কথা বলিও।

স্বামী। কি?

স্ত্রী। প্রকৃতি যখন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা! আমি তোমার কে? পুরুষ আদর করিয়া তখন কি বলেন? হাঁসিলে কি হইবে—বলনা?

স্বামী। পুরুষ আদর করিয়া তখন কি বলেন—কেমন? অনাদরে বলা শুনিতে চাওনা! না?

স্ত্রী। যাও! আর বলিয়া কাজ নাই।

স্বামী! শুন বলিতেছি। পুরুষের আদর অনাদর—একথা কে বলিতে পারে? অনুরাগিনীর প্রেম মানুষ বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু অনুরাগের প্রেম মানুষ কি করিয়া বুঝিবে? প্রকৃতি আদর করিয়া যখন পুরুষের নিকটে যায় তখন ভূমা পুরুষ প্রকৃতির প্রেম-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া অনন্ত প্রেমে প্রকৃতিকে আদর করেন। সে আদর কি মানুষ বলিতে পারে?

স্ত্রী। তবুও মানুষ যতটুকু অনুভব করিয়া তাঁহার কথা বলিয়াছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়?

স্বামী। পুরুষ বলেন—"ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম

ভব জলধি রত্নম্”। অরূপ আমি আমার ভূষণ নাই—তুমিই ভূষণরূপে আসিয়া আমাকে রূপ দিয়াছ। তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার সাগরের মাণিক।

স্ত্রী। আহা! কি কথা! বড় মধুর! সত্যই সে সাত রাজার ধন সাগর সেচা মাণিক। যাক্ এ কথার অন্ত নাই। এখন স্তবের কথা বল।

স্বামী। প্রভু! বেদ তোমাকে অবিজ্ঞাত স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন—মানবের মন সামর্থ্যশূন্য বলিয়া তোমার কাছে যাইতে কুণ্ঠিত হয়, বাক্য তোমার নিকট যাইতেই পারে না। হে ব্রহ্মরূপিন্! হে হিরণ্যগর্ভ! হে আমার প্রাণের দেবতা! আমি তোমাকে নমস্কার করি!

দর্শনযোগ্য যে কিছু সামগ্রী আছে তুমি সে সকলেরই শ্রেষ্ঠ। আবার যখন কাতর ভক্তের উপর কৃপা করিয়া অতি বিচিত্র, অতি সুন্দর চরণ সরোজে ভক্তের হৃদ্‌সরোজের মধ্যভাগে আসিয়া দাঁড়াও আর তুমি বরদশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত সুন্দরমুখে সেই সান্দ্র অনুরাগ তরল বিলোল কটাক্ষে তাহার দিকে একবার চাও, তখন হে আশ্রয়প্রদ! হে মঙ্গলরূপিন্! হে শরণাগতের বরদাতা! হে তুলসী ভূষণ! হে আত্মন্! হে প্রণতপ্রিয়! হে ত্রিলোক মঙ্গল! তোমার কৃপাবলোকনে নূতনভাবে জীবিত তোমার শ্রীচরণ সেবক যে কেমন হয় তাহা বলিবে কে?

আহা! যোগিগণ হৃদাকাশে জ্যোতিরূপে তোমারই ধ্যান করেন তোমাকে নমস্কার! তুমি কালরূপে অনুরাগ অনুরাগিণীর সংযোগও কর বিয়োগও কর আবার সকলের ধ্বংসও কর; তুমি আবার প্রকৃতিরূপে গুণত্রয় স্বরূপে প্রকাশিত হও, তোমাকে নমস্কার। সত্ত্বরূপে তুমি বিষ্ণু! রজোরূপে তুমিই ব্রহ্মা আবার তমোরূপে তুমিই রুদ্র। হে স্থিতি সর্গান্তকারিন্ তোমাকে নমস্কার।

হে প্রভু! তুমিই বুদ্ধি! তুমিই অহঙ্কার! তুমিই পঞ্চতন্মাত্রা! তুমিই কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মা! তুমিই বুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মা! তুমিই বিষয়াত্মা! তুমিই ক্ষিত্যাদি পঞ্চরূপ, তোমাকে নমস্কার।

নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তর্ব্বর্ত্তিনে নমঃ।
অর্ব্বাচীন পরাচীন বিশ্বরূপায় তে নমঃ॥

তুমি ব্রহ্মাণ্ডরূপ! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী যাবৎ বস্তুর অন্তর্যামী পুরুষ! তোমাকে নমস্কার! তুমি চিরনূতন! তোমাকে নমস্কার!

তুমি চির প্রাচীন! তোমাকে নমস্কার! হে বিশ্বরূপিন্! তোমাকে নমস্কার! তোমাকে নমস্কার!

অনিত্য জগৎরূপে তুমি! নিত্যব্রহ্মরূপে তুমি! অনিত্য নিত্য রূপে তুমি! তুমি সৎ ও অসতের পতি! তোমাকে নমস্কার।

তুমি সমস্ত ভক্তজনের প্রতি কৃপাবশে স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ! তোমাকে নমস্কার!

হে জগন্মঙ্গল! তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত, তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি, তুমিই স্তব্য! এই জগতে যাহা কিছু আছে তুমিই তাহা! সমস্ত জগৎ তোমা দ্বারা আচ্ছাদিত! 'নমোঽস্তু ভূয়োপি নমোনমস্তে!'. তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার! প্রত্যহ একান্তে এই ভাবে চিন্তা করিয়া "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" কর—নিত্য প্রবাহ রাখ—দেখ দেখি কি এক অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ ভাবে, কি এক আশ্চর্য্য ইষ্টভাবে, কি এক চমৎকার আত্মভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠে! আর যদি ঠিক ঠিক সাধনা হয় তবে দেখ দেখি তাহার কৃপায় কি এক 'আপনি আপনি' ভাবে স্থিতি লাভ হইয়া যায়!

এখন মুখ্য ধ্যানের কথা বলিব! ধ্যান করিতে পারিলে চক্ষু পর্য্যন্ত স্থির হইয়া যাইবে আর মন 'নিবাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্' হইয়া যাইবে।

স্ত্রী। কি আর বলিব! আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। এখন আর ত কিছু বলিতে পারি না! আজ এই পর্য্যন্ত থাক। এখন একান্তে গিয়া তোমার চিন্তিত চিন্তা হৃদয়কে কি অবস্থায় রাখে তাহাই দেখি। কাল আবার শুনিব!

শিবরাত্রি।

ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী,

তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা।

ফাল্গুন মাস। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। আজ সাধনার এক মহা সুদিন। ব্রহ্মচর্য্যহীন জীবের কষ্টসাধ্য তপস্যার আশা কোথায়? তিথি মাহাত্ম্যে—ক্রিয়া মাহাত্ম্যে দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে আজ এক মাহেন্দ্রযোগ।

এই শুভদিনে এক ব্যাধ ঘটনাচক্রে পড়িয়া সারাদিন উপবাসী। দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহার গৃহে যাওয়া হইল না। মাংসভার স্কন্ধে লইয়া এক বিল্ববৃক্ষে অবস্থান করিয়া তাহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইল। দৈবযোগে সেই বিল্ববৃক্ষ-মূলে একটি শিব-লিঙ্গ স্থাপিত ছিল। অবিরল শিশির পাতে ব্যাধের দেহ অভিষিক্ত হইয়া জলধারা বহিতে লাগিল এবং ঐ সঙ্গে শাখাচ্যুত একটি বিল্বপত্র বৃক্ষমূলস্থ শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইল। ভগবান আশুতোষ সন্তুষ্ট হইলেন। যদিও ব্যাধ পূজার বিবিধ সম্ভার লইয়া সাধনা করে নাই "তথাপি তিথি মাহাত্ম্যাৎ তত্র মেহর্চ্চা মহাফলা"। সত্য বটে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনায় ব্যাধ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, একটু কি কর্ম্মভোগ অবশিষ্ট ছিল, তাই এই জন্মে ব্যাধ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া বিনা পরিশ্রমে সিদ্ধিলাভ করিল। ইহাতে তাহার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলনুন্মুখী ছিল, তাই দৈবের সাহায্যে সে পরম গতি লাভ করিল।

কি এই সাধনা, যাহাতে এত সহজে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে?

ইহা দেবাদিদেব আশুতোষের সাধনা। ইহাতে কোন আড়ম্বর নাই। কোন ঘটা নাই।

মূর্ত্তিমৃদা বিল্বদলেন পূজা
অযত্ন সাধ্যং মুখমেব বাদ্যং
তথাপি সাযুজ্য ফলপ্রদাতা
নিঃস্বস্য বিশ্বেশ্বর এব দেব।

মৃত্তিকা দ্বারা মূর্ত্তি তৈয়ার করিতে হয়। বিল্ব পত্রদ্বারা পূজা করিতে হয়।

অযত্ন সাধ্য মুখশব্দ বম্ বম্ ধ্বনিই এই পূজার বাদ্য। এই পূজার ফল সাযুজ্য-প্রাপ্তি।

আহা! কি সুন্দর আশার কথা। কি মধুর ভরসার কথা। শুভ শিব—চতুর্দ্দশী তিথির আগমন অপেক্ষা করিয়া আজ এই প্রসঙ্গই আলোচনা করা হউক।

শ্রীগুরু কৃপা করিলেন। বলিয়া দিলেন—যিনি নিজ বোধ রূপে সহস্রারে—যিনি ইষ্টমূর্ত্তিরূপে হৃদয় কমলে—তিনিই মানবদেহে শ্রীগুরুরূপে সম্মুখে। মন্ত্ররূপী ইষ্টদেবতা শ্রীগুরু-মুখ কমল হইতে বাহির হইয়া সাধককে কৃতার্থ করিলেন। আচমন করিয়া সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। শ্রীবিষ্ণুস্মরণে আজ দেহ, মন, ভিতর ও বাহির সব পবিত্র।

"অপবিত্র পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা"।

পবিত্র হউক বা অপবিত্র হউক শ্রীহরি স্মরণ করিবামাত্র সব পবিত্র হইয়া যায়। এ নাম যে অগ্নির মত। দেহ মন কয়লার ন্যায় ময়লা বটে কিন্তু নামরূপ অগ্নির সংযোগে এগুলিও অগ্নিময় হইয়া যায়। তারপর জলশুদ্ধি—"গঙ্গেচ যমুনে চৈব"—ইত্যাদি। আহা! পতিত পাবনা মা জাহ্নবীর নাম স্মরণ করিবামাত্র কোন এক সুখময় স্থানের কথা মনে পড়িয়া যায়। "বিষ্ণু পাদার্ঘ্য সম্ভূতে"—পরমপদের পরমভাব দ্রবময়ী গঙ্গা পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রবাহিত হইয়াছেন; স্পর্শ করিবামাত্র দয়াময়ী মা উত্তরবাহিণী হইয়া যেন তাঁহার উৎপত্তি স্থানে জীবকে লইয়া যান। সাধনার অভাবে জীব স্থিতিলাভ করিতে পারেনা সত্য কিন্তু কি এক অমৃতের আস্বাদ লইয়া ফিরিয়া আইসে নতুবা দেহ আনন্দ পুলকে ভরিয়া যায় কেন? তারপর অঙ্গন্যাস—ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির অন্তে মানস পূজা। ইষ্টদেবতা হৃদয় কমল আলো করিয়া বসিয়া আছেন। ধীরে ধীরে ঐ মধুর মূর্ত্তির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত কর। দেখ কেমন সহাস্য বদন! দেখ কেমন লাবণ্য বিচ্ছুরিত অঙ্গকান্তি! তোমার হৃদয় কমল আসন করিয়া তিনি বসিয়া আছেন, অথবা তাঁহার আসনই তোমার হৃদয়। হরি! হরি! তোমার হৃদয় ত আর সার্দ্ধহস্ত পরিমিত নয়। অনন্তকোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের আসন তোমার হৃদয়। একটু বিচার করিয়া দেখ তোমার হৃদয় কত বড় হইয়া গেল।

শিরস্থ সহস্রদল কমল হইতে যে অমৃত অবিরত ক্ষরিত হইতেছে তদ্দারা পাদ্য দাও, মনকে অর্ঘ্য দাও—যে মন তোমাকে মজাইয়াছে সেই মন আজ

তোমার কত উপকার করিল। সহস্রার ক্ষরিত সুধা আচমনীয় ও স্নানীয় জলরূপে অর্পণ কর। তারপর আকাশতত্ত্ব বস্ত্র, ক্ষিতিতত্ত্ব গন্ধ, চিত্ত অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব পুষ্প, প্রাণ ধুপ, তেজ তত্ত্ব দীপ, হৃদয়ে কল্পিত সুধা সমুদ্রের সুধা নৈবেদ্য, অনাহত ধ্বনি বাদ্য, বায়ু চামর, শিরস্থ সহস্রদল কমল ছত্র, শব্দতত্ত্ব গীত, ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম নৃত্য,—মনে মনে এই সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও। কি বিরাট্ সাধনা! বিশ্বনাথের কি বিরাট্ পূজা! সবগুলি ঠিক ঠিক না হইলেও মনোময় সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?

যদি ইহা কষ্টসাধ্য হয় তবে অন্য ভূমিকায় চল।

রত্নৈঃ কল্পিত মাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যাম্বরং
নানরত্ন বিভূষিতং মৃগমদা মোদাঙ্কিতং চন্দনং
জাতী চম্পক বিল্বপত্র রচিতং পুষ্পঞ্চ ধুপং তথা
দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে! হৃদ্‌কল্পিতম্ গৃহ্যতাং।

সৌবর্ণে মণিখণ্ড রচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সং
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফলং পানসং
শাকানাং অযুতং জলং রুচিকরং কর্পূর খণ্ডোজ্জ্বলং
তাম্বুলং মনসা ময়া বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভো! স্বীকুরু।

ছত্রং চামরয়োর্যুগং ব্যজনকং চাদর্শকং নির্ম্মলং
বীণা ভেরী মৃদঙ্গ কাহল কলা গীতঞ্চ নৃত্যং তথা
সাষ্টাঙ্গং প্রণতি স্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো! পূজাং গৃহাণ প্রভো!

সুন্দর রত্নময় আসনে ঠাকুরকে বসাইয়া শীতল জলে স্নান করাও। আহা! তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে তোমার কি হইতেছে এক একবার লক্ষ্য করিও। অতি সন্তর্পণে তাঁহার অঙ্গ মুছাইয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান করাও। তুমি কাঙ্গাল! মনে মনে যত পার মণি মুক্তা সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের অঙ্গে যেখানে যেটি শোভা পায় সেইখানে সেইটি পরাইয়া দাও। মৃগমদ চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ কর। জাতী চম্পক প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প ও বিল্বপত্রদ্বারা ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দাও এবং ধূপ দীপ দ্বারা আরতি কর—সুবর্ণ পাত্রে নানাবিধ সুখাদ্য এবং রসাল ফল, কর্পূর

সুবাসিত পানীয় জল প্রভৃতি ভক্তিভরে নিবেদন করিয়া দাও। কখনও ছত্র ধর কখন চামর ব্যজন কর, কখন নৃত্য গীতাদি দ্বারা তোমার হৃদয়ের রাজাকে পরিতৃপ্ত কর। তৎপর গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে তোমার দয়িতের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক স্তবস্তুতি কর এবং প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া বল—"সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো! পূজাং গৃহাণ প্রভো!" প্রাণের ভাষায় গদ্‌গদ্ স্বরে বল ঠাকুর! তোমার দাসানুদাসের পূজা গ্রহণ কর। এই আয়োজন শুধু তোমার তৃপ্তির জন্য। তোমার তৃপ্তির অনুভবই আমার পরম পুরুষার্থের পূর্ণ সিদ্ধি।

ভগবৎ প্রসন্নতার অনুভূতিতে যখন হৃদয় ভরিয়া যায় তখন অন্য ভূমিকায় যাইবার জন্য প্রয়াস করিতে হয়। নতুবা সাধনার এক কোঠায় বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।

এই যে তুমি—তুমি আমার কে? যাহাকে অহরহঃ মনে মনে পূজা করিতে সাধ যায়? তুমি আমার—

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরা প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগ রচনা নিদ্রা সমাধি-স্থিতিঃ,
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ-বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরোঃ
যৎযৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো! তবারাধনং।

আমার আত্মাই তুমি। তুমি আমার আত্মারাম। আমার মতি তোমার শক্তি গিরিজা। আমার পঞ্চপ্রাণ তোমার নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদি সহচর। আমার দেহ তোমার মন্দির। আমার বিষয়োপভোগ রচনা তোমার পূজা। আমার নিদ্রা তোমাতে সমাধি-স্থিতি। আমার প্রতি পদ-সঞ্চার তোমাকে প্রদক্ষিণ করা। আমার বাক্য সকল তোমার স্তব স্তুতি। আমার কৃতকর্ম্মগুলি হে শম্ভো! সকলই তোমার আরাধনা।

এই ভূমিকার সাধনায় "আমির" স্বাতন্ত্র্য আর কিছুই রহিল না। বস্তুতঃ কিছুই নাই। এই ভাবনা রাজ্যেত অধিকক্ষণ স্থিতিলাভ হয় না। সঙ্কল্প বিকল্প, ক্ষুধা পিপাসা, রোগ জরা, এই সুখময় ভাবনা রাজ্যেত থাকিতে দেয় না। সাধক তখন বড়ই কাতর হইয়া পড়ে এবং করজোড়ে প্রার্থনা করে, ঠাকুর! যদি বিশ্ব প্রপঞ্চ লইয়াই আমাকে থাকিতে হয় তবে তোমাকেও আসিতে হইবে। তুমি ভিন্ন এই বিশ্ব প্রপঞ্চের যে অস্তিত্ব আছে—তুমি ভিন্ন যে আর কিছু আছে ইহা

আম মনে করিতেও বড় ব্যথা পাই। তাই—"ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান অজ।" সাধক তখন কুর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প অথবা বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করে এবং হৃদয়স্থ দেবতা পুষ্প মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মৃণ্ময় লিঙ্গে কিম্বা প্রতিমাদিতে আবির্ভূত হইলেন, ইহা ভাবনা করে।

এইরূপ ভাবনা করিয়া ইষ্ট দেবতার আবাহন কর। আহা! এই আবাহন কত সুন্দর! "ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি—ঠাকুর! তুমি অনন্ত থাকিয়াও তোমার দাসের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য সান্ত। আনন্দময় পুরুষ আনন্দের খেলাচ্ছলে দীন ভক্তের বাহ্যপূজা গ্রহণ করেন! সাধক তখন ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বলে "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ"—"ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ"—"রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ"—উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ"—"ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ"—"পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ"—"মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ" "ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ"—আহা! কি প্রাণারাম এই অষ্ট মূর্ত্তির পূজা।

জীব যখন রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি দেয় তখন ভবরোগ-বৈদ্য ক্ষিতি মূর্ত্তির শান্তিময় বক্ষে আশ্রয় লইয়াত শান্তি পায়; তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইলে একবিন্দু জল পান করিয়া স্বস্তি পায়, এত সেই ভবায় জলমূর্ত্তি; দারুণ গ্রীষ্মে কাতর হইলে সর্ব্ব সন্তাপহারী পবন দেবের সুখস্পর্শে সুস্থ হয়, এত সেই উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তি, শোকে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইলে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে করে আমার একজন আছে যে সর্ব্বদা আমার পানে চাহিয়া আছে, এত সেই ভীমায় আকাশ মূর্ত্তি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ চন্দ্র, সূর্য্য সব তুমি—অথবা তোমার বিভূতি। তার পর—"পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ"। হরি! হরি! যজমান মূর্ত্তিকেও প্রণাম। যজমানও তুমি। সেব্য সেবক ত আর প্রভেদ রহিল না। শুধু তুমিই রহিলে। বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া গেল। সেবক নাই! সেবা আর কে করে! তালগাছ শুখাইয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। পুকুর শুখাইয়া ভরাট্ হইয়া গিয়াছে। শুধু তালপুকুর নামটি মাত্র আছে। তাই বিশ্ব ছায়া ছায়ামত মনে হয়।

এস এস—যদি কেহ দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে ব্যথিত হইয়া থাক এস এস—সাযুজ্য ফল প্রদাতা বিশ্বেশ্বরের চরণে অঞ্জলি পূর্ণ গঙ্গোদক প্রদান করিয়া বল—

দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়।

এস এস—যদি কেহ ইন্দ্রিয়ের দুর্দ্দমনীয় তাড়নায় মর্ম্মাহত হইয়া থাক এস এস মদনান্তক শূলপাণির চরণে অঞ্জলি পূর্ণ গঙ্গোদক প্রদান করিয়া ভক্তিভরে বল—

সংসার দুঃখ গহনাৎ জগদীশ রক্ষ।

এস এস—যদি কেহ অনভিলষিত সঙ্গের জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া থাক এস এস—কর্ম্মদোষে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের সাধ্যত নাই। নীলকণ্ঠের মত বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকিতেই হইবে। কি দুঃখময় নিয়তি। যদি রক্ষা চাও এস এস—নীলকণ্ঠের চরণে অঞ্জলি পূর্ণ গঙ্গোদক প্রদান করিয়া ভক্তিভরে বল—

সংসার দুঃখ সাগরাৎ পরিত্রাহি শম্ভো!

এস এস—যদি কেহ লয় বিক্ষেপের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া থাক এস এস—বৈরাগ্য ও জ্ঞানের অভাবে ভাবের একতান প্রবাহ থাকে না বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে যদি কেহ কাতর হইয়া থাক এস এস—জ্ঞানময় সদাশিবের চরণে—অঞ্জলি পূর্ণ গঙ্গোদক প্রদান করিয়া ভক্তিভরে বল—

জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহিমে শঙ্কর।

এস এস—একবার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া আশুতোষের পায়ে অঞ্জলি দিয়া প্রাণের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিয়া বল—

কর চরণ কৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ নয়নজং বা মানসং বাপরাধং
বিদিত মবিদিতং বা সর্ব্বমেৎ ক্ষমস্ব
জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো!

এইরূপে পূজা শেষ করিয়া শিবরাত্রির কথা শ্রবণ ও স্তবাদি পাঠ করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। পরদিন স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে শিবপূজা ও স্তব পাঠ করতঃ ব্রাহ্মণকে পারণ করাইয়া স্বয়ং পারণ করিতে হয়। পারণের জল পান করিবার সময় ভক্তিভরে বল—

সংসার ক্লেশ দগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর
প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদো ভব।

ঠাকুর! এই দুঃখময় সংসারের ক্লেশে আমি দগ্ধ হইতেছি তাই আমি এই সকাম ব্রত করিলাম। আমার আর অন্য কোন কামনা নাই। তুমি প্রসন্ন হও।

আমাকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান কর। আমি যেন জ্ঞানদৃষ্টি যোগে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ তোমাতে কল্পিত ইন্দ্রজালের মত ভাসিতেছে তাহা অনুভব করিয়া তোমার গুণ ও রূপ স্মরণ ও দর্শন করিতে করিতে তোমার স্বরূপে নিত্য স্থিতি লাভ করিতে পারি। ——— শ্রীগুরুদাস—

নিবেদন।

মা ব্রহ্মময়ী—আর কতদিন আমাকে এ অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিবে মা? আশায় বুক বাঁধিয়া চলিয়াছি—এ আশার কুয়াসা কবে অপসৃত হইবে মা? মা বিশ্বজননী—এ বিশ্বে আমার বলিবার আর কিছুই নাই যে! কেবল মা তুমি আমার—তোমার করুণা-কটাক্ষের উপর নির্ভর করিয়া এ অন্ধকারে চলিয়াছি। দিশাহারা মেঘের মত শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আর কত দিন এমন করিয়া থাকিব মা? একবার দয়া করিয়া আমার হৃদয়ের তীব্র জ্বালা জুড়াইয়া দাও—আমি এ যন্ত্রণাময় কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।

মা আমার—তুমি আমাকে সকলই দিয়াছিলে—আবার সর্ব্বস্বহারা করিয়াছ। কবে আমার মুখের দিকে তাকাইবে মা? কবে আমার "আমিত্ব" তোমার ঐ রাঙ্গা-চরণে লীন হইবে মা?

সেই এক শুভদিন আমার ভাগ্যে আসিয়াছিল। যেদিন "উৎসব" পত্রের একখণ্ড আমার হাতে পড়িয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। "উৎসব" পাঠে যে যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও উদ্যম হৃদয় কন্দরে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়। সেই দিন হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইয়াছে। সেই দিন হইতে মা তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে শিখিয়াছি। সেই দিন হইতে কুলধর্ম্ম পালন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। জানিনা এ পত্রের সম্পাদক কোন্ সাধু মহাপুরুষ। তাঁহার কৃপায় যে রত্ন পাইয়াছি তাহা অমূল্য।

দিন যে ফুরাইয়া আসিল। মা ব্রহ্মময়ী—জ্যোতিঃ স্বরূপিণী—আমাকে কবে তোমার জ্যোতিঃ দেখাইবে মা?

কোথায় মা শ্যামা—করমা করুণা—
অধম সন্তানে কেন বিড়ম্বনা॥
মায়ার বন্ধনে হতেছি কাতর,
কালের কামিনী,—কালভয় হর
এ জীবন অন্তে রেখো পদপ্রান্তে
কৃতান্তেরি করে কিঙ্করে দিওনা॥

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লী।

———

আমার গৃহস্থালী।

সংসার ত উঠিয়াছে তবুও গৃহস্থালী?

একটি সংসারে ছেলে মেয়ে নাই বলিয়া কি সকল সংসারে ছেলে মেয়ের অভাব হইবে? তখন যাহা ছিল তাহা আর বলিয়া কি হইবে? এখন দেখি ভারি গৃহস্থালী 'বনিয়া' গেল। অনেক ছেলে মেয়ে যুটিল। বড় ভারি সংসার হইল।

একটি মেয়েকে গৃহস্থালীর উপদেশও দিতে হইল। যে পত্রে উপদেশ দেওয়া হইল ইহা তাহারই অনুলিপি। প্রকাশের উদ্দেশ্য ঐ মেয়েটির সংসারের মতন যদি আর কাহারও সংসার থাকে এবং ইহা যদি তিনি দেখেন তবে তাহারও কিছু উপকার হইতে পারে।

"মা! অনেক দিন ত অসন্তোষে কাটিয়া গেল। এখন একটু সন্তুষ্ট হইয়া দেখিতে হইবে কি হয়। অসন্তুষ্ট হওয়া সহজ। যে মনে করিবে সেই অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে। কিন্তু অসন্তুষ্ট থাকিলে নিজেরও সুখ নাই আর অসন্তুষ্ট লোককে কেহই ভালবাসে না। বালকদিগকে লোকে ভালবাসে। কেন বাসে? বালকেরা সদা সন্তুষ্ট। এই প্রহার কর, এই গালাগালি দাও তখনিই আবার হাসি। ছোট বালকেরা কিছুই মনে রাখে না। দুই চারিটি ছেলে মেয়ে আছে যাহারা সর্ব্বদা আদর পায়, তাহাদের কিন্তু অভিমান বড় ভয়ানক।

যাক্ একবার সন্তুষ্ট হইয়া দেখনা কি হয়? তুমি মনে কর তোমার মনের মতন কিছুই নাই, তুমি কিরূপে সন্তুষ্ট হইবে? এটা আমি স্বীকার করি না। সংসার আবার মনের মতন কি হইবে? ধন বল, রত্ন বল, কিছুই ত বেশী দিন থাকে না। যদুপতির মথুরাপুরী যখন থাকিল না, রঘুপতির উত্তর কোশলাও যখন থাকিল না, তখন তোমার সব থাকিবে এ আশা করা বৃথা। সংসার আজ আছে কাল নাই। আমার সংসারও একদিন ছিল কিন্তু আজ নাই। কোথাও গেল! এখন তোমাদের দশজনের সংসার আমার হইয়াছে। তোমরা আমাকে মান্য কর—কি করিলে ভাল হয় জিজ্ঞাসা কর—তাই বলি।

দেখ মা! যে যেমন অবস্থায় পড়িয়াছ তাহাই ঈশ্বরের দেওয়া মনে করিয়া রাখ। শ্রীভগবান্ কাহারও উপরে কিছুমাত্র অবিচার করিতে পারেন না

বিচার করিয়া দেখনা কেন—একটা ভাল লোক যাহাকে তোমরা সাধু বল—এক জন সাধু যদি কাহারও কথন কোন মন্দ করিতে না চান তবে যিনি সাধুর সাধু তিনি কি কখনও কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন? এত ভাল মানুষ কি মন্দ করিতে পারে? তা পারে না। তবে যে আমরা কষ্ট পাই? পাই না কেন কষ্ট কিন্তু কষ্টটা যদি সন্তুষ্ট হইয়া সহ্য করিতে পারি তবে সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই যে ইহাতে আমার মঙ্গলই হইতেছে।

দেহের মঙ্গলকেই আমরা মঙ্গল ভাবি কিন্তু দেহটাইত সব নয়। আমাদের ভিতরে একটি চেতন বলিয়া বস্তু আছে। তাহাকে আমরা খুব চিনি। আমরা সকলেই তাহাকে আমি আমি করি। এইটি আমাদের আত্মা। শ্রীভগবান্ দেহের মঙ্গল অপেক্ষা আত্মার মঙ্গলকেই যথার্থ মঙ্গল বলেন। আমরা যদি তাঁহার মতন প্রকৃত মঙ্গলটি কি তাই বুঝি তবে আমরা বেশ বলিতে পারি যে জগতের অমঙ্গল বলিয়া কিছুই থাকে না। কারণ জগতে যাহা ঘটিতেছে তাহাত তাঁহার জানিত অবস্থায় ঘটিতেছে। সুতরাং উপস্থিত অমঙ্গল ভাবী মঙ্গলের সূচনা করে এইরূপ মনে করিয়া—আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ধীরভাবে করিয়া যাও এবং সর্ব্বংসহা ধরিত্রী দেবীর মত অম্লান বদনে সব সহ্য করিয়া যাও।”

কর্ম্ম।

কর্ম্মই আদি। আদিতে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্মদ্বারা শরীরকে পবিত্র ও ব্যাধিশূন্য রাখিতে হইবে, কর্ম্মদ্বারা মনকে পবিত্র বা আধিশূন্য করিতে হইবে, কর্ম্মদ্বারা বুদ্ধিকে অসৎবস্তু ছাড়াইয়া সৎবস্তু নিশ্চয় করিতে হইবে, কর্ম্মদ্বারা প্রতি মনুষ্য নিঃশ্রেয়স্ পথে চলিবে, এবং অন্যকেও চালাইবে। কর্ম্মদ্বারাই জগতের অভ্যুদয় লাভ করিতে হইবে—এক কথায় কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে হইবে।

যে কর্ম্ম প্রভৃত মঙ্গলের হেতু সে কর্ম্ম কি? কর্ম্ম বহু বটে কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বলিতে হয় শরীর, মন ও বুদ্ধিকে পবিত্রভাবে রক্ষা করিবার জন্য যে

কর্ম্ম তাহাই কর্ম্ম, অন্য সমস্ত উন্মত্ততা। শরীর সম্বন্ধে আহার, নিদ্রা, স্নান, ব্যায়ামাদি, মন সম্বন্ধে শুভেচ্ছা উপাসনাদি এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে বিচারাদি কর্ম্ম। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রায় লোকেই থাকিতে পারে না। সকলেই কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছে। এই কর্ম্মের ফলে সুখ ও দুঃখ মানুষ পাইতেছে। কৌশলপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদন যাহারা করিতে পারে তাহারাই প্রকৃত আনন্দ লাভ করে। কর্ম্ম এমন করিয়া বাছিয়া লইতে হইবে যাহাতে তপস্যা ও জীবিকা এক সঙ্গে চলে। যে যাহা করিবে তাহাই অন্যকে শিখাইবে। তাহাও নিষ্কাম হওয়া চাই।

কর্ম্মটি বুঝিয়া লইয়া পূর্ণ মনোযোগের সহিত উহা সম্পাদন করিতে পারিলেই নিষ্কাম কর্ম্ম হয়। এই কর্ম্মকালে ফলের উপর লক্ষ্য থাকে না। মনোযোগ থাকে কিরূপে গুরু-বাক্যমত কার্য্য করিব। তিনি বলিয়া দিয়াছেন তাই আমি কর্ম্ম করি, কর্ম্ম করিলে কি হইবে কি না হইবে তাহা তিনি জানেন। আমি তাঁহাকে ভালবাসি তাই তাঁহার ইচ্ছামত কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাকে ভাল না বাসিলে নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না। ভক্তগণ এইজন্য ভক্তিমার্গকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলেন। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাই ভগবানের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার মিলন হয়।

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ঘুম ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারা যায় স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। স্বপ্নের অবস্থায় নিশ্চয় করা যায় না, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি কি না। যেমন আত্মার দীর্ঘ স্বপ্নকালে আত্মা নিশ্চয় করিতে পারেন না ইহা স্বপ্ন কি না। স্বপ্নের উপর স্বপ্ন হইতেছে, স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন হইতেছে কিন্তু কিছুই অসত্য নয়। সমস্তই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। স্বপ্নদ্রষ্টা আপনার মনের ভিতরেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ দেখিতেছেন কিন্তু মনে করিতেছেন বাহিরে দেখিতেছি, আত্মা স্বপ্নে দেখিতেছেন—

জাতোঽহং জনকো মমৈষা জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রামিত্রমরাতয়ো বসুবলং বিদ্যা সুহৃদ্বান্ধবাঃ
চিত্তস্পন্দিত কল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি ॥

স্বপ্নে দেখিতেছেন এই আমি জন্মিলাম—এই আমার জননী, এই স্ত্রী পুত্র, এই শত্রু মিত্র, এই বন্ধুবান্ধব, এই ধনসম্পত্তি—আত্মা আপন চিত্ত মধ্যে এই সমস্ত

ভাবনা করিতেছেন—আর এই সমস্ত যেন ঠিক ঠিক বাহিরে চক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে—চিত্তের স্পন্দনমাত্রে বহির্জ্জগত যেন মনের বাহিরে গঠিত হইয়া গেল। চন্দ্র সূর্য্য বাহিরে, বৃক্ষ লতা বাহিরে, আকাশ পর্ব্বত বাহিরে, নদী সমুদ্র বাহিরে। সব বাহিরে দেখা গেল। জ্ঞাতিগণ কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে বাহিরে, 'মেয়েলি' ঝগড়া হয় বাহিরে, হাকিয়া ডাকিয়া অশ্রাব্য কথা কওয়া হয় বাহিরে। মাম্‌লা মোকদ্দমা, সমাজে রাখা, সমাজচ্যুত করা, ভয় ভরসা, ধন পুত্রে লক্ষ্মীলাভ, গৃহ আশ্রম, জনপূর্ণস্থান জনশূন্যস্থান বাহিরে হইয়া গেল। ঘর, বাড়ী, বাগান, জমীদারী ভাগাভাগি বাহিরে হইয়া গেল। ভাল থাকা ভাল না থাকা, চিন্তা করা চিন্তা না করা, পুরুষার্থ করা না করা, কলঙ্ক কলঙ্কভঞ্জন, সুনাম দুর্নাম, সঞ্চিত প্রারব্ধ ক্রিয়মান কর্ম্ম—সমস্তই বাহিরে হইতে লাগিল—অদ্ভুত প্রহেলিকা বটে—

"বিশ্বং দর্পণ দৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া"

দর্পণের মধ্যে বাহিরের বস্তুর ছায়া যেমন পড়ে আত্মার মধ্যে এই দেহ এই জগৎ সেইরূপ থাকিলেও—নিদ্রাকালে বস্তু সকল যেমন বাহিরে দৃষ্ট হয় সেইরূপ সমস্তই বাহিরে যেন আসিয়া গেল—আত্মার এই দীর্ঘস্বপ্নে যেমন আত্মা আত্মভাবনা-গুলিকেই বাহিরের বস্তু ভাবিয়া সুখী দুঃখী হইয়া যান সেইরূপ স্বপ্নকালে আমরা যাহা দেখি তাহাই স্বপ্ন ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই অসত্য বলিয়া বোধ হয় না।

জীবনটা স্বপ্ন কি না, জ্ঞানী লোক ইহার মীমাংসা করুন। অনেকে মীমাংসা করিয়াছেন—বৈদান্তিকদিগের মতে জীবন ধ্রুব স্বপ্ন, পাশ্চাত্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির মতেও "our little life is doomed with a sleep" "Life is a sleep—and forgetting." জ্ঞানীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধরা গেল যেন জীবনটা দীর্ঘস্বপ্ন। বিবাদ বিসম্বাদ, মিলন বিরহ, আহার নিদ্রা, সাধনা তপস্যা, সংসারে অবস্থান, সংসারত্যাগ, পুত্র কন্যার বিবাহ, বিদ্যাশিক্ষা, কর্ম্মত্যাগ, কাশীবাস, অধ্যয়ন অধ্যাপন, হিংসা দ্বেষ—মনে করা হউক এ সমস্তই স্বপ্ন। কিন্তু এ যে স্বপ্ন তাহাও ত বোধ করা কঠিন। এও মনে করা হউক জ্ঞানীদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু এই স্বপ্ন ভাঙ্গিবার কৌশল কি?

স্বপ্নে দেখা যায় নানাপ্রকার চিন্তা নানাপ্রকার দৃশ্য দণ্ডে দণ্ডে মনের মধ্যে

নৃত্য করে—বহুক্ষণ স্থায়ী দৃশ্য অথবা বহুক্ষণ স্থায়ী চিন্তা থাকে না, যদি কোন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু পরম রমণীয় বোধ হয়, যদি কোন চিন্তা বড়ই সুখের হয়, যদি মন নিতান্ত মনোযোগের সহিত স্বপ্নের রমণীয় বস্তু দেখিতে থাকে বা স্বপ্নের রমণীয় সুখ তন্ময় হইয়া ভোগ করিতে চায় তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। এই ঘটনা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। জ্ঞানিগণ এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলেন—জীবনে কোন বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে, কোন সুখের চিন্তা নিরন্তর করিতে পারিলে জীবন-স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। জীবন-স্বপ্ন ভঙ্গ হইলেই আত্মা আপন স্বরূপে অবস্থান করিবেন। আত্মস্বরূপে অবস্থান ব্রাহ্মীস্থিতি, ইহাই জীবন্মুক্তি।

একটি কথা পাওয়া গেল স্বপ্ন ভাঙ্গাইতে হইলে একাগ্রতা আবশ্যক। যাহারা নিরন্তর জপ করেন যাহারা নিরন্তর বিচার অভ্যাস লইয়া থাকেন তাহাদের লক্ষ্যও এই একাগ্রতা। ইহাই ধ্যান। ধ্যান পূর্ণরূপে অভ্যস্থ হইলেই স্বপ্ন ভাঙ্গিবে। চিত্ত একাগ্র হইলেই স্বপ্ন ভাঙ্গিবে।

এই একাগ্রতার জন্য গুরু 'চক্র' দিলেন, 'কূটস্থ' দিলেন, 'শ্বাস প্রশ্বাস' দেখাইয়া দিলেন, জপ দিলেন, গুরুমূর্ত্তি দিলেন, নানা প্রকার আদর দিলেন। চক্রে চক্রে শ্বাস প্রশ্বাস সহ প্রণব জপ অভ্যাস করিতে করিতে, কূটস্থ জ্যোতিতে চলা ফেরা করিতে করিতে যখন চলন আর থাকিবে না তখন স্বপ্ন ভাঙ্গিবে। এই কর্ম্ম যখন গুরু উপদেশ মত পূর্ণ মনোযোগের সহিত করা যায়—গুরু যদিও ফল বলিয়া দিয়াছেন—পূর্ণ মনোযোগের সহিত যে এই কর্ম্ম করে তাহার কি কোন কর্ম্ম-ফলে লক্ষ্য থাকে? যাহারা মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করেনা অথবা গুরুতে ভালবাসা নাই বলিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেনা—তাহারাই কর্ম্ম করিতে পারেনা—গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অন্য সমস্ত আকাঙ্খা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না। দুগ্ধ খাইলে বল হয়। কবিরাজ চলিয়া যাইবামাত্র মাতা অতি দুর্ব্বল পুত্রকে এক ঝিনুক দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিয়াই যদি জিজ্ঞাসা করেন "বাবা বল পেলিরে"? ১০৮ বার জপ করিয়াই জীবন্মুক্তি হইল কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করাও সেইরূপ। কৈ এত দিন ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি, হইল কৈ—ইহা লইয়া যাহারা ব্যাকুল তাহারা মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করেন না—কর্ম্ম করেন কেবল আপনার কামনা সফল হইল কিনা ইহাতে লক্ষ্য রাখিয়া। কিন্তু গুরুবাক্য মত সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত—কর্ম্ম করিলেই নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে। রস পাই বা না পাই, ভাল লাগুক বা না লাগুক ইহাতে

লক্ষ্য থাকে না। গুরুদত্ত কর্ম্ম আর কিছুই নহে—ইহা স্বাভাবিক কর্ম্ম। এই কর্ম্মই সকলে করিতেছে—গুরু তাহাই দেখাইয়া দিয়া থাকেন—এই কর্ম্মে কোন ক্লেশ নাই—যখন কষ্ট করিয়া এই কার্য্য করিতে হয় তখনই ইহা ঠিক ঠিক হইতেছে না, ইহা জানা উচিত। স্বাভাবিক ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমে বল আসিবে তখন ঐ বলও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে।

তাই বলিতেছিলাম নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর চিত্ত একাগ্র হইবে—একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে নিরোধ অবস্থা লাভ হইবে তখন আত্মার এ দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে এবং এই আপন স্বরূপে সচ্চিদানন্দরূপে তিনি স্থিতি লাভ করিবেন। স্ব স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়াও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপার ভাবনায় উৎপাদন করা এবং কার্য্যে ইহারা সত্য আছে বলিয়া দেখানই জীবন্মুক্তের খেলা।

অগ্রে তপস্যা পরে অন্য কর্ম্ম। তপস্যা বা আত্মোদ্ধার অনাদর করিয়া ব্যবহারিক কর্ম্ম সুফল প্রদান করে না। আত্ম কর্ম্ম করিয়া অন্য সময়ে অন্যবিধ কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহাও যে কর্ম্ম নিজে করি তাহাই অন্যকে শিখাইতে হইবে। নিজে যজন করিয়া অন্যকে যাজন করাইতে হইবে। নিজে অধ্যয়ন করিয়া অন্যকে অধ্যাপন করাইতে হইবে। নিজে প্রতিগ্রহ করিয়া অন্যকে দান করিতে হইবে। নিজে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অন্যকে ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ দিতে হইবে।

শ্রীভিক্ষু—

নাম সাধনা।

সবাই বলে ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরি। শ্রীহরির নাম কর। ইষ্টদেবতার নাম কর। শয়নে স্বপনে ভ্রমণে, আহারে বিহারে বিশ্রামে—সকল সময়ে প্রতি শ্বাসে নাম কর। মৃত্যুসংসার-সমুদ্র অবহেলায় পার হইতে পারিবে।

নাম যে করা যায় না—সর্ব্বদা নাম যে করিতে পারি না। কত কথা কহিতে পারি কিন্তু নাম করিতে পারি না। কেন পারি না? কিরূপে পারিব?

রোগী কি ঔষধ খাইতে চায়? জিহ্বা যে পিত্তরসে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিছুই রুচে না। অথবা যাহাতে রুচি হয় তাহাতে রোগ আরও বৃদ্ধি হয়, বিকার আরও বাড়ে, প্রলাপ আরও বেশী হইয়া যায়। পিত্তে জিহ্বা বিকৃত হইয়া গিয়াছে—মিছরিও তিক্ত বোধ হয়।

শ্রীভগবানের নাম অতি মধুর। মধুর হইলে কি হয় ভবরোগে জিহ্বা যে পিত্তে তিক্ত হইয়া রহিয়াছে। নামই যে ঔষধ। নাম কর—অবিশ্রান্ত নাম কর—ঔষধ সেবন বাদ দিওনা। একদিনও বাদ দিওনা। নামে রস পাইবে। মধুময় নাম মধুর মত মিষ্টই লাগিবে তখন আর ছাড়িতে পারিবে না।

ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে ঐ যে বিচার করিবার ঢং করিয়া ছাই রাই জ্ঞান চর্চ্চাতে সময় নষ্ট কর—জ্ঞান চর্চ্চাও হয় না, সময়ও যায়, তার পর 'ঝটপট' নিত্য কর্ম্ম সারিয়া উঠিয়া আইস, ইহা আর করিও না। নিদ্রা ভাঙ্গিলেই একবারে নাম করিতে থাক। মাঠের মধ্যে জল জমিয়া থাকে আর নালা কাটিয়া দিলে সেই জল সবলে বাহির হইতে থাকে, জলের স্রোত বহুদূর অগ্রসর হইলে তাহা রোধ করা কষ্টকর হয়। তাই মনের চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে নামের বাঁধ ভাল করিয়া দাও। নাম করিতে করিতে মনকে আর অন্য চিন্তার অবসর দিওনা। এইভাবে মন যখন নাম করিতে করিতে আপনাতে আপনি শান্ত হয় তখন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া মনের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্য যোগ ও জ্ঞান অভ্যাস কর।

"প্রথমে বহিপ্রবৃত্ত্যক্ষং গণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়"। বাহিরে ছুটিয়াছে যে ইন্দ্রিয় সেই ইন্দ্রিয়ের স্রোত ভিতরে আত্মার দিকে প্রবাহিত কর। প্রাণায়াম

প্রত্যাহার দ্বারা ইহা হয়। পরে মন যখন আত্মাকে ধারণা করিতে সমর্থ হইল, যখন ধ্যান ও সমাধির ছায়া অনুভূত হইতে লাগিল, যখন নামরূপী আত্মা দৃশ্যপ্রপঞ্চকে ছাইয়া ফেলিল, যখন সর্ব্বত্রই নামরূপী আত্মাই যেন বহুরূপে বহুভাবে দাঁড়াইয়া আছে বোধ হইতে লাগিল—যখন মনকেও মনে হইল নাম—সঙ্কল্প বিকল্পকেও মনে হইল নামের খেলা—যখন পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে মনে হইতে হইল নামই সত্য, নাম ভিন্ন অন্য সমস্তই অসত্য অপ্রয়োজনীয়—এই অভ্যাস যখন দাঁড়াইতে লাগিল—যখন মনে হইতে লাগিল রোগে আর করিবে কি, অসুখে আর কি হইবে—শরীর ত যাইবেই—আমি অবিরাম নাম করিয়া এ দেহ ক্ষয় করিব—"জপই জপই শ্যাম নাম ছার তনু করব বিনাশ"—এইরূপ যখন হইয়া যাইতে লাগিল তখন জপ ও ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে আত্মা বা নাম যে প্রকৃতি বা অন্য অভিলাষ বা ইচ্ছা হইতে ভিন্ন ইহা বিচার কর। আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহা স্থির হইলেই তুমি নিশ্চিন্ত। ইহা যতদিন না হইতেছে ততদিন নাম কর, মূর্ত্তি ধ্যান কর, মানস পূজা কর—প্রত্যহ কর, অবিরাম কর, সমস্ত আলস্য ত্যাগ করিয়া কর, হইবেই।

স্বপনে।

তীরে তরী নাই
আঁধার নামিল,—
হরি! ওপারে যেতে দিলে না আমারে।
কালিন্দীর কূলে
বাঁশরী বাজিল,
আমি 'স্বপনে' এসেছি বৈকুণ্ঠ-দুয়ারে।

Registered No. C. 583.

১০ম বর্ষ।] চৈত্র, ১৩২২ সাল। [১২শ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ এম, এ, বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী উৎসব অফিসে পাওয়া যায়।

(১) আহ্নিকম্ মূল্য ॥০ আনা। (২) উচ্ছ্বাসাঃ মূল্য ৶০ আনা। (৩) শোকশ্লোক মূল্য ১৲ টাকা। (৪) লক্ষ্মীরাণী মূল্য ১॥০ টাকা।

উৎসবের চাঁদা এবং উৎসব সম্পাদক মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ অন্যূন ২০০৲ দুই শত টাকা এখনও উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকের নিকট প্রাপ্য আছে। তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় টাকা সত্বরে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। তাঁহাদিগের এই সহানুভূতি না পাইলে শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যে আমরা সক্ষম হইব না।

বিনীত—

"উৎসব" সেবক মণ্ডলী।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা অক্ষম হইব।

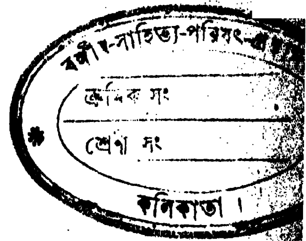
৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲, এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১০ম বর্ষ।] ১৩২২ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এই যে এক পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, সকল দেশে, সকল স্থানে, সকল সময়ে, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া আরও দাঁড়াইয়া থাকিবেন এই পুরুষকে আমরা দেখিয়াও দেখিনা জানিয়াও জানিতে চাই না অথচ ইনিই আমাদের সকল দুঃখ দূর করেন, ইনিই আমাদের ভবপারের কাণ্ডারী, ইনিই পাপী তাপীর আশ্রয়, ইনিই দীনহীনের শরণদাতা, ইনিই "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং"।

কে এই পুরুষ? তিনি দাঁড়াইয়া আছেন তুমি জানিলে কিরূপে? তুমি কি তাঁহাকে দেখিতেছ? তাঁহাকে কি দেখা যায়?

এই আকাশ, মাথার উপরে ঝুলিতেছে। আকাশ কিন্তু সর্ব্বব্যাপী। আকাশকে তুমি দেখিতেছ?

এই যে নীল যাহা দেখিতেছি তাহাকেই ত আকাশ বলি।

আকাশে নীলিমা নাই। আকাশ দেখাও যায় না তবুও বল নীল আকাশ দেখিতেছি। এ দেখা ত ভ্রমে। এখন ও কথা যাক, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী আকাশ যে বলিতেছ তাহা কি দেখ?

সর্ব্বব্যাপীকে ত দেখি না। তবে যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার এক অংশ মাত্র দেখিয়া বলি ইহাই সর্ব্বব্যাপী।

অংশ মাত্র দেখিয়া ইঁহাকে সর্ব্বব্যাপী কিরূপে বল?

কিরূপে বলি তাহা জানি না। তবু কিন্তু বলি। তুমি বুঝাইয়া দাও।

যাহা অংশ বলিয়া মনে হয়, তাহার আশেপাশে, উর্দ্ধে অধে, সম্মুখে পশ্চাতে, পূর্ণটি অংশকে ছুঁইয়া আছে। তাই চর্ম্ম-চক্ষুতে যতটুকু আঁটে ততটুকু দেখি বটে কিন্তু আমাদের আর একটি চক্ষু আছে তাহার দ্বারা আমরা সকলেই বলিতে পারি আকাশ সর্ব্বব্যাপী।

আবার চক্ষু কোথায়?

সকলেরই আর একটি চক্ষু আছে, তাহাকে বলে তৃতীয় চক্ষু, তাহাকে বলে জ্ঞান-চক্ষু।

শাস্ত্র কি এই চক্ষুর কথা বলিতেছেন?

বলিতেছেন না ত কি মনগড়া বলিতেছি? এই যে শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

> পশ্যন্তদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতং।
> সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বর কুণ্ডলোল্লসৎ॥ ১।৩।৪

অদভ্রং অনল্পং জ্ঞানাত্মকং যচ্চক্ষুস্তেন অদভ্রচক্ষুষা জ্ঞান দৃষ্ট্যা। অদোরূপং পৌরুষং রূপম্।

জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যোগিগণ ভগবানের এই অদ্ভুত পৌরুষরূপ দেখেন। কি এই অদ্ভুত পৌরুষরূপ? শ্রীভগবানের সহস্র সহস্র পদ, সহস্র সহস্র উরু, সহস্র সহস্র হস্ত, সহস্র সহস্র আনন, সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র কর্ণ, সহস্র সহস্র নাসিকা; আবার প্রত্যেক শিরঃ কর্ণাদি অঙ্গ অপূর্ব্ব শিরোভূষণ, বস্ত্র ও কুণ্ডল দ্বারা অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে।

কাহার এই রূপ?

যিনি লোক সৃষ্টির জন্য মহদাদি সম্ভূত যোড়শ কলায় পূর্ণ পৌরুষরূপ ধারণ করেন; যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া কারণসলিলে শয়ন করিলে যাঁহার নাভিদেশ হইতে প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন, আবার যাঁহার অবয়ব সন্নিবেশে ভুবনসমূহ কল্পিত; বিশুদ্ধ নিরতিশয় সত্ত্বগুণবিশিষ্ট এই অদ্ভুত রূপ সেই ভগবানেরই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কি এই ভগবান্?

এই সহস্রশীর্ষা পুরুষ সমস্ত অবতারের অক্ষয় বীজ স্বরূপ। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য যে ভগবান্ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন তিনিই

অবতার। এই অবতার সমূহের অক্ষয় বীজস্বরূপ শ্রীভগবানের অংশ ও অংশাংশ হইতে দেবতা, পশু পক্ষী, মনুষ্যাদির সৃষ্টি।

সমস্ত অবতার ও সপ্তঋষি, স্বায়ম্ভুবাদি মনু, দেবতা, মনুপুত্রাদি, লোকপাল দিকপালাদি সমস্তই যে ভগবান হইতে নির্গত হয়েন তাঁহার রূপটি কি দ্বিভুজ মুরলিধর শ্রীকৃষ্ণের রূপ ?

না তাহা নয়। শ্রীভাগবত ১।৩।৩০ শ্লোকে বলেন—

এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি ॥ ৩০

রূপশূন্য চিদাত্মা শ্রীভগবানের এই রূপ তাঁহারই আত্মাতে মহদাদি মায়াগুণের দ্বারা বিরচিত। চিদাত্মা অর্থে এখানে জীবাত্মা নহে। কারণ এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক সিসৃক্ষয়া।

মহদাভিজাত ষোড়শ কলায় পূর্ণ রূপটি ভগবান্ গ্রহণ করিলেন। সেই কথাই এইখানেও বলিলেন। বলিলেন চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ যে আত্মা ভগবান্ তিনি অরূপ। অর্থাৎ তাঁহার কোন আকার নাই, কোন মূর্ত্তি নাই, সেইজন্য কোন রূপও নাই। তবে যে তিনি রূপ ধারণ করেন সেটি মায়ার গুণ দ্বারা তাঁহার আত্মাতেই বিরচিত হয়।

অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ শ্রীভগবানের কোন রূপ নাই। তথাপি তিনি দ্বিবিধ দেহ ধারণ করেন। ইহা তাঁহার মায়ার সাহায্যেই হয়। শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণও বলিতেছেন—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদি মধ্যান্তবর্জ্জিতঃ।
ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্ট্বা তত্র সুপ্তোঽসি ভূতকৃৎ ॥
নারায়ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ নরাণামন্তরাত্মকঃ।
তন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥
আত্মনা সৃজসীদং ত্বমাত্মন্যেবাত্মমায়য়া।
ন সজ্জসে নভোবত্ত্বং চিচ্ছক্ত্যা সর্ব্বসাক্ষিকঃ ॥

বহিরন্তশ্চভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন।
পূর্ণোঽপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে॥

* * *

মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ স্বগুণৈরহমাদিভিঃ॥

তুমি আত্মমায়া দ্বারা আত্মাতেই আত্মাদ্বারা এই বিশ্ব সৃজন কর। শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণের এই উক্তির সহিত শ্রীভাগবতের 'মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি' এই উক্তির একতা দেখা যায়। অতএব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ' এখানে চিদাত্মা অর্থে জীবাত্মা হইতেই পারে না। যে ব্যাসদেব শ্রীভাগবতের রচয়িতা তিনিই শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। কাজেই ব্যাসদেবের ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও ব্যাখ্যা এখানে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীভাগবত যে ভগবানের দুই দেহের কথা বলিতেছেন এবং শ্রীভগবানকে অরূপ বলিতেছেন তাহা অতি স্পষ্টভাবে শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে পাওয়া যাইতেছে—

দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরিক্ষিযোঃ
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্।
বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন॥

তুমি যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা কর তখন দেহশূন্য তুমি তোমার দুই দেহ হয়। এক স্থূল বিরাট দেহ এবং দ্বিতীয় সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ দেহ। বিরাট্—দেহধারী বিরাট্ পুরুষ সহস্র সহস্র অবতার জন্মাইতেছেন এবং কার্য্যান্তে তাঁহারা সেই বিরাট্ পুরুষেই লয় হইতেছেন। শ্রীভাগবতও বলিতেছেন—

স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ॥

ভগবান অরূপ, অদেহ এবং অগুণ। এই অগুণ বিভু ভগবান্ সদসদ্রূপা গুণময়ী আত্মমায়া দ্বারা পুর্ব্বে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই যে শ্রীভগবানের কথা শ্রীভাগবত বলিতেছেন এবং শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণাদি

অন্যান্য শাস্ত্রও বলিতেছেন, ইনিই অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ আত্মা, ইনিই পরমাত্মা, ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই ভগবান্।

অদ্বয় জ্ঞানটিই তত্ত্ব। ইনিই আছেন অন্য কিছুই নাই। তথাপি মায়া-ইন্দ্রজাল দ্বারা ঐ অদ্বয় জ্ঞানটিই বহুনামে ও বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন।

যে ভগবান্ শ্রীভাগবতে বিরাট্ দেহ ধারণ করিয়া সহস্রশীর্ষা পুরুষ, সেই ভগবানই শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে রামরূপ ধারণ করিয়াছেন; ইনিই স্কন্দপুরাণে কোথাও ব্রহ্মা, কোথাও মহাদেব।

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—

তব নিঃশ্বসিতং বেদা স্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্ব ভূতানি তে পাদৌ শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষু সূর্য্যস্তব প্রভো ॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতাস্তুতিঃ স্তব্য ইহত্বমেব।
ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোঽস্তুভূয়োঽপি নমোনমস্তে।

এই পুরুষই শ্রীগীতায় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীভগবানই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা এবং সৎচিৎআনন্দস্বরূপ।

প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে এই যে এক পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন এখানে এই পুরুষই ভগবান্। তুমিও তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষে একটু দেখনা?

যেখানে ইচ্ছা দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া এই আদ্যন্তশূন্য অন্তরীক্ষমণ্ডলের দিকে ভাল করিয়া দেখিতে থাক আর ভাবনা কর "নাভ্যা আসীদরন্তরিক্ষং"। এই যে ভূপৃষ্ঠ হইতে নীল আকাশে যতদুর পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদৃষ্টি চলে ইহাই ত অন্তরীক্ষ মণ্ডল। এই অন্তরীক্ষ মণ্ডল সেই মহাপুরুষের নাভিদেশ।

এক মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। নাভি মাত্র আমরা যেন দেখিতেছি। জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, জ্যোতির্মণ্ডিত স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক এবং বিশ্বভূত সকল তাঁহার পাদদেশে। কোথায় এই পুরুষের অভাব? যতদিন বিশ্ব আছে ততদিন এই বিশ্বরূপ পুরুষও আছেন। আবার বিশ্ব যখন থাকিবে না, তখনও ইনি থাকিবেন। এই পুরুষই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, আদি গৃহস্থ, আদি নারায়ণ, শ্রীশিব, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসূর্য্য, শ্রীগণপতি, শ্রীভগবতী ইত্যাদি।

(২)

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহা শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকের প্রথম ছত্রের শেষার্দ্ধ। ইহার অর্থ "কৃষ্ণই কিন্তু ভগবান্ নিজে"।

"কিন্তু" কি জন্য বলা হইয়াছে?

শ্লোকটির ১ম ছত্রের প্রথমার্দ্ধের সহিত ইহার যোগ আছে।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহার অর্থ হইতেছে, এই সমস্ত অবতার এবং সুরনরাদি সেই পুরুষের অংশ ও বিভূতি; কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। অবতারের মধ্যে কৃষ্ণেরও নাম আছে। কাজেই কৃষ্ণকেও বলা হইতেছে ইনি বিরাট্ পুরুষের অংশ। আবার বলা হইতেছে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনি ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে পূর্ণ। কাজেই জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি আপন পূর্ণ শক্তি লইয়াই ভগবান্। এই ভগবানের কথাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এখন দেখা যাক্ যিনি অংশ তিনিই স্বয়ং ভগবান্ কিরূপে? অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে এই বিরোধের মীমাংসা কি?

কৃষ্ণাবতারও অংশ, ইহা অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

অংশাবতারো ব্রহ্মর্ষে যোহয়ং যদুকুলোদ্ভবঃ।
বিষ্ণোস্তং বিস্তরেনাহং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥৫।১।২

হে ব্রহ্মর্ষে! যদুকুলে উৎপন্ন এই যে বিষ্ণুর অংশাবতার ইহার বিষয় আমি বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

আবার কৃষ্ণ যে অংশাবতার একথা স্বয়ং মহাভারতও বলিতেছেন—

মূলস্থায়ী মহাদেবো ভগবান্ স্বেন তেজসা
তৎস্থঃ সৃজতি তান্ ভাবান্নানারূপান্মহাত্মনঃ ॥৬১
তুরীয়ার্দ্ধেন তস্যেমং বিদ্ধি কেশবমচ্যুতং
তুরীয়ার্দ্ধেন লোকাংস্ত্রীন্ ভাবয়ত্যেব বুদ্ধিমান্ ॥৬২

শান্তি পর্ব্ব ২৭৯ অধ্যায়ঃ।

মহাভারতের টীকাকার শ্রীনল্লীলকণ্ঠশূরীর ব্যাখ্যামত শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

মহোদয় অনুবাদ করিতেছেন "ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্য স্বরূপ পরম ব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজঃ প্রভাবে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব [যিনি এই আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন] তাঁহারই অষ্টমাংশ স্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন। কল্পান্ত কালে বিরাট পুরুষেরও ধ্বংস হয়; কিন্তু কেবল ভগবান্ ঐ সময়ে সলিল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে লোক সমুদয় বিনষ্ট হইলে এই অনাদি নিধন কেশব পুনরায় জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদয় পূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এখানে দেখা যাইতেছে যিনি ভগবান তিনি সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ স্বরূপে যিনি নির্গুণ তিনিই মায়া অবলম্বনে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিয়া রূপ ধারণ করেন। কাজেই উপাধির দিকে দৃষ্টি রাখিলে যাঁহাকে অংশ বলিয়া মনে হয় স্বরূপে দৃষ্টি রাখিলে তিনিই পূর্ণ। কারণ নামরূপ বিশিষ্ট উপাধি যেটি সেটি পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সেই উপাধি উপহিত পুরুষকেও পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হয়। শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ সেইজন্যই বলিতেছেন "পূর্ণোঽপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে" উপাধি উপহিত হইলেও চৈতন্য সর্ব্বদাই পূর্ণ; চৈতন্যের অংশ হয় না। মূঢ়জন জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে জানে না বলিয়া আপন সংকীর্ণ দৃষ্টিতে পূর্ণকেই অংশরূপে দেখে মাত্র। যেমন আকাশের কোন অংশ হয় না কিন্তু ঘটের মধ্যের আকাশ সেই পূর্ণমিত আকাশ থাকিলেও যেন ঘট দ্বারা বিচ্ছিন্ন মত বোধ হয় সেইরূপ।

আমরা দেখিলাম নামরূপে দৃষ্টি করিলে যিনি বিরাট পুরুষের অংশ, চৈতন্যে দৃষ্টি করিলে তিনিই পূর্ণ ভগবান্। এস্থলে কোন বিরোধ নাই।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এখানে এই স্বয়ং কথাটির ব্যাখ্যা একটু ফিরাইয়া করিলে বড়ই বিরোধ হয়। অর্থাৎ যদি বলা যায় অন্য অন্য সমস্ত অবতার গুলি কেহই স্বয়ং নহেন কৃষ্ণই কেবল স্বয়ং, তাহা হইলেই সর্ব্বশাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়।

শাস্ত্র ত আর কাহাকেও স্পষ্টাক্ষরে স্বয়ং বলেন না তবে অন্য কেহই স্বয়ং ভগবান্ নহেন এ কথা বলিব না কেন? কৃষ্ণই পূর্ণাবতার, অন্য অবতারগুলি অংশ মাত্র একথা বলাইত উচিত।

শাস্ত্র যে আর কাহারও সম্বন্ধে স্বয়ং বলেন নাই তাহা তোমাকে কে বলিল? স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাত পূর্ব্বে বলিয়াছি। গণপতি, সূর্য্য,

মহাদেব, দেবী সকলের সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিতেছেন ইহারা স্বরূপে নির্গুণ ইহারাই বিশ্বরূপ, আত্মা এবং মূর্ত্তিধারী অথবা মূর্ত্তিধারিণী। গণপতি উপনিষদ্, সূর্য্য উপনিষদ্, রুদ্র উপনিষদ্ দেবী উপনিষদ্ দেখিলেই বুঝিবে আমরা যাঁহাকে উপাসনা করি, তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার।

গণপতি ইত্যাদিত আর বিষ্ণুর অবতার নহেন। বিষ্ণু অবতারের মধ্যে কোন্ অবতারকে শাস্ত্র স্বয়ং বলিতেছেন ?

শ্রুতি বলিতেছেন শ্রীরামই কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন "যো রামঃ কৃষ্ণতামেত্য সার্ব্বাত্ম্যং প্রাপ্য লীলয়া" কৃষ্ণোপনিষদে ইহা পাওয়া যায়।

আবার বলিতেছেন "ওঁ শ্রীমহাবিষ্ণুং সচ্চিদানন্দলক্ষণং রামচন্দ্রং দৃষ্ট্বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরং মুনয়ো বনবাসিনো বিস্মিতা বভূবুঃ। তং হোচুর্নোঽবদ্যমবতারান্বৈ গণ্যন্তে আলিঙ্গামো ভবন্তমিতি॥ ভবান্তরে কৃষ্ণাঽবতারে যূয়ং গোপিকাভূত্বা মামালিঙ্গথ অন্যে যেঽবতারাস্তে হি গোপা ন স্ত্রীশ্চ নো কুরু। অন্যোঽন্যবিগ্রহং ধার্য্যং তবাঙ্গস্পর্শনাদিহ। শশ্বৎস্পর্শয়িতাস্মাকং গৃহ্ণীমোঽবতারান্বয়ম্॥" এখানেত স্পষ্টই বলা হইল কৃষ্ণ বলিয়া পৃথক্ কেহ নাই। রামই কৃষ্ণ হইয়াছিলেন আর গোপীরা রাম অবতারের মুনিগণ। ইহাতেও কি স্বয়ং বলা হইল না ? আর যদি স্বয়ং কথাটি দেখিতে চাও তাহাও পাইবে। স্বতন্ত্র তন্ত্রে দেখা যায়—

চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু সোমবারে পুনর্ব্বসৌ।
পূর্ব্বাহ্ণে চাভবৎ রামঃ স্বয়ং দেবো জনার্দ্দনঃ॥

প্রাণতোষিণী ভক্তিকাণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।

যিনি ভগবান্, যিনি নারায়ণ তিনিই জনার্দ্দন; শাস্ত্রের সর্ব্বস্থানেই ইহা দেখা যায়। এখানেত রামকে স্বয়ং জনার্দ্দন বলা হইয়াছে। তোড়ল তন্ত্রে কালীকেও বলা হইয়াছে স্বয়ং ভগবতী কালী ইত্যাদি। দেবী সূক্তে কালীই যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ইহা কি বলা হয় নাই ? তবেই দেখা যাইতেছে, যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারিণী। ইহাও তটস্থে, কিন্তু স্বরূপে তিনিই সচ্চিদানন্দ। নাম রূপ ও কর্ম্ম ধরিলে যাঁহাকে অংশ বলা হয় চৈতন্যে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়। সমস্ত অবতার সম্বন্ধেই বলা হয়—

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব্বব প্রকৃতিজাঃ চিৎ॥

পরমানন্দ সন্দোহাঃ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্ব দোষ বিবর্জ্জিতাঃ।

মহাবারাহে ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যদি ইহারও অন্য অর্থ করিয়া বলা হয়, কৃষ্ণাবতারে পূর্ণশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া তিনি পূর্ণ, "আবিষ্কৃত সর্ব্বশক্তিত্বাৎ" তবে ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে যখন রাম অবতারের বা নৃসিংহ অবতারের বা অন্যান্য অবতারের কার্য্যগুলি কৃষ্ণাবতারে হয় নাই তখন কিরূপে বলা যাইবে যে কৃষ্ণাবতারে পূর্ণ শক্তির কার্য্য হইয়াছিল? কার্য্যত শক্তিদ্বারাই হয়। তবে সমস্ত অবতারের কার্য্যই শক্তির কার্য্য। কৃষ্ণাবতারে ত সমস্ত অবতারের কার্য্য হয় নাই তবে কৃষ্ণাবতারে পূর্ণ শক্তির বিকাশ হইয়াছিল এই ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ বলা সঙ্গত হয় কিরূপে? শাস্ত্রত আর এই ব্যাখ্যা করেন নাই তবে লোকে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে কেন?

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোপাল তাপনীর ততটুকু অংশ তুলিয়াছেন যতটুকুতে তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্য হইবে। তিনি তুলিয়াছেন 'স হো বাচাব্জযোনিঃ। যোবাঽবতারণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবতি' ইত্যাদি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তার পরের অংশটুকু তুলেন নাই; কেননা তাহাতে তাঁহার মতলব সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন "কথং বাঽস্যাঽবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি"। শ্রুতি এই যে বলিতেছেন এই অবতার যে ব্রহ্ম তাহা সিদ্ধ হয় কিরূপে? এ কথা কি আধুনিক বৈষ্ণব মহাশয়েরা স্বীকার করিবেন? ইঁহারাত শ্লোক রচনা করিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছেন "যদদ্বৈতব্রহ্মোপনিষদিতদপ্যস্য তনুভা" ইত্যাদি। একথাটি সম্পূর্ণই শ্রুতি বিরুদ্ধ কথা। আধুনিক বৈষ্ণব সমাজের প্রামাণিক গ্রন্থ গোপাল তাপনীও ত বলিতেছেন "কথং বাঽস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি"? তার পরে কে শ্রেষ্ঠ অবতার এ সম্বন্ধে শ্রুতি উত্তর দিলেন "স হোবাচতং হি বৈ নারায়ণোদেবঃ" ইত্যাদি। শ্রীভাগবতের প্রচলিত ব্যাখ্যা কর্ত্তাগণ শ্রুতির সহিত পরিচিত হইয়াও শ্রুতি অমান্য করিয়া দলাদলি সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। কারণ শ্রুতি যখন যে অবতারের কথা বলিয়াছেন তাঁহাকেই বলিয়াছেন ইনিই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা অধিক পড়িতে চাননা তাঁহারা নৃসিংহতাপনী পড়িলেই সত্য কোনটি তাহা বুঝিবেন। শ্রুতি দেবীর পদানুসরণ করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রও তাহাই বলেন। কে শ্রেষ্ঠ অবতার এই সম্বন্ধে শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে পাওয়া যায়—

অবতারাঃ সুবহবো বিষ্ণোর্লীলানুকারিণঃ।
তেষাং সহস্রসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ॥

ইহাতে ত রাম অবতারকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইল আবার শ্রুতিও বলিলেন "যো রামঃ কৃষ্ণতামেত্য" ইত্যাদি।

বিবাদ মিটাইতে হইলে শাস্ত্রের কথাই গ্রহণ করিতে হয়। মূর্ত্তি মিথ্যা এই কথা বলাতেই বন্ধু বিগড়াইতেছে। আমরা শ্রুতি মানিব না, দলাদলি মানিব? মৈত্র্যুপনিষৎ বলিতেছেন "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চাথ যন্মূর্ত্তং অসত্যং যৎ অমূর্ত্তং তৎ সত্যং" ইত্যাদি। মূর্ত্তি অসত্য হইলেও যাঁহার মূর্ত্তি তিনি সত্য। ঋষিগণ মূর্ত্তি অসত্য জানিয়াও ভক্তিমার্গ চালাইয়া গিয়াছেন তবে তুমি আধুনিক বৈষ্ণব, মূর্ত্তিকে অসত্য বলিতে তোমার বাধে কোথায়? আর শাস্ত্র ত কোন অবতারকে ছোট বড় বলিতেছেন না। ভারতবর্ষ পঞ্চোপাসকের দেশ, এখানে বেদ সমস্ত দেবতাকেই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার বলিতেছেন। যাঁহারা কৃষ্ণোপাসক, কৃষ্ণই তাঁহাদের নিকট স্বয়ং ভগবান্ আর কালী, দুর্গা, শিব, রাম ইত্যাদি অন্যান্য দেবতা ও অবতারগুলি আবরণ দেবতা। আবার রামোপাসকের কাছে রামই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি আবরণ দেবতা। আবার শিবোপাসকের নিকট শিবই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি আবরণ দেবতা। কালী উপাসকের কাছে কালীই স্বয়ং ভগবতী। কৃষ্ণাদি আবরণ দেবতা মাত্র। শাস্ত্র এইভাবে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ দেবতা রাখিয়াও সকলগুলিকেই বলিতেছেন নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে। শাস্ত্রের এই মীমাংসা গ্রহণ না করিয়া কৃষ্ণভক্ত যেমন বলিবেন আমার কৃষ্ণ উপাসনা না করিলে কাহারও কিছু হইবে না, সেইরূপ কালীভক্তও ঐ কথা বলিবেন, শিবভক্তও ঐ কথা বলিবেন, রামভক্তও ঐ কথা বলিবেন। এই জন্যই ত সমাজে এত বিরোধ। কৃষ্ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা এতদূর গড়াইয়াছে যে কলিসন্তরণোপনিষদের—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

এই মন্ত্রের শেষ ছত্র প্রথমে গিয়াছে এবং প্রথম ছত্র পরে আসিয়াছে?

কেন আসিয়াছে? কৃষ্ণই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই রামকে নীচে আনিতে হইবে। এই সমস্তকে আমরা ব্যভিচার বলি, শাস্ত্র অমর্য্যাদা করা বলি।

আমরা জানি এ বিবাদ মিটিবে না। বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলে "বন্ধু বিগড়াইয়া" যাইবে। শতবার যদি চিৎকার করিয়া বলি, ওগো! আমিও বৈষ্ণব, কৃষ্ণ আমারও প্রাণের প্রাণ, আমিও কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, আমিও কৃষ্ণকে স্বয়ং বলি কিন্তু সেই সঙ্গে শাস্ত্রশিক্ষা মত একথা বলিনা যে রাম স্বয়ং নহেন, কালী স্বয়ং নহেন। একথা বলিলেও 'বিগড়ান বন্ধুও' ক্ষমা করেন না। কাজেই মীমাংসার জন্য তাঁহার আগমনের কাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তথাপি আমরা সেই করুণানিধানের নিকটে প্রার্থনা করি, প্রভু! আমাদিগকে সৎবুদ্ধি দাও, আমরা যেন ভাই ভাই বিরোধ না করি।

আগামী বর্ষ হইতে শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যাতে কোন প্রকার বিরোধের কথা আমরা আর তুলিব না।

ধন্য কে?

১। যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয় সেই জ্ঞানই জ্ঞান, আর উপনিষদে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই জ্ঞেয় এবং যাঁহারা পরমার্থ নিশ্চয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ তাঁহারাই ধন্য। অবশিষ্ট সকল জীব ভ্রমের বশীভূত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

২। যে পুরুষেরা প্রথমে বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া এবং মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া যোগরাজ্য লাভ করিয়াছেন আর রমণসুখ প্রদায়িনী পরমাত্মবিদ্যা অনুভব করিয়া অমৃতফল লাভ করিয়াছেন, আহা! তাঁহারা গৃহে থাকিয়াও পরম সুখে বিচরণ করেন এবং তাঁহারাই ধন্য।

৩। যাঁহারা সংসারে অধোগতির হেতুভূতা রতি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় উপনিষদের অর্থরস পান করতঃ ত্যক্তস্পৃহ ও বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিজন প্রদেশে বিচরণ করেন তাঁহারাই ধন্য।

৪। যাঁহারা ভববন্ধনের হেতুভূত 'আমি আমার' এই দুই পদের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া মানাপমানে সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হন এবং এই সংসারের একজন কর্ত্তা আছেন ইহা জানিয়া সেই সর্ব্বময় কর্ত্তাতে কর্ম্মপরিপাকফল সমর্পণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই ধন্য।

৫। যাঁহারা পুত্রোৎপত্তির জন্য দারপরিগ্রহ-লক্ষণরূপ পুত্রৈষণা, গবাদি ও বিত্তাদি প্রাপ্তি-ইচ্ছারূপ বিত্তৈষণা এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃলোক জয় ও বিদ্যা দ্বারা দেবলোক-জয়রূপ লোকৈষণা, এই এষণাত্রয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষ পদের অনুসন্ধান করেন, এবং অমৃততুল্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর নির্জ্জনে বসিয়া স্বকীয় হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্ম-জ্যোতি দর্শন করেন সেই দ্বিজগণই ধন্য।

৬। পরব্রহ্ম অসৎ নহেন, সৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহান্ নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, ক্লীব নহেন, কেবল একমাত্র জগতের কারণ, যাঁহারা এই প্রকারে সেই পরব্রহ্মোপাসনায় একাগ্রচিত্ত থাকেন তাঁহারাই ধন্য। অপর লোক সকল সংসার-পাশবদ্ধ।

৭। যাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন, সারশূন্য দুঃখের আকর স্বরূপ, জন্ম-মৃত্যু-জরা পরিপূর্ণ ভববন্ধনকে অনিত্য দেখিয়া জ্ঞান-খড়্গে ইহা ছেদন করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারাই ধন্য।

৮। যাঁহারা শান্ত, অনন্যমতি, মধুর স্বভাব, একত্ব নিশ্চয়কারী মনের দ্বারা নিবৃত্তমোহ এবং সাধুগণের সহিত নির্জ্জন প্রদেশে শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরমপদ সেই স্বরূপকে সম্যক্ চিন্তা করেন তাঁহারাই ধন্য।

৯। যিনি নিরন্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ ত্যাগ করেন, সুন্দরী নারীকে মৃতদেহবৎ পরিত্যাগ করিয়া যিনি সংসার-বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিষম বিষয় সকলকে বিষবৎ যিনি জ্ঞান করিয়াছেন তিনিই পরমহংস এবং তিনিই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন।

১০। যখন ভাগ্যবশে কোন ব্যক্তির পরব্রহ্ম দর্শন হয় তখন নিখিল জগৎকে আনন্দকানন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ জ্ঞান হয়, সমস্ত জলই গঙ্গাজলবৎ পবিত্র বোধ হয়, সকল ক্রিয়াই পবিত্র হইয়া যায়। প্রাকৃত বা সংস্কৃত সকল বাক্যই শ্রুতি বাক্য তুল্য হয়, পৃথিবী বারাণসী এবং সর্ব্বত্র অবস্থিতিই সুখকর বোধ হইয়া থাকে।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

মহাপ্রলয় হইয়া গেলে যখন সমস্ত বিশ্ব লয় হয় তখন যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই পরমপদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি স্পন্দন-রহিত অবস্থায় 'আপনি আপনি' থাকেন। এই অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিয়াও সৃষ্টিকালে তিনি যেন স্পন্দনযুক্ত অবস্থায় আইসেন। স্পন্দনরহিত অবস্থায় যিনি পরম শান্ত মঙ্গলময়, তাঁহার স্পন্দনযুক্ত মত অবস্থাটিই ত্রিজগৎরূপে স্থিতি। যিনি স্পন্দ ও অস্পন্দরূপে বিলাস করেন, করিয়াও যিনি এক শুদ্ধ ভরিতাকার—পূর্ণাকার; যিনি না থাকিলে চন্দ্র সূর্য্যাদি প্রকাশ-পদার্থ অন্ধকার মত হইয়া যায়; যিনি থাকাতে এই ত্রিজগৎ মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে; যাহার মনোভাব-গ্রহণ অবস্থাতে যে স্পন্দন উঠে তাহাতে নিশিভ্রাম্যমান অঙ্গারের চক্রাকারের ন্যায় এই জগল্লক্ষ্মী হয় পুনঃ পুনঃ উদয় এবং যিনি মনোভাব ত্যাগ করিয়া নিস্পন্দ অবস্থা লাভ করিলে এই জগদাড়ম্বর নিবৃত্ত হইয়া যায়; যিনি বাগেন্দ্রিয়শূন্য মূকের তুল্য হইয়াও বাচাল; মননশীল হইয়াও প্রস্তরের ন্যায়; নিত্যতৃপ্ত হইয়াও যিনি সহস্র মুখে ভোজন করেন; কোথাও সংস্থিত না হইয়াও যিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন; মন নাই তথাপি যিনি মানস সৃষ্টি করেন; নাট্যশালার দীপ সাহায্যে নটের নৃত্য করার মত যিনি সাক্ষী স্বরূপে থাকাতে চিত্তের বিবিধ স্পন্দন হয়; সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, কল্লোল, ক্ষুদ্র লহরীর মত যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উঠিতেছে; এক কথায় কর্ম্মেন্দ্রিয় উপাধিতে যে ক্রিয়া হইতেছে, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উপাধিতে যে রূপরসাদি বিষয় অনুভূত হইতেছে; এবং অন্তঃকরণ উপাধিতে যে চেতনা—এই সমস্ত তুমি যাহা জানিতেছ সেই সমস্তই সেই দেব, সেই দীপ্তিশীল, ক্রীড়াশীল পরমাত্মা। সমস্ত বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হয় তাহা বস্তুতঃ সেই পরম শান্ত পরমপদই।

যেমন সুষুপ্ত অবস্থাটিই স্বপ্নবৎ—স্বপ্নমত প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্মই সর্গবৎ—সৃষ্টি মত প্রকাশ পান। সর্ব্বাত্মক সুষুপ্ত স্থানটিই সেই ব্রহ্মস্থান। অর্থাৎ সমষ্টি সুপ্ত পুরুষের স্বরূপটিই এই ব্রহ্ম। যে ক্রমে এই ব্রহ্ম হইতে এই সর্ব্বত্র ভাসমান সৃষ্টি উত্থিত হয় তাহা বলা হইতেছে।

সুষুপ্তিতে বিষয় ভোগের দ্বারগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়। পুরুষের অন্নময়, প্রাণময়,

মনোময়, বিজ্ঞানময় আবরণগুলি থাকে না। থাকে একটি মাত্র আবরণ। ইহা অজ্ঞান-আবরণ; ইহা আপন পরিপূর্ণ স্বরূপের বিস্মৃতি 'আমিই সেই' এই স্থিতির অভাব। তথাপি এই সুষুপ্তিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয় বলিয়া স্বরূপানন্দের অতি ক্ষীণ স্ফুরণে সুপ্ত-পুরুষ আনন্দভূক্। স্থূল সূক্ষ্ম কোন প্রকার চিত্ত স্পন্দন না থাকায় সুপ্তপুরুষ অনায়াস-পদে স্থিতিলাভ করিয়া আনন্দময়।

সুষুপ্তিতে কুয়াসার মত একটা স্বরূপের বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান পুরুষকে ছাইয়া থাকে। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একটা আদ্যন্তশূন্য তমঃ বা ভৌতিক-প্রকাশের অভাব যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল ইহাও সেইরূপ। সুপ্ত আত্মপুরুষের তমঃ বা অজ্ঞান আবরণে লগ্ন ছায়া ছায়া মত এই বিশ্বটা, এই ভাবী বিচিত্র নামরূপ মাখা বিশ্বটা, প্রথমে ছায়ার মত থাকে। ক্রমে ছায়া ছায়া মতটাই স্বপ্ন-নগরের মত ভাসে। ক্রমে তাহাই আরও স্থূল হইয়া সৃষ্টিরূপে ভাসিয়া উঠে। এই সৃষ্টি ভাসার ব্যাপারটাই এখন বলা হইতেছে।

অনন্তপ্রকাশ আত্মরূপ সেই চিন্মণির সত্তাটি অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব স্বভাবতঃ অজস্র ভাবে উঠিতেছে। বেশ করিয়া ধারণা কর মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। স্থূল যাহা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থূলের সূক্ষ্ম সংস্কার সঙ্কল্প-শক্তিতে আছে। এই সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তি সূক্ষ্ম জগৎ লয় করিবার জন্য ঊর্দ্ধ মুখে ছুটিয়াছে। আর পরম শান্ত চলনরহিত, পরম শিব চৈতন্যকে স্পর্শ করিয়া এই সঙ্কল্পশক্তি নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর কিছুই নাই। এক অনন্তপ্রকাশ—অখণ্ড 'আপনি আপনি' ভাব মাত্র অবশিষ্ট। ইনিই অনন্ত চিন্মণি; চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ মণি। অনন্ত প্রকাশটি ইঁহার আত্মরূপ। বিশ্ব বলিয়া কোন কিছুই নাই। বিশ্বের পরিবর্ত্তে এক আদ্যন্ত শূন্য তমঃ এই বিশ্বের অভাব সূচক অজ্ঞান, জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ চিন্মণিকে যেন বেষ্টন করিয়া আছে। জ্ঞানের চতুস্পার্শ্বে যেন অজ্ঞান আছে। "আর কিছুই নাই" এই অভাব বোধরূপ অজ্ঞানটা যেন সংস্বরূপ—অস্তি স্বরূপ আছে, স্বরূপ-ব্রহ্মের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছ। 'আছে' এই ভাবের সঙ্গে 'নাই' এই অভাবটা অথবা অস্তির সঙ্গে নাস্তিটা যেন অবস্থিত। এই অভাবের মধ্যে বিশ্বটা ছায়া ছায়া মত আছে। কিরূপে? অভাবটা কার অভাব? বিশ্বের অভাব। বিশ্বত নাই কিন্তু বিশ্বের অভাবরূপ একটা ভাব যেন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে আছে।

সেই জন্য বলা হইতেছে মহাপ্রলয়ে স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ বা ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন এই বিশ্বটা তাঁহারই সত্তামাত্রাত্মক। চিৎ ও আনন্দমাত্রাত্মক নহে।

চিন্মণির যে সত্তা অবলম্বন করিয়া বিশ্ব অজস্র ভাবে উঠে, বিশ্ব লয় হইয়া গেলে সেই সত্তাটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই সত্তা হইতে যে ক্রমে বিশ্ব উঠে তাহাই বলা হইতেছে। যেহেতু এই বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তা মাত্র, যেহেতু সেই চিন্মণির পরমার্থ রূপটি মাত্রই এই বিশ্বের সত্তা, সেই হেতু মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ উঠে, সেইরূপ সেই চিন্মণি হইতে এই বিশ্ব-ঝলক স্বভাবতঃ অজস্রভাবেই উঠে। স্বভাবতঃ অর্থাৎ অবুদ্ধি পূর্ব্বক যখন অজস্র বিশ্ব-ঝলক চিন্মণির পরমার্থ সত্তা অবলম্বন করিয়া উঠে তখন ঐ সত্তা আপনাতে আপনি কিঞ্চিৎ চেত্যতা, কিঞ্চিৎ বহির্ম্মুখতা, কিঞ্চিৎ সৃষ্টি-বিষয়ক ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়েন। যেহেতু সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তি প্রথমে স্বভাবতঃ উঠে, প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক উঠে, সেই হেতু সেই অবুদ্ধিপূর্ব্বক উঠাটাই বুদ্ধিপূর্ব্বক বিশ্ব সৃষ্টির কারণ হয়। অবুদ্ধি পূর্ব্বক যাহা হয় তাহাতে যে চলন হয় তাহাই বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি-ব্যাপারের মূল সূত্র। যেমন ভোজনের ইচ্ছা না থাকিলেও যদি কেহ জোর করিয়া ভোজন করায় তখন যেমন ভোজনেচ্ছার উদ্রেক হয়, সেইরূপ পরম শান্ত চলন-রহিত ব্রহ্মে স্বভাবতঃ ঝলক উঠিলে অনিচ্ছারও ইচ্ছা জন্মে; সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছাই ইহা। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কিছু উঠাই বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টির কারণ। সেই জন্যই বলা হইতেছে এই সমস্ত বিশ্ব "আর কিছুই নাই" এই অভাব-বোধরূপ অজ্ঞান অবলম্বনে পরিপূর্ণ অস্তি ভাবের উপর কল্পনা মাত্র। চিন্মণি কিরূপে চেত্যতা বা বহির্ম্মুখতায় আসিলেন তাহা বলা হইল। এই চেত্যতাটি কিন্তু সম্বিৎ দ্বারা বা জ্ঞান দ্বারা এখনও অহং স্পর্শ করে নাই। অর্থাৎ অহং স্পর্শ পূর্ব্বক জাগতিক বস্তু সকল যেরূপ নামরূপ গ্রহণ করে, এই চেত্যতা এখনও তাহা করে নাই। ইহা এখনও 'অহং মর্শন পূর্ব্বকং অগৃহীতাত্মকম্'।

সেই চিন্মণির সত্তাটি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, শুদ্ধ-বোধ মাত্র। সেই শুদ্ধ বোধটি সমস্ত সৃজ্য বিষয়ের ভাবী নামরূপ অনুসন্ধান তৎপর অর্থাৎ "আছের" সঙ্গে যে "নাই" জড়িত, সেই "নাই" এর মধ্যে সমস্ত সৃজ্যবিষয়ের ভাবী নামরূপ অনুসন্ধান-তৎপরতাও আছে। ঐ ভাবী নামরূপ অনুসন্ধান দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপাভাষ বিশিষ্ট হইয়াই সেই সত্তাটি চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মে সৃষ্টি ইচ্ছা কেন জাগে

তাহাই বলা হইল। এই সঙ্কল্প শক্তিরূপা মায়াটি যখন ব্রহ্মে ভাসেন তখনই ব্রহ্ম বিচিত্র জগৎ ভাসার মত দেখায়।

সেই পরমা সত্তা যখন চেত্যতা লাভ করেন তখন সেই চেত্যতার মধ্যে ভাবী নামরূপের অনুসন্ধান রূপ বৃত্তি থাকে। ভাবী নামরূপ অনুসন্ধান বৃত্তি দ্বারাই ঐ সত্তা, ঐ শুদ্ধবোধ কিঞ্চিৎ উহিতরূপ—কিঞ্চিৎ উহ্যরূপ অর্থাৎ রূপভাস ধারণ করেন। চিত্তের ঈক্ষণ বৃত্তির যে চেত্যতা তাহা বিষয়-উপাধি লাভে যেরূপে ঈশ্বর ভাব ও জীব ভাব প্রাপ্ত হয়েন তাহাই প্রমাণিত হইল। চেতনাত্মক ব্রহ্ম সত্তা হইতে অভিন্ন যে পরমা সত্তা তাহাই চিন্নাম যোগ্য হয়েন। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই সংজ্ঞার উপযুক্ত হয়েন। পরমা সত্তা চিন্নাম যোগ্য হইবার পর "আমি বহু হইব" এই ঈক্ষণ-সম্বেদন রূপ যে সঙ্কল্প, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে সঙ্কল্প ঘন বা দৃঢ়ীভূত হয়। তাহার পরেই আত্ম কলনা হয়। 'আত্মা গৃহীতা কলনা তদ্বিষয়ে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মভাব লক্ষণ পরিচ্ছেদ' কলনা হয়। অর্থাৎ আমি বহু হইব এই সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তিচ্ছলে তাহা হইতে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপে আত্মভাবের পরিচ্ছেদ কল্পনা হয়। তখন আপনার অপরিচ্ছিন্ন ভূমাত্মভাবের বিস্মৃতি এবং আপনার পরম পদের পরিত্যাগও যেন ঘটে। ইহাতেই ভাবী প্রাণধারণোপাধিক জীব হিরণ্যগর্ভাদি নাম তিনি ধারণ করেন।

ব্রহ্মসত্তা তখনও ভাবনামাত্রসারা; তখনও বিকারাদি-ক্রিয়া-সারা হয় নাই। পরমা-সত্তা তখন ভাবনা বিশেষ দ্বারাই সংসারোন্মুখী হয়েন। ইহাতে তাঁহার ব্রহ্ম স্বভাবের কোন বিকার উৎপন্ন হয় না। যিনি অবিকৃত স্বভাব, ভাবনা দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। তবে জীব ভাব কিরূপে উঠে ইহা যদি বলা হয়, তাহার উত্তর এই যে সেই পরম সত্তার উপরে এই পরিচ্ছন্ন ভাবনা, রজ্জুর উপরে সর্প ভাসার মত উঠে। ইহার নাম ব্রহ্মসত্তার উপরে জীবভাবের উত্থান। এই জীবসত্তা পরে ইতর ভূতের অবকাশ প্রদান করে বলিয়া এক শূন্যপ্রায় খ সত্তার তখন উদয় হয়। খ সত্তাই আকাশ। আ—সমন্তাৎ কাশতে প্রকাশতে—আকাশের এই অর্থ সূর্য্যাদি সৃষ্টির পরে হয়। ভবিষ্যতে যে শব্দাদি উঠিবে সেই সমস্ত গুণের বীজ স্বরূপ এই খ সত্তা। পরাশক্তির সঙ্কল্পেই এই অসৎরূপ জগৎজাল সৎ মত ভাসে।

ধীমহি।

পরদিন যথা সময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকটে আসিলে পুনরায় কথা আরম্ভ হইল।

স্বামী। তিন শ্রেণীর সাধকের ধ্যানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য স্বতন্ত্র। অবলম্বনেরও পার্থক্য আছে। জ্ঞানীগণ সন্ন্যাসী। ইঁহাদের ধ্যান, আত্মা সম্বন্ধে শ্রবণ ও মননের পরে। যোগীর ধ্যান, যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের পরে। ভক্তের ধ্যান, অনুরাগের পরে রূপ চিন্তায় বা গুণ চিন্তায় বা রূপগুণ জড়িত লীলা চিন্তায়। তোমার অধিকারের কথাই এখানে বিশেষভাবে বলিব।

স্ত্রী। আচ্ছা, মন্ত্র জপের পূর্ব্বে ত ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হয়।

স্বামী। তাই হয় বটে কিন্তু ইষ্টদেবতাকে হৃদয়পদ্মে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে বসাইয়া লইতেও হয়। তার পরে ধ্যান করিতে করিতে জপ করিতে হয়। হৃদ্‌পদ্মে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে ইষ্টদেবতাকে বসাইয়া তাঁহার কোন অঙ্গে চক্ষু স্থির রাখিতে হয়। চরণকমলে অন্তশ্চক্ষু রাখিয়া যেন প্রণাম করিতেছি, এইভাবে নাম করিতে হয় জপের সময় দৃষ্টি স্থির না রাখিলে মন ধ্যানের অবস্থায় আসিতে বহু বিঘ্ন অনুভব করে। একটা সঙ্কেত এখানে বলিয়া দিতেছি, বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও। আকাশের বক্ষে যেমন সূর্য্য তুমিও তোমার চক্ষুকে আকাশের মত ভাবনা কর। তবেই তোমার হৃদয়ে সূর্য্য উঠিয়াছেন ইহা শীঘ্র ধারণায় আসিবে। সেই সূর্য্য মধ্যে তোমার দেবতা।

স্ত্রী। এইরূপ ধ্যানে রস কোথায়?

স্বামী। যাহা শ্রীভগবানের মূর্ত্তি তাহা রসেরই মূর্ত্তি। ইষ্টদেবতার প্রতি অঙ্গে ভাব মাখা। চরণকমলে ত্রাটক করিতে করিতে জপ করিলে একটা শান্তভাব আসিবেই। কিন্তু ত্রাটক ততক্ষণ পর্য্যন্ত করা চাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না চক্ষে জল আইসে। ইহার সহিত যদি চরণ চিন্তার ভাবটি আইসে তবে বড় সরস অবস্থা হয়।

স্ত্রী। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া যদি বল!

স্বামী। বলিতেছিলাম—আকাশে যে সূর্য্য উঠেন তাহা সকলেই দেখিতে পায়। সেই সূর্য্যের মধ্য ইষ্টদেবতা। হৃদাকাশে এই সূর্য্য ও এই দেবতা

দেখার জন্য জপকালে যত বত বার মন অন্যদিকে যাইবে তত তত বার মনকে প্রত্যাহার করিয়া পাদপদ্মে আনিতে হইবে। জপ করিতে করিতে ইহা করিতে হইবে। ১০৮ বার গায়ত্রী জপ হইলেও গায়ত্রী-পূটিত ইষ্টমন্ত্র ততক্ষণ জপ করা চাই যতক্ষণ না মন চরণে লগ্ন হইয়া যায়। এই সমস্ত কার্য্য করিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া উঠিলে ধ্যানাদি হয় না।

স্ত্রী। সম্মুখে অনেকখানি সময় রাখিয়া বসিলাম। পূর্ব্বে বিগ্রহের চিন্তাটি করিয়া রাখিয়াছি; আর আসনে বসিয়া মৃত্যুচিন্তার সাহায্যে মনকে কাতর করিয়া লইয়া কর্ম্মচিন্তা দ্বারা বিশেষরূপে সজাগ করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যার কার্য্যগুলি করিলাম। তার পরে কি করিব বল।

স্বামী। সুখাসনে উপবেশন করিয়া লক্ষ্য কর চক্ষু সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে যেন দেবতার রূপ দেখে এবং কর্ণ যেন হৃদয়মধ্যে আপনার উচ্চারিত মন্ত্রজপের ধ্বনি শুনিতে পায়। তার পরে হস্ত, চরণ, চক্ষু, হাস্য ইত্যাদির সহিত যে যে লীলা জড়িত তাহার চিন্তা কর। ধ্যান করিতে করিতে যখন অন্য সমস্ত ছাড়িয়া যায় তখন হয় সবিকল্প সমাধি। চক্ষু যাহা দেখে তাহা যেন ভ্রূমধ্যে দেখা যাইতেছে মনে হয় আর নিজের মধ্যে মন্ত্রধ্বনি যাহা শুনা যায় তাহা যেন হৃদয় হইতে উঠিতেছে মনে হয়। আবার শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে মনে হয় যেন সহস্রারে গিয়াছি। হৃদয়, ভ্রূমধ্য, সহস্রার এইজন্য ধ্যানের স্থান। আবার যাহারা মূর্ত্তি ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে, যে এই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছে তাহাকে লক্ষ্য করে, অর্থাৎ যে দ্রষ্টা পুরুষ লক্ষ্য করেন, জপ চলিতেছে, সেই পুরুষ যখন অন্য সমস্ত ভুলিয়া আপনাকে আপনি লইয়া থাকেন যখন আর কিছু থাকে না, থাকে কেবল অস্মি—আছি ইহার ভাব তখন হয় সবিকল্প সমাধি। ইহাকে অস্মিতা সমাধিও বলে। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অস্মিতা ভাবে থাকিলে যখন আনন্দ উঠিতে থাকে তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। এই চৈতন্য সমাধি বড় সুন্দর। চলিতে, ফিরিতে, উঠিতে, বসিতে, শুইতে, খাইতে কোন সময়েই ভাব ছুটিয়া যায় না অথচ যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মও হইয়া যায়।

স্ত্রী। আহা! এই যেন আমি চাই। যাহা কিছু করিনা কেন একক্ষণও যেন আমি আমার প্রিয়কে ছাড়িয়া না থাকি। শুইতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে সকল সময়ে সে আমার থাকিবে। জীবন্তভাবে, সদা জাগ্রতভাবে, আমার অনুভবে থাকিবে এই আমি চাই। তুমি ইহার উপায় বলিতেছ। কিন্তু

সমাধির কথা যাহা বলিতেছ তাহা ধরিয়াও যেন ধরিতে পারিতেছি না। আর একবার বল দেখি।

স্বামী। সমাধির কথা তুমি একবারে ধারণা করিতে পারিবে না। তথাপি আমি সহজ করিয়া বলিতেছি, বুঝিয়া রাখ। পরে ইহাতে কাজ দেখিবে।

স্ত্রী। আচ্ছা বল।

স্বামী। আসন করিয়া উপবেশন কর। হৃদয়-আকাশে সূর্য্য দর্শন মনে মনে ভাবনা করিয়া লও। পরে স্থির হইয়া বসিয়া থাক। প্রথমেই দেখিবে মন অসম্বন্ধ প্রলাপ করিতেছে। ইহাতে ব্যাকুল হইও না। এই অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর করিতে হইবে। সেইজন্য জপ অবলম্বন কর। এই জপ দ্বারা প্রলাপ তাড়িত হইবে। সূর্য্য মধ্যে তোমার দেবতা আছেন মনে রাখিয়া জপ করিতে থাক; একদিকে জপ চলিবে, অন্যদিকে প্রলাপ চলিবে। প্রলাপ যত যত বার অন্যমনস্ক করিবে তত তত বার আবার মনোযোগ করিয়া জপ কর। সঙ্গে ত সূর্য্যমধ্যে ইষ্ট চিন্তা বা ধ্যান আছেই। বেশীক্ষণ ধরিয়া এইভাবে জপ করিতে করিতে প্রলাপ সংক্ষেপ হইয়া আসিবে। তখন নাম জপের মধ্যে যে নামীর রূপ, লীলা, গুণ ইত্যাদি আছে তাহার মধ্যে লীলাতে মন লাগাও। লীলা ও গুণ চিন্তার রস পাইলে তবে রূপ চিন্তায় আইস। আরও বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে প্রতিশব্দে একটি করিয়া রূপের রেখা পাত হয়। কাজেই বেশী নাম জপে রূপ আপনিই আইসে। ভিতরে চরণ-কমলে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাক। যতক্ষণ না চক্ষু হইতে জল পড়ে ততক্ষণ চাহিয়া থাক। ইহাতে সমাধি হইবে। এইটি সবিকল্প সমাধি।

তার পরে যিনি জপ, ধ্যান, লীলা, চিন্তা ইত্যাদি করেন তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক। কারণ, কর্ম্ম যাহা হয় তাহা প্রকৃতির দ্বারাই হয়। এই দেহে যে চেতন পুরুষ আছেন তিনি যখন প্রকৃতিতে অভিমান করেন না তখন তিনি দ্রষ্টা। তুমি ধ্যানাদি সহ যখন জপ করিতে থাক তখন জপের ধ্বনিতে মনোযোগ একটানাভাবে রাখিতে পারিলে দ্রষ্টাভাবে থাকা কি বুঝিতে পারিবে। দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান জন্য যাহা করিতে হয় তাহাতে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। দীর্ঘ জপের সাহায্যে রমণীয়দর্শনকে পাইবার কৌশল জানিয়া লও। দীর্ঘ জপ করিতে করিতে জপের শব্দ যখন লয় হইয়া যাইতে থাকে তখন "অস্মি" "আছি" ভাবে স্থিতি হয়। ইহাও সবিকল্প সমাধি। এইভাবে স্থিতিতে থাকিতে পারিলেই

আনন্দ আসিবে। যখন আনন্দটি প্রবাহক্রমে চলিতে থাকে, শান্ত চলন-রহিত জ্ঞানস্বরূপ যে আনন্দ তাহাতে যখন স্থিতি হয়, তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। এই চৈতন্য সমাধিতে থাকিয়া সবই করা যায়, অথচ কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়াও অভিমান থাকে না। আর যখন কোন কর্ম্ম থাকে না, তখন "বৃক্ষইব স্তব্ধঃ" ভাবে স্থিতি হয়। তুমি যে প্রিয়কে লইয়া থাকিতে চাও তাহার রূপে যখন মন লাগিয়া যায় অথবা চক্ষুতে চক্ষু চাওয়া থাকে বা জ্যোতিতে আটকাইয়া থাকে, তখনও চৈতন্য সমাধির অন্য এক অবস্থা হয়। এইটি প্রবাহক্রমে হইলেই—এক চিন্তা-প্রবাহ থাকিলেই, আর সংসার-সাগর অতিক্রমের ভয় থাকে না। পতনেরও ভয় থাকে না। বুঝিতেছ জপের মধ্য দিয়া কত কি হয়?

স্ত্রী। আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি এইরূপ ধ্যানে উপাসনা করিয়া বাকি দিন কয়টা কাটাইয়া যাইতে পারি।

স্বামী। আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা আছে?

স্ত্রী। আর কি বাসনা থাকিবে? সবইত বলিলে। তবে—

স্বামী। এখনও তবে?

স্ত্রী। দেখ আমার করণীয় যাহা তাহা নিশ্চয় হইয়াছে এই মুহূর্ত্তে যেন আর কিছুই বলিতে চাই না। কিন্তু অতি আশ্চর্য্য এই সময়েও পূর্ব্বে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহার কথাও এক একবার জাগিতেছে।

স্বামী। তাহা ত জাগিবেই। বাধপূর্ব্বক ধ্যান যতদিন না হইবে ততদিন পূর্ব্ব সঙ্কল্প জাগিবেই। তোমার যে ধ্যানের অবস্থা তাহা লয় পূর্ব্বক ধ্যান। আচ্ছা কি উঠিতেছে বল।

স্ত্রী। মনে হইতেছে আমার ভাগ্যে না হয় নারায়ণ স্বামীরূপে আসিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের ভাগ্য আমার মত নহে তাহাদের উপায় কি?

স্বামী। নারায়ণ যে স্বামীরূপে আইসেন তা কি একবারেই হয়?

স্ত্রী। আমি কি একবারেই তোমাকে নারায়ণ বোধ করিতে পারিয়াছিলাম? নারায়ণ এমন দুষ্ট—

স্বামী। এ আবার কি তুলিতেছ?

স্ত্রী। দেখ গো স্বভাবটি কোথায় যাইবে? নিজের কাজটি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি বলিয়া বড় নির্ভয়ের অবস্থা আসিয়াছে। সেই জন্য একটু রহস্য জাগিয়াছে। ভগবানের সঙ্গেও একটু 'ফষ্টি নষ্টি' করিতে যেন বেশ লাগে?

স্বামী। কি বলিবে বল!

স্ত্রী। বলিতেছি কি সর্ব্বদা পাইব এই ভাবটি জাগিলেই একটু যেন "খোদাকে খোদা ইয়ার কে ইয়ার" বলিতেও ইচ্ছা করে। শুধু গম্ভীর হইয়া যেন সর্ব্বদা থাকিতে পারি না। কিন্তু বিষয়ের চপলতা ইহা নহে! বলিতেছিলাম শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কত ভালবাসিতেন। কিন্তু দুষ্টুমিও একটু ছিল। অর্জ্জুনও একবারেই নারায়ণকে নারায়ণ ভাবিতে পারেন নাই। গীতার দশম অধ্যায়ের পরে সখাই যে নারায়ণ তাহা ধারণা হইয়াছিল। তথাপি কতই ভালবাসিতেন। অভিমন্যু বিনাশের সময় অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া যখন পাণ্ডবদিগের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল আর দুর্য্যোধনের দলে যখন বড় উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল তখন দারুক বড়ই ব্যথিত হইলেন। বিপদকালে মধুসূদন কোথায়? দারুক শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেখানে পাণ্ডবেরা হাহাকার করিতেছিলেন সেখানে পাণ্ডব-সখার দর্শন মিলিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে দারুক শ্রীকৃষ্ণকে একাকী তাঁহার শিবিরে করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া থাকিতে দেখিলেন। দারুক প্রণাম করিয়া প্রভুকে পাণ্ডবদিগের বিপদের কথা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাল কাল, নীলমাণিকে গড়া গণ্ডদ্বয়ে জবা ভাসিয়া উঠিল—সুন্দর পদ্মপলাশলোচন দুইটি তখন কোকনদরূপ ধারণ করিল—আর তিনি সেই অবস্থায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কি যেন কি দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, দারুক! তুমি এই কথা সত্য জানিও যে অর্জ্জুনশূন্য জগতে আমি একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না।

নহি দারা ন মিত্রাণি জ্ঞাতয়ো ন চ বান্ধবাঃ।
কশ্চিদন্যঃ প্রিয়তমঃ কুন্তীপুত্রান্মমার্জ্জুনাৎ॥
অনর্জ্জুনমিমং লোকং মুহূর্ত্তমপি দারুক।
উদীক্ষিতুং ন শক্তোঽহং ভবিতা ন চ তত্তথা॥

দারুক! তুমি ইহাও স্থির জানিও যে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারে এমন শক্তি জগতে নাই।

তাই বলিতেছিলাম ঠাকুরটি কিছু দুষ্টও বটেন। যাহাকে এত ভালবাসিতেন তাহাকেও একবারে জানান নাই যে তিনি স্বয়ং। তিনি নির্গুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার একসঙ্গেই।

তুমি আমার স্বামী—আমার নারায়ণ। কিন্তু বলিতেছিলাম, যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীকে নারায়ণ ভাবে ভালবাসিতে পারে নাই অথবা স্বামীর সঙ্গে যাহাদের মনোমিলন হইতেছে না তাহাদের উপায় কি?

স্বামী। দেখ তোমার এই হৃদয়ের জন্য আমি তোমাকে এত ভালবাসি। শোন! ঐ সব স্ত্রীলোকও ভাল হইতে পারে যদি সত্য সত্যই ইহারা ভাল হইতে চায়।

স্ত্রী। কিরূপে ইহারা ভাল হইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

স্বামী। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীজনের অন্য অবলম্বন নাই। স্বামী যেমনই হউক না কেন স্বামীকেই নারায়ণ বোধ করিতে হইবে। স্বামীত্যাগ করিয়া অন্য কিছু করিলে হইবে না। অন্ততঃ ভারতের ধর্ম্ম ইহা নহে।

স্ত্রী। কিরূপে হইবে?

স্বামী। প্রীতিভাবে সাত জন্ম আর স্নেহভাবেও হয়—পাকাভাবে দ্বেষে তিন জন্ম।

স্ত্রী। কি বলিতেছ?

স্বামী। এখন দ্বেষ হইলেও চিরদিন দ্বেষ ছিল না। এখনও সব সময়ে দ্বেষ থাকে না। যখন দ্বেষ ছিলনা তখনকার অবস্থা ধরিয়া ধ্যান করুক। সহজ কথায় বলি—স্বামীকে ত একদিন ভাল লাগিয়াছিল। এমন স্ত্রী কোথায় যাহার জীবনে একদিনও স্বামী ভাল লাগে নাই? কখনও লাগে নাই? তবে যাহারা প্রথম হইতেই ব্যাভিচারিণী তাহাদের কথা আমি এখানে বলিতেছি না। ইহারা অতিশয় কপট। কপটাচারে ভগবান মিলে না। আর শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের মতনও এই কলিতে ঘরে ঘরে স্ত্রীলোক বা পুরুষ জন্মেনা। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভাবনা রাজ্যে উপলব্ধি করিবার কথা। জীব নিজের অন্তরে রাসলীলা যাহাতে অনুভব করিতে পারে সেই জন্য নারায়ণ স্থূলে এই লীলা দেখাইয়াছেন। মানুষ কিন্তু এই ভাবনা রাজ্যকে স্থূলে আনিতে গেলে ব্যভিচার করিবেই। ভাবনা রাজ্যে সমস্তই হয়।

স্ত্রী। বুঝিতেছি, এখন বল 'বনিবনাও' না থাকিলেও কিরূপে স্বামীতে নারায়ণ বোধ হইবে।

স্বামী। স্বামীকে একদিনও যদি ভালবাসিয়া থাকে তবে তখন তাঁর সদ্‌গুণ কিছু দেখা হইয়াছিল। তাই ধরিয়া স্বামীকেই ধ্যান করিতে হইবে।

নারায়ণের সমস্ত গুণগুলি স্বামীতে আরোপ করিতে হইবে। বলিতে হইবে আমার ভাগ্যদোষে আমি দুঃখ পাই।

হউক, এইরূপেই আমার প্রারব্ধভোগ হউক। তুমি আমার নারায়ণ। তোমার কর্ম্ম আমি কিরূপে বুঝিব? আমি আমার শত দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, সকল দুঃখ সহ্য করিয়া তোমার প্রসন্নতার জন্য সংসার করিব। তোমার প্রীতি অনুভবের জন্য জপ পূজা ধ্যান করিব। এইভাবে নিত্য কর্ম্ম ইহারা করুক। ক্রমে সব ভাল হইয়া যাইবে। দুঃখ সহ্য করা একটি কঠিন তপস্যা। প্রতি দুঃখে নারায়ণকে স্মরণ করাটি যখন অভ্যাস হইয়া যাইবে তখন স্বামীও ভাল হইয়া যাইবে এবং নারায়ণের কৃপাও অনুভব হইবে। ক্রমে স্বামীকে নারায়ণ ভাবিয়া ধ্যান করিতে পারিবে। ধ্যান করিতে পারিলেই স্বরূপ অনুভবে আসিবে। ধ্যান করিতে পারিলেই বুঝিবে ভিতরে সকল বস্তুই নারায়ণ।

স্ত্রী। আহা! যদি সকলে এই ধ্রুব সত্য অনুভবের জন্য চেষ্টা করে তবে বুঝি জগতের এত দুঃখ আর থাকে না।

স্বামী। ধ্যান অপূর্ব্ব বস্তু। ধ্যানের জন্যই অন্য অন্য তপস্যা। শ্রুতি বলেন—দেবার্চ্চনা, স্নান, শৌচ, সাত্ত্বিক আহার বিহারাদি কায়িক তপস্যা; নাম জপ, স্বাধ্যায়, পুরাণাদি শ্রবণ বাচিক তপস্যা; এবং ধ্যানাদি মানসিক তপস্যা। "বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্"।

কায়িক ও বাচিক তপস্যা সাহায্যে প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা পর্য্যন্ত আসিলে পরে ধ্যান। এখন শ্রবণ কর। শাস্ত্র হইতে স্বগুণ ঈশ্বরের ধ্যানের কথা বলিতেছি।

স্ত্রী। প্রথম বয়সের সন্ধ্যা পূজা যাহা হয় তাহা যেন শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনে অভ্যস্ত হইবার জন্য। "তুমি প্রসন্ন হও" এইটি মনে রাখিয়া নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে জীবনের বহু সময়ে আপনার চিত্ত-প্রসন্নতা অনুভব করিয়া তোমার প্রসন্নতা অনুভবে আইসে। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে করিতে যখন তাঁহাকে বড় আপনার জন বলিয়া বোধ হয়—সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া যখন সংসারটা ভাল লাগে না তুমিই যে সকল জ্বালা জুড়াইবার স্থান—ইহা বেশ করিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভূত হইতে থাকে; এক কথায় যখন আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, কন্যা বা জামাতা ইত্যাদির মৃত্যুশোকে সংসারকে একটা জ্বালামালার স্থান বলিয়া মনে হয়, আর

আপনা হইতেই সংসারের কর্ম্ম সংক্ষেপ হইয়া যায় তখন যে ভাবে জীবন কাটাইতে হইবে তুমি তাহাই বল। ইহার সঙ্গে অবশ্যই ধ্যানের কথা থাকিবেই।

স্বামী। সংসার যখন বিষময় বোধ হয় তখন নির্জ্জনে যাওয়া উচিত। যিনি সংসারে থাকিয়াও নির্জ্জন স্থান করিয়া লইতে পারেন তাঁহার তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অবস্থায় যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই বলিতেছি। সম্পূর্ণ সাধনাটি এখানে বলা হইবে।

(১) শুভ তীর্থজলে প্রাতঃস্নান।

(২) সন্ধ্যাদি ক্রিয়া।

(৩) একান্তে সুখাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য সমস্ত জগদাদি বিষয়ের সঙ্গ বা আসক্তি ত্যাগ, তজ্জন্য বাহিরের বিষয় সকল যে বাসনারূপে হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া, পরে বাহিরের বিষয় প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে ধীরে ধীরে আত্মপুরুষের দিকে প্রবাহিত করিতে অভ্যাস।

(৪) ইহার জন্য প্রকৃতি যে আত্মপুরুষ হইতে ভিন্ন সর্ব্বদা তাহার বিচার।

(৫) এই বিচারের ফলে বোধ হইতে থাকিবে মানসিক বা বাহ্যিক যতপ্রকার কর্ম্ম হইতেছে সমস্তই প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা চৈতন্যদীপ্তা হইয়া করিতেছেন। প্রকৃতির কর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইতেছে বলিয়া শুদ্ধ আত্মা যেন বাহিরের বিষয় দেখিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া যেন আপনাকে আপনি ভুলিয়া মায়াগুণে বিমোহিত হইয়া পড়িতেছেন। এই পর্য্যন্ত বিচার করিতে পারিলে বোধরূপী সদ্‌গুরুর উদয় হইবে। তখন দৃশ্যদর্শন মুছিয়া যাইবে এবং আত্মদর্শন পরিস্ফুট হইবে। তখন দেহী প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইবেন।'

ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
প্রকৃতেরন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি॥

তুমিও এইরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া সর্ব্বদা আত্মবিচার কর, করিয়া প্রকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক জানিয়া মুক্তি লাভ কর। ইহা যদি না পার, 'ধ্যাতুং যদ্যসমর্থোহসি' নির্গুণের ধ্যান বা 'আপনি আপনি' ভাবে স্থিতিলাভ করিতে যদি না পার তবে "সগুণং দেবমাশ্রয়" সগুণ ঈশ্বরকে অবলম্বন কর।

স্ত্রী। প্রত্যহ এই সমস্ত চেষ্টা করিতে হইবে। আমি তোমার কথামত চলিতে চেষ্টা করিব সত্য তজ্জন্য প্রাতঃস্নান নিত্য সন্ধ্যাদি করিবই। কিন্তু নির্গুণ

স্থিতি আমার পক্ষে কতদূর সম্ভব তাহাত তুমি দেখিতেছ। আমার সগুণ দেবতার আশ্রয়ই লোভনীয়। তুমি এই আশ্রয়ের কথাই বল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যাহারা প্রাতঃস্নানে অসমর্থ তাহারা কি করিবে তাহা একটু বলিয়া দাও।

স্বামী। সাত প্রকারের স্নান আছে। যাঁহাদের প্রাতে অবগাহন স্নান ভীতিকর, তাঁহারা আর্দ্রগাত্রমার্জ্জনী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করতঃ ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। ইহাও স্নানের প্রকার ভেদ।

স্ত্রী। 'স্বগুণং দেবমাশ্রয়ের' কথা বল।

স্বামী। হৃৎপদ্মকর্ণিকে স্বর্ণ পীঠে মণিগণান্বিতে।
মৃদুশ্লক্ষ্ণতরে তত্র জানক্যাসহ সংস্থিতম্॥
বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যুৎপুঞ্জ নিভাম্বরং।
কিরীটহারকেয়ূরকৌস্তুভাদিভিরন্বিতম্॥
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতং তথৈব বনমালয়া।
লক্ষ্মণেন ধনুর্ব্বন্দ্বকরেণ পরিসেবিতম্॥
এবং ধ্যাত্বা সদাত্মানং রামং সর্ব্বহৃদিস্থিতং।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
শৃণু বৈ চরিতং তস্য ভক্তৈর্নিত্যমনন্যধীঃ।
এবং চেৎ কৃতপূর্ব্বাণি পাপানি চ মহান্ত্যপি।
ক্ষণাদেব বিনশ্যন্তি যথাঽগ্নেস্তূল রাশয়ঃ॥

হৃদয় কমলের কর্ণিকার মধ্যে মণিময় অথচ কোমল এবং স্নিগ্ধ ও চিক্কণ সুবর্ণ সিংহাসন। তাহার উপরে সীতার সহিত শ্রীরাম। শ্রীরামচন্দ্র বীরাসনে উপবিষ্ট। আকর্ণ বিস্তৃত কি সুন্দর শত সাধভরা নয়নযুগল। পরিধানে বিজলি পুঞ্জের ঘন ঘন ঝলকের মত পীতাম্বর। মস্তকে কিরীট, গলায় হার, হস্তে কেয়ূর। বক্ষে কৌস্তুভমণি। এই সমস্ত আভরণে হৃদয়-দেবতা অলঙ্কৃত। চরণে নূপুর, হস্তে বলয় ও গলায় বনমালা; এই সকলে কি অপূর্ব্ব সেই ভাবের মূর্ত্তি! উভয় হস্তে ধনুর্ব্বান ধরিয়া লক্ষ্মণ উপবিষ্ট। এই ভাবে ধ্যান কর আর আরও ভাব যে আমার আত্মারামই অন্য সকলের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে এইভাবে যিনি ধ্যান করেন তিনি যে মুক্ত হইয়া যান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আর একান্ত ভক্তি সহকারে প্রত্যহ যদি তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মসমূহ শ্রবণ কর

তাহাতে তোমার পূর্ব্বকৃত গুরুপাপসমূহ অগ্নিতে তুলারাশি যেরূপ দগ্ধ হয় সেইরূপ একক্ষণেই দগ্ধ হইয়া যাইবে।

স্ত্রী। ধ্যান করিতে যিনি প্রস্তুত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি হইতেছে বিশ্বাস। যাঁহার বিশ্বাস নাই তাঁহার কোন ধর্ম্মই হয় না।

স্বামী। বেশ কথা তুলিয়াছ। বল দেখি কি বিশ্বাস তোমাকে রাখিতে হইবে ?

স্ত্রী। আকাশে যেমন সূর্য্য, আর সূর্য্যমণ্ডলে যেমন দেবতা সেইরূপ হৃদয়ের মধ্যেও আকাশ আছে। সেই আকাশে সূর্য্যমণ্ডল। তাহার মধ্যে আমার দেবতা, আমার পরাণ পুতুলী।

স্বামী। হাঁ তাই। ইহা কল্পনা নহে। সত্য সত্যই হৃদয়ের রাজা হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে সেই পুরুষ বিরাজ করিতেছেন।

শ্রুতি সেই পুরুষ সম্বন্ধে বলিতেছেন।

অঙ্গুষ্টমাত্রঃ পুরুষোন্তরাত্মা
সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

অঙ্গুষ্টমাত্র পুরুষরূপে অন্তরাত্মা সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

আবার পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ সূর্য্যদেবকে আকাশের মধ্যে যেমন একটি ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় গোলক মত দেখায় সেইরূপ দহর আকাশে দুই কর্ত্তিত ত্রিভূজ মধ্যে জ্যোতির্বিন্দু মধ্যে যাঁহাকে অঙ্গুষ্ট পুরুষ রূপে দেখা যায় তিনিই—

সহস্র শীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাহত্যাতিষ্টাদ্দশাঙ্গুলম্॥

স্ত্রী। সত্যই। হৃদয়ের রাজা হৃদকমলে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্বাস যদি না থাকে, আর ইনিই সচ্চিদানন্দ পুরুষ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, ইনিই নির্গুণ, ইনিই অব্যক্ত সগুণ বিশ্বরূপ, ইনিই অবতার, ইহা যদি বিশ্বাস করিতে না পারা যায় তবে কাহাকে ডাকিব, তুমি এস ? কাহাকে বলিব তোমার সর্ব্বশক্তি আছে, আমার এই দুঃখ দুর করিতে তোমার আয়াস কিছুই নাই, তুমি মনে করিলেই আমার সকল দুঃখ দুর করিতে পার ; তথাপি যে আমি দুঃখ পাই, হে আমার দেবতা! তাহা তোমার জ্ঞাতসারেই পাই। আমি যে দুঃখ পাই তাহা যখন তুমি জান তখন দুঃখই আমার সুখ। কেন না এইরূপ দুঃখ-ভোগ ভিন্ন অন্য কোন

রূপে আমার মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। মঙ্গলময় তুমি—তুমি যাহা জীবকে আনিয়া দাও তাহা কখন অমঙ্গল হইতে পারে না। বিশ্বাস না থাকিলে—হৃদয়ের দেবতা হৃদয়ে আছেন, এইটি স্থির বিশ্বাস না করিলে ধ্যানই বা কাহার হইবে? উপাসনাই বা কাহার হইবে? বাহিরের প্রতিমা সম্বন্ধেও এই বিশ্বাস থাকা চাই। আমার হৃদয়ে যিনি, আকাশ ভরিয়া যিনি, এক কথায় ভিতরে বাহিরে যিনি পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই এই মূর্ত্তিতে আসিয়াছেন। তিনিই এই মূর্ত্তি। তিনি অজ হইয়াও আপনার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করেন। এইটি প্রবলরূপে বিশ্বাস করিতে না পারিলে কোন প্রকার সাধনা যথার্থ মঙ্গল আনিয়া দিতে পারে না। আমার কিন্তু আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

স্বামী। বল। যতক্ষণ জিজ্ঞাস্য থাকিবে ততক্ষণ আমিও আছি।

স্ত্রী। আর জিজ্ঞাস্য না থাকিলে?

স্বামী। সে কথা থাক্। বল কি জিজ্ঞাস্য।

স্ত্রী। হৃদয়-কমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

স্বামী। আচ্ছা। শুন। শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন সমস্তই বলিতেছি—

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
শুচির্ব্বাপ্যশুচির্ব্বাপি ধ্যায়েৎ সততমীশ্বরম্॥
স্বদেহায়তনস্যান্তে মনসি স্থাপ্য কেশবং।
হৃদ্‌পদ্ম পীঠিকামধ্যে ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ॥

* * * * *

চিন্তয়েৎ হৃদয়ে পূর্ব্বং ক্রমাদাদৌ গুণত্রয়ম্।
তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা সত্ত্বেনাচ্ছাদয়েৎ রজঃ॥
ধ্যায়েৎ ত্রিমণ্ডলং পূর্ব্বং কৃষ্ণং রক্তং সিতং ক্রমাৎ।
সত্ত্বোপাধিগুণাতীতঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ॥

ধ্যেয়মেতদশুদ্ধঞ্চ ত্যক্ত্বা শুদ্ধং বিচিন্তয়েৎ।
ঐশ্বর্য্যং পঙ্কজং দিব্যং পুরুষোপরি সংস্থিতম্॥
দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণং শুদ্ধং বিকশিতং সিতম্।
নালমষ্টাঙ্গুলং তস্য নাভিকন্দ সমুদ্ভবম্॥

পদ্মপত্রাষ্টকং জ্ঞেয়মনিমাদিগুণাষ্টকং।
কর্ণিকাকেশরং নালং জ্ঞানবৈরাগ্যমুত্তমম্॥
বিষ্ণুধর্ম্মঞ্চ তৎ কন্দমিতি পদ্মং বিচিন্তয়েৎ।
তদ্ধর্ম্ম জ্ঞানবৈরাগ্যং শিবৈশ্বর্য্যময়ং পরম্॥

জ্ঞাত্বা পদ্মাসনং সর্ব্বং সর্ব্বদুঃখান্তমাপ্নুয়াৎ।
তৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে শুদ্ধদীপশিখাকৃতিম্॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্।
কদম্বগোলাকাকারং তারং রূপমিব স্থিতং॥

ধ্যায়েদ্বা রশ্মিজালেন দীপ্যমানং সমন্ততঃ।
প্রধানং পুরুষাতীতং স্থিতং পদ্মস্থমীশ্বরম্॥
ধ্যায়েজ্জপেচ্চ সততমোঙ্কারং পরমক্ষরম্।
মনঃ স্থিত্যর্থমিচ্ছন্তি স্থূলধ্যান মনুক্রমাৎ॥

তদ্ভূতং নিশ্চলীভূতং লভেৎ সূক্ষ্মেঽপি সংস্থিতিম্।
নাভিকন্দে স্থিতং নালং দশাঙ্গুলসমায়তং॥
নালেনাষ্টদলং পদ্মং দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তৃতম্।
সকর্ণিকে কেসরালে সূর্য্য সোমাগ্নিমণ্ডলং॥

অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
পদ্মী চতুর্ভুজো বিষ্ণুরথবাষ্টভুজো হরিঃ॥
শার্ঙ্গাক্ষবলয়ধরঃ পাশাঙ্কুশধরঃ পরঃ।
স্বর্ণবর্ণঃ শ্বেতবর্ণঃ সশ্রীবৎসঃ সকৌস্তুভঃ॥

বনমালী স্বর্ণহারী স্ফুরৎমকর কুণ্ডলঃ।
রত্নোজ্জ্বল কিরীটশ্চ পীতাম্বর ধরো মহান্॥
সর্ব্বাভরণভূষাঢ্যো বিতস্তির্ব্বা যথেচ্ছয়া।
অহং ব্রহ্ম জ্যোতিরাত্মা বাসুদেবো বিমুক্ত ওম্॥

ধ্যানাচ্ছ্রান্তো জপেন্মন্ত্রং জপাচ্ছ্রান্তশ্চ চিন্তয়েৎ।
জপধ্যানাদিযুক্তস্য বিষ্ণুঃ শীঘ্রং প্রসীদতি॥

ইহার মধ্যে সব কথাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। আপন আপন কুলগুরুর নিকটে জানিয়া লইলে সকলেরই হইবে। এখানে ব্যাখ্যা করা আর হইল না।

স্ত্রী। আমার সকল গুরুই কিন্তু—

স্বামী। আচ্ছা তাই। কিন্তু জানিও—

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি জ্যোতীংষি ভূয়শ্চ হৃদি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥
হৃদ্যন্তশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং তত্ত্বং তত্ত্বমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তেজোময়ং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

এক কথাই বহুরূপে বলা হইল। ধ্যানের পরে মানসপূজা করিবে। পুরুষেই স্থিতিলাভ হয়, তজ্জন্য তাঁহার দিব্য শক্তির ধ্যান করিতে হয়। এই দিব্যশক্তিই বরণীয় ভর্গ। ইনিই আত্মশক্তি। ইঁহার ধ্যানই আমাদিগকে সেই নিত্য মুক্ত শুদ্ধ পুরুষের নিকটে লইয়া যায়। যে যেখানে যাঁহার উপাসনা করে তাহা বরণীয় ভর্গেরই উপাসনা। যত যত স্থানে সেই পরম পুরুষ মূর্ত্তিধারণ করেন তাহা এই বরণীয়ভর্গ আশ্রয়েই করিয়া থাকেন। যিনি চিৎ তিনি শক্তি অবলম্বনেই চিৎশক্তি হয়েন। যাহা কিছু মূর্ত্তি তাহা চিৎশক্তিরই মূর্ত্তি। মূলতত্ত্বটি এইরূপে জানিয়া নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তিকে ঐশ্বর্য্য পদ্মের উপরে অবস্থিত ভাবিয়া এবং নাভিস্কন্দ সমুদ্ভব জ্ঞান-বৈরাগ্যনালের উপরে অনিমাদি অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে শুদ্ধদীপশিখাকৃতি অঙ্গুষ্ঠমাত্র নির্ম্মল ওঙ্কার ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। ঐ ঈশ্বরের উর্দ্ধ প্রবাহিত বরণীয় ভর্গ প্রকটিত হইয়া পঞ্চ দেবতার মূর্ত্তিও ধারণ করিতেছেন। এইগুলি ভাল করিয়া স্ব স্ব গুরুর নিকট জানিয়া লইয়া সেই বরণীয় ভর্গকে আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তিতে চিন্তা করিতে হয়। যিনি মাতৃভাবে চিন্তা করেন তিনিও মাই প্রাণেশ্বর এইভাবে দেখিয়া তাঁহাতেই সকল ভাব প্রস্ফুট দেখিবেন; আবার যিনি স্থিতি লাভ ইচ্ছা করেন, তিনি ইষ্ট দেবতার সাহায্যে পরমানন্দে স্থিতি লাভও করিবেন।

তোমার পক্ষে সন্ধ্যা বন্দনাদির পরে শান্ত হইয়া সুখাসনে উপবেশন করিয়া একান্তে মানস পূজাই সুন্দর উপাসনা। মানসপূজা ভাবনা রাজ্যেই করিতে হয়।

স্ত্রী। ভাবনা রাজ্যে থাকিতে থাকিতে যখন তাহাকে সাক্ষাতে দেখিতে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন কতবার বলা হইয়া যায়—

"রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"
আমি কারে বা বুঝাই মা!
এরা হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী!

আহা তখন কতই কাঁদিতে হয়? দেখ এই শুভমুহূর্ত্তে বড়ই মনোহর বোধ হইতেছে। কি জানি কোথায় যেন চলিয়া যাইতেছি। মনে কত কি হইতেছে বলিব?

স্বামী। বল।

স্ত্রী। মনে হইতেছে যেন এই পৃথিবী ছাড়িয়া অন্তরীক্ষ মণ্ডলে উঠিলাম। আবার তাহা ছাড়িয়া স্বর্লোকে পৌছিলাম। সেখানে সূর্য্যদেবের উর্দ্ধ প্রবাহিত জ্যোতিরাশি দ্বারা এই ত্রিলোকের শেষ সীমায় আসিলাম। আহা! কি সুন্দর সে স্থান। সেস্থান অমৃত-সমুদ্রের তীর। তীরে আসিবামাত্র কি এক সুন্দর পদ্ম ভাসিয়া উঠিল। আমি আর সে আমি নই। দেহ আর স্থূল দেহ নাই। কি সুন্দর ভাবনাময় তন্মাত্র গঠিত দেহে আমি সেই পদ্মের উপরে উঠিয়া বসিলাম। পদ্ম উর্দ্ধতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে সুধা সাগরেব মধ্যে যেন চলিল। উহা যেখানে গিয়া পৌছিল আহা! সে কি সুন্দর মণিময় দেশ। পদ্ম সেই অমৃত সাগরের মধ্যবর্ত্তী মণিময় দেশে পৌছিল। দেখিলাম মণিময় সোপানের শেষ সোপানে এক পুরুষ, ভাল করিয়া দেখিলাম,—আমার নারায়ণ। কি সুন্দর রূপ! কি হাস্য! কত অলঙ্কার এই শরীরে! কি দিব্য দেহ! বলিতেও পারি না কত মনোভিরাম তিনি! আমার হাতে ধরিয়া তিনি সেই মণিময় দেশে লইয়া চলিলেন। কি সুখ-স্পর্শ! সমুদ্র মধ্যে দেশ। তীরে রত্নদ্রুম। কত সুন্দর পুষ্প বাটিকা। পরেই সপ্ত যোজন বিস্তীর্ণ প্রাকার। চারি দিকে চারি দ্বার। কত কত জগতের ঈশ্বর দর্শনার্থ সেখানে আসিতেছেন। কত সুন্দর বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী, ভ্রমর প্রজাপতি। সেই সুন্দর দেশের মধ্যভাগে দেখিলাম—কুমুদকহ্লার সুশোভিত হংসকারণ্ডবাকীর্ণ চারি সরোবর। তন্মধ্যে চারিটি রত্নমণ্ডপে পরিবেষ্টিত একটি কল্পবৃক্ষের মূলে আর একটি মণ্ডপ। আমার নারায়ণ আমাকে সেই কল্প

বৃক্ষমূলে রত্ন বেদিকার নিকটে আনিলেন। সেখানে সুন্দর রত্নোদ্ভাসিত সিংহাসনে কি দেখিলাম! চক্ষুতে চক্ষু আবদ্ধ। আহা! এই বুঝি সেই অনুরাগ অনুরাগিনী। কতক্ষণ যেন কোথায় আছি কিছুই বুঝিলাম না। যখন চক্ষু মিলিলাম তখন দেখিলাম সেই দিব্যোদ্যান কেলী কলকণ্ঠী, সেই আগম বিপিন ময়ূরী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আর চারিদিক সেই বিকচকচামোদ মাধুরী ভৃঙ্গনাদে পরিপূরিত। দেখিতে দেখিতে আবার কিছুই দেখিলাম না। আবার দেখিলাম আমিই ধ্যান মগ্ন। কেহ কোথাও নাই। যেমন মনে করিলাম কোথায় সে? অমনি দেখিলাম দয়মান দীর্ঘনয়নে চাহিয়া চাহিয়া, মধুর হাসি হাসিয়া মনোমোহন বেশে মাই প্রাণেশ্বর হইয়া আমাকে কোলে লইয়াছেন। তারপরে—আর ত বলিতে পারিলাম না।

* * * * *

সেদিন আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না।

বর্ষ-বিদায়।

এস এস মন। আমরা আবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার আয়োজন করি। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা পুঁছিয়া ফেলিবার উপায় করি এস। তবেই আর তুমি বিব্রত হইবে না।

ঐ দেখ পুরাতন চলিয়া যায়—পুরাতন পত্র ঝরিয়া পড়িল, পুরাতন ফুল শুকাইয়া গেল, এস এস আমরাও পুরাতন অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নূতন সৎসঙ্গে নূতন করিয়া জীবন পথে চলি এস!

এস এস এককে হৃদয়-সরোজে বসাও। এইটি যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ তুমি কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিবে না। একই তোমার অবলম্বন। এই তোমার ইষ্ট, এই তোমার মন্ত্র, এই তোমার গুরু।

যিনি তোমার এক, তিনি সর্ব্বদাই স্বরূপে এক কিন্তু মূর্ত্তিতে বহু, কর্ম্মে বহু,

বাক্যে বহু, ভাবনায় বহু। তোমার ইষ্টটি হৃদয়ে বসাইবার বস্তু। সমুদ্রের উপরে যেমন বহু তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে. আকাশে যেমন বহুবর্ণের মেঘ খেলা করে, সেইরূপ সেই একেরই উপরে বহু মূর্ত্তি ভাঙ্গে ভাসে। তথাপি সেই ইষ্টমূর্ত্তিই তোমার অবলম্বন।

তুমি যখন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবে তখন সেই হৃদয়ের মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই 'ব্রহ্মা মুরারি' পাঠ কর; যখন জপ তপ কর তখন সেই হৃদয়ের রাজাকেই স্মরণ করিয়া জপ তপ কর, যখন সূর্য্যার্ঘ্য দাও, যখন গণপতির পূজা কর, যখন শিবপূজা কর, তখন ভাবনা কর সূর্য্যমূর্ত্তিতে, গণপতি মূর্ত্তিতে, শিব মূর্ত্তিতে, কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে, দেবী মূর্ত্তিতে তুমি সেই এককেই ভজনা করিতেছ। যখন স্বাধ্যায় কর, যখন বহু দেবদেবীর স্তবস্তুতি পাঠ কর তখন সেই হৃদয়ের রাজাকে, সেই হৃদয়ের রাণীকেই যে তাঁর বহু বহু মূর্ত্তির কথা, বহুরূপের কথা, বহু লীলার কথা শুনাইতেছ উহা ভুলিও না।

বুঝিতেছ কেন বেদ এই উপদেশ দিতেছেন? বেদ বলিতেছেন অগ্রে তুমি ভক্ত হও। তুমি যতক্ষণ সকলকেই সেই একভাবে দেখিতে না শিখিবে ততক্ষণ তোমার ঠিক ঠিক ভক্ত হওয়া হইবে না। তুমি রাজস তামস হইয়া অত্যন্ত অসুখী হইয়া যাইবে, শান্তি কিছুতেই পাইবে না। যতক্ষণ না তুমি শত্রু, মিত্রে, পক্ষীতে, আকাশে সমুদ্রে, সূর্য্যে তারকায়, কৃষ্ণেতে কালীতে, দুর্গাতে রাধাতে, সকল দেবতায় সকল অসুরে, সর্ব্বত্র সেই এককেই না দেখিতে শিখিবে ততক্ষণ তোমার মনের বিবাদ কিছুতেই মিটিবে না।

ভক্ত সতী স্ত্রীর মতন। সতী স্ত্রী স্বামীকে একভাবেই কি দেখেন? 'এক ঘেয়ে' কোন কিছুতে এই নিত্য চঞ্চলার তৃপ্তি হয় না। স্বামী কখন বালক, কখন যুবক, কখন বৃদ্ধ, কখন সন্ন্যাসী কখন ভিখারী, কখন রাজা কখন প্রজা, কখন ক্রোধমূর্ত্তি কখন হাস্যমূর্ত্তি, কখন অমিত পরাক্রমশালী কখন অতি দুর্ব্বল, কখন মাতা, কখন পুত্র, জগতে যত কিছু রূপ থাকিতে পারে, জগতে যত কিছু মূর্ত্তি সম্ভব হয় সকলই আমার সেই দয়িতের—সেই ঈপ্সিততমের খেলা, তাঁরই ভঙ্গী।

মন! যখন তুমি শত গোলমাল তুলিয়া আমার মস্তক ঘুরাইতে থাক তখন আমি যদি তোমাকে ভাল করিয়া দেখি, আর দেখিয়া দেখিয়া বলি—তরঙ্গ ত সমুদ্র ভিন্ন কিছুই নহে, মন তুমি আবার একটা কি! আহা আমার সেই! মন সাজিয়া আসিয়াছ, আচ্ছা তোমাকে প্রণাম। যখন কেহ আমাকে উৎপীড়ন করে

তখন আমি যে মুহূর্ত্তে বলি, আহা! তুমিই এই কালপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছ, তখন আমার উৎপীড়নেও সুখ। যখন রোগ আমার শরীরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে তখন যে মূহূর্ত্তে মনে করি, রোগ রূপে তুমিই আসিয়াছ, তখন আর ব্যস্ততা থাকে না। আহা! বহুকে এক দেখায় বড় সুখ। এককে সকল দেখায় বড় সুখ। তথাপি এক একই; শুধু মুখসের তফাৎ।

তাই বলিতেছিলাম বর্ষ-বিদায়ে তোমাকে প্রণাম করি। বর্ষরূপে তুমিই আসিয়াছিলে; সুখ দুঃখ, রোগ উৎপীড়ন নানা ভঙ্গে খেলা করিয়া চলিয়া যাইতেছ। আমি সকল সময়ে, হৃদয়বিহারী তুমি, তোমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া, তোমাকে মনে রাখিয়া রাখিয়া, তোমাকে দেখিতে পারি নাই, তাই আমার ক্রটী হইয়াছে, আমার অপরাধের ক্ষমা কর, আমি প্রণাম করিতেছি। আমি আমার উৎপীড়কের মুখস তুলিয়া উৎপীড়ক রূপী তোমাকে দেখিতে পারি নাই, আমাকে ক্ষমা কর। আমি আমার রোগকে সর্ব্বদা তোমার খেলা রূপে দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আমি আমার বৈদ্যকে সর্ব্বদা তুমি ভাবে না দেখিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি, আমি আমার যাতনাকে তোমার স্নেহের দান ভাবিয়া সর্ব্বদা শান্ত হইতে পারি নাই, হে আমার দেবতা! আর আমি যেন ইহা না ভুলি। শ্রীমহাবীর অলঙ্ঘ্য সমুদ্র লঙ্ঘনের সময়ে হৃদয়স্থিত তোমাকে স্মরণ মাত্রে দুর্ল্লঙ্ঘ্য সাগরকে গোষ্পদের মত মনে করিতে পারিয়াছিলেন, দশস্কন্ধের সভাতে বদ্ধাবস্থায় আনীত হইয়াও ঐ প্রবল শত্রুর নিকটে কিছুমাত্র দীনতা যে প্রকাশ করেন নাই সে কেবল হৃদয়বিহারী তোমাকে স্মরণ করিয়া। তাই বলিতেছি নির্ভয় হইবার মূলসূত্র হৃদয়ে সেই একেকে বসান। এইটি যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ মন! তুমি কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিবে না।

এস এস, পুরাতন-বিদায়ে এইটির উপায় করি; এস এস নূতনের আবাহনে এইটিরইই দৃঢ় সঙ্কল্প করি, আমাদের ভাল হইবে।

জগতে দুঃখ আছে, দুঃখ থাকিবেই। দুঃখও থাকিবে অথচ আমাকে সন্তুষ্ট হইয়া সকল দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া লইতে হইবে। "বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথা পাতি লয়" আমাকেও তাই করিতে হইবে। আমারই কর্ম্মফলে—মন! কোথাও তুমি স্বামীহারা, কোথাও তুমি পুত্রহারা, কোথাও তুমি লোকের কাছে উপহাসের বস্তু, কোথাও তুমি উৎপীড়িত! লোককে সুখ-দুঃখের দাতা, লোককে তোমার যাতনার কারণ ভাবিয়া অসন্তুষ্ট হইলে কি হইবে? কেহই তোমাকে

দুঃখ দিতেছে না। তুমি তোমার প্রাণের প্রাণকে প্রাণে না বসাইয়া কষ্ট পাইতেছ। হৃদয়-সিংহাসনে প্রাণের ঠাকুরকে বসাও—সর্ব্বদা তাহার দিকে চাইতে অভ্যাস কর, শত নন্দিনীর গঞ্জনার ভিতরেও তুমি তার হাসি মুখ দেখিতে পারিবে, আর তার রঙ্গ দেখিয়া গোপনে কতই হাসিবে আবার কতবার তাহাকে বলিবে, রঙ্গময় তোমাকে প্রণাম। ঐ শোন বালিকা গাহিতেছে—

"একটি গাছে দুটি কোকিল, ডালে বসে কর কি
আর ডেকনা সোণার কোকিল, আমি কৃষ্ণ হারা হয়েচি"।

হৃদয়-বৃন্দাবনে যাহারা একবার কৃষ্ণসঙ্গ করিয়াছে তাহারা যখন তাহাকে সত্য সত্য দেখিতে পায় না তখন কোকিল ডাকিলে বলে "আর ডেকনা সোণার কোকিল আমি কৃষ্ণহারা হয়েচি"। তুমি যদি এতদূর না পার—যদি যথার্থ ভক্ত না হইয়াও থাক তবে না হয় বিশ্বাসে ঐ সমস্ত ভাবনা কর। করিয়া দেখ, কিছুদিন কর দেখিবে সত্য সত্যই তারে দেখাও যায়, তারে পাওয়াও যায়, আর বলাও যায়—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেব স ভক্তান্ কিমুপেক্ষতে?

প্রাপ্তি-স্বীকার।

নব্যন্যায়—সটীক সানুবাদ—ব্যাপ্তিপঞ্চক—মাথুরী। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ লোটাস লাইব্রেরী। ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মূল্য ৫৲ টাকা।

শাস্ত্রসংগ্রহ। বেদান্তপ্রস্থান। ১ম খণ্ড। অদ্বৈতসিদ্ধি—মধুসূদন সরস্বতী-কৃত সিদ্ধান্তলেশঃ অধ্যায় দীক্ষিতকৃত। খণ্ডনখণ্ডনখাদ্যম্ শ্রীহর্ষকৃত এবং প্রত্যকতত্ত্ব প্রদীপিকা বা চিৎসুখী—চিৎসুখাচার্য্যকৃত। এই চারিখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। সকলগুলির ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত।

আজপর্য্যন্ত নব্যন্যায়ের বঙ্গানুবাদ হয় নাই। সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়া শাস্ত্রানুরাগী জ্ঞানাকাঙ্খীর এবং সমাজের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা সমালোচনার জন্য এই দুই পুস্তক পাইয়াছি। পরে আমরা এই দুই পুস্তক পড়িয়া সমালোচনার চেষ্টা করিব।

অভিমান।

আমায় মান দিয়ে কেন রাখ্‌লে দূরে,
তোমার আপন হ'তে পর করে ?
আমার বাজ্‌লো লুকানো হৃদয়-পুরে,
মাগো ? এ ব্যথা আজ নূতন করে।

আমার ব্যথা লাগ্‌বে নাকি তোর বুকে ?
তাই ভাসিয়ে দিলি নয়ন জলে ;
আমার ভার কি মা তোর এতই ভার ?
চাস্‌ মন ভুলাতে কথার ছলে।

বাঁচিয়ে তুলে, আতপ বাতে ঝঞ্ঝাবাতে
সদা রাখ্‌লি যারে আপন বলে ;
জেনো, মায়ের ছেলে হো'ক যতই বড়
তবু মায়ের বাঞ্ছা আঁচল তলে।

একে এই উঠা নামার স্রোতের মাঝে
মাগো ? বসিয়ে গেলি পথের প'রে ;
আমার ভয় দেখাস্‌ তুই রঙ্গ করে
তাই অভিমানে মোর নয়ন ঝরে।

তোমার শীতল চরণ ছায়ার তলে
আমি লুটিয়ে রব "তোমার" ব'লে ;
দেখবো থাকিস কেমন মা দূরে ফেলে
মোর করম সারার অন্তকালে॥

১৩২২ সালের বর্ষ-সূচী।